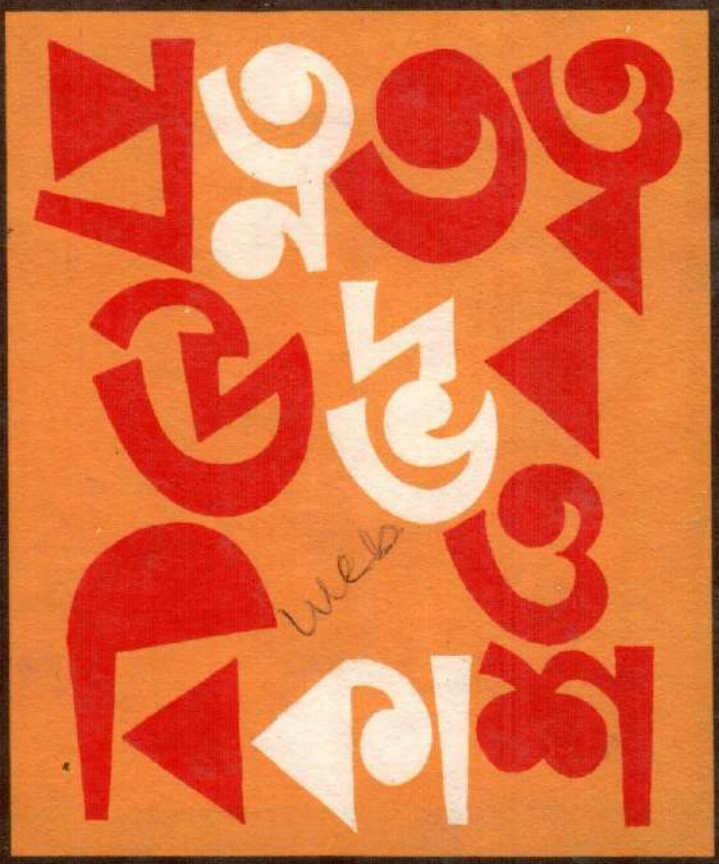
প্রত্নতত্ত্ব
উদ্ভব ও বিকাশ



web

মোঃ মোশারফ হোসেন

প্রত্নতত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ

পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

BANGLA AKADEMY Dhaka

মো: মোশারফ হোসেন

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫/জুন ১৯৯৮

বাএ ৩৮১২
মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০
(অর্থ বর্ষ ১৯৯৭-৯৮ সআবা উপবিভাগ)

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন
নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত ষাট টাকা মাত্র

PRATNATATTWA : UDBHAV O BIKASH PARIPREKSHIT BANGLADESH (Archaeology : Beginning and Development in the Perspective of Bangladesh), Author Md. Mosharraf Hossain. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Edition : June 1998. Price : Tk. 160.00 Only.

ISBN 984-07-3821-6

BANSDOC Library

উনিশ শত একাত্তরের
অখ্যাত শহীদদের
রক্ত সার্থক হউক,
এ কামনায়
এ ছোট প্রয়াস।

মুখবন্ধ

ইতিহাস রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লিখিত বিবরণ (Textual narratives)। কিন্তু প্রাচীন লিখিত উপাদানগুলোতে মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি সববিষয় বিশদভাবে উল্লিখিত থাকে না। এর কারণ দু'টি। প্রথমত, প্রাচীন লিখিত উপাদানগুলো সরাসরি সমাজের অভিজাত শ্রেণী অথবা তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত হতো। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কালে সমাজের বর্ণভেদ (caste system) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লালিত হতো। স্বভাবত:ই সে কালের রচনাগুলোতে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় সম্পর্কিত তথ্যাবলি উহ্য থাকত। তাই কেবল প্রাচীন লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে যে সমাজ বা জাতির ইতিহাস রচিত হয় তা কোনক্রমেই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে বিবেচিত হতে পারে না। অন্যদিকে, প্রত্নতত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় ও ভূ-খণ্ডে (Time and space) বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের জীবনের সাথে জড়িত সবধরনের সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি (cultural traits) অনাবৃত ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যাবতীয় সূত্রাদি সরবরাহ করে। এর ফলে ইতিহাস যেখানে নির্বাক, প্রত্নতত্ত্ব সেখানেই হয়ে উঠে সবাক। তাই প্রত্নতত্ত্বকে যথার্থভাবেই 'ইতিহাস-ঐতিহ্যের শেকড়' বলে ধরে নেয়া যায়।

একটি কথা প্রচলিত আছে, 'যা থাকে দৃশ্যের আড়ালে তা চলে যায় মনের অন্তরালে'। ইতিহাস দৃশ্যের আড়ালে পড়ে যাওয়া ঘটনাগুলোকে বই-এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরে। প্রতিটি ঘটনার পশ্চাতেই কোন না কোন ফলাফল থাকে তা সফলতার-ই হোক অথবা ব্যর্থতারই হোক। তাই ইতিহাস হলো এমন একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জাতি তার স্বরূপ দেখতে পায়। এর ফলে দু'টি মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, সফলতার ঘটনাগুলো একটি জাতির মধ্যে আত্মতৃপ্তি যোগায়। আর এর থেকে ঐ জাতি অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাছাড়া ঐ জাতি গর্ব ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার বুনিয়াদ লাভ করে। দ্বিতীয়ত, ব্যর্থতার উদাহরণগুলো জাতির সামনে যুগপৎভাবে ভুলের পরিমাণ ও তার মাশুলের ব্যাপ্তি তুলে ধরে। ফলে উক্ত জাতি নিজেদের সফলতা ও ব্যর্থতার তুলনামূলক বিশ্লেষণের আলোকে ভবিষ্যতের জন্য একটি ত্রুটিমুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে।

বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব যুদ্ধংদেহী জাপান ও বর্তমান বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক-প্রভু জাপানের পররাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতিমালার তুলনামূলক আলোচনা করলেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠে। এ ভাবে দেখা যাবে, ইতিহাস হচ্ছে সে আয়না যা দিয়ে একটি জাতি তার অতীতের

BANSDOC Library
Accession No.....

প্রতিচ্ছবি দেখে দেখে ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র আঁকে। আর প্রত্নতত্ত্ব হলো এমন একটি ঘটনা যা ইতিহাসের রূপকারগণের জন্য বৈচিত্র্যময় রঙের সম্ভার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হলে তা ইতিহাস সম্পর্কীয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী পদ্ধতির মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্ননিদর্শনাদির উপস্থাপনার গুরুত্ব অসীম। কারণ প্রত্ননিদর্শন পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষিত করে থাকে। তাই প্রত্নতত্ত্বের পৃষ্ঠপোষকতার সাথে জড়িত আছে ইতিহাস শিক্ষা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও ঐতিহ্যের লালন সংক্রান্ত যাবতীয় স্বার্থ। সম্ভবত, এ বিষয়গুলো বাংলা ভাষাভাষী সকলের নিকট সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরার মানসেই লেখক এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হোক, এটাই একান্তভাবে কাম্য।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা বহুদিন পর্যন্ত একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকের কাছে তাই বিষয়টি আজও একেবারেই অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছে। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রত্নতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রায় সবদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচিতে প্রত্নতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে সুখের কথা এই যে, বিলম্বে হলেও অতিসম্প্রতি আমাদের দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে তৈরি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক কোন প্রকাশনা প্রকাশের উদ্যোগ এ যাবৎ গৃহীত হয় নি। আলোচ্য পুস্তকে এই শূন্যতা পূরণের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

এই পুস্তকে সর্বমোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে। এরমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশসহ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিহাসে বিরাজমান যুগ-বিভাজন এবং এর আলোকে প্রত্নতত্ত্বের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রগুলির সম্পর্কের ধরন নির্ণয়ের উপযোগী বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন যুগের প্রত্নবস্তুসমূহের (হস্তান্তরযোগ্য প্রত্ননিদর্শন) ধরন প্রাযুক্তিককলার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে পঞ্চম অধ্যায়ে ইমারত (স্থাপত্যকীর্তি) সম্পর্কিত তথ্যাবলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইমারত ও প্রত্নবস্তুগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট উপস্থাপনাযাগ্য রাখার প্রক্রিয়াগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত গৃহীত ও সম্পাদিত প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের প্রাথমিক ফলাফলের একটি চিত্র বিধৃত করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সবশেষে নবম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ও এর পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ খননের ফলাফলগুলোর আলোকে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। আর এ জন্যই পুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে 'প্রত্নতত্ত্ব : উদ্ভব ও বিকাশ' (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ)। আশা করি, বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব নামক বিষয়টির রূপরেখা অনুধাবন করার পাশাপাশি নিজ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক আঙ্গিকটিও উপলব্ধি করা সহজ হবে। আমার এ প্রয়াস সার্থক হলে নিজকে কৃতার্থ মনে করব।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের প্রাক্কালে বিভিন্ন পর্যায় থেকে আমি বিবিধ সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ লাভ করেছি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন জনাব আ.ক.ম. যাকারিয়া, প্রয়াত অধ্যাপক এম. আর. তরফদার, অতিরিক্ত সচিব জনাব নাজমুল আহসান চৌধুরী, সাবেক যুগ্মসচিব জনাব মোসলেম আলী ও উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এছাড়া প্রায়-ই রাত জেগে পাশে বসে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে আমার দুই কন্যা মাজেদা হোসেন ও

ফৌজিয়া হোসেন। অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় পুস্তক-পুস্তিকা যুগিয়ে সহযোগিতা করেছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গবেষণা সহকারী শ্রী গোপাল কৃষ্ণ দাস। পাণ্ডুলিপি রচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে যাদের প্রকাশনা ও মৌখিক আলোচনা থেকে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের প্রতিও আমার ঋণের অন্ত নেই। তাই এঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী পুস্তকটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি বাংলা একাডেমীর কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বলব, আপ্রাণ চেষ্টা করেও পুস্তকটির কোন কোন পর্যায়ে অনাহুত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের পর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমগুলো সম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশনার অভাব এবং এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যাবলি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার বেশিরভাগ বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন পরোক্ষ সূত্র থেকে। সুতরাং এ বিষয়ে পাঠক ও শিক্ষার্থীদের সহৃদয় সহানুভূতি কামনা করে বলতে চাই যে, এটি কোন গবেষণাধর্মী পুস্তক নয়, বরং পাঠ্যপুস্তক। এ পুস্তকের মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের একটি প্রাথমিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

মোঃ মোশারফ হোসেন
উপপরিচালক-কাম-কীপার
জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
মে ১৯৯৮

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	ছ
প্রসঙ্গ কথা	ঝ
পরিস্ফুটন	ড
১. প্রত্নতত্ত্ব	১৭
২. প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপ্তি	৫৩
৩. প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু	৬৮
৪. ঐতিহাসিক প্রত্নবস্তু	৮৭
৫. ইমারত	১৩৩
৬. উপস্থাপনা	১৬৪
৭. বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম	১৮৯
৮. বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ভবিষ্যৎ	২৫২
৯. সমীকরণ	৩০৪
পরিশিষ্ট	
১. উপাস্য মূর্তি পরিচিতি	৩২০
২. পরিভাষা ও প্রতিশব্দ	২৬১
৩. গ্রন্থপঞ্জি	৩৭৩

পরিস্ফুটন

	রেখাচিত্র	পৃষ্ঠা
১.	সমোন্নত মানচিত্র	২৮
২.	জালাকার নক্‌শা	৩০
৩.	খনন খাদের সেকসনের দৃশ্য	৩৩
৪.	সেকসনের দৃশ্য অঙ্কনে ব্যবহৃত বিবিধ চিহ্ন	৩৭
৫.	প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় বিভিন্ন নিদর্শনাদি	৫৯
৬.	মধ্য-প্রাচীন পাথর পর্বের প্রযুক্তিবিদ্যা	৭০
৭.	মধ্য-পাথর পর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা	৭২
৮.	নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার	৭৪
৯.	নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার	৭৬
১০.	মধ্য-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার	৭৮
১১.	উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্ব, মধ্য-পাথর পর্যায় ও পুরা-ঐতিহাসিক যুগীয় নিদর্শনাদি	৮১
১২.	নব্য-পাথর পর্বের হাতিয়ার	৮৩
১৩.	হস্তলিপিবিদ্যার নমুনা	৯৭
১৪.	তুঘরা হস্তলিপিবিদ্যার নমুনা	৯৯
১৫.	ছাপাঙ্কিত ও লিপিবিহীন ছাঁচ নির্মিত মুদ্রায় ব্যবহৃত কিছু চিহ্ন	১০৪
১৬.	বাংলাদেশে ব্যবহৃত মৃৎপাত্র পোড়ানোর বদ্ধচুল্লি	১১০
১৭.	মৃৎপাত্রের বিভিন্ন অংশ	১১৬
১৮.	খোলামকুচি থেকে মৃৎপাত্র অঙ্কনের বিভিন্ন দিক	১১৮
১৯.	দগ্ধপূর্ব কালো প্রলেপযুক্ত ওয়্যার, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত	১২০
২০.	দগ্ধপূর্ব কালো প্রলেপযুক্ত ওয়্যার, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত	১২১
২১.	মূর্তির হাতে ধৃত কিছু আয়ুধ	১২৩
২২.	মূর্তির দেহের বিভিন্ন ভঙ্গি	১২৫
২৩.	মূর্তির হাতের বিভিন্ন মুদ্রা	১২৭
২৪.	স্তূপের বিভিন্ন অংশ বিভাজন	১৩৫
২৫.	বাংলাদেশের কয়েক প্রকারের মন্দির	১৪৫

রেখাচিত্র	পৃষ্ঠা
২৬. রত্নমন্দিরের বিভিন্ন অংশ বিভাজন	১৪৭
২৭. মসজিদের প্রধান সম্মুখভাগের কয়েকটি অংশ	১৫১
২৮. বড়দুয়ারী মসজিদের ভিত্তি-পরিকল্পনা, কোটবাড়ি, রোয়াইলবাড়ি, নেত্রকোণা	১৫২
২৯. বড়দুয়ারী মসজিদের প্রধান সম্মুখভাগের দৃশ্য, কোটবাড়ি, রোয়াইলবাড়ি, নেত্রকোণা	১৫৩
৩০. তাহখানার ভিত্তি-পরিকল্পনা, গৌড়, চাপাইনবাবগঞ্জ	১৬০
৩১. হাওয়াখানার ভিত্তি-পরিকল্পনা, তারাপুর, পুটিয়া, রাজশাহী	১৬২
৩২. পাল আমলে তৈরি মূর্তির অলঙ্কার	১৮১
৩৩. স্তূপ ও বিহারের ভিত্তি-পরিকল্পনা, হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি, সাভার, ঢাকা	১৯৮
৩৪. লালবাগ দুর্গের ভূমি-পরিকল্পনা, ঢাকা	২০০
৩৫. ভূমি-নকশা, রূপবান মুড়া, কোটবাড়ি, কুমিল্লা	২০৮
৩৬. রাণীর বাঙলোর স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের ভূমি-পরিকল্পনা, ময়নামতি, কুমিল্লা	২১২
৩৭. বিভিন্ন প্রত্নস্থলের অবস্থান, বারবাজার, ঝিনাইদহ	২১৪
৩৮. সিতাকোট বিহারের ভিত্তি-পরিকল্পনা, দিনাজপুর	২২১
৩৯. গোবিন্দ ভিটার ভিত্তি-পরিকল্পনা, মহাস্থানগড়, বগুড়া	২৩৮
৪০. হলুদ বিহারের ভিত্তি-পরিকল্পনা, বদলগাছী, নওগাঁ	২৫০
৪১. মহাস্থানগড় সংলগ্ন অঞ্চলের মানচিত্র প্রত্নস্থল	২৬০
৪২. প্রত্নস্থলসমূহের অবস্থান দেখিয়ে লালমাই-ময়নামতি	২৭৩
৪৩. বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র	৩০২
৪৪. গৌড়-লক্ষ্মণৌতি	৩১৪

আলোকচিত্র	
১. স্তরবিন্যাসিত সেকশনের দৃশ্য	৩২
২. সাধারণ দৃশ্য, জগদল ঢিবি, ধামুরহাট, নওগাঁ	৩৪
৩. ব্রাহ্মী লিপি, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত	৯১
৪. পটিকের মুদ্রা	৯১
৫. বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি তাম্রফলক	৯২
৬. কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের অভ্যন্তরভাগের দেয়ালের লতাপাতাসহ কুফিক ও নাস্‌খ হস্তলিপিবিদ্যার অলঙ্করণ	৯৪

	আলোকচিত্র	পৃষ্ঠা
৭.	লিপিবিহীন ছাঁচে তৈরি মুদ্রা	১০১
৮.	ছাপাঙ্কিত মুদ্রা	১০২
৯.	চাকীতে ঘুরিয়ে পাত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপ	১১২
১০.	পাহাড়পুড়ে প্রাপ্ত বাদামি রঙের মৃৎপাত্র	১১৩
১১.	উপবিষ্ট গরুড়, কাঠের তৈরি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সৌজন্যে	১২৮
১২.	জৈব মূর্তি, দিনাজপুরে প্রাপ্ত	১২৯
১৩.	জনার্দন বিষ্ণু, আনুমানিক খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতক	১৩০
১৪.	পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বুদ্ধ	১৩১
১৫.	কালোপাথরের শিবলিঙ্গ	১৩২
১৬.	নহবতখানা, নিমতলি, ঢাকা	১৪০
১৭.	দু'আনী সরস্বতী মন্দির, দেওপাড়া, নেত্রকোণা	১৪১
১৮.	জৈন দেরাসোরহ, বগুড়া	১৪২
১৯.	সাধারণ দৃশ্য, ছোটসোনা মসজিদ, গৌড়, চাপাইনবাবগঞ্জ	১৫০
২০.	দিনাজপুর রাজবাড়ির প্রধান তোরণ	১৫৬
২১.	বড়কাটারার দক্ষিণ তোরণ, ঢাকা	১৫৭
২২.	বর্তমানে বড়কাটারার ভেতরের অংশ, ঢাকা	১৫৮
২৩.	পাহাড়পুর ঢিবি, খননপূর্ব দৃশ্য	১৭০
২৪.	পাহাড়পুর বিহার, খনন ও সংরক্ষণের পর	১৭১
২৫.	হরিশ্চন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি, খনন পরবর্তী দৃশ্য	১৯৬
২৬.	শালবন বিহারের এরিয়েল দৃশ্য, ময়নামতি, কুমিল্লা	২০৩
২৭.	রূপবান মুড়ায় প্রাপ্ত বেলে পাথরের বুদ্ধ, ময়নামতি, কুমিল্লা	২০৫
২৮.	ভোজবিহারে অনাবৃত ব্রঞ্জ নির্মিত বজ্রসত্ত্ব, ময়নামতি, কুমিল্লা	২০৬
২৯.	ভারতভয়নায় অনাবৃত প্রকোষ্ঠ	২১৮
৩০.	ভারতভয়নায় অনাবৃত পোড়ামাটির নরমুণ্ড	২১৯
৩১.	সাধারণ দৃশ্য-গোবিন্দ ভিটা, মহাস্থানগড়, বগুড়া	২৩৭
৩২.	সাধারণ দৃশ্য : গোকুল মেধ, গোকুল, বগুড়া	২৪৩
৩৩.	গোয়ালভিটা, পাহাড়পুর ঢিবির সাধারণ দৃশ্য	২৪৭
৩৪.	গোয়ালভিটা ঢিবিতে অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ	২৪৮
৩৫.	মহাস্থানগড়ের উত্তর প্রাচীরে অনাবৃত তোরণ	২৬১

	আলোকচিত্র	পৃষ্ঠা
৩৬.	মহাস্থানগড় সংলগ্ন ছোট ট্যাংরার ধাপ	২৬২
৩৭.	ছোট ট্যাংরার ধাপে প্রাপ্ত বেলে পাথরের বৌদ্ধ মূর্তি	২৬৩
৩৮.	বেলে পাথরের স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ, পাথরঘাটা, পাঁচবিবি জয়পুরহাট, ১৯৮৪	২৬৫
৩৯.	তুলশীগঙ্গা নদীতে পড়ে থাকা পাথরঘাটার পাথরপট্ট, পাথরঘাট, জয়পুরহাট	২৬৬
৪০.	চন্দ্রবর্মন কোটের দক্ষিণপূর্ব কোণের বর্হিদৃশ্য, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ১৯৯০	২৬৮
৪১.	মাহিসন্তোষ দুর্গের পরিখা, পূর্ব কোণ, ধামুরহাট, নওগাঁ	২৭৭
৪২.	মাহিসন্তোষ দুর্গের পরিখা, ধামুরহাট, নওগাঁ	২৭৮
৪৩.	শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালির মসজিদের সম্মুখভাগের দৃশ্য, গৌড়	২৮০
৪৪.	সাধারণ দৃশ্য, গোয়ালদি মসজিদ, সোনারগাঁ	২৮১
৪৫.	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার, সোনারগাঁ	২৮৪
৪৬.	ষাট গম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের থাম, বাগেরহাট	২৮৬
৪৭.	লালবাগ দুর্গের পশ্চিম প্রাচীর, ঢাকা	২৮৮
৪৮.	অন্তিম-মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক পূর্বের ইউরোপীয় শিল্পীর চোখে লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বর্হিদেশ	২৯০
৪৯.	বড়কাট্যারার দক্ষিণ তোরণের দৃশ্য ঢাকা	২৯৪
৫০.	ভিতরগড়ের ইটের দেয়ালের অংশ, পঞ্চগড়	২৯৫
৫১.	পাথরের স্তম্ভমূল, ভিতরগড়, পঞ্চগড়	২৯৬
৫২.	যোগেশ্বরী, বেলে পাথর, কুমারপুরে প্রাপ্ত	২৯৯
৫৩.	কুমারপুরের পাথর খণ্ড	৩০০
৫৪.	দিবরস্তম্ভ, পোরশা, রাজশাহী	৩০১
৫৫.	পরিখাসহ গৌড় দুর্গের দক্ষিণ প্রাচীর	৩১৫

প্রত্নতত্ত্ব

ইংরেজি Archaeology শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রত্নতত্ত্ব। সংস্কৃত প্র+ত্ন (ত্নপ)= প্রত্ন = পুরাতন এবং তৎ+ত্ব(তত্ত্ব) – জ্ঞান বা বিজ্ঞান থেকে আধুনিক কালে প্রত্নতত্ত্ব শব্দটি জন্ম লাভ করেছে। অপরদিকে গ্রিক শব্দ archaia এবং logos শব্দদ্বয় থেকে Archaeology শব্দের উৎপত্তি। এরঅর্থ যথাক্রমে 'প্রাচীন দ্রব্যাদি' ও 'জ্ঞান' বা 'বিজ্ঞান'। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রত্নতত্ত্বের অর্থ দাঁড়ায় 'পুরাতন দ্রব্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান'। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্নতত্ত্ব আরও ব্যাপক অর্থ বহন করছে। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বিস্মৃত মানুষের জীবনধারা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনার কাজে নিয়োজিত জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখাটিই প্রত্নতত্ত্ব। বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিচারে এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এরমধ্যে মানবতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

উদ্ভব ও বিকাশ

খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৬–৫৩৯ অব্দে বেবিলনের সিপ্পুরে (Sippur) অবস্থিত সামাথ (Shamath) নামক একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নির্মাতার নাম জানার উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বপ্রথম ঐ দেশের সম্রাট নাবনিডাস (Nabonidus) মন্দিরটির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খনন কাজ পরিচালনা করেন। অতপর সম্রাটের কন্যা এন্নিগালডি–নান্না (Ennigaldi-Nanna) খননে উন্মোচিত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সংগৃহীত নিদর্শনাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এরপর গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডেস (Thucydides) বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে ৪৬০–৩৯৬ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এথেনসের অধিবাসীগণ দেলসের (Delos) ইজিয়ান (Aegean) দ্বীপের প্রাচীন সমাধিগুলোতে খনন পরিচালনা করে খননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি সম্পর্কে তদানীন্তন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অপরদিকে প্রাচীন নিদর্শনাদি ও নগরীর ধ্বংসাবশেষের সূত্র ধরে নিজ নিজ পূর্ব-পুরুষগণের সম্পর্কে জ্ঞানাহরণের অভিব্যক্তি সুপ্রাচীন কাল হতে চৈনিকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আরও লক্ষ করা গেছে যে শুধু অভিজাত সমাজই নয় নিরক্ষর সাধারণ মানুষও মুখে মুখে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পূর্ব-পুরুষগণের কীর্তিকাহিনী টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল। রোমান দার্শনিক লুকরেটিয়াস

(Lucretius) খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৯৬–৫৫ এবং চৈনিক উয়ান ক'অঙ (Yuan k'ang) খ্রিস্টীয় এক শতকে রচিত তাঁদের রচনাগুলোতে প্রত্ননিদর্শন ও বিভিন্ন সূত্র থেকে লভ্য সূত্রাদির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তদানীন্তন ও প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক কালের অন্যান্য কিছু লেখকের আলোচনায় আদিবাসী মানুষের বিবিধ কার্যাবলিও স্থান লাভ করেছিল। এভাবে দেখা যাবে যে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেও মানুষ প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করত এবং এ উদ্দেশ্যে প্রাচীন নিদর্শন ও সূত্রাবলি নিয়ে গবেষণা করত। তবে প্রত্নতত্ত্ব নামক আধুনিক শাস্ত্রটি জন্মলাভ করেছিল আরও অনেক পরে।

খ্রিস্টীয় পাঁচ শতকের দিকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন বিষয়াবলি নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেয়। ইউরোপীয় ইতিহাসে অন্ধকার ও মধ্যযুগ নামে পরিচিত এইপর্বে কেবল কতকগুলো কিংবদন্তি ও বাইবেল ভিত্তিক কিচ্ছাকাহিনীসহ নেহাৎ সাম্প্রতিক বিষয়াবলির আলোচনার উপর গুরত্বারোপ করা হতো। এ সময় প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় পাথরের হাতিয়ারগুলো বজ্রপাতের মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত স্বর্গীয় আয়ুধ এবং প্রাচীন খোলামকুচিগুলো মৃত্তিকার প্রকৃতিজাত বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে আলোচনায় স্থান লাভ করত। কিন্তু খ্রিস্টীয় পনের শতকে সূচিত রেনেসাঁ (Renaissance) যুগীয় পুনর্জাগরণের সাথে সাথে গ্রিক ও রোমের প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের আলোচনা বেগবান হয়ে উঠে। এমনকি, বিত্তবানদের নিকট প্রাচীন নিদর্শনাদি সংগ্রহ করা এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কাজের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণাক্রমের এই অধ্যায়টি 'প্রাচীন শিল্প-রসিক অভিজাত পর্ব' (Age of the dilettanti) নামে বিবেচ্য। প্রাচীন শিল্পরসিক এ অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে লালিত হয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি প্রাচীন প্রত্নস্থল অনুসন্ধান এবং সন্ধানলব্ধ প্রত্নস্থলগুলোতে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যথেচ্ছা মূল্যবান শিল্পনিদর্শনাদি লুণ্ঠন এবং তা বিক্রয় করে বিপুল বিত্ত অর্জনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। ফলে ক্রমাগত বিলুপ্ত ও উজাড় হতে শুরু করেছিল অসংখ্য প্রত্নস্থল। এসবের মধ্যে মিশরের পিরামিড ও ইউরোপের প্রাচীন সমাধিগুলো অন্যতম। প্রত্নতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের এ পর্বটিকে তাই যথার্থভাবেই 'ঐশ্বর্য লুণ্ঠন পর্ব' হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

ঐশ্বর্য লুণ্ঠনকারীদের বদৌলতে রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনাদি দিয়ে খ্রিস্টীয় ষোল শতকে ইতালির বাজারগুলো জমজমাট হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থাকে প্রতিহত করতে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ইংরেজ জাতিই সর্বপ্রথম সজাগ হলেন। ১৫৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রাচীন নিদর্শনাদি তদারকী ও গবেষণার জন্য জন লিল্যাণ্ড (John leland) নামক একজন পণ্ডিতকে নিয়োগ করলেন। লিল্যাণ্ড দীর্ঘদিন ধরে বহু প্রাচীন নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণায় এককভাবে নিয়োজিত থাকেন। এরপর উইলিয়াম কার্ডেন (william carden) নামে অপর একজন পণ্ডিত ১৫৮৬ সালে ব্রিটেনে এক প্রাথমিক আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান পরিচালনা করে ইংল্যাণ্ডের ভূমির উপর দণ্ডায়মান প্রাচীন নিদর্শনসমূহের এক বিস্তারিত তালিকা

প্রণয়ন করা সহ ব্রিটেনিয়া (Britannia) নামকরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। এ প্রকাশনায় প্রতিটি এলাকার স্থান বিবরণের সাথে সংগতি রেখে প্রাচীন ইমারতগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এমনকি, জমিতে উদ্ভিদের দেহবৃদ্ধির ধরনের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে মাটির নিচে ঢাকা পড়া প্রত্নস্থল শনাক্তকরণের সহজ পদ্ধতির বিষয়েও বলা হয়েছিল। এরই অনুবৃত্তিক্রমে পরবর্তীকালে এরিয়াল মাধ্যমে প্রত্নস্থল শনাক্তকরণের রীতি প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমে সমাদৃত হয়ে উঠেছিল।

শুধু তাই নয়, জন অব্রে (John Aubrey) নামক অপর এক পণ্ডিত স্টোনহেনজ (Stonehegne)[১] এবং এ্যাবেভুর্য (Abebury)[২] নামক দু'টি প্রত্নস্থলের দর্শনযোগ্য প্রত্ননিদর্শনাদির বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। এভাবে জন্মের প্রায় উনিশ শত বছর পর রাজা ও পণ্ডিতবর্গের যুগ্ম পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতনতা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে উত্তরণ করল। আর এ পর্যায়টিকেই প্রকৃতঅর্থে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের জন্মের প্রথম ধাপ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আঠারো শতকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতনতা এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব নামক নতুন বিজ্ঞানটি তার প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত করতে শুরু করে। কারণ জন অব্রের বিবরণের উপর নির্ভর করে ১৭০৯ সালে হারকুল্যনেউম (Herculleaneum)[৩] এবং পম্পেই (Pompeii)[৪] অঞ্চলে প্রথম কিছু সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসরণে খনন শুরু হয়। তবে খননের মাধ্যমে আহরিত দ্রব্যাদি ও তথ্যাদি পরস্পর সমন্বয় করে এই দু'টি প্রত্নস্থলের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হয় নি। তাই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজ এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করতে তৎপর হলেন, যে পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস উদ্ধার এবং উন্মোচিত নিদর্শন সংরক্ষণের যৌথ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়।

প্রত্নতত্ত্বের এই ধীর অগ্রযাত্রা ১৯১৮ সালে অত্যন্ত গতিশীল হয়ে উঠল। কারণ ঐ বছর ডেনমার্ক জাতীয় জাদুঘরের কিউরেটর (curator) ক্রিসচিয়ান যে থমসেন (christian j

---

১. পৃথিবীর একটি বিখ্যাত ম্যাগালিথিক (Megalithic) প্রত্নস্থল। এটা বৃটেনের সলিসবিউরি (Salisbury) অঞ্চলে অবস্থিত। এ প্রত্নস্থলে খননের ফলে কবর, মন্দির এবং ম্যাগালিথিক স্মৃতিস্তম্ভ অনাবৃত হয়েছে।

২. এটিও বৃটেনের বিখ্যাত ম্যাগালিথিক প্রত্নস্থল। এখানে ব্রঞ্জ পর্বেরও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৩. রোমের নেপলেস শহরের নিকটবর্তী একটি প্রত্নস্থল। এ প্রত্নস্থলে কয়েকটি পর্যায়ে খনন পরিচালিত হয়েছিল ; যথা- ১৭৩৮ থেকে ১৭৬৫, ১৮২৮-১৮৭৫ এবং ১৯২৫। তবে এ প্রত্নস্থল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আহরণের কাজ অদ্যাবধি সম্পন্ন হয় নি।

৪. প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য এবং বর্তমান ইতালির একটি শহর। বর্তমান নেপলেস শহর থেকে ১০ কি.মি. দূরবর্তী এ এলাকায় খ্রিস্টপূর্ব দশ শতকে জেলেদের একটি বিস্তীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীর ঘেরা এ জনবসতিতে অজস্র দালানকোঠা, মন্দির, জুয়াখেলার সংগঠন, মিলনায়তন, হোটেল, নাট্যমঞ্চ, ব্যাসিলিকা ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় ৬২ সালের এক ভূমিকম্পে এ শহর ধ্বংস হয় এবং খ্রিস্টীয় ৭৯ সালের বিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাত এই শহরকে লাভার নিচে ঢেকে দেয়।

Thomsen) ভূপৃষ্ঠ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া প্রত্নবস্তুগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, এই যুগকে তিনি তিনটি পর্যায় পরম্পরায় শ্রেণীবদ্ধও করেন। পর্যায়গুলো যথাক্রমে পাথর পর্যায়, ব্রঞ্জ পর্যায় ও লোহার পর্যায়। ১৮৩৬ সালে তিনি Guide to Nordic Antiquities শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি তাঁর উল্লিখিত থ্রি এইজ স্কিম অব প্রিহিস্টরির (Three Age Scheme of Prehistory) প্রত্যেক পর্যায়ের সাথে জড়িত প্রত্নবস্তু, সমাধিস্থকরণে অনুশাসনাবলি ও সমাধি স্থাপত্য ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীতে উক্ত জাদুঘরে যে. যে. অরস্যাই (J. J. Warsaae) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অরস্যাই প্রথম একটি সাংস্কৃতিক টিবিতে খনন পরিচালনা করে প্রস্তাবিত যুগ বিন্যাস অনুযায়ী স্তরবিন্যাস শনাক্ত করে থ্রি এইজ স্কিমের অস্তিত্বকে যুক্তিনির্ভর ভাবে উপস্থাপন করেন। ফলে খনন পরিচালকগণের নিকট স্তরবিন্যাস সমীক্ষার এক নতুন পথ অবারিত হলো।

থ্রি এইজ স্কিমের আলোকে পরিবর্ধিত খনন রীতিকে জার্মান পণ্ডিতগণ আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। কারণ ১৮৬০ সালে ইতালির পম্পেই (Pompii) প্রত্নস্থল giuseppe Fiorelli দ্বিতীয় দফা নতুন ভাবে খনন পরিচালনা শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উক্ত প্রত্নস্থলে বসবাসকারী মানুষদের সম্পূর্ণ জীবন প্রণালি সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাই প্রত্নস্থলটিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খনন পরিচালনার পরিবর্তে তিনি প্রথম প্রত্নস্থলটিতে সরেজমিনে ভূপৃষ্ঠদেশীয় আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে গোটা কয়েক সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন করেন। অতঃপর কেবল স্তরবিন্যাস নির্ধারণ করার লক্ষ সম্মুখে রেখে নির্বাচিত স্থানগুলোতে থ্রি এইজ স্কিম অব প্রিহিস্টরির ধারণার আলোকে খনন অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৮৭০ সালে Ernst Cartius গ্রিসের অলিম্পিয়ায়, Robert koldeway এবং Walter Andrae ইরাকের মেসোপটেমিয়ায়, Hurbert Schemidt তুরস্কের ANAU প্রত্নস্থলে অপেক্ষাকৃত সতর্কতা ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে খনন পরিচালনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার Robert koldeway এবং Walter Andrae সর্বপ্রথম 'গভীর শব্দ বিন্যাস' পদ্ধতি অনুসরণ করে খনন স্থান নির্বাচনের রীতি প্রচলন করেন। অপরদিকে Andrae খননে প্রাপ্ত পাথর, ধাতু, হাড় ও অন্যান্য উপাদানে তৈরি নিদর্শনগুলো, এমনকি শস্যকণা পর্যন্ত বিশ্লেষণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পেশাদারগণকে নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হেনরি পিট রিভার্স নিজের খামারবাড়ি ডরসেটের Cranborne Charse প্রত্নস্থলে খনন পরিচালনা করেছিলেন। তিনি যেহেতু একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন সেহেতু খননের নিয়মকানুন পালনের প্রতি কঠোর নিষ্ঠাবান ছিলেন। শুধু তাই নয়, তার খননের নীতিমালার শর্ত ছিল (ক) সমস্ত প্রত্নস্থল জুড়ে খনন, (খ) প্রতিদিন প্রাপ্ত প্রতিটি নিদর্শনের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ, (গ) খননে স্তরবিন্যাস নির্ণয় পদ্ধতি নিখুঁতভাবে অনুসরণ, (ঘ) সকল প্রাপ্তিকে সমান গুরুত্ব প্রদান, (ঙ) পূর্বের যেকোন প্রাপ্তির চেয়ে বর্তমানের প্রাপ্তিকে অধিক গুরুত্বারোপ, (চ) খননের প্রতিটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রণয়ন ও (ছ) খননের ফলাফল যতটা সম্ভব দ্রুত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর

পর স্যার জন মার্শাল এই শর্তাবলি অক্ষুণ্ণ রেখেই হরপ্পা ও মহেনজোদারোর বিস্তৃত প্রত্নস্থলগুলো সাফল্যের সঙ্গে অনাবৃত করণে সক্ষম হয়েছিলেন।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের সর্বশেষ রূপকার মর্টিমার হুইলার (১৮৯০-১৯৭০ সাল)। তাঁর অন্যতম অবদানগুলো হলো (১) জালাকার পদ্ধতি অনুযায়ী খনন পরিচালনা, (২) অনাবৃত হয়েছে এমন সব প্রত্নবস্তুর যথাযথ অবস্থানের বিবরণ নথিভুক্ত করণ, (৩) ত্রিমাত্রিক পদ্ধতি অনুসরণে প্রতিটি প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির মাপঝোক লিপিবদ্ধকরণ, (৪) প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং আরও অনেক কিছু।

বর্তমান বিশ্বে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যাবলি ও এর উদ্দেশ্য ক্রমেই আরও ব্যাপক হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৮ সালে আরিজোনার তাসকানে পরিচালিত The Garbage Project Rathji-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এ প্রকল্পে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কেবল একটি শহরের সকল বর্জ্যভাগাড়ে প্রাপ্ত বর্জ্যগুলোর উপর গবেষণা সীমিত রেখে ঐ শহরে বসবাসকারী বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনের অনেক অজানা তথ্য, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনধারা এবং প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ধরন, চাহিদা, অভিরুচি ইত্যাদি বিষয়ে অগনিত সূক্ষ্ম তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরফলে অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে যথাক্রমে সঠিক আমদানি নীতি, অপরাধ দমন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতামূলক বেশকিছু প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে দেখা যাবে যে প্রত্নতত্ত্ব আজ আর কেবল অতীতের অনুসন্ধানের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে সহায়ক সূত্রাবলি অনুসন্ধানপূর্বক কল্যাণকর প্রস্তাব প্রণয়নে নিয়োজিত হয়েছে। আর তাই দিন দিন এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা জন্ম গ্রহণ করছে। এসবের মধ্যে স্যালভেজ আরকেওলজি (Salvage Archaeology), এথনো-আরকেওলজি (Ethno-archaeology), আণ্ডার ওয়াটার আরকেওলজি (Under water Archaeology)। ইনডাসট্রিয়াল আরকেওলজি (Industrial Archaeology), মেরিন আরকেওলজি (Marine Archaeology), সেটেলমেন্ট আরকেওলজি (Settlement Archaeology) ও প্রসেসুয়াল আরকেওলজি (Processual Archaeology) উল্লেখযোগ্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

আজকের বিশ্বে প্রত্নতত্ত্ব যতই নতুন ব্যাপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, এর মূল কর্মকাণ্ড কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিস্মৃত মানুষের কার্যাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এই কর্মকাণ্ড যেহেতু পৃথিবী নামক গ্রহের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেহেতু এই কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল সূত্রাবলি বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাছাড়া এসব সূত্রাবলির প্রেক্ষাপটে রয়েছে পরস্পর ভিন্নমুখী বহুশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। আর এ শাস্ত্রগুলোর মধ্যে একটিই মূল ঐক্যসূত্র উপ্ত রয়েছে। এ ঐক্যসূত্রের পাদপিঠ ইতিহাস। প্রসঙ্গটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ-

শাস্ত্র	গবেষণার উপাত্ত	গবেষণার উদ্দেশ্য
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণী জগৎ	প্রাণীর ইতিহাস
ভূতত্ত্ব	শিলাস্তর	পৃথিবীর ইতিহাস
নৃতত্ত্ব	হাড়হাড্ডি ও সংস্কৃতি	মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ও সংগঠনের ইতিহাস
ইতিহাস	লিখিত উপাদান	মানুষের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক বিবরণ
প্রত্নতত্ত্ব	মানুষের তৈরি ও ব্যবহৃত সম্পদ অর্থাৎ স্মারকসূত্র।	ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন।

তবে আলোচ্য পুস্তকের মূলবিষয়বস্তু যেহেতু প্রত্নতত্ত্ব সেহেতু প্রত্নতত্ত্বের সাথে ইতিহাসের সম্পর্কটির প্রতিই অধিকতর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টা গৃহীত হলো।

ইতিহাস বলতে সংক্ষেপে বোঝায়, লিখিত বিবরণের উপর ভিত্তি করে অতীত মানুষের ধারাবাহিক ঘটনার সারসংকলন প্রণয়ন। কিন্তু সবযুগে সকল জনগোষ্ঠীতে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না। আবার বর্ণমালা প্রচলনের প্রথমদিকে যেসব বর্ণ ব্যবহৃত হতো সেগুলোর পাঠোদ্ধারও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি। এছাড়া পাঠোদ্ধারযোগ্য বর্ণ সংবলিত প্রাচীন লিখিত উপাদানের ভগ্নদশা অথবা অতিরঞ্জন দুষ্টতার কারণে অধিকাংশ পাঠোদ্ধার এখনও সর্বজনস্বীকৃতভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। দ্বিতীয়ত, লিখিত উপাদানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের উচুস্তরের মানুষের বিশেষ বিশেষ ঘটনার বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকে। তাই, শুধু মাত্র লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে বিস্মৃত মানুষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় লিখিত উপাদানে বিদ্যমান শূন্যতাসমূহ পূরণে বিস্মৃত মানুষের পরিত্যক্ত সকল নিদর্শনাদি অর্থাৎ স্মারকসূত্র একনিষ্ঠভাবে সাহায্য প্রদান করতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি একটি বিশেষ ধরনের গর্তে মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহলে কঙ্কালটি পড়ে থাকার ধরন অনুযায়ী প্রাচীন মৃতদেহ কবরস্থ করার বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণায় উপনীত হওয়ার সাথে সাথে প্রাপ্ত কঙ্কালের হাড়হাড্ডি বিশ্লেষণ করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী একদল মানুষের নরগোষ্ঠীর পরিচিতি সম্পর্কেও অবহিতি লাভ করা সম্ভব হয়। এসব তথ্য সাধারণত প্রাচীন লিখিত উপাদানে অনুপস্থিত থাকে। এভাবে দেখা যায়, প্রকৃত অর্থে প্রত্নতত্ত্ব হলো এমন একটি শাস্ত্র, যা প্রাচীন লিখিত উপাদানে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান, শূন্যতা পূরণ ও বর্ণিত ঘটনার সত্যতা যাচাই করত একটি বিশেষ সময়ে বসবাসকারী একটি মানব সমাজের গোটা চেহারার আদল তুলে ধরার মতো তথ্য পরিবেশন করে।

প্রত্ননিদর্শন

মানুষ পৃথিবীর বাসিন্দা, অনাদিকাল থেকে পৃথিবীতে সে প্রকৃতির কোলে এক সংগ্রামী জীবন অতিবাহিত করছে। মানুষের ভোগের জন্য খেয়ালি প্রকৃতি একদিকে যেমন পৃথিবীময় অসংখ্য উপাচার ছড়িয়ে রেখেছে, অন্যদিকে একইভাবে পদে পদে পেতে রেখেছে হাজারো প্রতিবন্ধকতার জাল। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী। তাই কোনকালে হার মানেনি কোন প্রতিবন্ধকতার কাছে, বরং প্রতিবন্ধকতার জালগুলো ছিঁড়তে উদ্ভাবন করেছে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং প্রয়োজনের তাগিদে ভূপৃষ্ঠের একপ্রান্ত ছেড়ে অপরপ্রান্তে সদম্ভে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু একটি প্রান্ত ত্যাগ করার প্রাক্কালে সেখানে ফেলে রেখে গেছে কিছু স্মারকসূত্র। এগুলো মোটামুটি দু'টি ভাগে বিভাজ্য হওয়ার যোগ্য ; (ক) স্পর্শ দিয়ে বোধ্য স্মারক মাটি, পানি, খনিজ সম্পদ, প্রান্তর, পাহাড়, উদ্ভিদ, পশুপাখি এবং নিজেদের উদ্ভাবিত বা রূপান্তরকৃত বস্তু-সামগ্রী ও (খ) স্পর্শ দিয়ে অবোধ্য স্মারক ধর্ম, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি এগুলোই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ভিত্তি যোগায়।

সকলপ্রকার স্মারকসূত্রগুলোর মধ্যে বিস্মৃত মানুষের তৈরি স্মারকসূত্রগুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ধরনের প্রতিটি স্মারকসূত্রই একটি বিশেষ যুগ ও ভূমণ্ডলে বসবাসকারী একদল নির্দিষ্ট মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে কোন একটি নির্ধারিত স্থানে এ শ্রেণীভুক্ত একটি বা একাধিক স্মারকসূত্রের উপস্থিতি লক্ষ করে এইমর্মে একটি প্রাথমিক ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব যে স্মারকসূত্রটির প্রাপ্তিস্থলে অথবা এর নিকটবর্তী কোন একটি স্থানে কোন একসময়ে এক দল বিস্মৃত মানুষ বাস করত। অতপর এই প্রাথমিক ধারণার উপর নির্ভর করে উক্ত স্মারকসূত্রটির উৎস সম্পর্কে গোটা কয়েক প্রশ্নের ভিত্তিতে অনুসন্ধান পরিচালিত হতে পারে। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ। (ক) প্রাপ্ত স্মারকসূত্রটি কি করে এর প্রাপ্তিস্থলে এল? (খ) এটি কাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো? (গ) ব্যবহারকারী মানুষগুলোই কি স্মারকসূত্রটির প্রস্তুত বা নির্মাণকারী? (ঘ) প্রাপ্ত স্মারকসূত্রটির ব্যবহারিক গুরুত্ব কি? (ঙ) প্রস্তুত বা নির্মাণ কাজে যে উপকরণ ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনুসৃত হয়েছে তার উৎসস্থল কোথায় এবং কারা এর উদ্ভাবক? এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হলে অন্যান্য সকলপ্রকারের স্মারকসূত্রগুলোরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সবশেষে যে উত্তরগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর সাথে লিখিত ইতিহাসে বিরাজমান বহু সমস্যা সমাধানের মতো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ তথ্য জড়িয়ে থাকে। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বে মানুষের তৈরি বা নির্মিত সকল শ্রেণীর স্মারকসূত্রগুলোকে একত্রে প্রত্ননিদর্শন অথবা প্রত্নসম্পদ বলে।

নমুনা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার বিচারে প্রত্ননিদর্শনগুলোকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা - বাস্তুজাত › ইমারত ও বস্তুজাত› প্রত্নবস্তু। আবার যেসব প্রত্নবস্তু তৈরির জন্য জৈব উপকরণাদি (হাড়, শিঙ, শঙ্খ জাতীয়) ব্যবহৃত হয় তেমন প্রত্নবস্তুগুলোর ক্ষেত্রে সম্প্রতি ইকফেক্ট (Ecofact) অভিধা অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। একইভাবে অবশিষ্ট প্রত্নবস্তুগুলোর প্রসঙ্গে আরটিফেক্ট (Artefact) অভিধা আরোপিত হচ্ছে।

পুনরায় বলে রাখা ভাল যে প্রতিটি প্রত্ননিদর্শন একটি সমাজের সাকার ও নিরাকার উভয় অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ, সকল যুগে সকল কালে প্রতিটি উৎপন্ন বা নির্মিত বস্তুর ব্যবহার, নির্মাণ কৌশল ও আকৃতি সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। এজন্যই প্রতিটি প্রত্ননিদর্শনকে মানুষের সম্পাদিত কাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারক এক অলিখিত ভাষা হিসাবে গণ্য করা যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্রত্ননিদর্শনগুলো মানুষের সম্পাদিত বিবিধ কাজের এক-একটি খুঁটিনাটি বিবরণ তুলে ধরে। যেমন- বাসস্থানের অবস্থান, বাসস্থানের ধরণ, উৎপন্ন বা ব্যবহৃত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য, নির্মাণসামগ্রী, প্রযুক্তিবিদ্যা, উপকরণ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।

প্রত্নবস্তুর উৎস

যেসব স্থানে প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় সেসব স্থানকে প্রত্নস্থল বলে। এগুলো সাধারণত নদীতট চত্বর, বন-বাদাড়, পরিত্যক্ত জমি, পাহাড়ের গুহা, টিলার ঢাল ও বিশালাকার গাছের পাদদেশে গচ্ছিত থাকে। আবার কখনও বা টিবির আকার ধারণ করে। প্রত্নস্থলগুলোর এ ধরনের স্থানবিবরণ কতকগুলো বিশেষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি বৈ আর কিছু নয়। এর কারণ অনেক। প্রথমত, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ, পর্যায়, পর্ব ও শাসনামলের মানুষ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে বসবাস করত। দ্বিতীয়ত, আবহাওয়া, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও নদীর গতি পরিবর্তনসহ ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূপৃষ্ঠের বহুস্থানে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ইরা (Era), পিরিয়ড (period), ইপোক (epoch) এবং হিমযুগগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উর্বর সমতল ভূমি নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে অথবা মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণেও আবার গড়ে উঠেছে নতুন নতুন লোকালয় বা জনপদ এবং এরসাথে সাথে পুরাতন বহুলোকালয় ও জনপদ হয়ে গেছে বিধ্বস্ত বা বিজন।

বিজন বা পরিত্যক্ত বসতিগুলোতে ধীরে ধীরে বাতাস তাড়িত হয়ে এবং বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে ধুলাবালি জমে উঠে। এর উপর একসময় পাখির বিষ্ঠা, বৃষ্টির পানি ও বাতাসের মাধ্যমে ভেসে আসা পরাগ-রেণু বা ফলের বীজ ছড়িয়ে পড়ত। এভাবেই ধীরে ধীরে বিস্তৃত মানুষের বসতি ও কীর্তিগুলো টিবি, পরিত্যক্ত অনুচ্চ প্রান্তর, জঙ্গলাকীর্ণ ইত্যাদি স্থানবিবরণ লাভ করেছে।

নদী তীরের বহু জনপদ সুদূর অতীতে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ধরনের জনপদের মানুষগুলো সঙ্গতকারণেই পরবর্তী সময়ে সমতল ভূমিতে বসবাস করতে ভয় পেত এবং নতুন বসতি স্থাপনের জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচুজমি বেছে নিত। এভাবে একদল মানুষ প্রাচীন কোন টিবির উপর নতুন করে বসবাস শুরু করত। তাই একটি টিবি আকারের প্রত্নস্থলে একাধিক যুগ, পর্যায়, পর্ব ও শাসনামলের প্রত্ননিদর্শন সঞ্চিত হতে থাকত। দ্বিতীয়ত, এমন

অনেক প্রত্নস্থলও থাকতে পারে যেখানে আদৌ কোন জনবসতি কোনকালে ছিল না। অথচ বন্যা বা অন্যকোন কারণে সৃষ্ট পানির স্রোত এ প্রত্নস্থলে প্রত্নবস্তু সঞ্চিত করেছে।

প্রত্ননিদর্শন আহরণ প্রক্রিয়া

প্রত্ননিদর্শনের সন্ধান লাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন প্রত্নস্থল শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে আবিষ্কারার্থে ভ্রমণ বা জরিপ পরিচালনা করা। এ কাজের শুরুতেই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ একটি বিশেষ অঞ্চল নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। এ প্রসংগে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত সবজায়গা সবসময় যাতায়াতযোগ্য থাকে না। আবার যাতায়াতযোগ্য হলেও ভ্রমণ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট ঝুঁকি, টাকা ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এ জন্যই জরিপ কাজ শুরু করার প্রাথমিক পর্যায়ে জরিপের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলের পরিবেশগত দিকগুলো (আবহাওয়া, মাটি, নদনদী, জীবজগৎ), ভাষা, আচার-আচরণ, লোকগাঁথা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, নৃতত্ত্ব, ভূতাত্ত্বিক বিবরণ, ধর্ম, সাংস্কৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পাদিত প্রকাশনাগুলো (যদি হয়ে থাকে) থেকে নানাবিধ তথ্য আহরণ করে নিতে হয়। এরফলে ঐ এলাকায় কোন্ কোন্ যুগে মানুষের বসতি গড়ে উঠা সম্ভব ছিল সে সম্পর্কে জরিপকারীদের মধ্যে একটি প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি হয়। আরও লক্ষ রাখা প্রয়োজন ইতিহাসের প্রতি যুগ, পর্যায় ও শাসনামলে বিস্মৃত মানুষের জীবনযাপন প্রণালি ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। বিশেষ ধরনের একটি জীবনযাপন প্রণালির সাথে একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশের আত্মজ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। অতএব, প্রথমেই যদি প্রত্যেক প্রতি যুগ পর্যায় পর্ব ও শাসনামলের জীবনধারণ ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিমূলক পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরিপ শুরু করা যায় তবে প্রত্নস্থল খুঁজে পাওয়ার কাজটি সহজ হয়ে উঠে।

কোন একটি প্রত্নস্থলে প্রত্ননিদর্শন আবৃত থাকলে ঐ স্থানের মাটির উর্বরতা পার্শ্ববর্তী জমির তুলনায় ভিন্নতর হয়। ফলে এই দুই স্থানের গাছের পাতার রঙসহ দেহবৃদ্ধির আনুপাতিক হার বিশ্লেষণ করলে একটি পার্থক্যের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পরিত্যক্ত স্থানে দূর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদ গজায়। অন্যদিকে আবাদি জমিতে থাকে পরিচিত গাছগাছালি। দ্বিতীয়ত, মাটির নিচে ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লুকানো থাকলে ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্গসংস্থানের অমসৃণ দৃশ্যপট বজায় থাকে। এ পার্থক্যগুলো এরিয়াল (Aerial) আলোকচিত্রে (পাখির দৃষ্টিতে দৃশ্যমান) সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার মাটির কাছ থেকে ধারণকৃত দৃশ্যে (বিড়াল দৃষ্টিতে দৃশ্যমান) মাটির রঙ ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সহজেই বোধ্য হয়ে উঠে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের ক্ষেত্রে এ দু'ধরনের আলোকচিত্রের তুলনামূলক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এরিয়াল দৃশ্য থেকে মূল উপজীব্য চিহ্নিতকরণের কাজে ঘনচিত্রদর্শন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করলে অধিক সুফল লাভ করা যায়।

বিড়াল দৃষ্টি এবং পাখির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এমনভাবে ধারণকৃত একটি বিশেষ এলাকার আলোকচিত্রগুলোর তুলনামূলক বিবরণের বিশ্লেষণ শেষে আলোকচিত্রে প্রস্ফুটিত আলোছায়ার

প্রকার বিন্যাস করে উক্ত ভূমিপৃষ্ঠে বিদ্যমান উদ্ভিদ জগতের রঙসহ দেহবৃদ্ধির গতি, সাংস্কৃতিক নিদর্শন, মাটির রঙ, স্থানবিবরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলেই একটি বিশেষ এলাকায় প্রত্নস্থল আছে কি না এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। কারণ ধারণকৃত আলোকচিত্রে আলোছায়ার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই একটি প্রত্নস্থলের রূপরেখা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাই আলোকচিত্রগুলো আলোর দু'ধরনের প্রেক্ষাপটে ধারণ করতে হয়, যেমন — সকাল বা বিকেলের তীর্যক আলোতে এবং দুপুরের খাড়া আলোতে। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কাজের দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম বজিং (bosing)। এ পদ্ধতিতে একটি সম্ভাব্য স্থানের পৃষ্ঠদেশে একটি বড় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে হয়। এরফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তার প্রকৃতি থেকে ঐ স্থানের মাটির নিচে কোন প্রত্ননিদর্শন আছে কি–না এ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা আহরণ করা সম্ভব হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের অপর গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটির নাম প্রবিং (probing)। এ পদ্ধতিতে একটি সম্ভাব্য স্থানের মাটির ভিতর একটি ধাতু শলাকা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নতুন জমে উঠা মাটিতে সহজেই দন্ডটি প্রবেশ করান যাবে। অন্যদিকে প্রত্ননিদর্শন বিহীন জমিতে শলাকাটি প্রবেশ করাতে তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। মাটির নিচে যদি কোন ইমারত গচ্ছিত থাকে তবে এ শক্তি প্রয়োগের মাত্রার আনুপাতিক হার আরও বেশি হয়। শক্তি প্রয়োগের এ পার্থক্য থেকে মাটির নিচে প্রত্ননিদর্শনাদির অবস্থান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দাঁড় করান সম্ভব। উন্নত বিশ্বে অবশ্য এর বিকল্প হিসেবে 'বৈদ্যুতিক গতি প্রতিরোধক দ্যোতনা' নামে অপর একটি পদ্ধতিতে একটি প্রত্নস্থলের দু'প্রান্তে পরস্পর তার যুক্ত দু'টি তড়িতাণু দন্ড প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলার সময় মানযন্ত্রের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য ধরা পড়বে তার পরিমাণ অনুযায়ী অন্তরীণ প্রত্ননিদর্শনের সম্পর্কে ধারণা আহরণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রত্নস্থলের যে স্থানে ধাতু, ভেজামাটি ইত্যাদি আবৃত থাকবে সেসব স্থানে সঙ্গতকারণেই তড়িৎ প্রবাহের মাত্রার পতন পরিলক্ষিত হবে। ভূমিপৃষ্ঠের মাটিতে ধাতু, অম্ল বা ক্ষার ও চৌম্বিক অবস্থিতি বিচার করেও অনেক স্থানে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া নির্দশন, খাত (নালা বা ডোবা), চুল্লি ইত্যাদি ধরনের প্রত্নস্থলের সন্ধান লাভ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে তড়িতাণু চৌম্বকমান মাপযন্ত্র, পেরিস্কোপ (periscope) আলোকচিত্র, যান্ত্রিক ছেদনি, খনি নির্দেশক, ধাতু নির্দেশক, উজ্জ্বল তীর্যক আলোতে আলোকচিত্র ধারণের জন্য ক্যামেরা ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া পরীক্ষামূলক খাদে সীমিতাকারের খনন পরিচালনার মাধ্যমে মাটির স্তরে সঞ্চিত প্রত্নবস্তুর অবস্থান বিশ্লেষণ করে বসতি ছিল না অথচ প্রত্নবস্তু সঞ্চিত হয়েছে এমন প্রত্নস্থল চিহ্নিত করা সম্ভব।

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আহরিত তথ্যাবলির সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানবিবরণ, মানচিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও নামকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত প্রত্নস্থলগুলোর শনাক্তকরণ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। আকস্মিক ভাবেও এ পর্যন্ত বহু প্রত্নস্থলের সন্ধান জানা গেছে। সাধারণত জলাশয় খনন, নতুন নির্মাণ, হালচালনা ইত্যাদি কাজের সময় এ ধরনের সন্ধান অনুষ্ঠিত

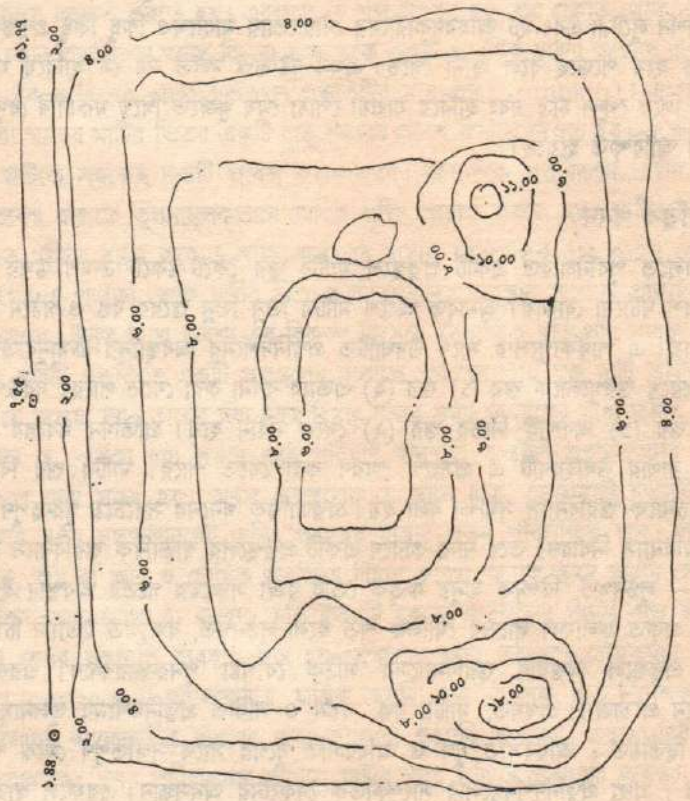
হয়েছে। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক সেনাছাউনি নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকার সময় বাংলাদেশের ময়নামতি অঞ্চলে অবস্থিত প্রত্নস্থলগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম অবহিতি লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে অনেকগুলো প্রত্নস্থল বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিদগ্ধ প্রত্নরসিকগণের দ্বারাও সন্ধানে এসেছে। এ ধরনের প্রত্নস্থলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ঢাকা জেলার সাভারস্থ হরিশ্চন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি ও গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়াস্থ চন্দ্রবর্মণকোট। বাংলাদেশের প্রত্ননির্দশন সম্পর্কে বহু প্রত্নরসিক বিবরণও পাওয়া যায়। এছাড়া যুদ্ধের সময় বোমা বিস্ফোরণ, প্রত্ননিদর্শন লুটেরা এবং ইট আহরণকারীদের দৌরাত্ম্যের মাধ্যমেও কিছু কিছু প্রত্নস্থল অতর্কিতে অনাবৃত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয় যে হারিয়ে যাওয়া কুকুর খুঁজতে গিয়ে স্কুল ছাত্র এবং হারিয়ে যাওয়া পোষ্য মেষ খুঁজতে গিয়ে মরুচারি বেদুইনদের দ্বারা প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

খনন বলতে পূর্বনির্ধারিত একটি প্রত্নস্থলে মাটির স্তর কেটে কেটে ক্রমশ উপর থেকে নিচে অনুপ্রবেশ ঘটানো বোঝায়। অনাবৃত অংশে মাটির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের রঙ ও গঠনে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ পার্থক্যগুলোর সাথে উদঘাটিত প্রত্ননিদর্শনের অবস্থানের ক্রমানুবর্তিতার সংগতি বজায় রেখে স্তরগুলোকে স্তর (১) স্তর (২) এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সর্বউপরিস্থিত স্তর অর্থাৎ স্তর (১) অবশ্যই নিচের স্তর (২) থেকে নবীন হবে। প্রতিদিন খবরের কাগজগুলো গুছিয়ে রাখার উদাহরণটি এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে। মাটির স্তর বিন্যাসের এই পর্যালোচনাকে স্তরবিন্যাস সমীক্ষা বলা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই স্তরবিন্যাস নির্ধারণ। তবে নানা কারণে একটি প্রত্নস্থলের স্বাভাবিক স্তরবিন্যাস বিঘ্নিত হয় ; যেমন — লুণ্ঠনগর্ত, বিস্মৃত মানুষ কর্তৃক তৈরি বর্জ্য সঞ্চয়ের গর্তের অবস্থান ইত্যাদি। তাই খননের প্রকৃত ফলাফল লাভের মৌলিক শর্ত হলো লুণ্ঠনগর্ত, বর্জ্যগর্ত ইত্যাদি চিহ্নিত করত: একটি প্রত্নস্থলে অন্তরীণ স্তরবিন্যাসের সঠিক বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারকরণ। এরজন্য তিনটি অনুশীলন প্রয়োজন। প্রথমত, মাটির রঙ, বয়ন ও সঞ্চিত প্রত্ননিদর্শনের তুলনামূলক বিবরণ তৈরি। দ্বিতীয়ত ; অধিবসতি যুগ ও অধিবসতি যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মেঝে শনাক্তকরণ। তৃতীয়ত ; প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনগুলোর সাংস্কৃতিক নৈকট্যের অনুসন্ধান। এরফলে স্বাভাবিক স্তর, লুণ্ঠনগর্ত ও বর্জ্যগর্তগুলো পরস্পর থেকে পৃথক করা সহজ হয়।

একটি প্রত্নস্থলের ভূপৃষ্ঠে একাধিক উদগত ও অবদমিত স্থানবিবরণ বজায় থাকে। এজন্যই একটি প্রত্নস্থলের সর্বত্র একটি স্তরের একই ধারাবাহিকতা বজায় নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে একবার কোন স্তরকে অনাবৃত করা হলে উক্ত স্তরটিকে পরবর্তীতে আর কোনক্রমেই পুনঃবিন্যস্ত করা সম্ভব হয় না। তাই খনন চলাকালীন সময়ে প্রত্নস্থলের বিভিন্ন স্থানে কোন্ স্তরটি কি অবস্থায় অনাবৃত হলো তার সার্বিক বিবরণ আলোকচিত্র ও নকশার সমর্থনে লিখিত।

রেখাচিত্র – ১

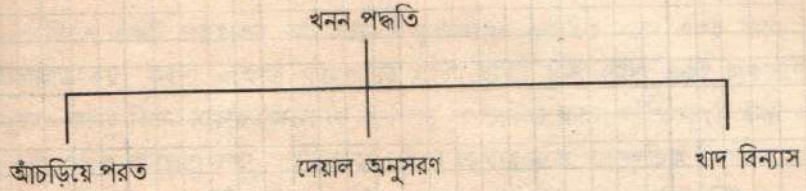


স্কেল – ২০'—১"

সমোন্নত মানচিত্র

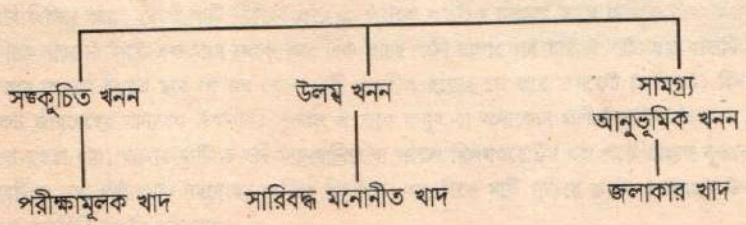
আকারে তাৎক্ষণিকভাবে নথিভুক্তকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ ক্ষেত্রে অবিমিশ্রতা বজায় রাখার প্রয়োজনে প্রতিটি সদ্য উন্মোচিত নিদর্শনের প্রাপ্তিসম্পর্কিত যাবতীয় মাপঝোক নির্ভুলভাবে গ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাই খনন শুরু করার পূর্বে প্রত্নস্থলের ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা নির্ধারণ করা না থাকলে এ সম্পর্কিত মাপঝোক গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এজন্যই খনন শুরুর প্রাথমিক শর্ত হলো, খননের জন্য নির্ধারিত প্রত্নস্থলটির ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের অবস্থান দেখিয়ে একটি সমোন্নত মানচিত্র তৈরি করা। প্রত্নস্থলের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত বেঞ্চ মার্ক (সমুদ্র সমতল থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের উচ্চতর সূচক সংকেত) অথবা সমতল ভূমির ভূ-পৃষ্ঠের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ মানচিত্র তৈরি করা হয়।

খনন কাজ শুরুর দ্বিতীয় পর্বে খননের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খননের প্রকৃত উদ্দেশ্যই মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ খননের সময় অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন ধরনের ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। খননের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলোকে আমরা নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করতে পারি ঃ-

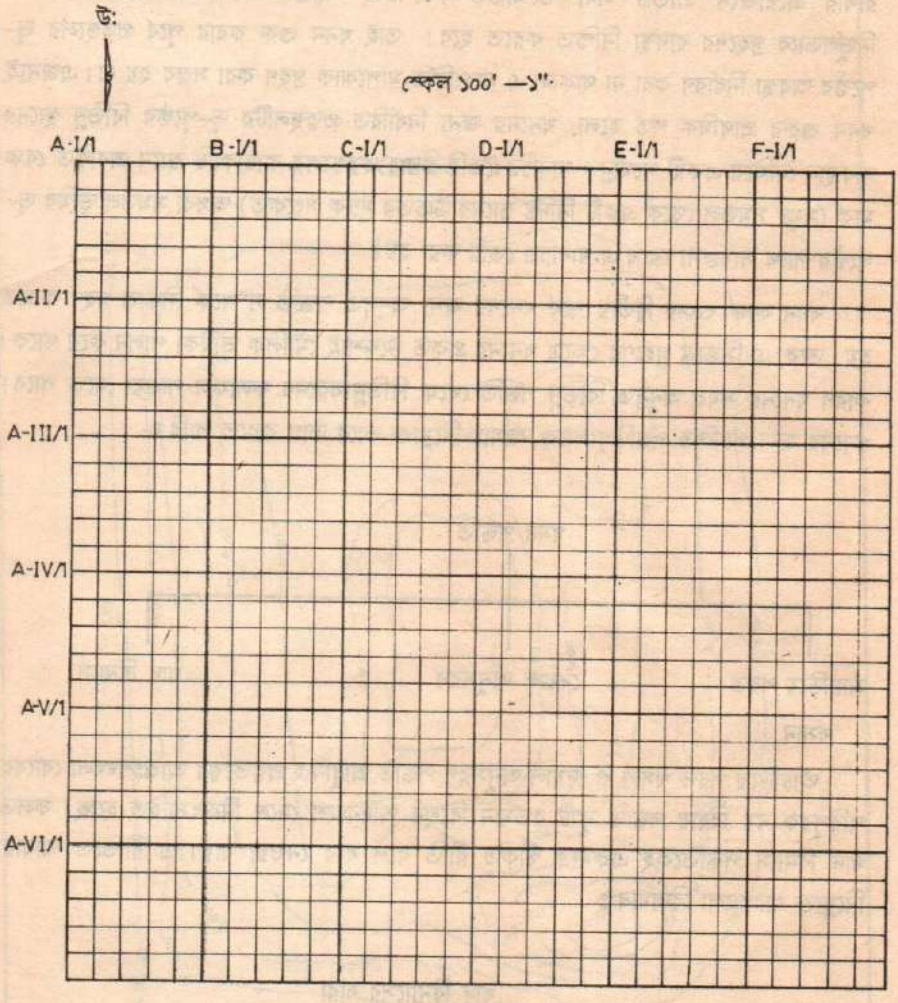


আঁচড়িয়ে পরত খসান ও দেয়াল অনুসরণ পদ্ধতি আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের আন্তঃশৃঙ্খলা বোধের পরিপূরক নয় বিধায় পদ্ধতি দু'টি বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ফলত খাদ বিন্যাস পদ্ধতিকেই একমাত্র স্বীকৃত রীতি বলে ধরে নেওয়া যায়। এ রীতিতে আবার নিম্নোক্ত ধারাগুলো বিদ্যমান ঃ

খাদ বিন্যাসের ধারা



রেখাচিত্র – ২



জালাকার নকশা

উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতির দিকথেকে এরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের তাৎপর্য বহন করে। তাই নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো ঃ

পরীক্ষামূলক খনন

একটি প্রত্নস্থলের স্থানবিবরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর সহজে প্রত্ননির্দশন প্রাপ্তির একটি সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা হয়। তারপর ঐ সম্ভাব্য স্থানে একটি নির্ধারিত পরিমাপের খাদ স্থাপন করত অভিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালিত হতে পারে। এরফলে একটি প্রত্নস্থল থেকে কেবল সাংস্কৃতিক নিদর্শন আছে কি-না এবং থাকলে তার ধরন কি হতে পারে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।[৫] এ পদ্ধতির খননে সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চলাকালে প্রত্নস্থল চিহ্নিতকরণ ; দ্বিতীয়ত, মূল খনন কাজ শুরুর প্রাথমিক নীতি স্থিরকরণ (তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা বিফলতায় পর্যবসিত হয় অথবা দেয়াল অনুসরণ পদ্ধতির খননে পর্যবসিত হয়) এবং তৃতীয়ত, একটি সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিস্তৃতি সম্পর্কে তথ্য আহরণ।

উলম্ব খনন

এ পদ্ধতিতে একটি প্রত্নস্থলের অধিকতর বিস্তৃতঅংশের একাধিক খাদে একই সাথে খনন পরিচালিত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে খননখাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সর্বদা একই দিকনির্দেশনা অনুসরণ করার বিধান রয়েছে। ফলে এ পদ্ধতিতে পরিচালিত খননে পরীক্ষামূলক খনন খাদের তুলনায় অধিক পরিমাণে তথ্য আহরিত হয়। এসব তথ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিদর্শনের নমুনা, বিভিন্ন অধিবসতি, পর্ব অধিবসতি, পর্বের সংখ্যা, প্রতিটি অধিবসতি পর্বের বৈশিষ্ট্য ও তাদের ক্রমানুবর্তিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ পদ্ধতির খনন দিয়ে একটি প্রত্নস্থলের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয় না। এ জন্যই প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাপ্ত ফলাফলকে একটি পুস্তকের সূচিপত্র বা রেলগাড়ির সময়-সূচির সাথে তুলনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ খাদ বিন্যাস পদ্ধতির খনন কেবল স্থাপত্যিক নিদর্শন সংবলিত প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রেই অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

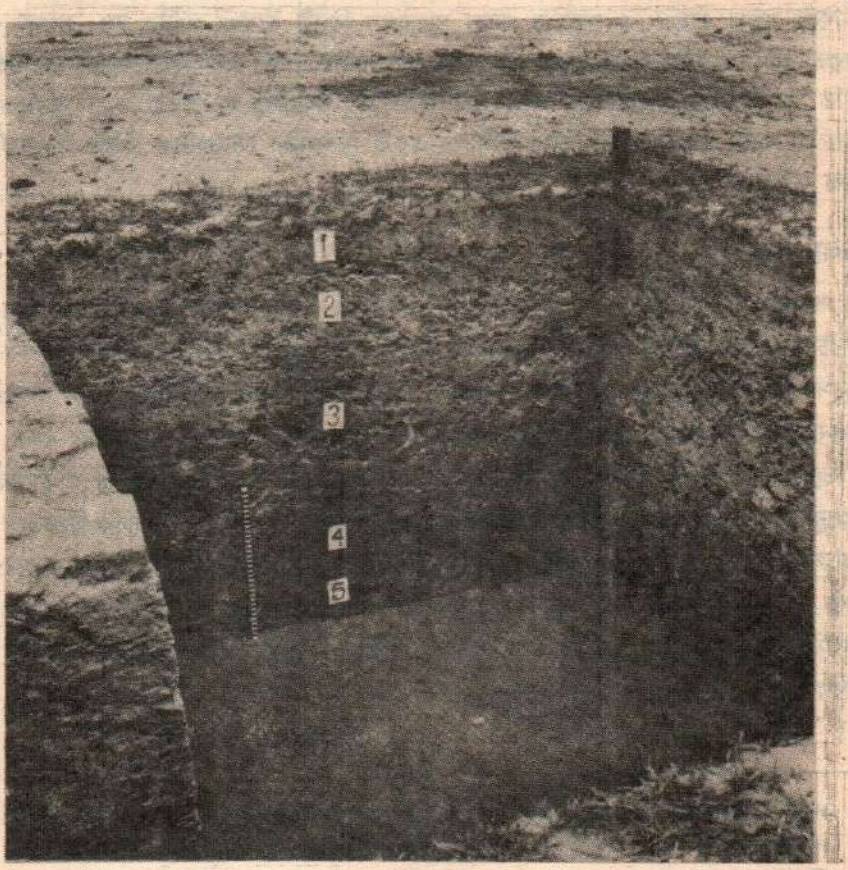
---

৫. তদুপরি বিভিন্ন স্তরের থেকে মাটি নির্বাচন করে ঐ মাটিকে কসটিক সোডার সাথে মিশিয়ে সিদ্ধ করার পর তলানিতে নাড়া না দিয়ে এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে পানি ঢালার পর যদি ঐ পানি গাঢ় বাদামি আভা সৃষ্টি করে তাহলে বুঝতে হবে যে স্তর থেকে মাটি সংগৃহীত হয়েছে সে স্তরে ফসফেট (ফসফেট) বিদ্যমান। ফসফেট জীবদেহের অন্যতম উপাদান। সুতরাং ঐ স্তরে মানুষ বা অন্যকোন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার মাটিতে যদি ম্যানগানিজ বা সয়েল মিলথওয়েট্রেস ধরা পড়ে তাহলে বুঝতে হবে ঐ স্তরটিতে সদ্য বিলীয়মান নরদেহের অস্তিত্ব বিদ্যমান। অন্যদিকে মাটি পুড়িয়ে কার্বন ও লোহার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিতি অর্জন করা যায়।

সামগ্র বা এরিয়া খনন (আনুভূমিক)

এ পদ্ধতির খনন পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর তুলনায় ব্যাপক, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এর মাধ্যমে খনন খাদের সংখ্যা খননের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় যে কোন দিকনির্দেশনা, কার্যকাল ও বিস্তৃতি অনুযায়ী যে কোন দিকে সম্প্রসারিত করা যায়। খনন খাদের এ সংখ্যা বৃদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট প্রত্নস্থলে আবৃত প্রত্ননিদর্শনের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খনন পরিচালক নিশ্চিত হতে পারেন।

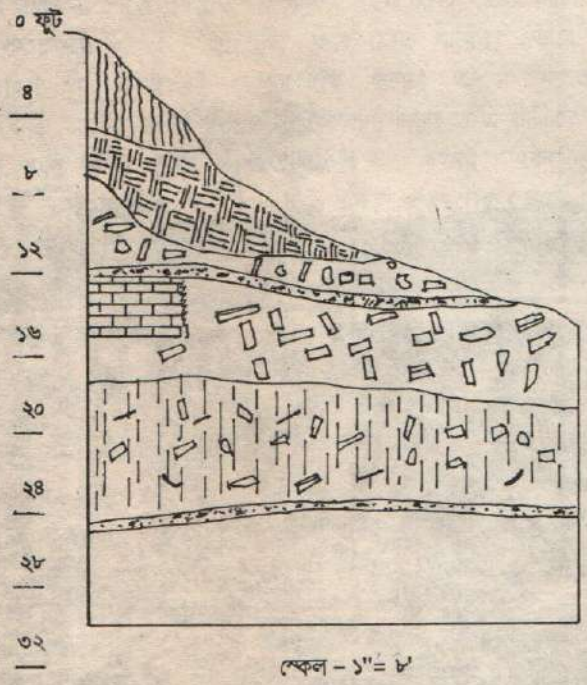
আলোকচিত্র – ১



স্তরবিন্যাসিত সেকশনের দৃশ্য

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতামত এই যে উপরিল্লিখিত কোন একটি একক পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই খনন পদ্ধতি কি হওয়া উচিৎ এ নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে

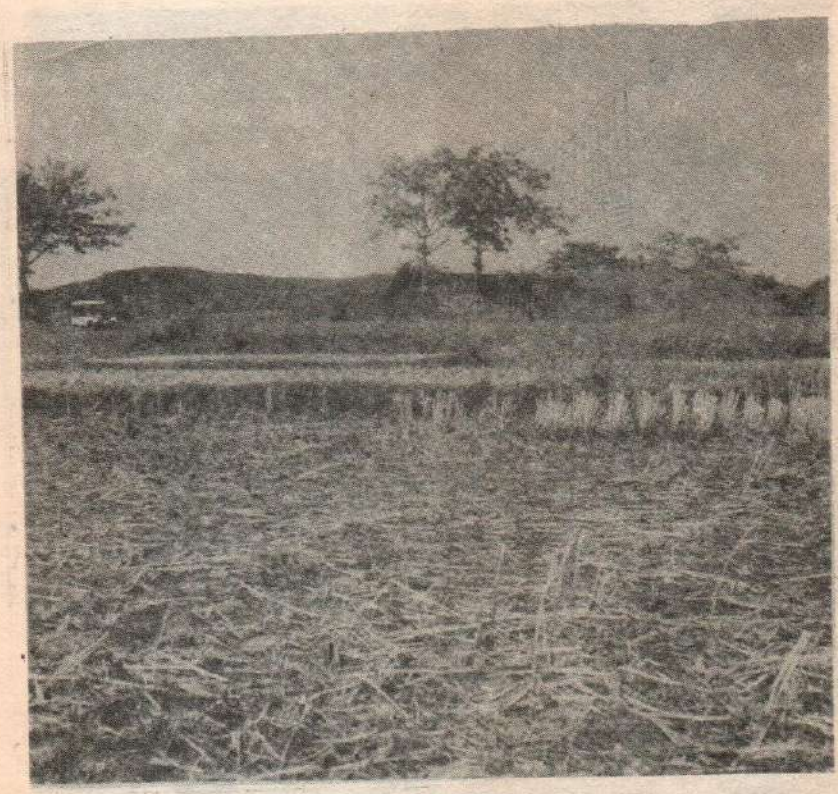
রেখাচিত্র – ৩



খনন খাদের সেকশনের দৃশ্য

অদ্যাবধি চিন্তাভাবনা অব্যাহত রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন খনন পদ্ধতি আবিস্কৃত হচ্ছে অন্যদিকে খাদ বিন্যাসের ক্ষেত্রেও একাধিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এরমধ্যে জালাকার পদ্ধতিতে খাদবিন্যাস অধিক ফলপ্রসূ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে সনডেজ (sondage) নামে আরও একটি পদ্ধতি উত্তরোত্তর অধিকহারে অনুসৃত হয়ে আসছে। পরবর্তী অংশে দু'টি খাদবিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কেই পৃথক বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

আলোকচিত্র - ২



সাধারণ দৃশ্য : জগদল ঢিবি, ধামুরহাট, নওগাঁ

সনডেজ বা সাউণ্ডিং পন্থার খাদবিন্যাস ঃ এ ব্যবস্থাধীনে প্রথমে প্রত্নস্থলের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান ভূমিস্তর ও প্রত্ননিদর্শনের ধরন সম্পর্কে তথ্য আহরণ করে নেওয়া হয়। এরপর খননের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন করে নির্ধারিত স্থানগুলোতে সীমিতাকারের খনন পরিচালিত হয়।

আবার মাটির নিচে আবৃত কোন ফাঁপা অংশ যেখানে খনন পরিচালিত হলে ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে প্রথমে যান্ত্রিক ছেদনির সাহায্যে ছেদন কাজ সম্পাদন পদ্ধতিতে একটি ফুঁটো করে নেওয়া হয়। তারপর একটি ধাতব নলের মাথায় ফ্লাসসহ চারদিকে ঘোরান যায় এমন ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী ক্যামেরা সংযুক্ত করে ওঠা ঐ ফুঁটো দিয়ে ভেতরের ফাঁপা অংশে প্রবেশ করিয়ে প্রত্নসম্পদের অবস্থান, ধরন ও বিন্যাস সম্পর্কিত আলোকচিত্র ধারণ করা হয়। অতঃপর আসে খাদবিন্যাসের প্রসঙ্গ। সনডেজ পন্থায় খনন পরিচালনার জন্য অনুসৃত খাদবিন্যাস পদ্ধতিকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। এরমধ্যে প্রথমটি একাধিক খাদে খনন পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত। এ পদ্ধতিতে কোণমাপকযন্ত্র এবং সমতল নির্ণয়ক যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্নস্থলের চারটি কোণ নির্ধারণ করা হয়। এ কোণের সূত্র ধরে একই সাথে একাধিক খাদে খনন চলতে থাকে। খনন পরিচালক খননের অভিষ্ট লক্ষে না পৌছা পর্যন্ত একটি খাদের সাথে অপর খাদের নির্দিষ্ট দূরত্ব ও আকার বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে খাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যেতে পারেন। এভাবে এ খনন পদ্ধতি শেষাবধি জালাকার খাদ বিন্যাসেরই নামান্তর হয়ে পড়ে। অবশ্য সনডেজ পন্থায় খননের আরও একটি রীতি আছে। দ্বিতীয় এ রীতিটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ রীতিতে প্রত্নস্থলের শিখর থেকে পাদমূল পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্রস্থের প্রলম্বিত একটি মাত্র খাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খনন পরিচালিত হয়। ফলে এ রীতি অনুসন্ধান করে একটি প্রত্নস্থলের কেবল একটি স্তরবিন্যাস সমীক্ষা দাঁড় করানো ব্যতীত প্রত্নস্থলটির অন্তরীণ সাংস্কৃতিক সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

জালাকার পদ্ধতির খাদবিন্যাস ঃ এ বিন্যাসের জন্য প্রধানত দু'টি রীতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম রীতিতে খননের জন্য নির্বাচিত প্রত্নস্থলকে দু'দিক থেকে দু'টি ৯০° কৌণিক ভাবে পরস্পর ছেদক সরল রেখা দিয়ে এমনভাবে বিভক্ত করা হয় যেন ছেদবিন্দুটি প্রত্নস্থলের ঠিক মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করে এবং এর চারপাশ চারটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর প্রতিটি অংশে পরস্পর সমান দূরত্ব বজায় রেখে কতকগুলো আড়াআড়ি ও খাড়া সরল রেখা টানা হয়। ফলে চার অংশে বিভক্ত প্রত্নস্থলটি কতকগুলো সমান পরিমাপের বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। জালাকার খাদবিন্যাসের জন্য অনুসৃত দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বর্তমানে বাংলাদেশে অনুসৃত হচ্ছে। নিচের আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হবে।

বাংলাদেশে অনুসৃত খনন পদ্ধতি

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রত্নস্থলের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি স্থায়ী নির্দেশনা খুঁটি স্থাপন করা হয়। এ খুঁটি থেকে প্রত্নস্থলের দু'দিকে ৯০ ° কোণ বজায় রেখে এমনভাবে দু'টি সরল রেখা টানা হয় যেন খননের জন্য নির্ধারিত সম্পূর্ণ স্থলটি একটি বড় বর্গের দু'টি বাহুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ বর্গটিকে আবার সমান মাপের কতকগুলো মাঝারি বর্গে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর এদের প্রত্যেকটিকে সমানসংখ্যক ছোট বর্গে বিভক্ত করা হয়। এরপর প্রতিটি ছোট বর্গের চারপাশে চলাচলের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট রেখে মধ্যবর্তী স্থানে খনন পরিচালিত

BALIDOO

হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষা অনুযায়ী খনন বহির্ভূত এ স্থানটির নাম বক (baulk) এবং ছোট বর্গগুলোর অবশিষ্ট স্থানের নাম খাদ। এভাবে সমস্ত প্রত্নস্থলটির ভূপৃষ্ঠে একটি জালাকার নক্শার আকার ধারণ করে। জালাকার নক্শাভুক্ত মাঝারি বর্গগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি ইংরেজি বড় হাতের বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। প্রত্নস্থলের স্থায়ী নির্দেশনা-খুঁটি থেকে প্রতিটি মাঝারি বর্গের অবস্থান ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে বিন্যস্ত করা হয়। এরপর প্রতিটি মাঝারি বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সারির জন্যও একটি বিশেষ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। মাঝারি বর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে সারির অবস্থান ও গণনার ক্রমের সংগতি বজায় রেখে এ সংখ্যা বিভাজন সম্পন্ন হয়। এ সংখ্যাগুলো রোমান নুমেরাল (Roman numeral) পদ্ধতিতে লিখিত হয়। সবশেষে প্রতি সারিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি খাদের অবস্থান বোঝাতে প্রতিটি খাদকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়। এ সংখ্যাগুলো এ্যারাবিয়ান নুমেরাল (Arabian numeral) পদ্ধতিতে সংযোজিত করা হয়। মাঝারি বর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে বর্গের অবস্থান ও গণনার ক্রমের সংগতি বজায় রেখে এ সংখ্যা আরোপন নিষ্পত্তি করা হয়। এভাবে একটি খাদের যে পরিচিতি দাঁড়ায় তা ঐ খাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে কৌণিকভাবে প্রোথিত একটি নির্দেশিকা খুঁটিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। প্রতিটি খুঁটির আদর্শ দৈর্ঘ্য ৩৩.১ সেমি এবং প্রত্যেক পাশের প্রস্থ ২.৫৪ সেমি হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিটি ছোট বর্গের পরিমাপ ৬.৯৬ মিঃ × ৬.৯৬ মিঃ (২০' × ২০') নির্ধারণ করে জালাকার নক্শা স্থাপন করার রীতি প্রচলিত আছে। অবশ্য এর চারপাশে শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়কদের চলাচলের সুবিধার্থে ৭৬.২ সেমি (২' — ৬") পরিমাপ জায়গা বক হিসাবে রাখা হয়।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে কোন প্রত্নস্থলের সর্বত্র খনন পরিচালনার পরিবর্তে কতকগুলো বিশেষ খাদে খনন অব্যাহত রেখে অল্প ব্যয় ও সংক্ষিপ্ত সময়ে ঐ প্রত্নস্থলের অন্তরীণ প্রত্ননিদর্শনের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত একটি বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব হয়। খননের যথাযথ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কখনই কোন একক পদ্ধতি যথাযথ ভাবে ফলপ্রসূ নয়, বরং খননের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করত প্রত্নস্থলের আকার আকৃতি ব্যাপ্তি অন্তরীণ প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় কোন একটি বা যৌথ আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, খনন কখন কোথা থেকে শুরু করতে হবে এ বিষয়েও কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রকৃতঅর্থে খনন শুরুর বিষয়টি একান্তভাবেই পর্যালোচনা নির্ভর। শুধু তাই নয়, খননের পদ্ধতি এবং খনন অব্যাহত রাখার সময় ব্যাপ্তির বিষয়গুলোও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একান্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে খনন সর্বদাই কোন একটি বিশেষ সমস্যা সমাধানের লক্ষ সম্মুখে রেখে পরিচালিত হয়। তাই সমাধানের অগ্রগতি ও প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্য এই দু'য়ের উপর নির্ভর করেই খনন পরিচালক উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

এবার খননের গভীরতার প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমেই বলতে হয় যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরুর পূর্ববর্তী স্তর পর্যন্ত খনন অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে এরজন্য সবগুলো খাদেই সমান

রেখাচিত্র – ৪



সেকসনের দৃশ্য অঙ্কনে ব্যবহৃত বিবিধ চিহ্ন

গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনার প্রয়োজন নেই। কোন্ খাদে খননের গভীরতা কি হবে তা খননের প্রতিদিনের ফলাফলের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হবে। অন্যদিকে, খনন চলাকালীন অবস্থায় কোন অংশে স্থাপত্যিক নিদর্শনের অংশবিশেষ অনাবৃত হলে ঐ অংশটি অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত রাখাই শ্রেয়। কিন্তু এর উপস্থিতি যদি খননের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তবে খননের ফলাফল অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় কেবল প্রয়োজনীয় আলোকচিত্র ধারণ, বিস্তারিত নক্শা প্রণয়ন এবং পর্যাপ্ত তথ্য আহরণের কাজ সমাপ্ত করার পর সদ্য অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ অপসারণের বিষয় বিবেচিত হতে পারে।

কেবল স্থাপত্য কীর্তির অংশই নয়, খনন চলাকালে প্রত্নবস্তুও অনবরত অনাবৃত হতে থাকে। কিন্তু এদের দীর্ঘদিন প্রাপ্তিস্থলে ফেলে রাখা যায় না, বরং স্থানান্তর করতে হয়। এ ক্ষেত্রেও উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। তবে প্রত্নবস্তু স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানীয় দৃশ্যপট, অবস্থানের ধরন, ছেদদৃশ্য ও স্তরবিন্যাসের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক নক্শা, আলোকচিত্র ও তাৎক্ষণিক লিপিবদ্ধকৃত বিবরণের গুরুত্ব অত্যধিক বেশি বলে বিবেচিত হয়।

খননের জন্য নির্বাচিত খাদের সংখ্যা অনুযায়ী খননের শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এই শ্রমিকগণকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা যায়। প্রতি দলের জন্য প্রয়োজন হয় একজন সেকসন কাটার (section cutter), একজন ছোট গাইতি ধারক, একজন বড় গাইতি ধারক, একজন কোদাল ধারক ও একাধিক ঝুড়িবাহক। খননের স্থান থেকে অপসারিত মাটি স্তূপীকৃত করার স্থানের দূরত্বের উপর নির্ভর করে ঝুড়ি বাহকদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হয়। এছাড়া দুই বা তিনটি খাদের তদারকীর জন্য একজন প্রত্নতাত্ত্বিক-তত্ত্বাবধায়ক থাকেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট খাদগুলোতে প্রতিদিন সম্পাদিত কাজের তাৎক্ষণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর বিবরণে তারিখ অনুযায়ী খননের গভীরতা, স্তরবিন্যাসের ধরন (রঙ, বয়ন, গুরুত্ব) প্রত্ননিদর্শনের বিবরণ (নাম, উপাদান, আকৃতি, সংখ্যা, অবস্থান, রঙ, পরিমাপ, বর্তমান অবস্থা), প্রত্ননিদর্শনের প্রাপ্তিস্থলের বিশদ বিবরণ (খাদ, অবস্থানের ধরন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর এসব কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য তিনি সঙ্গে রাখবেন একটি বুরুলফিতা, বিবর্ধক কাঁচ, অঙ্ককপট্টি, কাঠের স্কেল, ছুরি, ব্রাস, তুলি, খাতা, পেনসিল ইত্যাদি।

কিন্তু খননের মাঠের কাজের নথিভুক্তিকরণের কাজটি এককভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বাবধায়কের উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে, প্রত্নবস্তু বা স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ স্থানান্তর করার পূর্বে এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা অনাবৃত হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার নক্শা অঙ্কন ও আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হয়। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি প্রত্নবস্তু স্থানান্তরের সাথে সাথে ঐ প্রত্নবস্তুর যোজন করতে হয়। প্রত্নবস্তুর গবেষণা তো বটেই নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও এ যোজন কাজ অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই প্রতি

খনন দলে সার্বক্ষণিকভাবে শিক্ষানবিশ, আলোকচিত্রকর, নক্শা অঙ্কনকারী, জরিপকারী, দ্রব্যবস্তু যোজনকারী ও অঙ্কনপট্টি লেখক নিযুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়।

খনন চলাকালীন নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে ক্যামেরার ভূমিকা অগ্রগণ্য। কারণ এটি একটি জড় বস্তু। রক্তমাংসে গঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক–তত্ত্বাবধায়ক বা নক্শা অংকনকারীর মতো এর ভুল তথ্য পরিবেশন করার অবকাশ নেই। ক্যামেরা সকল সময়ই অনাবৃত তথ্যের অবিকল চিত্রায়ন প্রদান করে। তবে এর ধারণকৃত চিত্রায়ণকে নিখুঁত করে ফুটিয়ে তোলার জন্য খনন খাদের প্রতিটি সেকসন ছোট হাত গাইতি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক এমনভাবে ছেঁটে রাখতে হবে যেন উন্মোচিত দৃশ্যের কোন খুঁটিনাটি ক্যামেরার লেন্সকে এড়িয়ে যেতে না পারে। অন্যদিকে সেকসনের নক্শা অল্কনের কাজটি অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। তাই বর্তমান বিশ্বে উন্নতভাবে ধারণকৃত আলোকচিত্র থেকে এ নক্শা অঙ্কনের একটি বিকল্প ও সহজ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এর নাম ফটোগ্রামেট্রি (photogrammetry)।

প্রতিদিন সর্বমোট আট ঘন্টা খনন কাজ চলতে পারে। স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে দৃষ্টিগোচরে আনয়নের সুবিধার্থে সূর্যউদয়ের সময় থেকে পরবর্তী চার ঘন্টা এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বপর্যন্ত চার ঘন্টা এই দুই পর্যায়ে প্রতি কার্যদিবসকে ভাগ করে নেওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, অপরাহ্নে ও পূর্বাহ্নে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠে তীর্যকভাবে পতিত হয়। ফলে আলোছায়ার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় পললস্তরের প্রকৃত রঙ, ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যিক নিদর্শনের সমোন্নত রেখা এবং মাটির বয়নসহ অন্যান্য উপাদানগুলো অনুধাবন সহজ হয়।

খনন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁদের হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করবেন। কারণ, খনন কাজে প্রতিনিয়ত যেসব নিদর্শনাদি অনাবৃত হয় তার প্রায় সবগুলোই অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থায় অন্তরীণ থাকে। এজন্য খাদের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পর্যায়ক্রমে খনন করা যেতে পারে। প্রতিবারের খননের জন্য আদর্শ গভীরতা অনূর্ধ ৫ সেমিঃ হতে পারে। প্রতিবারের খনন শেষে খাদের তলদেশ ব্রাস নিয়ে নিপুণভাবে পরিষ্কার করে ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ের খনন শুরু করা যায়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের জন্য বিশেষ ধরনের হাতিয়ার প্রয়োজন ; যেমন– গাইতি (ছোট ও বড়), বেলচা, সেকসন কাটার, ছুরি, প্লাষ্টিক তারের ব্রাস, চিমটা, কণিক, ট্যারফ কাটার বা ট্রিমার ইত্যাদি। অপরদিকে খনন চলাকালে অসতর্ক শ্রমিকের দ্বারা নাজুক প্রত্ননিদর্শন যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস বা স্থানচ্যুত হয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। তাই খনন চলাকালে শ্রমিকদের গতিবিধির দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বজায় রাখতে হয়।

খননের বিড়ম্বনা

প্রকৃতঅর্থে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মোকাবেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ইতিহাসে বিরাজমান সমস্যাবলি সমাধানের লক্ষ সম্মুখে রেখে নতুন সূত্রাবলি সন্ধানের উদ্দেশ্যে খনন

পরিচালিত হয়। কিন্তু এর ফলাফল লাভের প্রসংগটি একেবারেই অপরিজ্ঞাত থাকে। দ্বিতীয়ত, একটি প্রত্নস্থলের প্রত্ননিদর্শন দীর্ঘসময়ের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা অতিক্রম করে ধ্বংসাবশেষের আকারে অন্তরীণ থাকে। ফলে প্রত্নস্থলটির বিস্তৃতির সকল অংশে কোন অবিমিশ্রতা বজায় থাকে না। তৃতীয়ত, এমন অনিশ্চিত অবস্থায় খননের ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারেও কোন প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই বরাদ্দকৃত টাকা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়ে উঠে। ফলে প্রায়শঃই উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্যলাভের পূর্বে খননের মাঠ ত্যাগ করতে হয়।

খননে যা অবশ্যকরণীয়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সকল প্রত্নস্থলে সকল সময়ে একটি বিশেষ খনন পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রত্নস্থলের অবস্থা (আকার-আকৃতি, অবস্থান, বিস্তৃতি), দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ, বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণসহ আরও কিছু আনুষঙ্গিক শর্তের উপর নির্ভর করে। এমনকি, খনন খাদের পরিমাপ, সংখ্যা, গভীরতা ইত্যাদির জন্যও কোন সুনির্ধারিত নির্দেশনা নেই। অপরদিকে, খনন অর্থই ধ্বংস। কারণ, একবার কোন স্থানে খনন পরিচালিত হলে ঐ স্থানকে আর খনন পূর্বাবস্থায় সংস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই খনন যে পদ্ধতিতেই পরিচালিত হোক না কেন, এক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'টি বিষয়ে কঠোর সতর্কতা বজায় রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, শ্রমিকদের অসতর্কতার কারণে অনাবৃতকৃত কোনতথ্য যেন ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে। দ্বিতীয়ত, অনাবৃত প্রতিটি নিদর্শনের দলিলজাতকরণের—কাজটি যথাসময়ে যথাযথ ভাবেই সমাপন করতে হবে। তাছাড়া কোন প্রত্নস্থলে যদি পূর্ববর্তী খননের অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী পর্যায়ে অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে পূর্ববর্তী বছরের খনন প্রতিবেদন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ রাখতে হবে যে যথার্থ সাক্ষ্য প্রমাণ ভিত্তিক প্রকাশনা ব্যতীত কোন খননই প্রকৃতঅর্থে অর্থবহ হয়ে উঠে না। তাই খনন সমাপনের অব্যবহিত পরপরই খনন প্রতিবেদন প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক-তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সন্নিবেশিত দৈনিক বিবরণের সকল বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দু'টি। প্রথমত, অনাবৃত প্রতিটি প্রত্ননিদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ প্রণয়ন। দ্বিতীয়ত, আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলোর প্রাপ্তিস্থলগুলো এবং নমুনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য যোজন। এই কাজগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই সবগুলো কাজ যাতে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় সেজন্য খনন শুরুর পূর্বে পর্যাপ্ত সতর্কতার সাথে প্রত্নস্থলের সমোন্নত মানচিত্র তৈরি ও প্রত্যেক খাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক খুঁটি স্থাপনের বিষয়টি সর্বক্ষণ নিশ্চিত রাখতে হবে। এছাড়া সদ্য অনাবৃত প্রতিটি নিদর্শনের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উক্ত খুঁটি থেকে ত্রৈমাত্রিক পদ্ধতিতে মাপঝোক গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে, খননে উন্মোচিত প্রতিটি নিদর্শন কোন্ খাদের কোন্ স্তর এবং কত গভীরতায় পাওয়া গেল এ সম্পর্কিত তথ্যের নথিভুক্তিকরণ বিহীন অবস্থায় খনন নেহাৎ অর্থশূন্য হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে

গ্রিড ও খুঁটি স্থাপন এবং প্রতিটি বর্গের ও বকের পরিসরে পারস্পরিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হলে সকল মাপঝোক বিপন্ন হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি এড়াতে হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, সকলসময় সর্বত্র প্রত্যেক বর্গ, খাদ ও বকের পরিমাপ নিখুঁত রাখা। দ্বিতীয়ত, সকল নির্দেশনা খুঁটির অবস্থান যাতে সুনিয়ন্ত্রিত থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তৃতীয়ত, প্রতিদিনের খনন শেষে খনন শিবিরের নির্ধারিত যোজন খাতায় সদ্য অনাবৃত প্রত্নবস্তুগুলো নথিভুক্তকরণ। তারপর প্রতিটি প্রত্নবস্তুর যোজন সংখ্যা অনপনীয় কালি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত একটি অংশে ক্ষুদ্রাকার অক্ষরে লিখে রাখা। যোজন বহিতে প্রত্যেকটি প্রত্নবস্তুর জন্য নির্ধারিত যোজনসংখ্যার বিপরীতে প্রত্নবস্তুটির সামগ্রিক বিবরণ যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা। এ বর্ণনায় প্রত্নবস্তুর নাম, খাদ, স্তর, গভীরতা, আকার-আকৃতি, মাপ, উপাদান, ব্যবহারের ধরন, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি এবং প্রাপ্তিস্থল সম্পর্কিত খুঁটিনাটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সবশেষে বলতে হয়, খননে আশানুরূপ ফলাফল লাভের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, খননে অংশ গ্রহণকারীদের প্রগাঢ় দৃষ্টিশক্তি, গভীর অনুসন্ধিৎসা, একাগ্রতা ও সময়ানুবর্তিতা। অর্থাৎ খনন চলাকালে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদকে সর্বতোভাবে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ চতুর গোয়েন্দা অথবা কোন দৃষ্টিসম্পন্ন শিকারি ঈগলের ভূমিকা পালন করতে হয়। এছাড়াও তাঁকে প্রত্নতত্ত্বের প্রায় সকল শাখা সম্পর্কে কমপক্ষে প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন এবং খননের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, একজন আনাড়ি খননকারী ফলাফলের চেয়ে ধ্বংসই বেশি ডেকে আনে।

তারিখ নির্ণয়

প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের একটি মৌলিক দিক প্রত্ননিদর্শনের তারিখ নির্ণয়ন। কারণ এর মাধ্যমেই প্রত্ননিদর্শনগুলোর সাথে জড়িত বিস্মৃত মানুষের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে উঠে। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, প্রত্ননিদর্শনাদি দু'টি মূলভাগে বিভাজ্য, যথা-লিপিবিহীন ও লিপিসংবলিত। দ্বিতীয় ধরনের নিদর্শনাদি আবার পরিচিতি বিহীন, তারিখ বর্জিত, পাঠোদ্ধারের অযোগ্য ও সমস্তপ্রকার বা দু'একটি বিবরণধর্মীয় বৈশিষ্ট্য সংবলিত হয়ে থাকে। শেষোক্ত ধরনের নিদর্শনাদির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক তারিখ অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের প্রত্ননিদর্শন কদাচিৎ সন্ধানে আসে। যদি সন্ধানে এসেই যায় তাহলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণকে গভীর অনুসন্ধিৎসার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হয় যে লিপি সংবলিত নিদর্শনটি মূল অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কি-না। শুধু তাই নয়, একটি মাত্র লিপি অথবা তারিখ সংবলিত নিদর্শন পাওয়া গেছে এমন প্রত্নস্থলের সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ বেশিরভাগ প্রত্ননিদর্শনই তারিখ বা পরিচিতি বিহীন অবস্থায় সন্ধানে আসে। আর এদের তারিখ নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতত্ত্বে দু'টি মূল পদ্ধতি অনুসৃত হয়, যথা-আপেক্ষিক এবং কালমিতিক। নিচে দু'টি পদ্ধতি সম্পর্কেই একটি প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরা হলো।

আপেক্ষিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে গভীর অনুশীলন, যুক্তিতর্ক ও বিভিন্ন পর্যালোচনা থেকে উদ্ভূত একটি সাধারণ সমীক্ষায় উপনীত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। এ সমীক্ষার বিভিন্ন দিক রয়েছে ; যেমন – বসতি বিন্যাসের উচ্চতা বিশ্লেষণ, স্তরের ক্রমবিশ্লেষণ, নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্লেষণ, ভেয়্যার্ভে (Verve) বিশ্লেষণ, ক্রমানুবর্তিতা নির্ধারণ বা ক্রমবিশ্লেষণ এবং আরও অনেক। তবে আপেক্ষিক পদ্ধতির সাহায্যে কোন একটি প্রত্ননিদর্শনের জন্য কেবল একটি সময়কাল ব্যাপ্তিসূচক বন্ধনী প্রস্তাব করা ব্যতীত পঞ্জিভিত্তিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। নিচে এ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. বসতিবিন্যাসের উচ্চতা বিশ্লেষণ ঃ বায়ু প্রবাহ ও বন্যা বা বৃষ্টির পানির স্রোত বাহিত বালিকণা, প্রাণীজগৎ থেকে উদ্ভূত জৈব উপাদান এবং মানুষের বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমে একটি পরিত্যক্ত স্থানের উপর নির্দিষ্ট হারে স্তরসঞ্চিত হয়। ১৯৫৯ সালে পরিচালিত একটি প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতি এক হাজার বছরে একটি পরিত্যক্ত প্রত্নস্থলের উপর প্রায় ৩৮সেমি পুরুস্তর সঞ্চিত হতে পারে। স্তরসঞ্চয়নের এই হারের সাথে একটি ঢিবির বর্তমান অবস্থার মোট উচ্চতার পরিমাপ তুলনা করত উক্ত ঢিবিতে অবস্থিত প্রত্ননিদর্শনের জন্য একটি আপেক্ষিক তারিখের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

খ. স্তরের ক্রমবিশ্লেষণ ঃ সমোন্নত মানচিত্র তৈরি করে সমুদ্রসমতল থেকে একটি প্রত্নস্থলের সর্বোচ্চ এবং বিভিন্ন অংশের উচ্চতা নির্ণয় করা এই পদ্ধতির প্রাথমিক শর্ত। অতপর প্রত্নস্থলের সর্বোচ্চস্থান থেকে সর্বনিম্নাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে কয়টি স্তরের অস্তিত্ব রয়েছে তা নির্ধারণ করতে হয়। প্রতিটি স্তরের একটি বিশেষ গভীরতা, রঙ, বয়ন ও সাংস্কৃতিক সঞ্চয় থাকে। এগুলোকে খনন চলাকালে উপর থেকে নিচের দিকে যথাক্রমে স্তর(১), স্তর(২) ও স্তর (৩) হিসাবে গণনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে স্তরগুলো ক্রমান্বয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে গঠিত হয়। আর খনন অব্যাহত থাকে উপর থেকে নিচের দিকে। স্বভাবতই ধরে নিতে হবে যে স্তর (১) সমকালীন, স্তর (২) প্রথমোক্তটির অব্যবহিত পূর্বকালীন এবং স্তর (৩) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। স্তর গঠনের এই ধারাবাহিকতা যদি একটি প্রত্নস্থলের সর্বত্র অক্ষুণ্ন থাকে তবে ঐ প্রত্নস্থলকে নিখুঁত স্তরীভূত প্রত্নস্থল বলা যেতে পারে। এ ধরনের প্রত্নস্থলগুলোতে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির সময়কাল প্রস্তাব করার জন্য তিনটি বিষয় অনুসরণীয়। প্রথমেই দেখতে হবে, কোন স্তরে তারিখ সংবলিত নিদর্শন সঞ্চিত রয়েছে কি–না। যদি কোন স্তরে এ ধরনের নিদর্শনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে ঐ স্তরের জন্য একটি বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক তারিখ প্রস্তাব করা সহজ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, ঐ স্তরটির উপরে বা নিচে অবস্থিত অন্যান্য স্তরগুলোর অবস্থানের ক্রম অনুযায়ী সেগুলোর জন্যও একটি ধারাবাহিক সময়কাল প্রস্তাব করা যায়। দ্বিতীয়ত, যেসব প্রত্নস্থলের কোন স্তরে তারিখ সংবলিত নিদর্শন একেবারেই অনুপস্থিত সেসব ক্ষেত্রে কেবল স্তরের অবস্থানের ক্রম অনুযায়ী প্রতিটি স্তরের জন্য মোটামুটি একটি সময়কালের

ব্যাপ্তিসূচক বন্ধনী প্রস্তাব করা যায়। অতপর একটি নির্দিষ্ট স্তরের জন্য যে সময়কাল নির্ধারিত হয় তা উক্ত স্তরে সঞ্চিত সর্বাধিক সংখ্যা বিশিষ্ট এবং একটি বিশেষ নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা সকল প্রত্নবস্তুর তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্তরের ক্রমবিশ্লেষণের মাধ্যমে আপেক্ষিক তারিখ নির্ণয়নের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যা করণীয় তাহলো, প্রত্নস্থলের সবগুলো খাদের মধ্যে যে কয়টি স্তরের অস্তিত্ব বজায় থাকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা। কারণ এর উপর নির্ভর করেই প্রতিটি অধিবসতির সময়কাল, নির্মাণ সময়কাল ও পুনঃনির্মাণ সময়কালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রতিটি স্তর শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

সাধারণত মাটির রঙ, উপাদান, বয়ন, গভীরতা ইত্যাদি গড় করে স্তরগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করে শনাক্ত করা হয়। তারপর এক বা একাধিক স্তরের সাংস্কৃতিক সঞ্চয়গুলো গড় করে একটি বিশেষ সময়কালে বসবাসকারী 'সংস্কৃতি মানবের' উত্থান পতনের সাথে জড়িত স্তরগুলো নির্ধারণ করা হয়। তবে নানা কারণে এই স্বাভাবিক স্তরবিন্যাস বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রত্ননিদর্শনাদি মূলস্থানের পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত বিন্যাসে বিন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর পদ্ধতি অনুসরণ করে স্তরবিন্যাস প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এর নাম ইউনিট লেবেল (unit level) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে একটি অনিশ্চিত গভীরতা পর্যন্ত খনন অব্যাহত থাকে। তারপর কয়েকটি খাদের যতদূর গভীরতা পর্যন্ত একই সাংস্কৃতিক বা নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত প্রত্ননিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হতে থাকে ততদূর গভীরতাকে একটি ইউনিট লেভেল হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিটি শেষপর্যন্ত স্তরবিন্যাস সমীক্ষা পদ্ধতিতেই পর্যবসিত হয়ে পড়ে। পার্থক্য কেবল এই যে স্তরবিন্যাস সমীক্ষা পদ্ধতিতে মাটির রঙ, বয়ন ও কাঠামোর উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, অথচ ইউনিট লেবেল পদ্ধতিতে প্রাথমিক গুরুত্ব সদ্য আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনাদির নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা বা সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততার উপর আরোপিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ কথা একপ্রকার নির্দ্বিধায়ই বলা চলে যে, পদ্ধতি যাই হোক না কেন, প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সার্বিক সাফল্য মূলত স্তর নির্বাচনের যথার্থতার উপরই নির্ভরশীল।

গ. নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যাগত শ্রেণীবিন্যাস ঃ মানুষের ইতিহাস ধাপে ধাপে যতই অগ্রবর্তী হচ্ছে মানুষ ততই উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন করেছে। ফলে প্রতিটি যুগ পর্যায় ও পর্বে শুধু মানুষের তৈরি দ্রব্যাদির সংখ্যাই বৃদ্ধি পায়নি বরং প্রতিটি নমুনার উৎপন্ন দ্রব্যাদির গড়ন, আকার বয়ন কাঠামো, উপকরণ, ব্যবহারিক উপযোগিতা ও অলংকরণের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে উন্নততর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এভাবে দেখা যাবে যে প্রতিটি যুগ, পর্যায় বা পর্বের উৎপন্ন দ্রব্যাদি একটি বিশেষ নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যার ধারক। শুধু তাই নয়, একই সময়কালে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর তৈরি নিদর্শনগুলোর মধ্যেও কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। একটি বিশেষ নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা যখন একটি বিশাল ভূখণ্ডে বসবাসকারী একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দ্বারা দীর্ঘ দিন ধরে অনুসৃত হয় তখন এই ধারাটি একটি বিশেষ সংস্কৃতির

পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠে। আর এই সংস্কৃতির সাথে জড়িত মানুষগুলো 'সাংস্কৃতিমানব' রূপে গণ্য হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতিমানবের জন্য বিবিধ সময়কালের ব্যাপ্তিসূচক বন্ধনী প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে।[৬] তাই নতুনভাবে সন্ধানে আসা একটি নির্দিষ্ট স্তরে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনগুলোর মধ্যে যদি কোন একটি চিহ্নিত সংস্কৃতির নৈকট্য লক্ষ করা যায় তাহলে সহজেই এরজন্য একটি সময়কাল প্রস্তাব করা সম্ভব। সুতরাং একটি প্রত্নস্থলের বিভিন্ন গভীরতায় বিন্যস্ত স্তরগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনাদির অবস্থান ভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন, নমনা-প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্লেষণ এবং সাংস্কৃতিক নৈকট্যের অনুসন্ধান করে আপেক্ষিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব।

ঘ. ভেয়্যার্ভ বিশ্লেষণ ঃ প্রতিটি হিমযুগে সমুদ্র সৈকতে একটি বিশেষ নমুনার পললায়ন সঙ্ঘটিত হয়েছে। অতপর উষ্ণ আন্তহিমযুগে বরফ গলন থেকে সৃষ্ট ঘর্ষণে হিমযুগের স্তরের উপর ভিন্ন ধরনের আর একটি পললায়ন ঘটেছে। সর্বশেষ হিমযুগের পর থেকে আজ অবধি প্রতিবছর এই পললায়ন অব্যাহত রয়েছে। পললায়নের এই অবস্থা পর্যালোচনাকে 'ভেয়্যার্ভ বিশ্লেষণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভেয়্যার্ভে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন একটি মরা নদীর খাত বা সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভব। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, সবশেষ হিমযুগের বরফগলা পানির ঢল নেমে যাওয়ার পর থেকে সমুদ্র উপকূলে যে পললায়ন সঙ্ঘটিত হয়েছে তার উপর প্রতি বছর পানির স্রোতের সাথে বয়ে আসা পলি ও বালিকণা নতুন নতুন স্তর সৃষ্টি করেছে। খাল বা নালায় এই পলি ও বালি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়। বরফগলার প্রথম পর্যায়ের ঢল রুক্ষ ধরনের কণিকায় গঠিত হাল্কা স্তর এবং শেষদিকের ঢলগুলো চমৎকার ধরনের কণিকায় গঠিত স্তর সৃষ্টি করেছিল। এগুলোকে ভেয়্যার্ভে বলা হয়। পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, বাৎসরিক ভেয়্যার্ভের গড় বেধ দাঁড়ায় এক সেন্টিমিটার। প্রতিটি স্তরে জমে উঠা বালুকণার ভিন্নতর বিন্যাসের উপর নির্ভর করে ভেয়্যার্ভেগুলো সম্পর্কে দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। (ক) প্রতি বছর কতগুলো অবক্ষেপ সংস্থাপিত হয়েছে। (খ) সঞ্চিত ভেয়্যার্ভের মোট বেধের পরিমাণ কত। সুতরাং একটি ভেয়্যার্ভে সংবলিত প্রত্নস্থলের ভেয়্যার্ভের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে উক্ত প্রত্নস্থলটির জন্য একটি আপেক্ষিক সময়কাল প্রস্তাব করা সম্ভব হয়। তবে এ

---

৬. Le-Moustier নমুনা-প্রযুক্তিবদ্যার ঐতিহ্যভুক্ত নিয়ানডেরথ্যাল হোমোসেপিয়েন্সদের বিস্তৃতি লক্ষ করা গেছে জার্মানি, প্যালেস্টাইন, অষ্ট্রিয়া, জিবরালটার, স্পেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে। এদের সময়কালের ব্যাপ্তিসূচক বন্ধনী এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর (তৃতীয় আন্ত হিমযুগ)। সুতরাং হোমোনিয়্যানডারথ্যালসিস একটি সংস্কৃতি মানব। অন্যান্য সংস্কৃতি মানবদের মধ্যে ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগনন (সময়কাল পঞ্চাশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার বছর), সিনানগ্রোপাস পেকিনেনসিস বা পিকিংমানব) সময়কাল দশ লক্ষ থেকে দুই লক্ষ), পিথেকানগ্রোপাস ইরেকটাস্ বা জাভা মানব বা শলো মানুষ (সময়কাল বিশ লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর), হাইডেলবার্গ বা হোমোহাইডেলবার্গ জেনসিস (তিন লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বছর) এবং পিল্ট ডাউন মানুষ (সময়কাল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর) অন্যতম।

পদ্ধতিতে বার শত বছরের অধিক বয়সী প্রত্নস্থল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আজ অবধি সম্ভব হয় নি।

৪. ক্রমানুবর্তিতা নির্ধারণ বা ক্রমপদ্ধতি ঃ প্রত্ননিদর্শনাদি একাধিক প্রেক্ষাপট ও অবস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক রূপ সমৃদ্ধ হয়ে অনাবৃত হয়। এগুলো বিশ্লেষণ করে অনেক ক্ষেত্রে একটি সংস্কৃতি বা নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব, বিকাশ, অবক্ষয় ও বিলুপ্তির সময়কাল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হলো, কোন্ স্তরে বা সমতলত্বের মাত্রায় একই সংস্কৃতি বা নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যাভুক্ত প্রত্ননিদর্শন কি পরিমাণে পাওয়া গেল। এক জাতীয় প্রত্ননিদর্শন যে স্তরে অধিক পরিমাণে এবং সর্বাধিক উন্নত মানসম্পন্ন অবস্থায় পাওয়া যাবে সঙ্গতকারণেই ঐ স্তরকে সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনাদির সাথে জড়িত সংস্কৃতি বা নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্লাসিক্যাল আমল হিসাবে গণ্য করতে হবে। শুধু তাই নয়, উল্লিখিত স্তরের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত স্তরে ক্রমান্বয়ে যেমন উক্ত বৈশিষ্ট্যসূচক প্রত্ননিদর্শনগুলো সংখ্যালঘু হয়ে উঠবে, তেমনি নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যায় ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু মান পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ এ স্তরগুলো উক্ত নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যার এবং সংস্কৃতির অবক্ষয়সহ বিলুপ্তি পর্বের সাথে জড়িত। অপরদিকে ধ্রুপদী সময়কালের স্তরগুলোর নিম্নদেশের স্তরগুলোতে একই বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শনাদির সংখ্যা এবং নুমনা-প্রযুক্তিবিদ্যার মান নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও উন্নত হতে থাকবে। অর্থাৎ এই স্তরগুলো উক্ত নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যার বা সংস্কৃতির উদ্ভব পর্বের সাথে জড়িত।

দীর্ঘদিন মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকায় ভূপৃষ্ঠের তাপ ও চাপ এবং মাটির বিভিন্ন পদার্থের প্রভাবে প্রত্ননিদর্শনের বহিরাবরণে কিছু ধীর পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয় ; যেমন – ধাতুর তৈরি নিদর্শনাদির উপর মামড়ি, বিশেষ করে তামা ও ব্রঞ্জের উপর সবুজ রঙের মরিচা এবং খনিজ পাথরের উপর হলদে আবরণ তৈরি হয়। এসবের প্রকৃতি ও গভীরতা বিশ্লেষণ করেও কোন কোন প্রত্ননিদর্শনের প্রাচীনত্ব, উদ্ভব, বিকাশ ও অবলুপ্তির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে একটি সময়কাল প্রস্তাব করা সম্ভব হয়। এ ধরনের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথমত, প্রত্ননিদর্শনের আদর্শ নমুনা সংগ্রহ ; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন আদর্শ নমুনার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে এদের মানের উত্থান পতনের হার নির্ধারণ, তৃতীয়ত, আদর্শ নমুনাটির সাংস্কৃতিক উৎসের সন্ধান অথবা সমকালভুক্ত নিদর্শনাদির সাথে তুলনামূলক আলোচনা। এই পদ্ধতিকে যুগপত্তা বা পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণাঅক তারিখ নির্ণয়ন বলে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের গাণিতিক সূত্র বহুল পরিমাণে সাহায্য করে থাকে।

এরপর আসে প্রাচীন প্রাণীবিদ্যা, প্রাচীন ভূতত্ত্ব, প্রাচীন জলবায়ু ও প্রাচীন ভেষজভিত্তিক সমকালীনত্ব নিরূপনের প্রসঙ্গ। আগেই বলা হয়েছে যে, একটি বিশেষ স্তরে একটি বিশেষ রঙ, উপাদানের সংমিশ্রণ ও কাঠামো বজায় থাকে। ভূ-তাত্ত্বিক আলোচনা প্রমাণ করে যে পৃথিবী তার দীর্ঘজীবনে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থা অতিক্রম করেছে ; যেমন- হিমবাহ, প্লাবন ও ভূস্পন্দন। এদের প্রভাবে যেমন বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ভূ-পৃষ্ঠের বহিরাবরণ হরেক রকম স্থানবিবরণ লাভ করেছে। ভূতত্ত্বে উল্লিখিত প্রতিটি অবস্থার জন্য একটি সময়কাল সূচক

বন্ধনী নির্ধারিত রয়েছে। আবার স্তর বা শিলাপরতে মিশে থাকে সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগরেণু, শস্যকণা অথবা পশুপাখির হাড়। অগ্নুৎপাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য পলায়নরত বিলুপ্ত প্রাণী তাদের পদচিহ্ন রেখে গেছে গলিত লাভার উপর। একইভাবে স্তর বা শিলাপরতে ফসিল আকারে বিলুপ্ত বৃক্ষ এবং পশুপাখির চিহ্নও পাওয়া গেছে। অনেকক্ষেত্রে প্রত্নবস্তুর গায়ে ওটার ব্যবহারজনিত দাগ এবং দাঁতে শস্যকণার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। microwear analysis এবং scanning electron microscopic নিরীক্ষা দ্বারা এসব দাগ ও শস্যকণা চিহ্নিত করা সম্ভব হলে দু'ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, স্তরটির সময়কালের জলবায়ুর প্রকৃতি। তাছাড়া প্রাণীবিদ্যা অনুযায়ী প্রতিটি বিশেষ ধরনের জলবায়ুর সময়কালে কতকগুলো বিশেষ প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। ফলে জলবায়ুর প্রকৃতি জানা সম্ভব হলে জীবজগৎ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় জলবায়ু, জীবজগৎ ও স্তরের জন্য একটি সময়কাল সূচক বন্ধনী ইতিমধ্যেই প্রাণীবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। ফলে এসব প্রস্তাবনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে একটি প্রত্নস্থলের বিশেষ স্তরে সঞ্চিত প্রত্ননিদর্শনের জন্য একটি সময়কাল সূচক বন্ধনী প্রস্তাব করা যায়।

প্রত্ননিদর্শনের ক্রমানুক্রমিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ফ্লোরিণ (flourine) পরীক্ষা। এ পদ্ধতি ১৯৪৬ সালে প্রচলিত হয়। এর মূল শর্ত হলো, জীবদেহের হাড় মৃত্যুর পর প্রাকৃতিক নিয়মেই মাটি থেকে ধীরে ধীরে ফ্লোরিণ সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে হাড়ের তন্ত্রীগুলোতে fluorapotite (calcium fluophosphate) নামে একটি যৌগিকের জন্ম হতে থাকে। ভূতাত্ত্বিক বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই জৈব উপকরণে তৈরি প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে সঞ্চিত ফ্লোরিণের পরিমাণ নির্ণয় করে একটি সময়কাল সূচক বন্ধনী নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

সবশেষে বসতির ধরন সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে উপনীত হওয়া যায়। বসতির ধরন সংক্রান্ত আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সাংস্কৃতিক বিবর্তন। এর ভিত্তি তিনটি যথা- প্রসারণতত্ত্ব (আবিষ্কার বৃদ্ধির ধাপে ধাপে সংস্কৃতির রূপান্তর), বিমিশ্রণ (পাশাপাশি চলমান দু'টি সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের ধারা থেকে সৃষ্ট একটি নতুন ধারা) এবং অস্তিত্ব আত্মস্থত (উন্নত ধারার মাঝে অনুন্নত ধারার বিলীনতা)। এ সবের আলোকে একটি বসতি বিস্তারের ধরন আলোচনা করে সহজেই একটি প্রত্নস্থলের বিলুপ্ত সংস্কৃতি মানবের উত্থান, পতন ও বিলুপ্তির পারস্পরিক যুগপত্তা নির্ণয় করা সম্ভব।

চ. **অন্যান্য** ঃ কোন একটি প্রত্নস্থলে বুদ্ধিমান মানুষের পদচারণা শুরুর প্রথম পর্যায়ের তথ্যাদি আহরণের জন্য রয়েছে biostratigraphy তবে এ পদ্ধতির সাফল্য কেবল সুবিন্যস্তভাবে স্তরীভূত প্রত্নস্থল থেকে আদর্শ নমুনার প্রত্ননিদর্শন প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। আদর্শ নমুনার প্রত্ননিদর্শন বলতে মূলত ফসিল বোঝান হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাচীন জলবায়ুতত্ত্বের প্রসঙ্গ তো পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত আর এ ক্ষেত্রে পরাগরেণু সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে

১৯৬১ সালে প্রচলিত এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে একটি নিখুঁতভাবে স্তরীভূত প্রত্নস্থলের নির্ধারিত স্তর থেকে আদর্শ নমুনা মাটি সংগ্রহ করা হয়। তারপর ফ্লটিং (floating) যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত নমুনা মাটি থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগরেণুর সুক্ষ্ম কণা পৃথক করা হয়। এই পরাগরেণু বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট স্তরের সাথে সম্পৃক্ত যুগ, উদ্ভিদজগৎ, মানুষের খাদ্যাভাস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা আহরণ করা সম্ভব। আমরা জানি যে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে পৃথিবীতে পরস্পর ভিন্নমুখী বিবিধ জলবায়ু অব্যাহত ছিল। এক এক জলবায়ুতে কয়েকটি নির্ধারিত প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় ছিল। ফলে পরাগরেণু বিশ্লেষণ করে উদ্ভিদের প্রকৃতি শনাক্ত করা সম্ভব হলে এরসাথে অন্যান্য তথ্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনা সমাপন করে অনেকক্ষেত্রেই একটি বিশেষ স্তরের জন্য একটি আপেক্ষিক সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়।

নিরঙ্কুশ বা কালমিতিক পদ্ধতি

এ পদ্ধতি আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ পদ্ধতি থেকে অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। কারণ এ পদ্ধতি বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক তারিখ প্রদান করে। এ পদ্ধতিতে কোন সাংস্কৃতিক নিদর্শন বা প্রত্নবস্তুর তারিখ নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই প্রত্নবস্তুটিকে প্রকৃত অস্তিত্বব্যঞ্জক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ধার করতে হবে। এটা এজন্য যেসব জড়বস্তু বা জীবের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় কণিকা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তারিখ নির্ণয়ের জন্য সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শনে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় কণিকার হার নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কোন কোন তেজস্ক্রিয় কণিকা অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত এবং অন্যবস্তুর সংস্পর্শে এসে সহজেই ঐ বস্তুর তেজস্ক্রিয়তায় রূপান্তর ঘটায়। অপরদিকে একটি নিদর্শনের তেজস্ক্রিয় কণিকা আয়ের হার সবসময়ই যেমন সমান, তেমনি এর হ্রাস প্রাপ্তিও ঘটে নির্ধারিত হারে। ফলে কোন প্রত্নবস্তু বা সাংস্কৃতিক নিদর্শনে এই আয় ও রূপান্তরের হার কত তা জানা সম্ভব হলে ঐ প্রত্নবস্তু বা সাংস্কৃতিক নিদর্শনের কালমিতিক তারিখ নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি বস্তুতে কিছু না কিছু বিশেষ ধরনের পদার্থ বিদ্যমান থাকে। নানাকারণে এদের মধ্যে নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটে। বিশেষ উপাদানে বিদ্যমান পদার্থের পরিমাণের এই হ্রাসবৃদ্ধি ও অন্যপদার্থে রূপান্তরের কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমেও কালমিতিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব। নিচে এ পদ্ধতির বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ক. তেজস্ক্রিয় অঙ্গার বিশ্লেষণ ঃ বায়ুমণ্ডলে দ্রুত চলমান ইলেক্ট্রনের সাথে কসমিক রশ্মির সংঘর্ষে নাইট্রোজেন এ্যাটম মৌল সৃষ্টি হয়। এরথেকে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের অণু সৃষ্টি হয়। এটা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। তাই জীবজগতের প্রাণীমাত্রই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় অঙ্গার শোষণ করে। এই তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের অণুর একটি ধণাঅক ও ঋণাঅক চার্জ অবস্থা বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ভারি রূপান্তরিত কণিকা তেজস্ক্রিয় অঙ্গার ১৪ (C14)। জীবদেহে এর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের অণুর চেয়ে লক্ষকোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। কোন প্রাণীর মৃত্যুর পর জীবদেহ (মূলত হাড়)

থেকে তেজস্ক্রিয় অঙ্গার চৌদ্দের ধণাত্মক চার্জ অবস্থা বিশিষ্ট রূপান্তরিত কণিকা নির্দিষ্ট হারে হ্রাস পেতে পেতে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের অণুতে রূপান্তরিত হয়। তেজস্ক্রিয় অঙ্গার চৌদ্দের কণিকার অর্ধায়ু প্রায় ৫৭৩০ ± বছর। এই হার অনুযায়ী একটি প্রত্নবস্তু বা সাংস্কৃতিক নিদর্শনে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় অঙ্গার কণিকার অণুতে পরিণত হতে সময় লাগে ৫০,০০০ থেকে ৭৫,০০০ বছর। সুতরাং একটি পরীক্ষাধীন নিদর্শনে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় কার্বনের অণু ও কার্বন চৌদ্দের কণিকা এবং এদের হ্রাস ও বৃদ্ধির তুলনামূলক হার নির্ণয় করে একটি বর্ষপঞ্জি ভিত্তিক কালমিতিক তারিখ পাওয়া সম্ভব। ফসিল ও কয়লার তারিখ নির্ণয়ের জন্য এটা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তবে এ পদ্ধতিতে যে প্রত্নবস্তুটির তারিখ নির্ণয় করতে হবে, সে প্রত্নবস্তুটি সংগ্রহের সময় এমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন ওটা পরীক্ষা চলার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বায়ুর সংস্পর্শে এসে নতুনভাবে তেজস্ক্রিয় অঙ্গার দ্বারা সংক্রামিত হতে না পারে। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে প্রায় এক লক্ষ বছর পর্যন্ত প্রাচীন প্রত্ননিদর্শনাদির তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

আরও লক্ষণীয় যে, ভূতত্ত্বের আলোকে যে মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত নবীন সে মৃত্তিকার বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও চৌদ্দ পরীক্ষা ব্যবহৃত হতে পারে। পক্ষান্তরে বেশি প্রাচীন মৃত্তিকা স্তরের জন্য স্ট্রনটিয়াম ও রুবিডিয়ান পরীক্ষা যথেষ্ট ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া রেডিও এ্যাক্টিভ মেজারমেন্ট (রেডিও ক্রনলজি) এর মাধ্যমেও মৃত্তিকার বয়স নির্ধারণ করা যায়।

খ. **পটাসিয়াম** (potassium) **আর্গণ** (argon), **ইউরেনিয়াম** (uranium) **পরীক্ষা** ঃ অধিকা জড়বস্তুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম বিদ্যমান থাকে। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয় ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট হারে সীসায় পরিণত হয়। সুতরাং পরীক্ষাধীন প্রত্নবস্তুতে বিদ্যম ইউরেনিয়ামের পরিমাণ মেপে তার কালমিতিক তারিখ নির্ণয় করা যায়। আবার শিলা, ভস্ম আগ্নেয়গিরিজাত অজৈব বস্তুতে বিদ্যমান নির্ধারিত পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পটাশিয়াম পরিমি হারে ক্ষয় হয়ে আর্গণ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। অর্ধেক পটাসিয়াম ক্ষয় হতে ১৩০ কোটি ব (অর্ধায়ু) সময় প্রয়োজন। অবশিষ্ট অর্ধেক ক্ষয় হতে পুনরায় অনুরূপ সময় প্রয়োজন হ এভাবে পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট হারে পটাসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। পরীক্ষাধী প্রত্নবস্তুতে আর্গণ মৌলের বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রত্নবস্তুটিতে কি পরিমাণ পটাসিয়াম অবশিষ্ট আছে নির্ণয় করা যায়। এভাবে শিলা ও আগ্নেয়গিরিজাত অজৈব পদার্থে গঠিত বস্তু বা সাংস্কৃতি নিদর্শনে অবশিষ্ট থাকা পটাসিয়ামের পরিমাণ মেপে প্রত্নবস্তু বা প্রত্ননিদর্শনের বয়স নির্ধারণ যায়। শেষোক্ত পদ্ধতিটি সংক্ষেপে k/ardating নামে পরিচিত। আবার আগ্নেয় লাভা গ অবস্থায় আর্গণ গ্যাস ত্যাগ এবং পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। কিন্তু ঠাণ্ডা হলে তেজস্ক্রিয়তার প্র পটাসিয়াম চল্লিশ রূপান্তরিত হয়ে আর্গণ চল্লিশে পরিণত হয়। পটাসিয়াম চল্লিশের অর্ধায়ু ১ মিলিয়ন বছর। ফলে পরীক্ষাধীন শিলায় এদের পরিমাণ নির্ধারণ করে এক বিলিয়ন থেকে বিলিয়ন পুরাতন শিলায় কালমিতিক তারিখ জানা সম্ভব হয়।

তারাই হোমো ইরেক্টাস। কিন্তু তাদের মগজের পরিমাণ ছিল গড়ে ৩০০ সিসি। ফলে তাদের পক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু এদের উত্তরসুরী হোমো হ্যাবিলিসের মগজের পরিমাণ ছিল গড়ে ১০০০ সিসি এবং হোমো স্যাপিয়েন্সদের ১৪০০ সিসি। ফলে এদেরকেই প্রযুক্তিবিদ্যার মূলপ্রবক্তা হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।[৮]

যতদিন পর্যন্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ততদিন পর্যন্ত তারা বানর জাতীয় প্রাণীকুলের মতো গাছে গাছে আরোহণ করে বা মাটিতে ঝরে পড়া ফল কুড়িয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করত। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখার পর তাদের পক্ষে দূরের দৃশ্য অবলোকন করা ও দ্রুত বিচরণ সম্ভব হয়েছিল। ফলে তারা হাতের নাগালের বাইরে থাকা ফুলফল সংগ্রহের জন্য ঢিল ছোড় বা লাঠির আঘাত হানা এবং দূরের পশুকে লক্ষ করে শিলাখণ্ড বা লাঠি ছুঁড়ে মারতে শুরু করেছিল। এ ভাবেই রচিত হয়েছিল মানুষের হাতিয়ার ব্যবহারের প্রেক্ষাপট। গোটা মানব সমাজ এ অবস্থার কালানুক্রমিক বিবর্তনের এক একটি ধাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশের এক একটি ধাপ বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করা সম্ভব হলেই বিস্মৃত মানুষগুলো কোন যুগ, পর্যায় ও পর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কারণ, প্রতিটি যুগ, পর্যায় ও পর্বে মানুষের জীবন যাপনের ধারাগুলো নতুন গতিতে মোড় নিয়েছে। আর এই নতুন ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিস্মৃত মানুষ তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তৈরি করত এবং আজও করছে।

জীবন ব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী মানুষের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করা যায় ; যথা – প্রাগৈতিহাসিক, পুরা ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক। এই তিনটি যুগের মানুষের কার্যাবলি ও জীবন ব্যবস্থা তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনার জন্য কেবল দু'টি সূত্র আছে। এদের একটি গুহাচিত্র এবং দ্বিতীয়টি পাথরের হাতিয়ার। পৃথিবীর অধিকাংশ গুহাচিত্র ইউরোপ ও ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইউরোপীয় গুহাচিত্রগুলোর মধ্যে লা-কো, ফঁ-দি-গঁ, পেয়ার নন পেয়ার, আদোরা, ফ্রান্সের দরদোনা ডেলোর লাক্সো, ও ইতালি আলতামোরা অন্যতম। লাক্সোর গুহাচিত্রগুলো প্রায় বিশ হাজার বছরের পুরাতন। 'ব্লো পাইপ টেকনিকে'[৯] অঙ্কিত এই ছবিগুলো থেকেই তৎকালের

---

৮. হোমো স্যাপিয়েন্সদের অপর নাম ক্রোম্যাগনন (Cromagnon man)। বস্তুত ক্রোম্যাগনন হলো ফ্রান্সের একটি পাহাড়ি এলাকা। এখানেই এদের ফসিল পাওয়া গেছে। এরা প্রায় ২৫০০০ বছর পূর্বে বাস করত। এদের উচ্চতা ছিল গড়ে ১.৮ মিটার। এদের শারীরিক গঠন শক্ত এবং মাথা লম্বা ও সরু ছিল। অপরদিকে নাক পাতলা, লম্বা ও উন্নত ছিল। মগজের পরিমাণ নিচে ১০০০ থেকে উপরে ১৫০০ সিসি। তাই এদেরকেই আধুনিক মানুষের সর্বশেষ পূর্বসূরী হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।

৯. এইজন্য প্রথম গুহার দেয়াল ঘষে সমান করা হতো। তারপর দেয়ালে পোড়া কাঠ, হাড় বা পাথর দিয়ে রেখাচিত্র উৎকীর্ণ করা হতো। তৃতীয়ত, রেখাচিত্রের আবরণগুলোর উপর হাড় জাতীয় নল দিয়ে ফুৎকার

জীবজন্তু, শিকার করার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিতি লাভ করা গেছে। ভারতের মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং পাঞ্জাবেও এ ধরনের বহুচিত্র রয়েছে। তবে এদের বিষয়বস্তু একটু ব্যাপক।

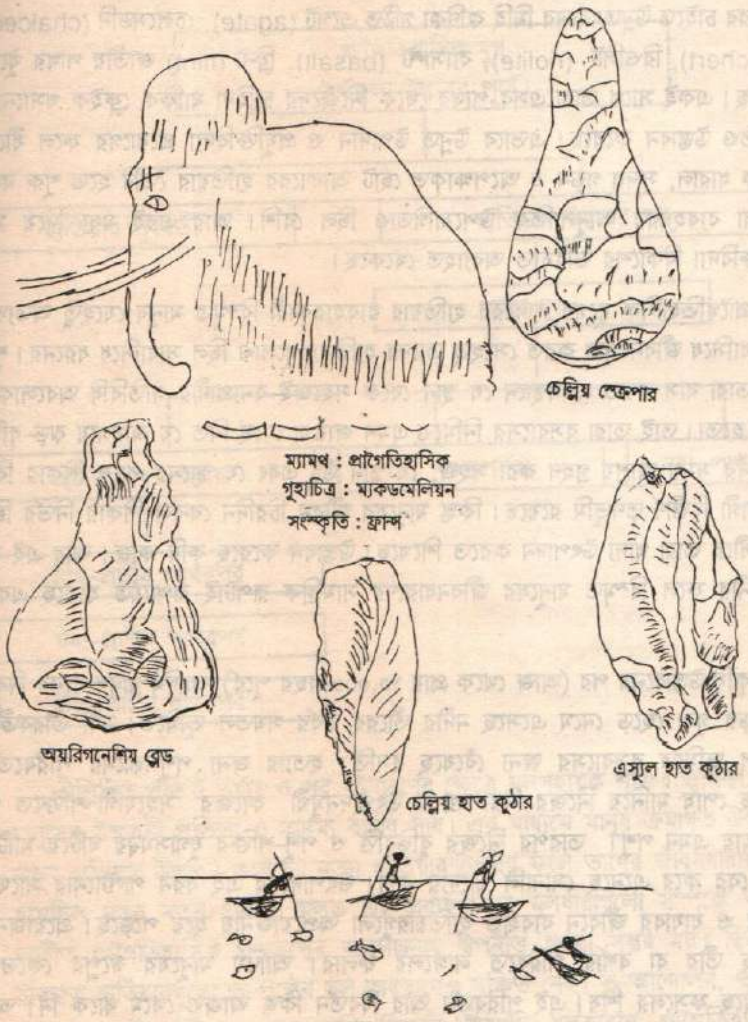
এই যুগের প্রথম দিকে মানুষ ভাষা, পোশাক, আগুন, হাতিয়ার ইত্যাদি কোন কিছুর ব্যবহারই জানত না। তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল ফুলফল ও শিকড় সংগ্রহ। তখন তারা খাদ্যের অন্বেষণে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ের গুহা, বালিয়ারি, গাছের ডাল, গাছের গুঁড়ির ফোঁকর প্রভৃতি ধরনের জায়গায় অস্থায়ীভাবে রাত কাটাত। অর্থাৎ তারা ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী ও যাযাবর। তারপর ধীরে ধীরে তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটেছে। তাই নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে একসময় তারা পশু শিকারের জন্য হাতিয়ার উদ্ভাবন করেছে। হাতিয়ার তৈরির জন্য তারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে সহজলভ্য পাথর। তবে কাঠ, শিং, হাড় ইত্যাদির তৈরি হাতিয়ারের সন্ধানও কোন কোন প্রত্নস্থলে পাওয়া গেছে।[১০] কিন্তু পাথরের তৈরি হাতিয়ার যেহেতু কালের যবনিকা ভেদ করে এখনও তাদের স্মৃতিচারণে আমাদের অধিক সাহায্য করছে সেহেতু এই যুগকে 'পাথরের যুগ' নামেও অভিহিত করা হয়।

আদিম মানুষ পাথর যুগের গোড়ার পর্বে আগুনের ব্যবহার জানত না বলে সংগৃহীত ও শিকার লভ্য সবখাবার কাঁচা আহার করত। তাই তাদের প্রয়োজন হতো কেবল চামড়া খসানো, বীজ বিযুক্ত করণ, মাটি খোদাই, মাংস ছেঁড়া, হাড্ডি বিচ্ছেদ বা ভাঙ্গা ইত্যাদি কাজের উপযোগী হাতিয়ার। আর এ উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে মানুষ কেবল সেইসব সহজলভ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড খুঁজে বেড়াত যে খণ্ডগুলো এ ধরনের কাজের উপযোগী। কিন্তু এ ধরনের পাথরখণ্ড সঙ্গত কারণেই ভোঁতা অথবা সহজভাবে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। সুতরাং তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরখণ্ডকে অপর একটি পাথরখণ্ড দিয়ে আঘাত করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার প্রবণতার উন্মেষ ঘটে। এ ধরনের সহজলভ্য পাথরের মধ্যে স্ফটিক-মনি ও বেলে-স্ফটিকের ফ্লেইক এবং বেলে পাথরজাত নুড়ি অন্যতম। কিন্তু এসব পাথরকে আঘাত করলে নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্লেইক উঠে আসার পরিবর্তে এবড়োথেবড়ো ভাবে ফ্লেইক উঠে আসত। কারণ এসব পাথর রুদ্ধ কণিকা দিয়ে গঠিত। স্বভাবতই এসব পাথর দিয়ে ইচ্ছা অনুসারে নির্ধারিত গড়ন অনুযায়ী হাতিয়ার তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তদুপরি যেসব হাতিয়ার তৈরি হতো সেগুলো ছিল অমসৃণ ও ভোতা ধরনের। ফলে চামড়া খসানো, মাংস টুকরো করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য এদের যথেষ্ট উপযোগিতা ছিল না। অথচ দিন দিনই বুদ্ধিবৃত্তি

ছুড়ে, লাল, নীল, হলুদ ও কালো রঙ ছিটিয়ে দেওয়া হতো। সবচেয়ে সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্যে বর্শাবিদ্ধ পশু অন্যতম।

১০. বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মায়ানমারে কিছু প্রস্তরীভূত কাঠের তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গেছে। কিন্তু সংখ্যা ও সংস্কৃতির বিচারে প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি হাতিয়ারগুলো এখনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার (সংস্কৃতি) আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ইউরোপের তরালবা নামক অঞ্চলেও একটি হাতির পাঁজায় বিদ্ধ অবস্থায় একটি কাঠের বর্শা পাওয়া গেছে।

রেখাচিত্র – ৫



আফ্রিকার বুসম্যানদের দ্বারা অঙ্কিত মাছ ধরার দৃশ্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় বিভিন্ন নিদের্শনাদি

বিকাশের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের উপযোগিতার ধরন নতুন থেকে নতুনতর হচ্ছিল।

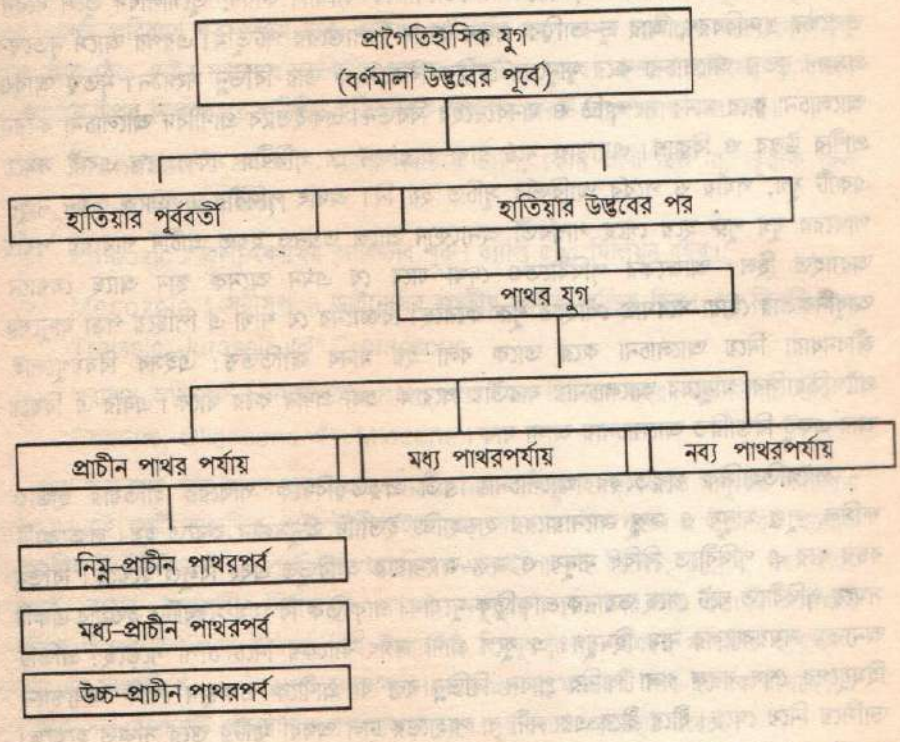
প্রয়োজন ও বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আদিম মানুষ নতুন নতুন উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধ থেকেছে। তাই একসময় পাথরে পাথর ঠুকে যেমন আগুন জ্বালাতে শিখেছে তেমনি স্ফটিকজাত পাথরের চাইতে উন্নতধরনের মিহি কণিকা গঠিত এগেট (agate), চেলসেডনি (chalcedony), চার্ট (chert), রিওলিট (riolite), ব্যাসাল্ট (basalt), ফ্লিন্ট (flint) জাতীয় পাথর খুঁজে বের করেছে। একই সাথে তারা এসব পাথর থেকে নিজেদের চাহিদা মাফিক ফ্লেইক খসানোর নতুন পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছে। এভাবে উন্নত উপাদান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে অধিক ধারাল, সুন্দর গড়ন ও অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হাতিয়ার তৈরি হতে শুরু করেছিল। এগুলো ব্যবহারের আনুপাতিক উপযোগিতাও ছিল বেশি। আর এরই মধ্য দিয়ে মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশের ভবিষ্যত অব্যাহত থেকেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারকারী বিস্মৃত মানুষ যেহেতু অত্যন্ত সরল ও সাধাসিধে জীবনধারণ করত সেহেতু তাদের হাতিয়ারগুলোও ছিল সাধাসিধে ধরনের। শুধু তাই নয়, তারা বাস করত এমনস্থানে যে স্থান থেকে সহজেই বন্যপ্রাণীর গতিবিধি অবলোকন করা সম্ভব হতো। তাই তারা বসবাসের নিমিত্তে এমন জায়গা বেছে নিত যে জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির সময় আশ্রয় গ্রহণ করা সহজ, যে স্থান উঁচু এবং যে স্থানের পাশে শিকার বিচরণের উপযোগী বিস্তীর্ণ তৃণভূমি রয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবন চিরদিন কেবল শিকার নির্ভর ছিল না। ধীরে ধীরে তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে। উদ্ভাবন করেছে কৃষি কাজ। আর এই সর্বশেষ উদ্ভাবনীর ফলে বিস্মৃত মানুষের জীবনধারণের সামগ্রিক রূপটাই রূপায়িত হয়েছে এক নতুন ধাঁচে।

কৃষি উদ্ভাবনের পর (আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে) আদিম মানুষ বনের নিকটবর্তী পাহাড়ের গুহা ছেড়ে নেমে এসেছে নদীর তীরের উর্বর সমতল ভূমিতে। নদী তীরবর্তী উর্বর সমতল ভূমিতে বসবাসের জন্য বেঁধেছে বসতি। হত্যার জন্য পশুসন্ধানের পরিবর্তে খুঁজে নিয়েছে পোষ মানিয়ে নিজের নিরাপত্তা ও উৎপাদনমুখী কাজের সহযোগী শক্তিতে পরিণত করা যায় এমন পশু। তারপর নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও পশু-শক্তির যুগ্মসমন্বয় ঘটিয়ে মাটির বুক চিড়ে বের করে এনেছে সোনালি খাদ্যের কণা। উৎপাদনের এই ধরন পাল্টানোর সাথে সাথে শিকার ও যাযাবর জীবনে ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তীর বা বর্শার পরিবর্তে লাঙ্গলের ফলার। আদিম মানুষের স্বপ্নের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে ফসলের শিষ। এই পরিবর্তন আর বিবর্তন কিন্তু আজও থেমে থাকে নি। অব্যাহত এই পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপেই সূচিত হয়েছে একটি নতুন যুগ, পর্যায় ও পর্ব। বস্তুত, পরিবর্তনের এই সূত্রগুলো চিহ্নিতকরণের সাফল্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের মূলধারা।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যেহেতু পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যতীত আর অন্যকোন নিদর্শন, এমনকি ঘরবাড়ি ও বর্ণমালা ফেলে যায় নি, সেহেতু তাদের সম্পর্কে জানতে হলে একমাত্র সূত্র

হলো তাদের তৈরি ও ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো খুঁজে বের করা এবং তাদের নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে আবার নিম্নোক্ত কয়েকটি পর্যায় ও পর্বে ভাগ করা হয়েছে।



উল্লিখিত প্রতিটি পর্যায় ও পর্ব -উত্তরণের ক্ষেত্রে মূলসহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেছে মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অদম্য বাঁচার সাধ। এর মাধ্যমে মানুষ ক্রমাগত উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ার উদ্ভাবন করেছে। নতুন হাতিয়ার তৈরির ফলে তাদের জীবনধারায়ও সংযোজিত হয়েছিল নতুন নতুন প্রবাহ। মূলত এই প্রবাহগুলোর মূলধারাগুলো সম্পর্কে অবহিতি লাভ ব্যতীত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো ভূ-পৃষ্ঠের মূল অবস্থানেও সঞ্চিত নেই। ভূ-আন্দোলন, ভূমিকম্প, বন্যা, বালুঝড়, নদী সৃষ্টি ও তার গতিপরিবর্তন ইত্যাদি বহুকারণে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের হাতিয়ারগুলো একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাথরের তৈরি হাতিয়ারগুলো স্রোতের আঘাতে, মাটির চাপে ও পরস্পর ঘর্ষণে ক্রমশ মূলরূপের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে ফেলেছে। অনেকক্ষেত্রে এদের পৃষ্ঠদেশীয় বহিরাবরণে ভূমির চাপ ও তাপ এবং মাটির জৈবিক পদার্থের বিক্রিয়ায় নতুন পদার্থের প্রলেপ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই

এই বিষয়গুলোকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হলে রসায়নবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আর এভাবেই প্রত্নতত্ত্বের সাথে রসায়নবিদ্যার একটি যোগসূত্র রচিত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমেই যে বিষয়টি আসে তা'হলো জলভাগ ও স্থলভাগের জন্ম ও বিন্যাসের নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যা। কারণ, ভূগোলবিদ তুলে ধরেন ভূপৃষ্ঠের স্থানবিবরণ, আর ভূ-তাত্ত্বিক প্রদান করেন শিলাস্তরের পটভূমি। এরপর আসে নৃতত্ত্বের প্রসঙ্গ। নৃতত্ত্ব আলোচনা করে মানুষের দৈহিক বিবর্তন ও তার বিভিন্ন সংগঠন। নৃতত্ত্ব আরও আলোচনা করে মানব সংস্কৃতি ও মানবদেহের বিবর্তন। একইভাবে প্রাণীবিদ আলোচনা করেন প্রাণীর উদ্ভব ও বিকাশ। এছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে পৃথিবীর সকলপ্রান্তে একই সময়ে একটি যুগ, পর্যায় ও পর্বের আবির্ভাব সূচিত হয় নি। অর্থাৎ পৃথিবীর একপ্রান্তে যখন নতুন পাথরের যুগ শুরু হয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী অন্যকোন প্রান্তে তখনও হয়ত প্রাচীন পাথরের পর্যায় অব্যাহত ছিল। আজকের পৃথিবীতেও দেখা যাবে যে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া সবেমাত্র পৌছতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের যে শাখা এ পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় মানব জাতিতত্ত্ব। এইসব বিষয়গুলোই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আলোচনায় যাবতীয় পরোক্ষ তথ্য প্রদান করে থাকে। এবার এ বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় ব্রতী প্রত্নতত্ত্ববিদকে পাথরের হাতিয়ার ছাড়াও ফসিল, লুপ্ত মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের হাড়হাড্ডি ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে হয়। লক্ষকোটি বছর ধরে এ পৃথিবীতে বিবিধ মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার আবির্ভূত এবং বিলুপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে ঘটে গেছে ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সঙ্ঘটিত হওয়ার একটি অন্যতম সময়কালের নাম হিমযুগ। এ যুগে প্রাণী জগৎ বরফের নিচে চাপা পড়েছে। প্রতিটি হিমযুগের শেষ বরফ গলা পানির প্লাবন বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এরা নদী বা পাহাড়ের ঢাল অথবা মাটির স্তরে সঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে ভূমির উত্থান-পতনের ফলে সৃষ্ট হয়েছে হ্রদ, মালদ্বীপ, টিলা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। শুকনো গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট আগুনে পুড়ে গেছে সুনীল বন। তাপের পরিবর্তনের ফলে নদী মজে গেছে অথবা গতি বদলিয়েছে। পৃথিবীর বয়স যত বেড়েছে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ থেকে ভূপৃষ্ঠে ততই শিলাস্তরের সংখ্যা বেড়েছে। সবচেয়ে প্রাচীনটি তলিয়ে গেছে সবচেয়ে নিচে। অপেক্ষাকৃত নবীনটি জেগে উঠেছে উপরে। ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচের কঠিন শিলাস্তরটির নাম ব্যাসালরক (basalrock) । এর উপর পর পর থরে থরে ক্রমাগত নবীন স্তরগুলো জেগে উঠেছে। অর্থাৎ সবচেয়ে নবীনটি এসেছে সবার উপরে। প্রতিটি স্তর ঐ যুগের প্রাণীদের মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত রস ও পানি বা বাতাসের সাহায্যে সঞ্চিত উপাদানের প্রতিনিধিত্বকারী। আগেই বলা হয়েছে যুগে যুগে এ পৃথিবীর জীবজগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রতিটি স্তরে সঞ্চিত উপাদানের আনুপাতিক হারের পার্থক্য এবং তাদের উপর ভূপৃষ্ঠের তাপ ও চাপের তারতম্যের কারণে প্রতিটি স্তরের বয়ন কাঠামো ও রঙ একটি বিশেষ

ধরন অর্জন করে। এসব স্তরের বিন্যাস পর্যালোচনা করেই ভূতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর বয়সকে যথাক্রমে কয়েকটি ইত্তন, ইরা, পিরিয়ড, ইপোক, সাব-ইপোকে বিভক্ত করেছেন। একইভাবে প্রাণীবিদ্যার আলোচনায় দেখা যাবে সবশেষ ইপোটি আবার সাতটি (মতান্তরে নয়টি) হিমযুগে বিভক্ত। এক সময় পৃথিবীর বাসিন্দা অতিকায় তৃণভোজী ডাইনোসররা প্রথম হিমযুগে বিলুপ্ত হয় এবং তাদের পরিবর্তে ঘন পশমে ঢাকা ম্যামথ আবির্ভূত হয়। এসব প্রাণীদের মধ্যে কোনটিই আজ আর বেঁচে নেই। সবশেষে আবির্ভূত হয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। এভাবে প্রাণীদের আবির্ভাব ও বিলুপ্তির উপর নির্ভর করে পৃথিবীর ইতিহাসকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) Archaean ঃ সর্বপ্রাচীন ব্যাপ্তি সবচেয়ে বেশি, কোন প্রাণী ছিল না, ভূত্বকে ছিল প্রাক্‌কেমব্রিয়ান মৃত্তিকা।

(২) Paleozic ঃ প্রাণী-কোষের আবির্ভাব শুরু। ব্যাপ্তি ৫০০ মিলিয়ন বছর।

(৩) Mesozoic ঃ সরীসৃপ ও ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। এর তিনটি ভাগ Traissic, Jurassic এবং Cretaccous.

(৪) সবশেষ অধিকল্প ঃ সময়কালের ব্যাপ্তি প্রায় সত্তর মিলিয়ন বছর। এর তিনটি ভাগ – Eocene, Oligocene এবং Miocene.

প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে শুরু হওয়া Miocene প্রাণীযুগেই পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা শুরু হয়। এই যুগটি ভূতাত্ত্বিক প্লেইস্টোসীন ইপোকের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এ ভূতাত্ত্বিক ইপোক আনুমানিক ১ মিলিয়ন বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল। এই ইপোকেই সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়নামতি লালমাই, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, সাভার, মধুপুর, ভাওয়ালের গড় ইত্যাদি লালমাটি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো গড়ে উঠেছে। এই ইপোকেই হিমযুগগুলোর হিমবহ সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া এর সাম্প্রতিক (recent) ও হলসেন (Holcene) নামে একটি সাব-ইপোক রয়েছে। এ ভূতাত্ত্বিক সাব-ইপোকটি আনুমানিক দশ হাজার বছর পূর্ব থেকে অব্যাহত রয়েছে।

প্লেইস্টোসীন ইপোকেই মানুষ গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসে। এসব মানুষ অবশ্য দেখতে আজকের মতো ছিল না। এদের আকৃতি অনেকাংশে লেজবিহীন বানরের সাথে তুলনীয় ছিল। তাই ওদের সাধারণ নাম নরবানর। নরবানরের অবস্থা থেকে মানুষ কি করে আজকের পর্যায়ে উপনীত হলো সে সম্পর্কিত কোন তথ্য আজও পাওয়া যায় নি। এদের অস্থির অংশবিশেষ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, ফ্রান্স, হাংগেরি, চিন ও জার্মানে পাওয়া গেছে। যে সব স্থানে এগুলো পাওয়া গেছে সেসব স্থানগুলোর নাম অনুসারে এদেরকে বিভিন্ন অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছে ঃ যেমন- ন্যায়নডারথাল (জার্মানি), হাইডেলবার্গ (হাঙ্গেরি), প্যারাপিথেকাস, প্রোপ্লিয়পিথেকাস, অস্ট্রালোপিথেকাস, ড্রাইওপিথেকাস, পিকিং (চিন), সিনাসথ্রোপাস, পিথিকানথ্রোপাস (জাভা), সোয়নস্কোম (দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড) ফোঁতেশভাদ (ফ্রান্সের আতলানটিক উপকূল), ত্রিনিল (জবদ্বীপ), ক্রোমনীয়/ক্রোমাঞ্চ ইত্যাদি। এদের অস্থির গড়নের পার্থক্য অনুযায়ী অনুমিত হয় যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের নরবানরগুলোর মধ্যে আকৃতিগত

বিদ্যমান ছিল। এদের কোন না কোনটির মধ্যেই হয়ত নরবানর থেকে আজকের মানুষে উত্তরণের লুপ্ত-সংযোগটি নিহিত আছে। এ বিভাজন কেবল অস্থিবিদ্যার পর্যালোচনার আলোকেই নিরূপণ করা সম্ভব। অস্থিবিদ্যার পর্যালোচনা যখন ফসিলের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয় তখন এ পর্যালোচনাটিকে জীবাশ্মবিজ্ঞান বলা হয়। সাম্প্রতিক কালের মানুষকে আবার চুল, চামড়া ও নখের রঙ এবং দৈহিক গড়ন অনুযায়ী কতকগুলো বৃহত্তর মানবধারায় বিভক্ত করা হয়েছে ; যেমন– পশমী চুলের অধিকারী নিগ্রোয়েড (Negroid), সোজা চুলের অধিকারী মঙ্গলয়েড (Mongoloid), কোঁকরান চুলের অধিকারী ককেশীয় (Caucassus) এবং ঢেউ খেলান ও মোটা চুলের অধিকারী অষ্ট্রিক (Austrood)। নিগ্রয়েড ও ককেশীয়দের আদি নিবাস আফ্রিকা ও এশিয়া। অন্যদিকে মঙ্গলয়েডদের চিন, কম্বোডিয়া, জাপান, মায়ানমার, ফিলিপাইন, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে দেখা যায়। এছাড়া অষ্ট্রিকদের আদি নিবাস প্যালেস্টাইন। এসবই নৃতত্ত্বের আলোচ্যবিষয়। অথচ এর কোন একটি বাদ দেওয়া হলে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

পুরা ঐতিহাসিক যুগ

ঐতিহাসিক যুগের সাথে ভাষা ও বর্ণমালার সম্পর্ক নিগূঢ়। কিন্তু মানুষ কখন সুনির্দিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছ দিয়ে একে অপরের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেছিল সে সম্পর্কে এযাবৎ কিছু সুনির্ধারিত ভাবে জানা সম্ভব হয় নি।-তবে পণ্ডিতদের ধারণা এই যে বর্ণমালার ব্যবহার প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল। সূচনাপর্বের বর্ণগুলোকে তাদের আকৃতির বিন্যাস অনুযায়ী কতকগুলো বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। তবে বলে রাখা ভাল যে সে যুগের অধিকাংশ লিপিগুলো থেকে আজও পাঠোদ্ধারের কাজটি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। তাই উক্ত যুগটির নাম পুরাঐতিহাসিক বা দুর্বোধ্য বর্ণমালার যুগ। এ যুগের অন্যতম উদাহরণ মিসরীয় ও হরপ্পা সভ্যতা। আবার এ যুগেই ধাতুর ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করে।[১১] তাই ধাতু আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে এ যুগকে আবার ধাতু-পাথর যুগ নামেও অভিহিত করা যায়। এ যুগের দু'টি পর্যায় রয়েছে, যথা—তামা পর্যায় ও ব্রঞ্জ (তামা+টিন) পর্যায়। এ যুগেই মানুষ নদীর তীরের নির্দিষ্ট উর্বর সমতল ভূমিতে প্রাচীর ঘেরা নিরাপদ চত্বরে অবস্থিত ও শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্মিত ঘরবাড়িতে বসবাস করতে শুরু করে। তাই এ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় এসব প্রত্ননিদর্শনগুলো প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এসব প্রত্ননিদর্শন

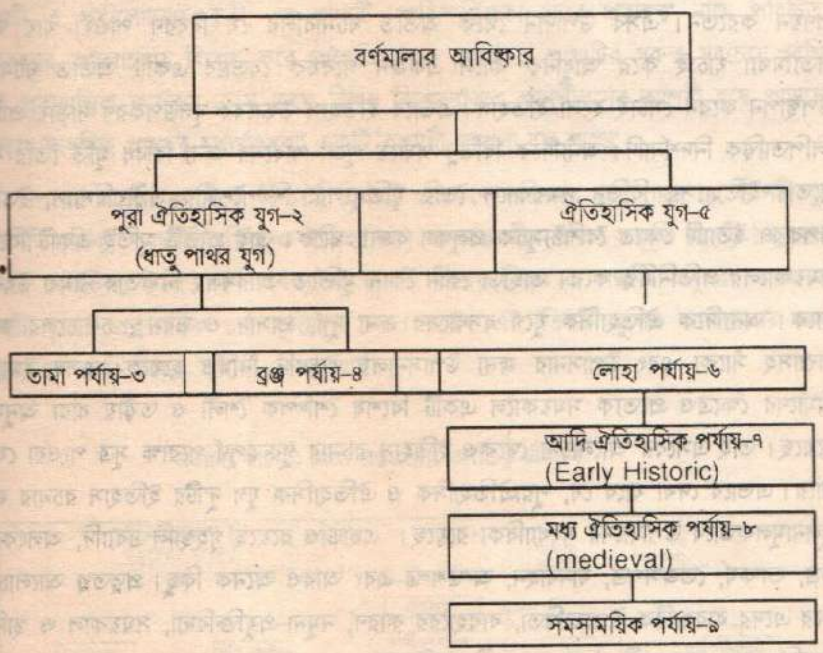
---

১১. ১৯৯১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ইতালি ও অষ্ট্রিয়ার আলপস পর্বতমালার ৩২০০ মিটার উঁচু এক শিখরের শিরোদেশে এ যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সঙ্ঘটিত হয়েছে। এ আবিষ্কারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তামা-পাথর পর্যায়ের একজন হিমায়িত মানুষের অবিকল মৃতদেহ। আইসম্যান নামে বিশ্বখ্যাত এই মানুষটির সঙ্গে আরও পাওয়া গেছে তামার তৈরি কুঠার, ঘাসের তৈরি থলে, আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহারযোগ্য চকমকি পাথরের টুকরা, কাঠের হাতল ও পাথরের ফ্লেইকের ছোরা, হরিণের চামড়ায় তৈরি তূণীর ও পাখির পালক বসান তীর। এর বয়স আনুমানিক ৫০০০ বছর।

তো আর বর্ণমালার মতো কথা বলতে পারে না। তাই এগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হয় গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে। এ পর্যালোচনায় চারুকারু শিল্পকলার উপকরণাদি তৈরির ক্ষেত্রে অনুসৃত কৌশল, ব্যবহারিক উপযোগিতা, আকার-আকৃতি, অবস্থানগত বিশদ বিবরণ (উল্টানো, সুবিন্যস্ত, বিশৃংখল), অনাবৃতকরণ কালের তাৎক্ষণিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবরণ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে থাকে।

ঐতিহাসিক যুগ

লিখিত উপাদান থেকে যে যুগের বিবরণ জানা যায় সে যুগকে ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়। তাই বর্ণমালা আবিষ্কারোত্তর, সময়কালকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যেতে পারে।



আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের সূচনালগ্নে পশ্চিম দিক থেকে আগত আর্য নামে একটি জাতি বাংলা-ভারত পাক-উপমহাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এদের সাথে উপমহাদেশের অনার্য অধিবাসীদের সংমিশ্রণে ধীরে ধীরে এক নতুন সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর আদি নাম ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য সংস্কৃতি। কালের বিবর্তনে এ সংস্কৃতিও একসময় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন নামের বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শিগণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে শুধু ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয় বরং রক্ত, সামাজিক কাঠামো এবং জীবনধারণের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন অব্যাহত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে পর্যায়ক্রমে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল

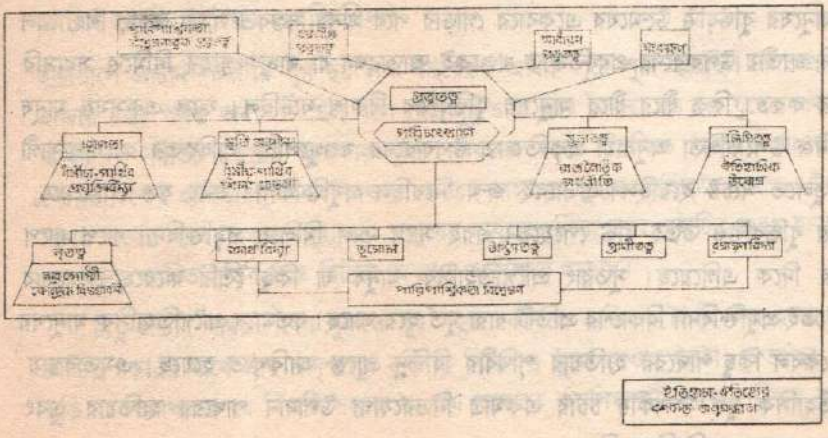
একাধিক জনপদ। বিভিন্ন সূত্র থেকে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে এ উপমুহাদেশে ষোলটি জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। এ জনপদগুলো একধরনের ছাপাঙ্কিত ও ছাঁচ নির্মিত মুদ্রার প্রচলন করেছিল। এ পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক প্রত্নবস্তু উত্তরদেশীয় পালিশকৃত ওয়্যার (ware)। এরপর কয়েকটি জনপদ ধীরে ধীরে একজন শক্তিশালী যোদ্ধার নেতৃত্বে স্ব স্ব নেতা ও রাজ্যের জন্ম দিল। এভাবে শুরু হলো রাজা ও রাজ্যের উত্থান। এরা মাঝেমধ্যে জমি ক্রয়-বিক্রয়, জমিদান, রাজকীয় আদেশ-নির্দেশ, ধর্মীয় বিধানাবলি, বংশপঞ্জি, বিজয়গাঁথা, প্রসিদ্ধ ঘটনা, সময়কাল, জীবনী, ইমারতের পরিচিতি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য পাথর বা ধাতু ফলকের উপর লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। অনেকসময় স্মারক মুদ্রাও প্রচার করতেন। অপর দিকে বিভিন্ন শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী ও পণ্ডিতবর্গ কিছু শাস্ত্র, ইতিবৃত্ত, দার্শনিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি প্রণয়ন করতেন। এসব উপাদান থেকে অতীত ঘটনাবলির যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সত্যমিথ্যা যাচাই করে আধুনিক কালে একজন গবেষক যেভাবে একটি অতীত ঘটনাকে উপস্থাপন করেন সেটাই হলো ইতিহাস। এভাবে ইতিহাস উদ্ধারের মূলউপকরণ দাঁড়ায় প্রাচীন লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি। অন্যদিকে বিভিন্ন পর্যায়ে পূজা-পার্বনের জন্য বিবিধ মূর্তি তৈরি করা হতো। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে তৈরি মূর্তিগুলোর শিল্পশৈলীর তত্ত্বীয়বিন্যাস, তৈরির উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসূচক প্রলক্ষণ বজায় থাকে। তাই প্রতিটি মূর্তিই একটি বিশেষ সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া কোন কোন মূর্তিতে তারিখসহ নির্মাতার নামও উৎকীর্ণ থাকে। অন্যদিকে ঐতিহাসিক যুগে বসবাসের জন্য দুর্গ, প্রাসাদ ও ভবন ; চলাচলের জন্য রাস্তাসহ সাঁকো এবং উপাসনার জন্য উপাসনালয় ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। এসব ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সময়কালে একটি বিশেষ শৈল্পিক শৈলী ও তত্ত্বীয় ধারা অনুসৃত হয়েছে। তাই এসবের আলোচনা থেকেও ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ সূত্র পাওয়া যেতে পারে। এভাবে দেখা যাবে যে, পুরাঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ দুটির ইতিহাস রচনার জন্য তুলনামূলকভাবে উপাদানের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে গৃহস্থালি দ্রব্যাদি, অলংকার, চিত্র, ভাস্কর্য, তৈজসপত্র, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং আরও অনেক কিছু। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করে এদের ব্যবহারিক উপযোগিতা, ব্যবহারের কারণ, নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা, সময়কাল ও স্থানিক বিস্তৃতি এবং প্রস্তুতকারী ও ব্যবহারকারীর পরিচয়।

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি প্রত্ননিদর্শন একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ধারা-প্রবাহের প্রতিনিধিত্ব করে। এসব আদিম ধারা-প্রবাহ বর্তমান বিশ্বের বহু উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আজও বিদ্যমান আছে। ফলে একটি নব্যসন্ধানলব্ধ প্রত্ননিদর্শন থেকে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর সম্পর্কে পূর্ণতথ্য উদঘাটন করতে হলে এগুলোর সাথে জাতিতাত্ত্বিক সূত্রগুলোর তুলনামূলক আলোচনাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। তাই মানুষের ব্যবহৃত ও তৈরি যে কোন বস্তু একটি বিশেষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যদিকে বস্তুটি কিভাবে ব্যবহৃত হতো এবং পরিত্যক্ত হয়েছে, এ বিশ্লেষণের সাথে জড়িত আছে ঐ সমাজের উত্থান-পতনের যাবতীয় সূত্র। অতঃপর বস্তুটির প্রাপ্তির স্তর সম্পর্কীয় ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলে ঐ জনগোষ্ঠী বা সমাজ কোন সময়কালে বসবাস করত সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত দাঁড় করান সহজ হয়। তাছাড়া বিস্মৃত মানুষের পরিধেয়, সজ্জা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করলে ঐ এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন ছিল সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য অনেকক্ষেত্রে প্রত্নবস্তু ছাড়াও নামকরণ বিশ্লেষণ, স্পর্শন দ্বারা বোধের অযোগ্য সূত্র বা স্মারক, প্রাচীন জলবায়ুবিদ্যা, প্রাচীন উদ্ভিদবিদ্যা, নদীপ্রবাহতত্ত্ব ইত্যাদি শাস্ত্র আলোচনা করতে হয়। মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে এ বিষয়গুলোর আলোচনাকে বলা হয় 'প্রাণী-পরিবেশ সম্পর্কীয় চর্চা'। প্রত্নতত্ত্বের যে শাখাটি এ পর্যালোচনায় ব্রতী, সে শাখাটি 'পারিপার্শ্বিকতা চর্চার প্রত্নতত্ত্ব' নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্রে এ শাখাটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলনের আশ্রয়ী হয়ে পড়েছে। সুতরাং আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব যথার্থভাবেই একটি 'বহুমুখী শৃঙ্খলা বদ্ধ শাস্ত্র'।

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বিষয়টি এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তিনটি যুগে (প্রাগৈতিহাসিক, পুরাঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক) মানুষের জীবনধারার প্রকৃতি তিনটি ভিন্নধারায় এগিয়ে চলেছিল, ফলে কোন অবস্থাতেই একটি বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করে এই তিনটি যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা যুক্তিযুক্ত নয়। অর্থাৎ এই তিনটি যুগের আলোচনার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক কর্ম-কাণ্ডের সাহায্য নেওয়া যায়।

অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে প্রত্নতত্ত্বের আন্তঃসম্পর্ক



৩

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনাপর্বে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রতিনিয়ত তাদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মোকাবেলা করতে হতো। কেবল কায়িক শক্তি দিয়ে নিরস্ত্র মানুষের পক্ষে সকলসময় বনের বুনো জানোয়ারদের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হতো না। স্বভাবতই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে কায়িক শক্তির সহযোগী আর একটি শক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তাছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য গাছের উঁচু ডাল থেকে ফল-ফুল নামিয়ে আনা অথবা মাটি খুঁড়ে শিকড় বের করার জন্য কেবল হাতই যথেষ্ট ছিল না। এ ক্ষেত্রেও প্রাগৈতিহাসিক মানুষ আরও একটি সহযোগী শক্তির প্রয়োজন অনুভব করেছিল। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে এই তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো মিটানোর নিমিত্তে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নিজেদের পরিচিত পরিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সহজলভ্য উপকরণগুলোর উপর নির্ভর করেছিল। যতদূর সম্ভব মাটি বা পাথরের ঢেলা, কাঠ, হাড়, শিঙ ইত্যাদিই ছিল তৎকালে সর্বাধিক সহজলভ্য এবং উল্লিখিত প্রয়োজনগুলো মেটানোর উপযোগী উপকরণ। কিন্তু এদের মধ্যে একমাত্র পাথর ব্যতীত আর কোনটিই সময়ের বিবর্তন এবং প্রকৃতির তাপচাপ অগ্রাহ্য করে টিকে থাকার উপযোগী নয়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের একেবারে গোড়ার পর্বে মানুষ সম্ভবত পাথর, হাড়, শিং, ডাল ইত্যাদি জাতীয় উপকরণের প্রকৃতিজাত খণ্ডকেই আত্মরক্ষা বা খাদ্যসংগ্রহের নিমিত্তে সরাসরি ব্যবহার করত। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছিল। ফলে একসময় মানুষ নিজ নিজ উপযোগিতা অনুযায়ী প্রকৃতিজাত উপকরণের খণ্ডগুলোকে অধিকতর কার্যোপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। এভাবেই জন্ম নিয়েছিল প্রযুক্তিবিদ্যা। সময় যত পেরিয়েছে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়েছে। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যা কিছু তৈরি করেছে সেগুলোর প্রতিটিতেই প্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশের প্রতিটি ধারা মূর্ত হয়ে আছে। বর্তমানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের তৈরি কেবল কিছু পাথরের হাতিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আবিষ্কৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কীয় চর্চার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান পাথরের হাতিয়ার এবং এগুলোর নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্লেষণ।

পাথরে তৈরি হাতিয়ারের সাধারণ নমুনা

নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের গোড়ার দিকে হাতিয়ার তৈরির জন্য স্ফটিক মনি শিলা ও আগ্নেয়শিলা ব্যবহার করত। কার্যসমাপনী প্রান্তের আকৃতি বিচারে এ হাতিয়ারগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা-একমুখো ও দ্বিমুখো। এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এসব নামের মধ্যে চপার-চপিং (Chapper-Chopping), হাতকুঠার, ক্লীভার (Cleaver) ও স্ক্রেপার (Scraper) অন্যতম। তবে ব্যবহারিক উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ নামকরণগুলোর যথার্থতা নির্ণয় করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাচীন পাথর পর্যায়ের মধ্যপর্বে একই নমুনার হাতিয়ার পাওয়া যেত। পার্থক্য কেবল এই যে হাতিয়ারগুলোর আকার পূর্বের চেয়ে ছোট। উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্বে বারিন (বারিন) নামে আরও একটি নমুনার হাতিয়ার প্রচলিত হয়েছিল।

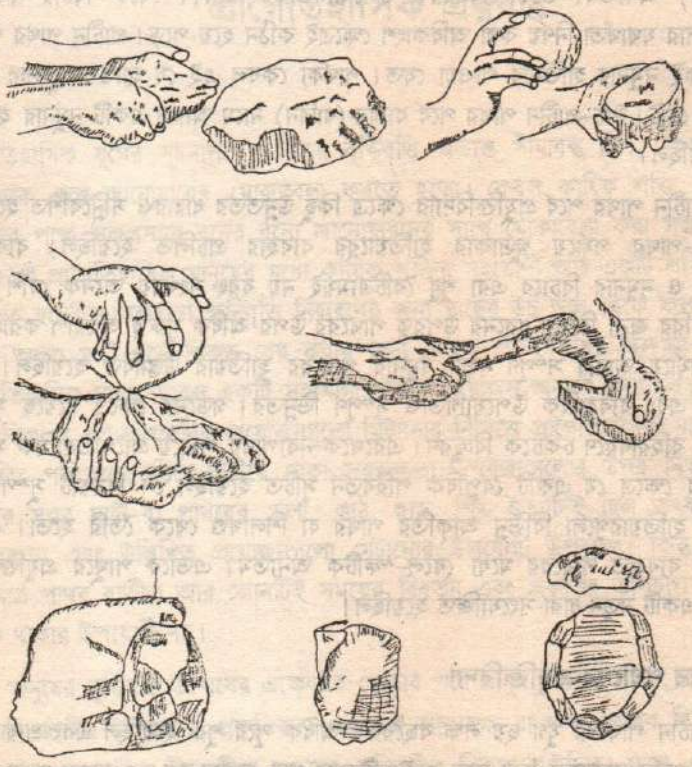
উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্বে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু উন্নততর ধারারও সন্নিবেশিত হয়েছিল। আবার মধ্য-পাথর পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ারের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ব্যবহারিক উপযোগিতা ও নমুনার বিচারে এরা শুধু বৈচিত্র্যময়ই নয় বরং সংখ্যায় অনেক বেশি। এসব হাতিয়ার তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের উপরত্ন পাথরের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো। নব্যপাথর পর্যায়ে আবার সম্পূর্ণ নতুন নমুনার পাথরের হাতিয়ার উদ্ভাবিত হয়েছিল। এদের প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ব্যবহারিক উপযোগিতাও সম্পূর্ণ ভিন্নতর। গড়নের ক্ষেত্রে রয়েছে সুডৌল বিন্যাস এবং বহিরাবরণে চকচকে বিচ্ছুরণ। এরথেকে নব্যপাথর পর্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তবে হাতিয়ারগুলো বিভিন্ন আকৃতির পাথর বা শিলাখণ্ড থেকে তৈরি হতো। এগুলো তৈরির জন্য ব্যবহৃত পাথরের মধ্যে বেলে-স্ফটিক অন্যতম। এভাবে পাথুরে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আর একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছিল।

প্রাচীন পাথর পর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা

ইউরোপে প্রাচীন পাথরের যুগ ছয় লক্ষ বছরেরও অধিক পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয়। এ যুগের প্রথম দিকের অধিকাংশ নদীতট চত্বরের ক্ষুদ্রাকার নুড়ি সঞ্চয়নের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শেষের দিকের হাতিয়ারগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাহাড়ের গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে। উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ারগুলো গুহাবাসী মানুষের ব্যবহৃত শিলাশ্রয়ের গুহাচিত্র এবং হাড়ের তৈরি ক্ষুদ্রাকার ক্ষোদিত মূর্তির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের শুরুতে খুব সহজ কৌশলে হাতিয়ার তৈরি করা হতো। এরজন্য অভিষ্ট গড়নের সাথে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ নুড়ি বা শিলাখণ্ড খুঁজে নেওয়া হতো। অতঃপর সন্ধানলব্ধ নুড়ি বা শিলাখণ্ডের যে দিকটি সহজে বা কম আঘাতে কার্যসমাপনী প্রান্তে পরিণত করা সম্ভব

রেখাচিত্র – ৬



মধ্য–প্রাচীন পাথর পর্বের প্রযুক্তিবিদ্যা

ছিল কেবল সে প্রান্তে অন্য একটি শিলাখণ্ড দিয়ে আঘাত করে অভিষ্ট গড়ন অর্জনের প্রচেষ্টা গৃহীত হতো। ফলে এ হাতিয়ারগুলো ভোঁতা শ্রেণীভুক্ত। এদের কার্যসমাপনী প্রান্তের অংশে কেবল বিক্ষিপ্ত ফ্লেইক বিমোচন ক্ষত বিদ্যমান থাকে। কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য প্রাচীন পাথর পর্যায়ের মানুষ যে কোন আকৃতির শিলাখণ্ড সংগ্রহ করে প্রথমে সেটাকে সরাসরি অন্য একটি পাথর খণ্ড দিয়ে পর্যায়ক্রমে আঘাত করে একটি হাতিয়ারের প্রাথমিক অন্তস্তল তৈরি করত। এরপর ঐ অংশটির কার্যসমাপনী প্রান্ত তৈরি হতো। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে একটি ফ্লেইক্ তৈরির জন্য একটি কারিগরিপর্যায়ের পরিবর্তে দু'টি কারিগরিপর্যায় অনুসৃত হতো। ধীরে ধীরে প্রযুক্তিবিদ্যার আরও উন্নতি হয়েছিল। দেখা গেল, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবার একটি নির্ধারিত লক্ষমাত্রা স্থির করে পরিমিত শক্তি প্রয়োগ এবং নির্ধারিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আঘাত করে যে কোন শিলাখণ্ড থেকে একটি ফ্লেইক্ বিমোচন করত। অতঃপর এ ফ্লেইকটিকে অভিষ্ট হাতিয়ারের গড়ন প্রদান করা হতো। সবশেষে এর একপ্রান্তে দ্বিতীয় দফা পরিমার্জনজনিত শৈল্পিক কোমল আঘাত হেনে একটি কার্যসমাপনী প্রান্ত তৈরি করা হতো। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে একটি শিলাখণ্ড থেকে হাতিয়ার তৈরির জন্য উপর্যুপরি তিনটি কারিগরি অনুশীলন অনুসৃত হতো।

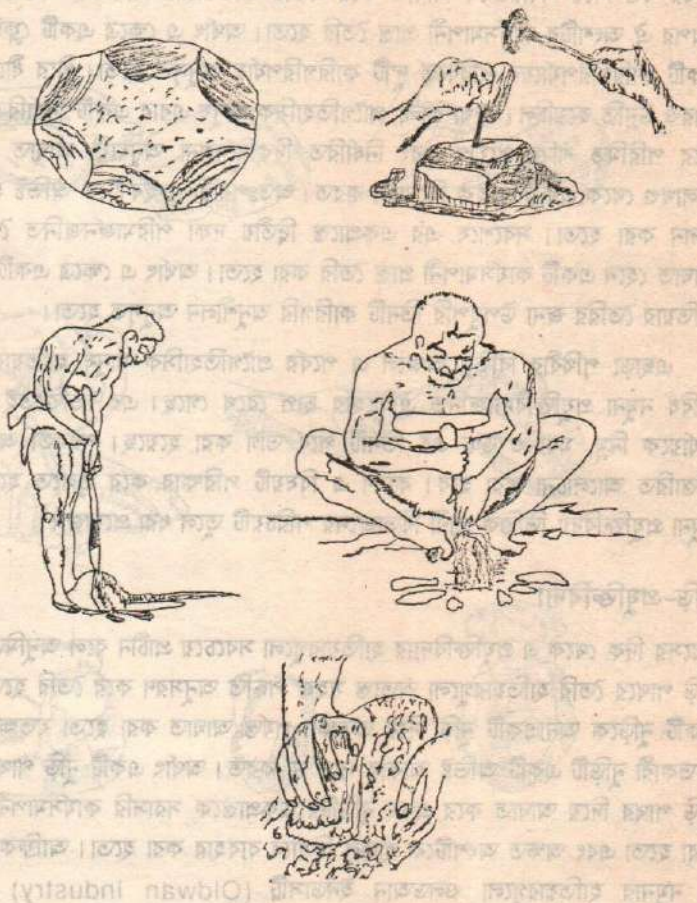
এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্বের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ হাতিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে বিবিধ নমুনা প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত ঐতিহ্যের ছাপ রেখে গেছে। এর ভিত্তিতেই প্রাচীন পাথরের পর্যায়কে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কারণ এ বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলতে হলে প্রথমে এদের নমুনা প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক শ্রেণী বিভাজনের পরিচয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন।

নুড়ি-প্রযুক্তিবিদ্যা

বয়সের দিক থেকে এ প্রযুক্তিবিদ্যার হাতিয়ারগুলো সবচেয়ে প্রাচীন বলে অনুমিত হয়েছে। কারণ নুড়ি পাথরে তৈরি হাতিয়ারগুলো অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি হতো। এ শ্রেণীভুক্ত একটি নুড়িকে অন্যএকটি নুড়ি দিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আঘাত করা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত আঘাত লাভকারী নুড়িটি একটি অভিষ্ট আকার লাভ না করত। অর্থাৎ একটি নুড়ি পাথরকে অন্যএকটি নুড়ি পাথর দিয়ে আঘাত করে প্রথম নুড়িটির একপ্রান্তকে সরাসরি কার্যসমাপনী প্রান্তে পরিণত করা হতো এবং অক্ষত অংশটিকে হাতল হিসাবে ব্যবহার করা হতো। আফ্রিকা মহাদেশে প্রাপ্ত এ নমুনার হাতিয়ারগুলো ওলডআন ইনডাসট্রি (Oldwan Industry) নামে পরিচিত প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ নমুনার হাতিয়ারগুলোর বহির্দেশে ফ্লেইক বিমোচন ক্ষতাদি বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনায় একাধিক বার আঘাত প্রদান করা হতো বলে এ নমুনার হাতিয়ারগুলোতে আঘাত শুরুর নির্দিষ্ট কোন উন্নীত সমতলস্থান বিদ্যমান থাকে না। আর তাই নুড়ি থেকে তৈরি হাতিয়ারগুলোকে রুক্ষ নমুনার হাতিয়ার বলা হয়। এদের কার্যসমাপনী প্রান্ত ভোঁতা প্রকৃতির হয়ে থাকে।

BANSDOC Library Dhaka

রেখাচিত্র – ৭



মধ্য-পাথর পর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা

অন্তস্তল-প্রযুক্তিবিদ্যা

এই বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হাতিয়ারগুলো ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া গেছে। তবে বিভিন্ন প্রান্তে শিলাখণ্ড থেকে অন্তস্তল তৈরির জন্য বিবিধ পদ্ধতিতে আঘাত প্রদানের কৌশল অনুসৃত হতো। তাই এক একটি প্রান্তে প্রস্তুতকৃত অন্তস্তলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই ভিন্নতাগুলোর উপর নির্ভর করেই অন্তস্তল প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক হাতিয়ারগুলোকে আরও কতকগুলো নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ঐতিহ্যগুলো এ্যাব্বেভিলিয় (Abbevillian), চেলিয় (Chellean), আশিলয় (Acheulean) প্রভৃতি নামে পরিচিত। ফ্রান্সের সম্মে (Somme) নদীর উপকূলবর্তী এলাকা, এ্যাব্বেভিলিয় ও আশিলায় ঐতিহ্যের এবং চেল্লেস চিলিয় ঐতিহ্যের লালনভূমি।

ফ্লেইক প্রযুক্তিবিদ্যা

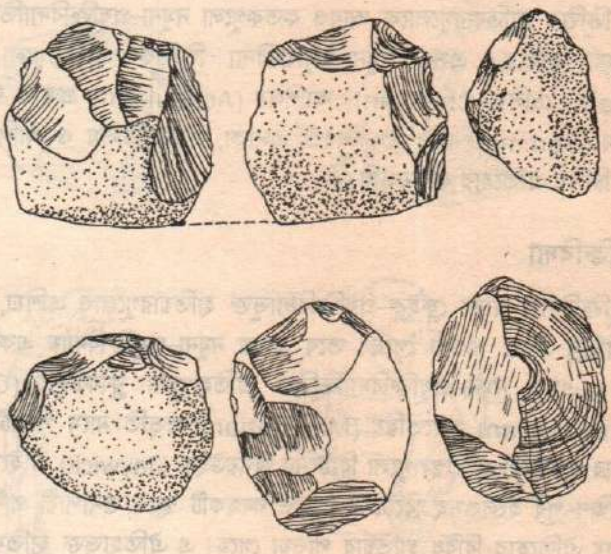
অন্তস্তল প্রযুক্তিবিদ্যার মতো ফ্লেইক-প্রযুক্তিবিদ্যাভুক্ত হাতিয়ারগুলোও এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া গেছে। তবে এদের নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যায় একাধিক ঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এসব নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক ঐতিহ্যগুলো ক্লাকটনিয় (Clactonian), লেভালয় (Levalosian) মুসতেয়িয় (Mousterian) প্রভৃতি নামে পরিচিত। ক্লাকটনিয় হাতিয়ারগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তিস্থলগুলো ব্রিটেনের জ্যায়উইক (Jaywick) ও ইসেক্সে (Essex) অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডসহ ব্রিটেনের আরও কয়েকটি স্থানে স্তন্যপায়ী প্রাণীর হাড়হাড্ডির সাথে লেভালয় ঐতিহ্যের বিবিধ হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এ ঐতিহ্যভুক্ত হাতিয়ারগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটি ফ্লেইকে দ্বিতীয় দফা পরিমার্জনজনিত পুনঃঅঙ্গগত না হেলে সরাসরি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হতো। লেভালয় ঐতিহ্যের লালন ভূমি ইংলণ্ডের টেমস উপত্যকা। এ ঐতিহ্যের সমসাময়িক কালে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের দর্দনীয় (Dardogue) উপত্যকায় মুসতেরিয় ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটে। ১৮৬০ সালে ভিজে (Vizere) জেলার ল-মুস্তের (La-Moustier) নামক এক গুহায় এ ঐতিহ্যভুক্ত হাতিয়ার হমনিতের কঙ্কালের সাথে আবিস্কৃত হয়।

ব্লেড-প্রযুক্তিবিদ্যা

কারিগরী বিচারে ব্লেড-প্রযুক্তিবিদ্যা উপর্যুক্ত উভয়প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যাগুলোর উপরই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। কারণ ব্লেড থেকে প্রস্তুতকৃত হাতিয়ারগুলোর গড়ন ও রূপ যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং কার্যোপযোগিতাও যথেষ্ট বেশি।

উপরে বর্ণিত প্রযুক্তিবিদ্যায় তৈরি হাতিয়ারগুলো কোন কোন প্রত্নস্থলে এককভাবে আবার কোথাও একটির সাথে অন্যটি মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে প্রতিটি বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যা

রেখাচিত্র – ৮



চপার



চপিং

নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার

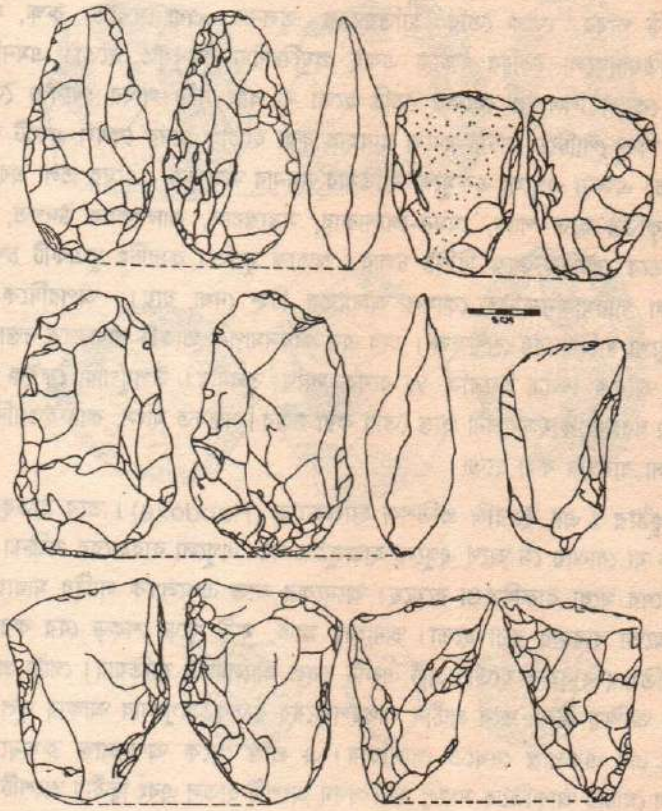
যে ভিন্ন ভিন্ন মানবধারা থেকে উদ্ভূত বা অনুসৃত সে বিষয়ে পণ্ডিতরা প্রায় সকলে একমত। ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং নমুনা অনুসারে হাতিয়ারগুলোকে কতকগুলো বিশেষ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে একটি করে বিশেষ নাম প্রদান করা হয়েছে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ-

চপার-চপিং ঃ এ জাতীয় হাতিয়ারগুলো পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলেই অধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে। নুড়ি পাথর থেকে তৈরি হাতিয়ারের তুলনায় এরা দেখতে রুক্ষ, যদিও উভয় নমুনার হাতিয়ারগুলো তৈরির ক্ষেত্রে একই প্রযুক্তিবিদ্যা অনুসৃত হতো। এমনকি চপার-চপিংগুলো কেবল শিলাখণ্ড থেকেই তৈরি হতো না বরং নুড়ি পাথর থেকেও তৈরি হতো। চপারগুলো কিছু পোঁচিয়ে কাটার কাজে ব্যবহার করা হতো। এদের কেবল একটি কার্যসমাপনী প্রান্ত থাকত। এজন্য এগুলো একমুখো হাতিয়ার নমুনার অন্তর্ভুক্ত। এদের তলা এবং প্রান্তগুলো বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, যেমন-গোলাকার, সমান্তরাল, গোলাকারে উদগত, খাড়া এবং কৌণিক। তবে কৌণিক প্রান্ত বিশিষ্ট চপার অত্যন্ত দুর্লভ। কদাচিৎ দু'একটি চপারের গায়ে দ্বিতীয় দফা পরিমার্জনজনিত কোমল আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। অপরদিকে চপিংগুলো একাধিক মুখো হাতিয়ারের শ্রেণীভুক্ত। তবে এর কার্যসমাপনী প্রান্তটি সাধারণত দন্তাকারের হয়ে থাকে, যা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি W বর্ণের সাথে তুলনীয়। উপর্যুপরি ফ্লেইক বিমোচনের মাধ্যমেই এ ধরনের কার্যসমাপনী প্রান্ত তৈরি করা সম্ভব। সম্ভবত মাংস, কাঠ ইত্যাদি চাবকানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করা হতো।

হাতকুঠার ঃ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হ্যাণ্ডঅ্যাক্স (Handoxe)। তবে হাতকুঠার বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় সে অর্থে এগুলো হাতকুঠার নয়। এগুলো ব্যবহারের প্রক্রিয়া নিয়েও তাই বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বাকবিতণ্ডা রয়েছে। অনেকের মতে এগুলোকে লাঠির মাথায় বেঁধে বর্শা ফলকের মতো ব্যবহার করা হতো। অন্যদের মতে, মাটি খুঁড়ে শেকড় বের করার কাজে এ নমুনার হাতিয়ার ব্যবহৃত হতো। এটি একটি বহুল আলোচিত হাতিয়ার। গোটা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই এর অস্তিত্ব ছিল। তবে প্রাচীন পাথরপর্যায়ের হাতকুঠারগুলোর আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড়। এর একপ্রান্ত দেখতে গোলাকার। এ প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে অনেকাংশে মোচার আকৃতিতে সমাপ্ত হয়। প্রথম অংশটি হাতল এবং দ্বিতীয় অংশটি কার্যসমাপনী প্রান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আর এই বৈশিষ্ট্যের বিচারে হাতকুঠারগুলোকে কৌণিক কাটারির শ্রেণীভুক্ত খোঁচরি হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে। আবার কোন কোন হাতকুঠার একাধিক মুখো হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। এযাবৎ বিভিন্ন নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যাভুক্ত ঐতিহ্যের হাতকুঠার আবিস্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে স্ট্রেপি (Strepy), আশিলয়, ওলডয়ন (Oldawan), এ্যাবেভিলিয়, চেল্লিয় প্রভৃতি নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক ঐতিহ্যের অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এসব হাতকুঠারগুলো প্রথম প্রাপ্তিস্থানের নামানুসারেই এ ধরনের নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

সর্বাধিক প্রাচীন ধরনের হাতকুঠার পাওয়া গেছে বেলজিয়ামে। এগুলো স্ট্রেপি হাতকুঠার নামে পরিচিত। চকমকি বৈশিষ্ট্যময় নুড়ি থেকে তৈরি ও ঐতিহ্যভুক্ত হাতকুঠারগুলোতে অত্যন্ত

রেখাচিত্র – ৯



ক্লিভার

নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার

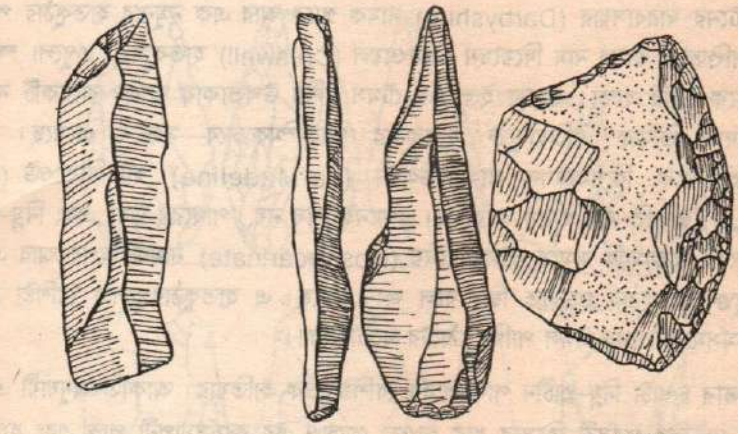
রুক্ষভাবে ফ্লেইক বিমোচন ক্ষত এবং উর্দ্ধদেশীয় বহিরাবরণ অক্ষত থাকে। আশিলয় হাতকুঠারগুলো বলগা হরিণ, ম্যামথ ও পশমী গণ্ডারের হাড়হাড্ডির সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ব্রিটেনসহ ইউরোপের বহুদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের বয়স খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০০ থেকে ২০০০০ অব্দে ন্যস্ত করা যায়। এদের আর একটি সাথী হাতিয়ার স্ক্রেপার। পরবর্তী পর্যায়ে স্ক্রেপার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ব্রিটেনের দারবাসয়ার (Darbyshire) নামক স্থানে আর এক নমুনার হাতকুঠার পাওয়া গেছে। পণ্ডিতগণ এদের নাম দিয়েছেন ক্রেসওয়েল (Creswell) হাতকুঠার। এগুলো স্ফটিক শিলা থেকে তৈরি হতো। এছাড়া ইংলণ্ডের টেমস নদীর উপত্যকায় আরও কয়েকটি নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ঐতিহ্যভুক্ত হাতকুঠার আকস্মিকভাবে সন্ধানে এসেছে। এসব হাতকুঠারগুলোকে বিশেষজ্ঞগণ ল্য-ম্যাডিলইন (La-Madeline), ল্য-মিকোওউ (La-Micoque) প্রভৃতি নাম প্রদান করেছেন। এখানেই শেষ নয়, 'পাথরের উষা' এবং নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের মাঝামাঝি সময়ে রষ্ট্রক্যারিনেয় (Rostrocarinate) নামক অপর আর একটি ঐতিহ্যভুক্ত হাতকুঠার প্রচলিত ছিল বলে জানা গেছে। এ হাতকুঠারগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এদের কর্মসমাপনী প্রান্ত ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা।

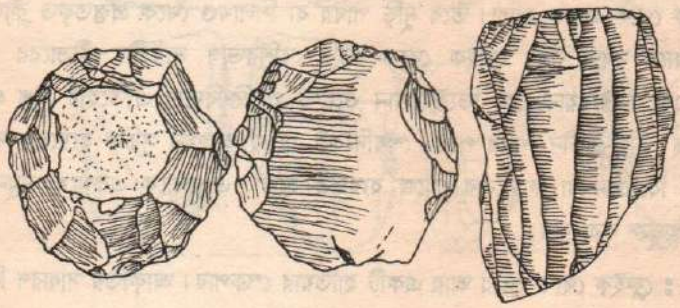
ক্লীভার ঃ এটা নিম্ন-প্রাচীন পাথরপর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক হাতিয়ার। আকৃতি অনুযায়ী এটিকে আধুনিক দাউলির পূর্বসুরী হিসেবে ধরে নেওয়া গেলেও এর কার্যসমাপনী প্রান্ত এবং হাতলের স্থানগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এই শেষোক্ত প্রভেদের উপর নির্ভর করে ক্লীভারগুলোকে বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি উপ-নমুনাভুক্ত করেছেন। আবার বেশিরভাগ ক্লীভার পাথরের ফ্লেইক থেকে প্রস্তুত হতো। তবে নুড়ি পাথর বা শিলাখণ্ড থেকে প্রস্তুতকৃত ক্লীভারের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয়। ফ্লেইক থেকে তৈরি বেশিরভাগ ভারতীয় ক্লীভারের ক্ষেত্রে লেভালোয়ান এবং ভিক্টরিয়ান-এবং ভিক্টোরিয়ান ওয়েস্ট প্রযুক্তিবিদ্যার ঐতিহ্যের মিশ্র প্রভাব লক্ষ করা গেছে। নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের শেষদিকেই এদের আগমন সূচিত হয়েছে। সম্ভবত এগুলো ফ্লেইক বিমোচন বা ফাটানোর কাজে ব্যবহৃত হতো। এগুলোকে একমুখো নমুনাভুক্ত হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

স্ক্রেপার ঃ ফ্লেইক থেকে তৈরি আর একটি হাতিয়ার স্ক্রেপার। আকৃতির সাধারণ বিন্যাস অনুযায়ী এগুলোকে ছুরির কাজ বা চাঁছার জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার বলে ধারণা করা যায়, যা দিয়ে গাছের অথবা পশুর চামড়া খসানো এবং ক্ষুদ্রাকার কাঠের খণ্ডাংশ পরিপাটি করা যেত। এগুলো একমুখো এবং ছুরি নমুনার হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। মধ্য-প্রাচীন পাথর পর্বের শুরু থেকে বৈচিত্র্যময় গড়নের ক্ষুদ্রাকার স্ক্রেপারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৈচিত্র্যময় গড়নের জন্য বিশেষজ্ঞগণ স্ক্রেপারগুলোকে কয়েকটি উপ-নমুনায় বিভক্ত করেছেন।

রেখাচিত্র – ১০



ব্লেড বারিন স্ক্রেপার



প্রস্তুতকৃত অন্তস্তল ফ্লেইক বিমোচিত অন্তস্তল

মধ্য–প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার

পয়েন্ট ঃ ফ্লেইক থেকে তৈরি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারগুলোর মধ্যে সুঁচাল ছেদক জাতীয় এই নিদর্শনগুলো বহুল বিতর্কিত। এগুলো ছোট, বড়, মোটা, পাতলা, মাঝারি, স্বাভাবিক ত্রিকোণাকার, প্রায়-ত্রিকোণাকার, অনেকাংশে পত্রাকার, একমুখো অথবা দু'মুখো ইত্যাদি বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। কোন কোন নিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রকৃত লেভালয় ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে পয়েন্টগুলোকে মধ্য-প্রাচীন পাথরপর্বের নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও কোন কোন বিশেষজ্ঞ এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এগুলো সম্ভবত কাঠ অথবা হাড় ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করা হতো।

ব্যরার ও অ্যল ঃ এগুলো শীর্ণকায় ব্লেড থেকে তৈরি হতো। এর কার্যসমাপনী সূক্ষ্মপ্রান্ত তৈরির জন্য বিভিন্ন ধাপে পরিমার্জনজনিত উপর্যুপরি কৌশল আঘাত হানার প্রয়োজন হতো। এ নমুনাভুক্ত হাতিয়ার মধ্য-প্রাচীন পাথরপর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শন।

বারিন ঃ এ নমুনার হাতিয়ারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এদের আকৃতি দেখে মনে হয় এগুলো শিলাশ্রয়ের গাঁয়ে খোদাই কাজ নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহৃত হতো। এরা সাধারণত ব্লেডের অথবা ক্ষুদ্রাকার পাথর-নুড়ির ফ্লেইক থেকে তৈরি হতো। এগুলো তৈরির প্রযুক্তিবিদ্যায় ক্ল্যাকটনিয়, মুস্‌তেরিয়, আশিলয়, লেভালোয় ও ঈত্তল প্রভৃতি ঐতিহ্যগুলোতে অনুসৃত প্রযুক্তিবিদ্যার মিশ্রণ ঘটিত এবং চাপ প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসৃত হতো। গড়ন, আকার, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং স্তরবিন্যাসের দিক থেকে বারিনগুলোকে উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন পাথরপর্যায়ের হাতিয়ারগুলোর বিষয় আলোচিত হলো। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে যদিও হাতকুঠার ও ক্লীভার নিম্ন-প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ার তথাপি এগুলো পরবর্তী দু'টি পর্বেও ব্যবহৃত হতো। পার্থক্য কেবল এই যে পরবর্তী পর্বগুলোতে এদের আকৃতি ক্রমেই ছোট হয়ে এসেছে, সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নততর ঐতিহ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তাই প্রাচীন পাথর পর্যায়ের সর্বশেষ পর্বকে (উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্ব) তিনটি সময়ানুক্রমিক প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক ঐতিহ্যের নমুনায় বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে সলুট্রিয় (Solutrian) গ্রাভেট্টিয় (Gravettian) এবং অ্যাউরিগনেসিয় (Aurignation)। গ্রাভেটিয় ঐতিহ্যের সমসাময়িক আরও দু'টি ঐতিহ্য হচ্ছে ছ্যাত্তেলপেরেনিয় (Chattelperrenian) এবং পেরিগড়ডিয় (Perigordian)। মধ্যবর্তী গ্রাভেটিয় ঐতিহ্যটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এই ঐতিহ্যভুক্ত হাতিয়ারগুলোর এক পিঠ ভোঁতা ধরনের চকমকি শিলার ব্লেড থেকে তৈরি করা হতো।

উপ-মহাদেশের হাতিয়ার

এ উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম হাতিয়ারগুলো সোন (Sohan অথবা Soan) নদীর উপত্যকায় এবং মাদ্রাজে আবিস্কৃত হয়েছে। অত্যন্ত বড় পরিমাপের ও রুক্ষ ধরনের এ হাতিয়ারগুলো বড় আকারের পাথর খণ্ড থেকে ছিটকে পড়া ফ্লেইক দিয়ে তৈরি করা হতো।

এদের পৃষ্ঠতলের বিভিন্ন অংশে প্রাথমিক ফ্লেইক বিমোচন ক্ষত, বিস্তৃত কন্দ ও সুডৌল মোচাকার প্রস্ফুটনের বিক্ষিপ্ত অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রাযুক্তিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আঘাত শূরুর উন্নীত সমতল স্থানটি প্রাযুক্তিক কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষত বিহীন ও নেহাৎ সাধারণ গোছের। অপরদিকে শীর্ষস্থ বহিরাবরণে সাধারণত কোন প্রাযুক্তিক কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষত বিদ্যমান থাকে না। এ নমুনাভুক্ত হাতিয়ারগুলোর কার্যসমাপনী প্রান্তটি ব্যবহারিক অথবা প্রকৃতিজাত কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত থাকে। এদের গড়ন এ ধারণা প্রদান করে যে এগুলো সম্ভবত কর্তন, শিকার করা অথবা খোদাইর কাজে ব্যবহৃত হতো। এগুলোর প্রযুক্তিবিদ্যা ক্লাকটনিয় ঐতিহ্যের প্রভাবপুষ্ট। স্তরবিন্যাসে, গড়ন, আকার ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিচারে এ নমুনার হাতিয়ারগুলোকে প্রায় ছয় লক্ষ বছরের প্রাচীন বলে ধরে নেওয়া যায়।[১২] বিশেষজ্ঞগণ এদের প্রাক্‌সনিয় হিসাবে গণ্য করেন।

সোন উপত্যকায় প্রাপ্ত দ্বিতীয় ধরনের হাতিয়ারগুলো ফ্লেইকের পরিবর্তে শিলা পিণ্ডের খণ্ডাংশ অথবা অন্তস্তল থেকে তৈরি। এগুলো তৈরির জন্য সাধারণত বেলে-স্ফটিক পাথর এবং পাঞ্জাবে লভ্য নীলাভ আভা যুক্ত ধূসর রঙের আগ্নেয়শিলা ব্যবহার করা হতো। তবে সানকালিয়া ও মড্ডিয়াস হেল্যান প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এ হাতিয়ারগুলোকে প্রাথমিক ভাবে নুড়ি-হাতিয়ার নমুনাভুক্ত করার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। এ নমুনার হাতিয়ারগুলোর মধ্যে চপার-চপিং এবং আদিম-নমুনা হাতকুঠার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম নমুনাভুক্ত হাতিয়ারগুলো সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় নমুনার হাতিয়ারগুলো ডিম্বাকার-সমতল বিশিষ্ট নুড়িপাথর থেকে তৈরি করা হতো। এক্ষেত্রে নির্ধারিত নুড়িটির বহিরাবরণের উল্টো দিক থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ফ্লেইক বিমোচন করে একটি কৌণিক-বিন্দু সৃষ্টি করা হতো। স্তরবিন্যাস, গড়ন, আকৃতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার মান অনুযায়ী এ নমুনাভুক্ত হাতিয়ারগুলো চার লক্ষ বছরের (হিমালয় এলাকার দ্বিতীয় উষ্ণ-আন্তহিমযুগ) প্রাচীন বলে অনুমিত হয়েছে।[১৩] এ গোত্রভুক্ত হাতিয়ারগুলোকে নিম্ন-সোনিয় বলা হয়।

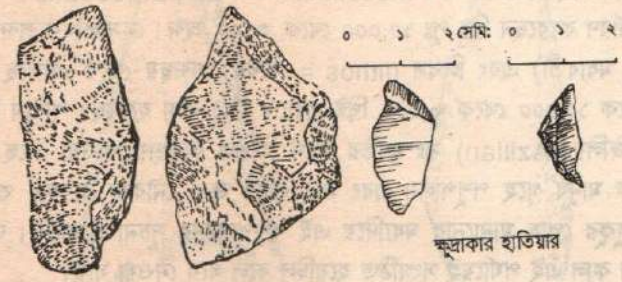
স্তরবিন্যাসের অবস্থান ও নমুনাভেদ অনুযায়ী সোন উপত্যকায় প্রাপ্ত তৃতীয় ধরনের হাতিয়ারগুলোকে উচ্চ-সোনিয়-ক এবং উচ্চ-সোনিয়-খ এই দুই নমুনায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এ পর্বগুলোতে পূর্ববর্তী পর্বগুলোর হাতিয়ার ব্যতীত আরও কিছু নতুন নমুনার হাতিয়ার আবির্ভূত হয়েছে। শেষোক্ত নমুনার হাতিয়ারগুলোর মধ্যে লেভালোসিয় ও ক্লাকটনিয় ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। উচ্চসোনিয়-খ নমুনার হাতিয়ারগুলোর ক্ষেত্রে লেভালোসিয় ঐতিহ্যের প্রভাব সংবলিত ফ্লেইকের সংখ্যা প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। লেভালোসিয় ঐতিহ্যের প্রভাবমণ্ডিত নিদর্শনগুলোর

---

১২. O. P. Jaggi, Dawn of Indian Technology, Vo. 1. Atma Ram and Sons, Delhi, 1969, p. 11

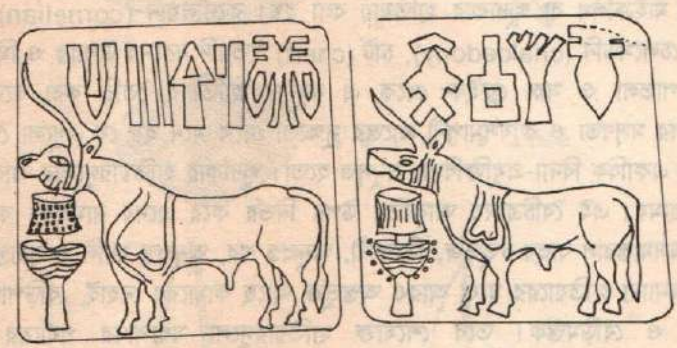
১৩. Neelima Dahiya, Arts and Crafts in Northern India, B.R. Publishing corporation, Delhi, 1986, p. 6.

রেখাচিত্র – ১১

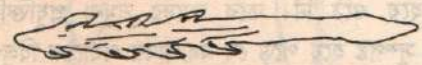


ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ার

পয়েন্ট



হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহর



হারপুন

উচ্চ–প্রাচীন পাথর পর্ব, মধ্য–পাথর পর্যায় ও
পুরা–ঐতিহাসিক যুগীয় নিদর্শনাদি

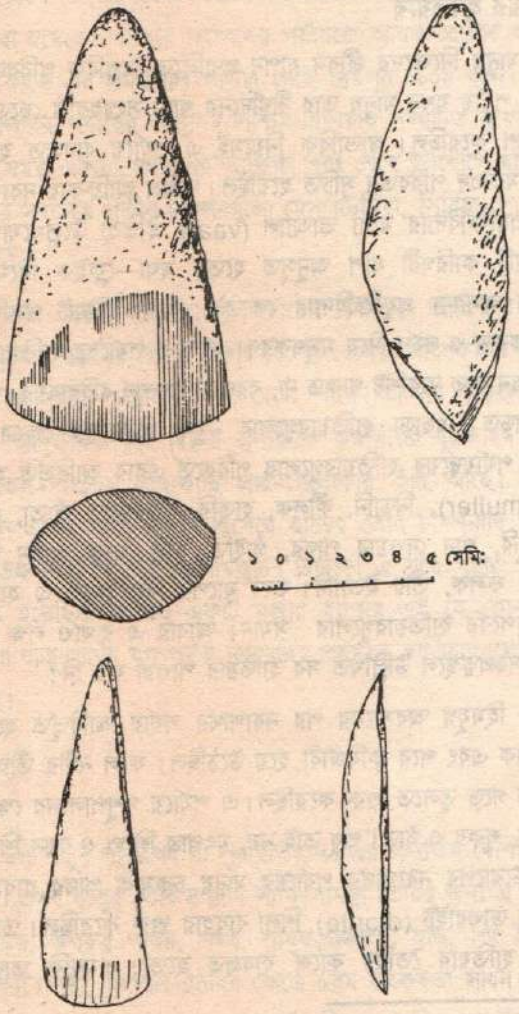
মধ্যে অন্যতম হলো ডিসকইড্যাল (Discoidal) অন্তস্তল, স্ক্রেপার ব্যরার, ব্লেড ইত্যাদি। সোন উপত্যকার সবচেয়ে নবীন হাতিয়ার অ্যল। সোনিয় ঐতিহ্যের এ হাতিয়ার তৈরির কৌশল অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের। তাই এই নমুনাটি নবীন সোনিয় নামেও পরিচিত।

মধ্যপাথর পর্যায়ের হাতিয়ার

ইংরেজি ভাষায় এই পর্যায়ের নাম Mesolithic এবং Epipalaeolithic। পণ্ডিতগণ এর সময়কাল নির্ধারণ করেছেন খ্রিঃ পূঃ ১০,০০০ থেকে ৩০০০ অব্দ। মেসলিথিক শব্দটি গ্রিক মেসস (Mesos = মধ্যবর্তী) এবং লিথস (lithos = পাথর) শব্দদ্বয় থেকে এসেছে। বৃটেনে এর প্রাথমিক স্তরকে ১০,০০০ থেকে ৬,০০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে নীত করা হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপে এটা ফ্রান্সের এ্যাজিলিয় (Azilian) সংস্কৃতির সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ পর্যায়েই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ গৃহে পশুপালন এবং মাছ ধরার জন্য নৌকার ব্যবহার শুরু করেছিল। সম্ভবত বন্যকুকুর পোষ মানানোর মধ্যদিয়ে এই পশুপালনের সূচনা হয়েছিল। তাই আধুনিক মানুষের সূচনা কাল এই পর্যায়েই সংগঠিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

এ পর্যায়ের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ারগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার। তাই এদের এককথায় মাইক্রলিথ বা ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ার বলা হয়। কর্ণেলিয়ান (cornelian), অকীক, চকমকি, চেলসেডনি (chalcedony), চার্ট (chert) ইত্যাদি ধরনের উপরত্ন ও মিহি বুননের পাথরের পাতলা ও সরু ফ্লেইক থেকে এ নমুনার হাতিয়ার তৈরি করা হতো। এদের বহিরাবরণের মসৃণতা ও কার্যসমাপনী প্রান্তের সূক্ষ্মতা দেখে মনে হয় যে এগুলো তৈরির জন্য পর্যায়ক্রমে একাধিক বিদ্যা-প্রযুক্তিবিদ্যা অনুসৃত হতো। ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ারগুলোর আকৃতিও ছিল বড় বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময় আকৃতির উপর নির্ভর করে এদের নামকরণ করা হয়েছে অর্ধচন্দ্র, অসমান্তরাল বাহুর চতুর্ভুজ, ত্রিকোণী, অনুপ্রস্থ শর, অনুপ্রস্থ ফালি ও সূচ্যগ্র কাঁটা। এ পর্যায়ের অন্যান্য হাতিয়ারের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত আছে কামারের নেহাই, বেড়িপাথর, মুগুর, গদামস্তক ও বেড়িমস্তক। তবে শেষোক্ত হাতিয়ারগুলো মধ্যপাথর পর্যায়ের ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ারগুলো থেকে আকারে যথেষ্ট বড়। আবার এদের কোন্‌টি ঠিক কি কাজে লাগান হতো এ বিষয়ে কোন কোন বিশেষজ্ঞ যদিও কিছু কিছু অভিমত প্রদান করেছেন তথাপি এ অভিমতগুলো আজও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। তবে তাদের নমুনা প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন আলোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে মধ্যপাথর পর্যায়ের বিলুপ্ত মানুষ ধ্যান-ধারণার দিক থেকে পূর্ববর্তী পর্যায়ের বিলুপ্ত মানুষের চেয়ে অধিকতর উন্নত ছিল এবং এদের কর্মক্ষেত্রও যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। এ ক্ষেত্রে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ার কোন কোন প্রত্নস্থলে প্রাচীন পাথর পর্যায়ের মধ্য-পর্বের বৃহদাকার হাত কুঠার ও ক্লীভার থেকে শুরু করে আদি ঐতিহাসিক পর্বের শুরুতে ব্যবহৃত প্রত্নবস্তুর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ারের মধ্যপর্বে যেসব হাতকুঠার, ক্লীভার ও স্ক্রাপার পাওয়া গেছে সেগুলোর প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল প্রাচীন পাথরপর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে অনেক উন্নতমানের এবং পরিমাপের

রেখাচিত্র – ১২



নব্য পাথর পর্বের হাতিয়ার

দিক থেকেও এগুলো ক্ষুদ্রাকার ছিল। শুধু তাই নয়, হাতকুঠার, ক্লীভার ও স্ক্রাপারগুলোর দৈহিক গড়নের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব লক্ষ করা গেছে। এ পর্যায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, গুহার গায়ে ছবি অঙ্কনের সূচনা।

নব্য পাথরপর্যায়ের হাতিয়ার

নব্যপাথর পর্যায়ে মানুষ নিজেদের জীবন-যাপন প্রণালিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। কারণ, এটাই সেই পর্যায় যখন মানুষ তার দীর্ঘদিনের খাদ্য সংগ্রহবৃত্তি ছেড়ে খাদ্য উৎপাদনকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই এ পর্যায়ে ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলোর নমুনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় নব্যপাথর পর্যায়ের মসৃণ হাতিয়ার তৈরির প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে ভাঅ্যাল (vaal) ঐতিহ্য উল্লেখযোগ্য। এ ঐতিহ্যভুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যায় তিনটি কারিগরী ধাপ অনুসৃত হতো, যথা—ফ্লেইক বিমোচন ও শান দিয়ে মসৃণকরণ। এছাড়া অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে[১৪] আরও তিনটি পদ্ধতি অনুসৃত হতো ; যেমন- কর্তন, ঠোকরান ও ঘর্ষণ দিয়ে মসৃণকরণ। ফলে এ পর্যায়ের হাতিয়ারগুলোর বহিরাবয়বে কোন ফ্লেইক বিমোচন ক্ষত অবশিষ্ট থাকত না, বরং এর সম্পূর্ণ বহিরাবয়ব থেকে একটা চকচকে বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়ত। এছাড়া হাতিয়ারগুলোর নমুনা বিন্যাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। পূর্ববর্তী পর্যায়দ্বয়ের হাতিয়ারগুলোর পরিবর্তে এবার আবির্ভূত হলো কুঠার, অ্যাজ (adze), মাল্লের (muller), নিড়ানি, কীলক, হাতুরি, হস্তচালিত জাঁতা, বেড়িপাথর বাটালি, মুষল, ফ্লেইকের ছুরি, শান দেওয়ার পাথর, গাঁইতি, চুল্লি থেকে আগুন উত্তোলনের চিমটা, কাস্তে, মাকু, বর্শার ফলক, তীর ইত্যাদি। তবে মাপের দিক থেকে এ হাতিয়ারগুলো প্রাচীন পাথর পর্যায়ের নিম্নপর্বের হাতিয়ারগুলোর সমান। আবার এ কথাও লক্ষ রাখা প্রয়োজন যে নব্যপাথর পর্যায়ের সবপ্রত্নস্থলে উল্লিখিত সব হাতিয়ার পাওয়া যায় নি।

ইউরোপে শেষ হিমযুগ অবসানের পর নব্যপাথর পর্যায় আবির্ভূত হয়েছিল। এ পর্যায়ে মানুষ প্রথম পশুপালক এবং পরে কৃষিজীবী হয়ে উঠেছিল। ফলে নদীর তীরবর্তী উর্বর সমতল ভূমিতে মানুষ বসতি গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। এ পর্যায়ে পশুপালনের ক্ষেত্রে কুকুরের পাশে স্থান করে নিল ভেড়া, শূকর ও ষাঁড়। শুধু তাই নয়, মৃৎপাত্র শিল্প ও বয়ন শিল্পও বিকাশ লাভ করেছিল। এবার ইউরোপের নব্যপাথর পর্যায়ের মানুষ চকমকি পাথর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আরও শক্ত প্রকৃতির ডাওরাইট (diorite) শিলা ব্যবহার শুরু করেছিল। তবে এ শিলা কেবল কুঠার জাতীয় বড় হাতিয়ার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। এমনকি তারা বসতির পাশে

---

১৪. P.E. Cleator, The true book about Archaeology, Frederick Muller Ltd., London, 1960, p. 70 ; এ পর্যায়ে পাথর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু নতুনত্ব এসেছিল। কারণ ব্যবহৃত পাথরগুলোর মধ্যে ফিল্লিট (phyllite), এপিডরাইট (Epidorite), গ্নেইস (gneiss), ব্যাসাল্ট (basalt), স্লেট (slate), বেলে পাথর ও বেলেস্ফটিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, D.P. Agarwal., The Archaeology of India, Delhi, 1948, p.107

একপ্রকার বেষ্টনী তৈরি শুরু করেছিল। এ্যবভ্যুরই নামক প্রত্নস্থলটি এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ব্রিটেনে এ পর্যায়ের সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব ২২৫০–১৮০০ অব্দ পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এর পরপরই ধাতু পাথরযুগ আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল এবং নিকট প্রাচ্যে এর সময়কাল আরও পিছিয়ে ধরা হয়েছে। ক্রিটের একটি নব্যপাথর পর্যায়ের প্রত্নস্থলকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০থেকে ২৭০০ বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। মিশরে নব্যপাথর পর্যায়কে আরও 'প্রাচীন' বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আবার জেরিকোতে এর সময়কাল পাওয়া গেছে খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে নব্যপাথর পর্যায়ের অভ্যুদয় পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এ ভূভাগ থেকে এটা ক্রমে ক্রমে সমস্ত এশিয়া, অতঃপর আফ্রিকা এবং শেষে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আর তাই নব্যপাথর পর্যায়ের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শনগুলো মেসপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেসটাইন এবং মিশরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই নব্যপাথর পর্যায়ের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে অঞ্চলভেদে হাতিয়ারগুলোর গড়নের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কুঠারের গড়ন প্রসঙ্গটির পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। আসাম অঞ্চলে যে কুঠারগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো আণুভূমিক কাঁধ বিশিষ্ট অন্যদিকে কাশ্মিরের বুরজাহম নামক প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত কুঠারগুলোর হাতল অংশের কাছাকাছি প্রায়–গোলাকার কাঁধ আছে। আবার বিহারের চিরান্দ নামক প্রত্নস্থলে এদের সাথী–সামগ্রী হিসেবে হাড়ের তৈরি নিদর্শনাদি পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ের অপর অন্যতম সাথী–নিদর্শন খোলামকুচি। তাছাড়া এ যুগে গুহার গায়ে ছবি আঁকা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। আরও একটি মজার ব্যাপার এই যে কোন কোন প্রত্নস্থলে মধ্যপাথর পর্যায় থেকে ধাতু–পাথর যুগ পর্যন্ত নব্যপাথর পর্যায়ের হাতিয়ারগুলো পরস্পর মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ধাতু–পাথর যুগ

এ যুগের অপর নাম উপ–নতুন পাথরপর্ব বা পুরাইতিহাস। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তামা ও ব্রঞ্জ ব্যবহারের সূচনা। এসব ধাতুর তৈরি দ্রব্যাদি সাথি–সামগ্রী তৈরির জন্য এ যুগে সোনা, রূপা, খড়িপাথর, অঙ্গারপাথর, উপরত্ন পাথর, শঙ্খ, শামুক,গজদন্ত, হাড়, শিং ইত্যাদিও ব্যবহৃত হতো। এ যুগের অপরবৈশিষ্ট্য, মৃৎপাত্র তৈরির ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা সাধন। তদুপরি এ যুগে ব্যবসা–বাণিজ্য ও স্থাপত্যের সূত্রপাত এবং ভাস্কর্যের বিকাশ সাধিত হয়েছিল। এসবের উপর নির্ভর করে ধরে নিতে হয় যে আজকের সভ্যতার মূল বুনিয়াদ এ যুগের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সভ্যতার সূচনালগ্নের এ যুগের কেন্দ্রগুলো মিশরের নীলনদের অববাহিকায় (সুমেরীয় সভ্যতা = পরবর্তীকালের মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন), চিনের হোয়াংহো ও ইয়াংসি অববাহিকায়

এবং ভারত-পাকিস্তানের হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শনসমূহ সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, হরিয়ানাসহ গুজরাটে অবস্থিত। এযুগে ব্যবহৃত সামগ্রীর সংখ্যা অজস্র। এগুলোর মধ্যে অলংকার, প্রসাধন (চুলের পিন, দাড়ি কামানোর সামগ্রী, আয়না, কাঁকই, কাজল দণ্ড), হারপুন, বাটখারা, মাপনি (দণ্ড ও চোঙ), বড়শি, বুতাম, সীলমোহর, বল্লম, তীরের ফলা, ধাতু গলানোর পাত্র, চামুচ, ছুরি, চুল্লি, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি আরও বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত। এতসব বিচিত্র দ্রব্যাদি তৈরি করতে মানুষকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল বৈচিত্র্যময় প্রযুক্তিবিদ্যা। আর আজকের সভ্য দুনিয়াও হলো এ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিযোগিতার লীলাভূমি। যে জাতি এক্ষেত্রে যতটা এগুতে পেরেছে সে জাতি পৃথিবীতে ততটা মাথা উন্নত করে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে।

৪

ঐতিহাসিক প্রত্নবস্তু

ঐতিহাসিক যুগের মানুষ ব্যবহার করেছে এমনসব সামগ্রীর তালিকায় লিপি সংবলিত ফলক, মুদ্রা, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, সমরাস্ত্র, গৃহস্থালি দ্রব্যাদি, ভাস্কর্য, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, চারুকারুজাত পণ্য, অলংকার ইত্যাদি অন্যতম। এগুলোর প্রতিটিই প্রত্নতত্ত্বে প্রত্নবস্তু হিসেবে গণ্য হয়। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'ধরনের প্রত্নবস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এসবের মধ্যে ইতিহাস রচনার উপযোগী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। তাই লিপিতাত্ত্বিক উপাদানগুলো দিয়েই এ অধ্যায়ের আলোচনা সূচিত হলো।

ভাষাতত্ত্ব ও লেখতত্ত্ব

লেখতত্ত্বের ভিত্তি ভাষা। তাই এ সম্পর্কিত কোন আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভাষার প্রেক্ষাপটটিকে একটু তলিয়ে দেখা ভাল। ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশ করে এমন কিছু অর্থবোধক উচ্চারণের সুশৃঙ্খলিত রূপ। এর সাকার রূপের নাম লেখা। লেখার জন্য প্রয়োজন বর্ণ (অক্ষর = হরফ) এবং এদের কিছু সহায়ক সাংকেতিক চিহ্ন। একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় যখন কতকগুলো বিশেষ ধরনের হরফ ও ধনাত্মক চিহ্নের সমন্বিত রূপে সন্নিবেশিত হয় তখন তাকে লিপি বলে।

পৃথিবীতে যেমন অজস্র ভাষা আছে তেমনি অজস্র বর্ণমালাও আছে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যেমন উচ্চারণগত পার্থক্য আছে তেমনি বিভিন্ন বর্ণমালার মধ্যে আছে আকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য। শুধু তাই নয়, বর্ণাত্মক চিহ্ন এবং বর্ণপার্থক্যকরণের জন্য নির্ধারিত চিহ্ন ব্যবহারের মধ্যেও ভিন্নতা বজায় থাকে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যেসব ভাষার বর্ণমালা নেই, যেমন –বাংলাদেশের মুরং উপজাতির ভাষা আছে কিন্তু বর্ণমালা নেই। আবার একই বর্ণমালা বিভিন্ন ভাষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–উর্দু, ফারসি, তুর্কি, সিন্ধি এবং আরও কিছু ভাষার মাধ্যম হিসেবে আরবি বর্ণমালার প্রায় সবকয়টি বর্ণ ব্যবহৃত হয়। তবে সবক্ষেত্রে বর্ণমালার সংখ্যা সমান নয়। মূলত আরবি বর্ণমালার বর্ণের সংখ্যা ২৮টি। অথচ ফারসি বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা ২৩টি। একইভাবে তুর্কি বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা ৩৩টি। অন্যদিকে হিব্রু বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা ২২টি, রুশ বর্ণমালায় ৪১টি, গ্রিক ২৪টি, ল্যাটিন ও ইংরেজিতে ২৬টি, স্পেনিশ ২৭টি, ইতালিয়তে ২০টি, তাতারে ২০০ ও বার্মিজে ২৯টি। সবচেয়ে মজার লিপিমালা আছে চৈনিক ভাষায়। এ ভাষায়

রয়েছে অজস্র শব্দাত্মক চিহ্ন। এদের সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। লেখা বা বর্ণমালা আবিষ্কার ছাড়াও মানুষ নানাভাবে ভাষার প্রকাশ ঘটাত, যেমন — দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে বিভিন্ন রঙের দড়িতে গিঁট পেঁচিয়ে শব্দ মূর্তকরণের রীতি প্রচলিত ছিল। সাধারণত লাল রঙের সুঁতোর গিঁট দিয়ে যুদ্ধ বা স্বর্ণ বোঝান হতো। এই পদ্ধতিকে 'কুইপু' বলে।

এবার লিখন পদ্ধতির প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্ণ আবিষ্কারের শুরুর দিকে লেখার জন্য মানুষ পাথর, চামড়া, কাঠ, পাতা, পোড়ামাটি ইত্যাদি বহুউপাদান ব্যবহার করত। এসবের উপর লিখন লেখার জন্য স্বভাবতই উৎকীর্ণকরণ, রঙের আঁচড় কাটা, ঢালাই ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসৃত হতো। তবে লিখিত নিদর্শনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতমগুলো পাথরের গায়ে খোদিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্বের যে শাখা এ ধরনের প্রাচীনতম লিপির আলোচনা করে তাকে ইপিগ্রাফি (Epigraphy) বা প্রাচীনলিপিবিদ্যা বলে। লিখনের জন্য ধাতু পাতের মতো উন্নতমানের উপকরণ আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যপর্বে আবিষ্কৃত হয়। নতুন উপকরণ উদ্ভাবনের পর লিপিকারগণ প্রতিটি লিপিকে অধিক আকর্ষণীয় শৈলী ও বিন্যাসে বিধৃতকরণের প্রয়াসে ব্রতী হন। এ পর্বের লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো উৎকীর্ণ ঢালাই ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের পাথর, ধাতুফলক ও পোড়ামাটির উপর পাওয়া যায়। সময়ের বিবর্তনে কাগজ ও কালি আবিষ্কারের পর লিখনবিদ্যা পটুয়াবিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে উঠেছিল। পটুয়াবিদ্যা প্রভাবিত বিভিন্ন লিপিতে বিবিধ অলঙ্কারিক লিখন বিন্যাসের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রত্নতত্ত্বের যে শাখা পটুয়াবিদ্যা প্রভাবিত লিখনের বিভিন্ন মুদ্রা বিন্যাস আলোচনা করে তাকে ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) বা হস্তলিপিবিদ্যা বলে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হস্তলিপিবিদগণই এর জনক এবং লালনকারী।

পুরাঐতিহাসিক যুগ

পৃথিবীতে ঠিক কবে এবং কোথায় প্রথম ভাষার উদ্ভব হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। বর্ণমালার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মধ্যপাথর পর্যায়ে গুহাচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে লিপি উদ্ভাবনের পটভূমি রচিত হয়। তবে সর্বপ্রাচ্যের টাইগ্রিস ইউফ্রেতিস (দজলা-ফোরাত) উপত্যকার সুমেরিয় সভ্যতারই প্রথম লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনের অস্তিত্ব দেখা গেছে। সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের প্রয়োজনে সুমেরিয়রা লিপি উদ্ভাবনে নিয়োজিত হয়েছিল বলে ধারণা প্রচলিত আছে। তারপর প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছরে বহুধাপ ও পর্যায় পেরিয়ে বর্ণমালা বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিবর্তনের উক্ত ধাপগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

চিত্রলিপি ঃ এ লিপিতে একটি বিশেষ বস্তু বিশ্লেষণের জন্য একটি ইঙ্গিতধর্মী চিত্র অঙ্কন করা হতো। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর সম্পর্কে ধারণা করা যেত মাত্র। অর্থাৎ গাছ বোঝাতে গাছের সাথে সাদৃশ্যময় প্রতীকী চিহ্ন আঁকা হতো।

ভাবলিপি ঃ এ ক্ষেত্রেও কেবল বস্তুর সাথে সাদৃশ্যমান প্রতীক রূপ অঙ্কিত হতো। ব্যতিক্রম শুধু এই যে বিশেষ ভাবটি প্রকাশের নিমিত্তে একইসাথে একাধিক প্রতীকের সমাবেশ ঘটান হতো।

শব্দলিপি ঃ এ ক্ষেত্রে অবশ্য কেবল প্রতীকের সমাবেশ ঘটান হতো না, বরং কোন একটি বস্তুর নামের শব্দতত্ত্ব সূচক বিভিন্ন রূপক রেখা অঙ্কন করা হতো।

বর্ণলিপি ঃ এ ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়কে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে ধ্বনির বৈচিত্র্য অনুযায়ী বস্তুর পরিচয়সূচক বিভিন্ন আকারের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। স্বরচিহ্ন, দীর্ঘস্বর, হ্রস্বস্বর ব্যঞ্জনস্বর ইত্যাদির পার্থক্য বোঝানোর মতো কোন বর্ণের উদ্ভব ঘটে নি।

স্বরলিপি ঃ লিপি উদ্ভবের এইধাপে স্বরবিন্যাসের তারতম্য অনুযায়ী বর্ণের পাশে বিভিন্ন বর্ণাত্মক চিহ্নাদির সমাবেশ ঘটতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণ সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য স্বরতানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। ফলে বর্ণগুলো আর শব্দ নির্ভর না থেকে স্বরনির্ভর হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ পর্বেই দীর্ঘস্বর, হ্রস্বস্বর ও ব্যঞ্জনস্বর এবং যুক্তাক্ষরের আবির্ভাব ঘটেছিল।

স্বরলিপি উদ্ভবের ফলে লিপিবিদ্যা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। তবে পৃথিবীর সর্বত্র একইসাথে একই নমুনার বর্ণমালা প্রচলিত হয় নি। বরং বিভিন্ন সভ্যতার বর্ণমালায় বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অনুযায়ী পুরাঐতিহাসিক যুগীয় বর্ণমালাগুলোকে মোটামুটি নিম্নোক্ত ভাগগুলোতে বিভক্ত করা যায়।

কীলকাকার লিপি ঃ তীরের ফলার সাথে সাদৃশ্যময় আকৃতির জন্য এ বর্ণমালার লিপিগুলোকে এ নাম প্রদান করা হয়েছে। এর সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে ইরাকের অন্তর্গত সুমের বা মেসোপটেমিয়ায়। তাই এ লিপিকে সুমেরীয় লিপি বলা হয়। এ লিপির মধ্যে চিত্রলিপি এবং স্বরলিপির মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ কীলকাকার লিপি ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শনটির বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। এ্যাঙ্গেলবার্ট ক্যাম্ফার (১৬৫১–১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ) নামে এক পণ্ডিত এর নামকরণ করেন।

মিশরীয় চিত্রলিপি ঃ এই লিপি চিত্রলিপির ধারাবাহক। তবে এ ক্ষেত্রে বর্ণনার জন্য নির্ধারিত সম্পূর্ণ বস্তুটির ছবি আঁকা হতো না, বরং মস্তকের প্রায় অনুরূপ এঁকে মানুষ বোঝানোর চেষ্টা করা হতো। এ লিপি কেবল মিশরীয় পুরোহিতগণ ব্যবহার করতেন। তাই এর নাম পবিত্র চিত্রাক্ষর। অপরদিকে প্রাচীন মিশরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আর একধরনের লিপিমালা প্রচলিত ছিল। তার নাম গণলিপি। এটা তুলনামূলক ভাবে সহজবোধ্য। তবে এসব লিপিতে কোন স্বরধ্বনি যুক্ত হরফ ছিল না। এরমধ্যে ছিল কেবল চব্বিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনি যুক্ত হরফ। এই লিপির সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শনটি খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৭৭ অব্দের একজন মিশরীয় রাজার কবর থেকে আবিস্কৃত হয়েছে।

সেমিটিক বর্ণলিপি ঃ এটা অনেকাংশে বর্ণলিপি। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় চার হাজার বছর আগে বসবাসকারী সেমেটিক জাতি এ বর্ণমালা ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে এ বর্ণমালা ফিনিশীয় জাতির দ্বারা আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ বর্ণমালায়

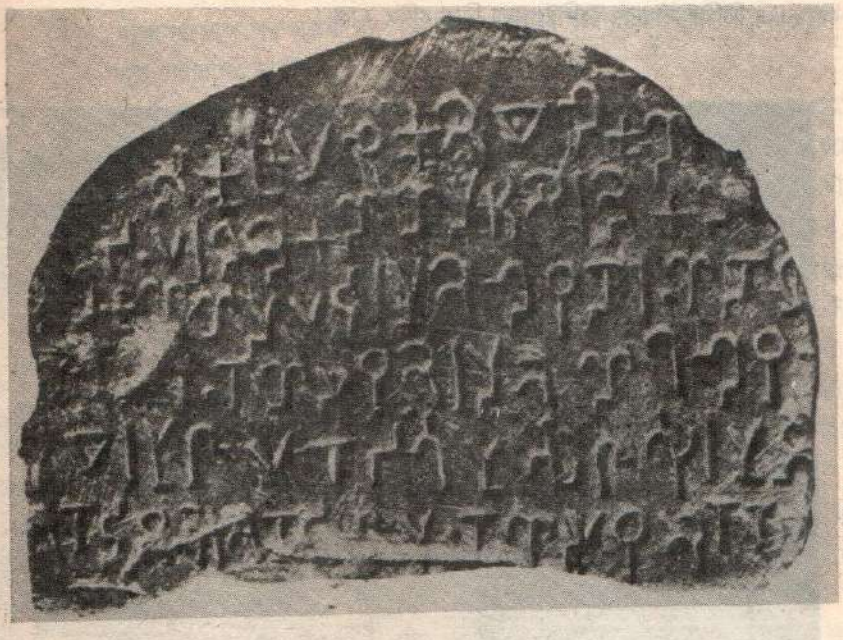
কেবল ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

হরপ্পা সভ্যতা লিপি ঃ ভারতের পশ্চিম ও পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মহেনজোদারো, হরপ্পা, রংপুর, লোথাল প্রভৃতি প্রত্নস্থলগুলোতে প্রাপ্ত সীলমোহরে এ বর্ণমালার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মূলত চিত্রলিপির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলেও এসব লিপিতে ধ্বনিলিপি ও স্বরলিপির প্রভাবও সুস্পষ্ট। অবশ্য এ ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এ লিপির গ্রহণযোগ্য পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি। উপরিল্লিখিত লিপিগুলো ছাড়া সম্প্রতি আরও কিছু প্রাচীন লিপি আবিস্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় মিনোয়ান সভ্যতার লিনিয়ান-'এ' ও লিলিয়ান-'বি', মিশরের সিবাই লিপি, প্রাচীন সিডনের (বর্তমান সিরিয়া) ইউগারিট লিপি উল্লেখযোগ্য।

আদি ঐতিহাসিক ভারতীয় লিপি ঃ হরপ্পা সভ্যতার (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ২১৫০–১৮৫০) পরবর্তী অধ্যায়টি 'বৈদিক যুগ' নামে পরিচিত। এ পর্বের কোন লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অপরদিকে ম্যাগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রিকদেশীয় লেখক স্ট্রাবো জানিয়েছেন, মৌর্যবংশের (আঃ ৩১৪–২৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে (খ্রিঃ পূঃ ৩২৪–৩০০) এ উপমহাদেশে কোন বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না। তখন রাজকার্য নির্বাহ করা হতো স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় 'বৈদিক যুগ' নামক পর্বটিতে বর্ণমালার প্রচলন সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে প্রাচীন লিপিবিদ্যার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায়, মহামতি অশোকের (আঃ ২৭৩–২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) শাসনামল থেকে সর্বপ্রথম লিপি সংবলিত আদেশ-নির্দেশ জারি হতে শুরু করে। এই শাসনামলের লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর ভাষা ছিল সংস্কৃতজাত প্রাকৃত। কারণ, মগধের রাজকার্য প্রাকৃত ভাষায় নিষ্পত্তি করা হতো। এই রাজভাষার আরও কয়েকটি আঞ্চলিক রূপ প্রচলিত ছিল। রাজভাষাটি মগধী-প্রাকৃত নামে পরিচিত। তবে পালি ও প্রাকৃত ভাষা লেখার জন্য দুই ধরনের লিপি ব্যবহৃত হতো। যথা-খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। এই দুই লিপির সাধারণ পার্থক্য এই যে প্রথমটি ডান থেকে বাঁম দিকে এবং দ্বিতীয়টি বাঁম থেকে ডান দিকে লিখতে হতো। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছিল। খরোষ্ঠী লিপির দু'টি মাত্র উদাহরণ এ পর্যন্ত মানসেহরা ও সাহবাজগর নামক দু'টি স্থানে পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় আপাতত দু'টি সিদ্ধান্তে পৌছা যায়। প্রথমত, এ লিপিমালা কেবল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, এ লিপিমালা এ অঞ্চলে অধিকদিন বেঁচে থাকতে পারে নি।

ব্রাহ্মী লিপি মৌর্য শাসনামল থেকে গুপ্ত শাসনামল (৩১৯/২০–৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তবে সবচেয়ে প্রাচীন পাঠযোগ্য ব্রাহ্মী লিপিটি সম্রাট দারিওস (আঃ ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক জারিকৃত পারস্যদেশীয় সিংগাই জাতীয় মুদ্রাগুলোতে দেখা যায়। অশোকের আমলের নিদর্শনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনটি নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত কপিলাবস্তু (পিপরাবা) নামক গ্রামে পাওয়া গেছে। এরপর এ লিপি

আলোকচিত্র – ৩



ব্রাহ্মী লিপি, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত

আলোকচিত্র – ৪



পটিকের মুদ্রা

ধীরে ধীরে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে সময় ও ভৌগোলিক বিস্তৃতির প্রভাবে ব্রাহ্মী লিপিতে বিভিন্ন পর্যায়ের পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। এ লিপির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণিত হলো।



বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি তাম্রফলক

(১) স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়প্রকার বর্ণের উপস্থিতি রয়েছে।

(২) হ্রস্ব, দীর্ঘ, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের অবকাশ রয়েছে।

(৩) ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বর সংযোগের মাত্রাচিহ্নও আছে। অর্থাৎ এ লিপিমালায় ৬৪ প্রকার মূল উচ্চারণের সুযোগ রয়েছে।

আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের বাংলাদেশে ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে (প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) এর একটি নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। চুনাপাথরের উপর উৎকীর্ণ এ ছোট্ট নিদর্শনটিতে যে ব্রাহ্মী হরফ রয়েছে তার সাথে মৌর্য-শাসনামলে নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচলিত ব্রাহ্মী হরফের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, এ শিলালিপিতে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একজন প্রজাবৎসল শাসকের জনকল্যাণমূলক সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মূলত এ দু'টি প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে পণ্ডিতগণ ধারণা পোষণ করেন, উক্ত শিলালিপিটি মহামতি অশোকের শাসনামলে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এর বর্ণিত বিষয় থেকে আরও জানা যায়, লিপিটির সমসাময়িক কালে পুণ্ড্রনগরেতে (পুণ্ড্রনগরে) একজন মহামাত্য (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) নিয়োজিত ছিলেন। লিপিটির প্রাপ্তিস্থান যেহেতু একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ সেহেতু এ ধ্বংসাবশেষকে পুণ্ড্রনগর হিসেবে ধরে নিতে খুব বাঁধা থাকে না। এসব পরোক্ষ সূত্র প্রমাণ করে বর্তমান মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। আর এ ধারণা যদি সত্য হয় তবে আরও মেনে নিতে হবে যে খ্রিষ্টপূর্ব চার-তিন শতকে মৌর্য সম্রাটগণ বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে একটি প্রদেশ (ভূক্তি) স্থাপন করেছিলেন। আর পুণ্ড্রনগর ছিল সেই প্রদেশেরই রাজধানী। মৌর্য-সম্রাটগণ একজন মহামাত্যের মাধ্যমে এ প্রদেশ শাসন করতেন। আজকের মহাস্থানগড়েই তার প্রশাসনিক কার্যালয় অবস্থিত ছিল।

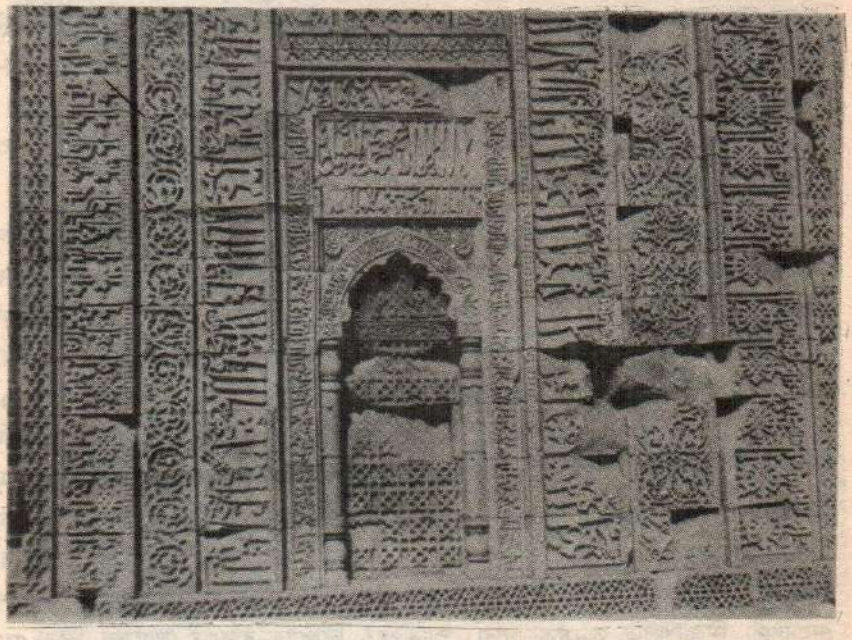
খ্রিস্টীয় ছয় শতকে রাজকীয় গুপ্তদের শাসনের অবসান ঘটতে শুরু করলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক স্থানীয় রাজবংশের উদ্ভব সূচিত হতে শুরু করে। এরফলে খ্রিস্টীয় নয় শতকের দিকে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি একাধিক আঞ্চলিক ধারায় লালিত হতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হলো – সিদ্ধমাতৃক, নাগরী ও সারদা (কাশ্মিরি)। প্রথম দু'টি বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধমাতৃকের অন্যতম উদাহরণ পাল বংশের (৭৬৫-১১৭৫ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় শাসক ধর্মপালের (৭৮১-৮২১ খ্রিস্টাব্দ) খালিমপুর তাম্রপট্ট। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় নাগরীর (দেবনাগরী) নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাথরপট্ট, ধাতুফলক, মৃন্ময় সীলমোহর পিষ্টক, গোলক, পাদমূল, পোড়ামাটি ইত্যাদির উপর উৎকীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় সাত-তের শতকে রাজত্বকারী দেব, খড়্গ, রাত, নাথ, পাল, চন্দ্র, বর্মন, সেন, পট্টিকের, পরবর্তী দেব প্রভৃতি রাজবংশগুলোর অধিকাংশ লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোতে দেবনাগরী শিলাশৈলীই অনুসৃত হতো। আর এই লিপিতে ব্যবহৃত হরফের ধরন থেকেই কালক্রমে বর্তমান বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব।

মধ্য-ঐতিহাসিক পর্যায় ঃ মধ্য-ঐতিহাসিক পর্যায়ে এ দেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের

শাসন সূচিত হয়। ইসলামে যেহেতু প্রাণীবিষয়ক অলংকরণ নিষিদ্ধ সেহেতু মুসলিম শাসনামলে বিশেষ নমুনার অলঙ্কারিক হস্তলিপিবিদ্যা প্রচলিত হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এসেছিলেন আরব জাহান থেকে। তাই ইসলামি হস্তলিপিবিদ্যার প্রধান উপজীব্য ছিল আরবি বর্ণমালা। এই বর্ণমালা কেবল আরবি ভাষায়ই নয় বরং ফারসি, তুর্কি, উর্দু ইত্যাদি আরও বহুভাষায় ব্যবহৃত হয়। আর এরই ফলশ্রুতিতে হস্তলিপিবিদ্যার ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে একাধিক নমুনা প্রচলিত হয়েছিল। তবে এসব নমুনার উদ্ভব, বিকাশ ও শৈলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে প্রচণ্ড বাদানুবাদ অব্যাহত রয়েছে। এ পুস্তকের নির্ধারিত কলেবর বজায় রাখার স্বার্থে আপাতত এ বাদানুবাদের প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে নিচে কেবল এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এমনসব বিবিধ নমুনার শৈলীগুলোর সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে আরবি বর্ণমালার হস্তলিপিবিদ্যায় দু'টি পৈতৃক নমুনার অস্তিত্ব রয়েছে। যথা–কুফিক ও নাস্‌খ। এরমধ্যে কুফিক সবচেয়ে প্রাচীনতম। খ্রিস্টীয় ছয় শতকে কুফা নগরীতে নাবাতীয় (উত্তর আরব) বর্ণমালার প্রভাবপুষ্ট হয়ে এর সূচনা হয়।

আলোকচিত্র – ৬



কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের অভ্যন্তরভাগের দেয়ালে লতাপাতা সহ কুফিক ও নাস্‌খ হস্তলিপিবিদ্যার অলঙ্করণ

খ্রিস্টীয় আট শতক থেকে এই হস্তলিপিবিদ্যা একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে শুরু করে। কূফিক হস্তলিপিবিদ্যার বর্ণগুলো চৌকো ও চোখাচোখা আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বর্ণগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরও রয়েছে শিরকোণ ও তীর্যক রেখা। লিপিগুলো খাড়া বা লম্বভাবে বিন্যস্ত হয়ে কোণের সৃষ্টি করে। ফলে এ হস্তলিপিবিদ্যায় সিরীয় লিপির প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে নাবাতীয় ও সিরীয় লিপির সাথে আরবি কূফিক লিপির একটি প্রধান পার্থক্য এই যে নাবাতি ও সিরীয় লিখন পদ্ধতিতে যুক্তাক্ষর অনুপস্থিত, কিন্তু কূফিক হস্তলিপিবিদ্যায় যুক্তাক্ষর উপস্থিত এবং বর্ণান্তর ও স্বরচিহ্ন বাঙ্ময়ের রেখা ও বিশুদ্ধ বানান নির্দেশক চিহ্নের উপস্থিতি আনুপাতিক হারে অত্যন্ত কম থাকে। এছাড়া ১৬টি মূল আরবি বর্ণের জন্য রয়েছে ২৮টি উচ্চারণ। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চারণের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য নির্ধারিত কোন রীতি ছিল না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ের কূফিক নমুনায় লিখিত নিদর্শনগুলোর বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে দারুণ বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণান্তর ও স্বরচিহ্ন বাঙ্ময়ের বিন্দু এবং উচ্চারণ নির্দেশক বানানের জন্য কূফিক নমুনায় কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। তবে এসব চিহ্ন রূপায়নের জন্য একাধিক বাড়তি রঙ ব্যবহার করা হতো। সাধারণত উচ্চারণ নির্দেশক বিন্দু অথবা চিহ্নগুলো নির্দেশ করতে কালো রঙ এবং বর্ণান্তরসহ স্বরচিহ্নের জন্য নীল অথবা লাল রঙ প্রয়োগ করা হতো। পরবর্তীকালে আরও ব্যবহৃত হতো নাসত (অযুগ্ম স্বরচিহ্ন) এবং তানবিম (অযুগ্ম চিহ্ন যুগ্মকরণ)। ধীরে ধীরে দীর্ঘ ব্যঞ্জন স্বরগুলোকেও অপেক্ষাকৃত হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। খ্রিস্টীয় সাত শতকের দিকে কূফিক নমুনায় লিখিত কোরআনের পাণ্ডুলিপিগুলোতে এসবের ব্যবহার দেখা যায়। এ উপমহাদেশে খ্রিস্টীয় বার শতক পর্যন্ত এ নমুনার ধারা অব্যাহত ছিল। অতঃপর এ লিপি কেবল অলংকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলাম আবির্ভূত হয় খ্রিস্টীয় তের শতকে। আর এটা ছিল কূফিক নমুনা অপ্রচলিত হওয়ার সূচনা পর্ব। তাই বাংলাদেশে কূফিক লিপির নিদর্শন অত্যন্ত দুর্লভ।

আরবি হস্তলিপিবিদ্যার দ্বিতীয় পৈত্রিক নমুনাটির নাম নাস্‌খ। খ্রিস্টীয় তের শতক থেকে এর বিকাশ শুরু হয়। এই নমুনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো গোল-বক্রাকৃতির বর্ণসজ্জা। এছাড়া এ বর্ণমালায় লয় দণ্ড ও আনুভূমিক বাহুগুলো ঢালু করে উপস্থাপন করা হতো। ফলে যে কোন উপাদানের উপর এ নমুনার লিপিগুলো বিধৃত করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। এর বিন্যাসের মধ্যেও একটি সাবলীল গতি বজায় রয়েছে। এছাড়া এ নমুনার নিদর্শনগুলোতে এক তৃতীয়াংশ এবং দুই তৃতীয়াংশ খাড়া পঙক্তি থাকে তবে এক্ষেত্রে খফি নমুনার শৈলী অনুকরণের প্রবণতার প্রতি জোর আরোপিত হয়। সাধারণত আরবি ভাষায় লেখা পুস্তকগুলোতে এ নমুনার ব্যবহার সর্বাধিক দেখা গেছে। কোন কোন নিদর্শনে কূফিক ও নাস্‌খ নমুনা যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-আদিনা মসজিদের শিলালিপিতে। এছাড়া এ হস্তলিপিবিদ্যার অধিকাংশ নিদর্শনে যুক্তাক্ষর, উচ্চারণ বিশুদ্ধকরণের চিহ্ন, স্বরচিহ্নের বিন্দু, বর্ণান্তরের চিহ্ন ইত্যাদির উপস্থিতি আনুপাতিক হারে বেশি। ফলে নাসখ্ নমুনার নিদর্শনগুলো থেকে পাঠোদ্ধারের বিষয়টি

অনেকাংশে সহজ ও নির্ভরযোগ্য। উল্লেখ্য যে এই নমুনার নিদর্শনগুলোতে জবর, জের, পেশ ইত্যাদি স্বরচিহ্নগুলোর পরিবর্তে সাধারণত বর্ণের উপরে, নিচে অথবা প্রথমে এক থেকে তিনটি স্বরচিহ্ন বাহুময় রেখা যোগ করা হতো। মুগল শাসনামলে কেবল কোরআন নকল করার জন্য নাস্‌খ নমুনার শৈলী অনুসৃত হতো। এছাড়া পাকিস্তানের সিন্ধিসহ আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষা লেখার জন্য আজও নাস্‌খ নমুনা প্রচলিত রয়েছে।

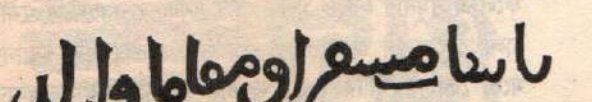
মুসলিম শাসনামলের হস্তলিপিবিদ্যার উপরে বর্ণিত দু'টি পৈত্রিক নমুনার শৈলী ছাড়া আরও কয়েকটি নতুন ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটির নাম তালীখ। এর জন্মস্থান পারস্য। তাই এর শৈলীতে পাহলবী লিখনরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। খ্রিস্টীয় তের শতক থেকে এর বিকাশ শুরু হলেও এর স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিক। কারণ খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকে এর স্থান জুড়ে বসে নাসতালীক। এর হরফগুলো অধিক গোলাকার এবং প্রায়-বৃত্তাকার। ফলে নাসতালীক ধারায় লিখন অত্যন্ত সহজ। বিশেষ করে ছিন ও শীনের ক্ষেত্রে কেবল সর্পিল অথবা ঢেউয়ের মতো একটি রেখার ব্যবহার করা হতো। সাধারণত ফারসি ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিতেই নাসতালীক নমুনা অধিক হারে অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশে মহামতি আকবরের সময় থেকে এ নমুনার বহুল ব্যবহার শুরু হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরআনের পাণ্ডুলিপিগুলোর মূল বর্ণনা অংশে নাস্‌খ এবং অনুবাদ অথবা টিকা-টীপ্পনীর অংশে নাসতালীক নমুনা ব্যবহার করা হতো। খ্রিস্টীয় তের শতক থেকেই এ ধরনের দৃষ্টান্তের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। আধুনিক কালে উর্দু লিখনের ক্ষেত্রে এই নমুনা প্রচলিত আছে। আর আরবি বর্তমানে নাস্‌খ ও নাসতালীকের যৌগিক ধারায় লিখিত হচ্ছে। নিচে অন্যান্য নমুনাগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

ধারা	বৈশিষ্ট্য
থুলথ	এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বক্র পঙক্তি এবং দুই-তৃতীয়াংশ খাড়া পঙক্তি থাকে। ফলে এই নমুনায় জালি নক্‌শা রূপায়নের প্রচেষ্টা বাহুময় হয়ে উঠে।
তওকী	এ ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ বক্র এবং এক-চতুর্থাংশ খাড়া পঙক্তি থাকে। তবে এরমধ্যে জালি নক্‌শা বিধৃতকরণের প্রবণতা সুস্পষ্ট।
রিক'তনা	তিন-চতুর্থাংশ বক্র এবং এক চতুর্থাংশ খাড়া পঙক্তি থাকে। এছাড়া খফি নক্‌শারও অনুকরণ করা হয়।
মুহাক্কাক	তিন চতুর্থাংশ খাড়া এবং এক চতুর্থাংশ বক্র পঙক্তি থাকে। লেখার সামগ্রিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জালি নক্‌শার প্রতিফলন ঘটান হয়।
রয়হান	তিন চতুর্থাংশ খাড়া এবং এক চতুর্থাংশ বক্র পঙক্তি থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে লেখার সামগ্রিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে খফি নক্‌শার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়।
তওলীক	কমসংখ্যক খাড়া পঙক্তি ব্যবহৃত হতো।

রেখাচিত্র – ১৩



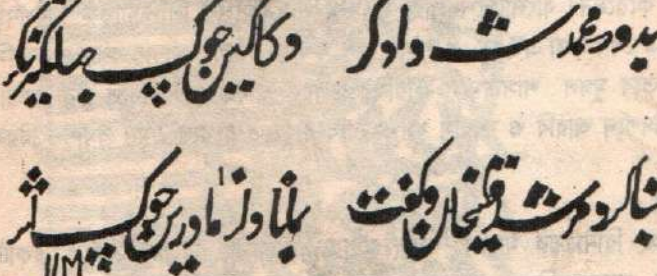
নাস্‌খ



নাস্‌খ



গুবর



নাস্তালিক

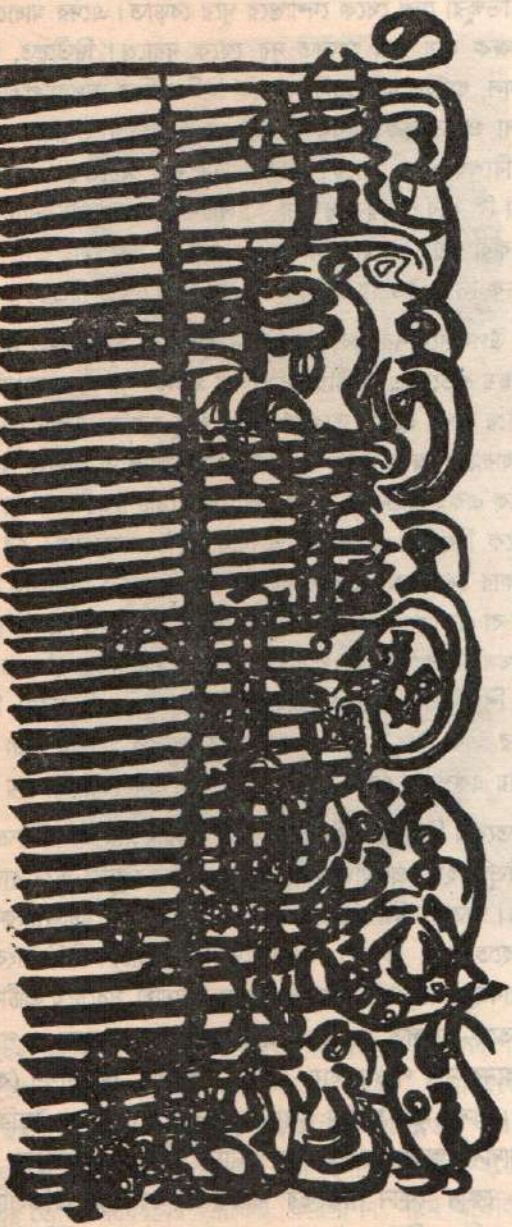
হস্তলিপিবিদ্যার নমুনা

মণ্ডলী	বেশকিছু খাড়া খোচা চিহ্নের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।
শিকস্ত	নাসতালীকের সাথে এর পার্থক্য নিতান্ত সামান্য।
বিহার	অত্যন্ত ক্ষণজীবী এ ধারা কুফিক, নাস্‌খ এবং নাসতালীকের যৌগিকরূপ থেকে সৃষ্ট।
ঘুবার	অত্যন্ত ক্ষীণ এবং অগভীর রেখায় বর্ণগুলো দৃশ্যমান করা হতো।
তোঘরা	এ নমুনাটি অত্যন্ত অলংকারিক। কারণ হরফ বিধৃতকরণের মধ্যদিয়ে পরোক্ষে বিভিন্ন চিত্র প্রস্ফুটনের প্রয়াস সাধিত হতো। এমনকি অলংকরণের প্রয়োজনে হরফগুলোকে কখনও লম্বা, কখনও বক্র, আবার কখনও-বা সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিতভাবে চিত্রাকারে উপস্থাপন করা হতো। ফলে এ নমুনার হরফে মূলত তীর ধনুক, সেনাছাউনি, নৌকা, বৈঠা, হাঁস, চালাঘর ইত্যাদি জাতীয় পটভূমি সৃষ্টি হতো। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে লোহার খুঁটির বেড়া জাতীয় অক্ষর বিন্যাস অন্যতম। তবে এর শৈলীতে কোন উন্নতমানের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রিঃ) নির্মিত মসজিদগুলোর শিলালিপিগুলোতে এ নমুনার উপস্থিতির হার খুববেশি।

উপরের আলোচনার সমাপ্তি টানার পূর্বে আর একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিষয়টি হলো এই যে কুফিক, নাস্‌খ ও নাসতালীকের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য হস্তলিপিবিদ্যার নমুনাগুলোর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক পার্থক্যগুলো ততটা সুস্পষ্ট নয়। তাই আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত বহুনিদর্শনের হস্তলিপিবিদ্যার নমুনার শৈলী নির্ণয় নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে দিনাজপুর জেলার বিরোল থানায় প্রাপ্ত লিপিফলকটির হস্তলিপিবিদ্যার শৈলীকে অনেক বিশেষজ্ঞ নাস্‌খ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এম, আর তরফদার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মুসলিম শাসনামলের লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সম্পর্কে আপাতত শেষ কথা এই যে, এ শাসনামলে কখনও আরবি আবার কখনও ফারসি ভাষা ব্যবহৃত হতো। তবে মুগল শাসনামলে ফারসির উপরই অধিক গুরুত্বারোপ করা হতো। আবার কোন কোন নিদর্শনে আরবি ও ফারসি যুগপৎভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণও বিরল নয়।

মুদ্রাতত্ত্ব

মুদ্রা হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম। ফলে মুদ্রার প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে একটি শাসনামলের অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকারখানা, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া মুদ্রা শুধু ব্যবসাবাণিজ্য এবং রাজ্যের বিস্তৃতির সূত্র ধরেই নয় বরং সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক লেনদেন ইত্যাদির মাধ্যমেও দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ উপমহাদেশে আদি ঐতিহাসিক পর্বে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল।



রেখাচিত্র—১৪

তুঘরা হস্ত লিপিবিদ্যার নমুনা

বৌদ্ধধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ধর্ম প্রচার এবং তীর্থ ভ্রমণ। আর এজন্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। এদের মাধ্যমেই এক জনপদ বা রাজ্যের মুদ্রা পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াত দূর থেকে দূরান্তে। দ্বিতীয়ত, কোন কোন মুদ্রায় রাজা, রাজ্য, সময়কাল, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে লিপিতাত্ত্বিক অথবা প্রতীকী তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। এ বিষয়গুলো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই প্রত্নতত্ত্ব মুদ্রা আলোচনার একটি বিশেষ শাখা আছে। এ শাখাটির নাম মুদ্রাতত্ত্ব। এখন প্রশ্ন হলো, মুদ্রা আলোচনার প্রক্রিয়াটা কি হবে? প্রত্নতত্ত্বে মুদ্রা আলোচনার জন্য মূলত নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হয় ; যেমন– ধাতুর ওজনমাত্রা, কাঠামো, রূপ, চিহ্ন, মাত্রামান বা মূল্যমান, পরিচিতিসূচক লিপি, তৈরির কৌশল ও চিহ্নগুলোর চরিত্র–চিত্রণ।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রাগুলো ছাপাঙ্কিত মুদ্রা নামে পরিচিত। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে এ জাতীয় মুদ্রাগুলোর প্রচলন শুরু হয়। ছাপাঙ্কিত মুদ্রা তৈরির জন্য প্রথমে ধাতু গলিয়ে ফেলা হতো। তারপর গলিত ধাতু জমিয়ে একটি পট্র তৈরি করে নেওয়া হতো। এ পট্রটিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কয়েকটি লম্বা ফালিতে বিভক্ত করা হতো। তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি ফালিকে একই প্রক্রিয়ায় কতকগুলো ছোট ছোট চতুষ্কোণাকার খণ্ডে বিভক্ত করা হতো। এরপর এদেরকে নির্ধারিত ওজনমাত্রা অনুযায়ী ছেঁটে ফেলা হয়। এর ফলে কোন কোন ছাপাঙ্কিত মুদ্রা বর্গাকার থেকে আয়তাকার বা বলায়াকার অথবা ডিম্বাকার রূপ ধারণ করত। এদের এক পিঠে এক বা একাধিক ছাপচিহ্ন বিঁধিয়ে দেওয়া হতো। একটি ছাপযন্ত্রে একটি অথবা কয়েকটি চিহ্নের যৌথসমাবেশ থাকতে পারত। সবচেয়ে প্রাচীন ছাপাঙ্কিত মুদ্রাগুলো তামার তৈরি। এছাড়া রূপা, শিসা, টিন, মিশ্রধাতু এবং বিলিয়ন (তামা + দস্তা) দিয়ে তৈরি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। আবার এক ধাতুর উপর অন্যধাতুর প্রলেপ দিয়েও মুদ্রা প্রচারিত হতো। ছাপাঙ্কিত মুদ্রা খ্রিস্টীয় একশতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকের দিকে ধাতুবিদ্যা বিকশিত হওয়ার পর ছাপাঙ্কিত মুদ্রার পাশাপাশি ছাঁচে তৈরি মুদ্রা আবির্ভূত হয়। প্রথমদিকে এসব মুদ্রায় কতকগুলো চিহ্ন ব্যতীত কোন লিপি ব্যবহার করা হতো না। অতপর লিপিবিদ্যার প্রসারের সাথে সাথে মুদ্রাজারিকারীর পরিচয়সূচক মুদ্রালিপি সন্নিবেশিত হতে শুরু করল। উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন লিপি সংবলিত মুদ্রায় ব্রাহ্মী ও খরোস্ঠী হরফের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী সবচেয়ে প্রাচীন লিপি সংবলিত মুদ্রা খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকে প্রচলিত হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি পাণ্ডুলিপিতে এসব মুদ্রার বিভিন্ন ধরনের নাম পাওয়া যায় ; যেমন– শতমান, কারসাপণ (কাহাপণ), মাশক, কৃণল, পুরাণ ও ধরন। এসব মুদ্রা বিভিন্ন মূল্যমানে তৈরি হতো। মুদ্রা তৈরির জন্য রূপা ও তামাই ছিল মুখ্য উপাদান। অবশ্য ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বৈদিক সূত্রাবলিতে হিরণ্য ও নিসখ নামের অস্তিত্ব থেকে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা এই যে আদি ঐতিহাসিক পর্যায় শুরুর পর্বে সোনার মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রা শতমান নামে পরিচিত ছিল। শতমানের অপেক্ষাকৃত নিম্ন–মূল্যমান সূচক অভিধা ছিল মান। কিন্তু কুশান (আঃ খ্রিস্টীয় একশতক)

আলোকচিত্র – ৭

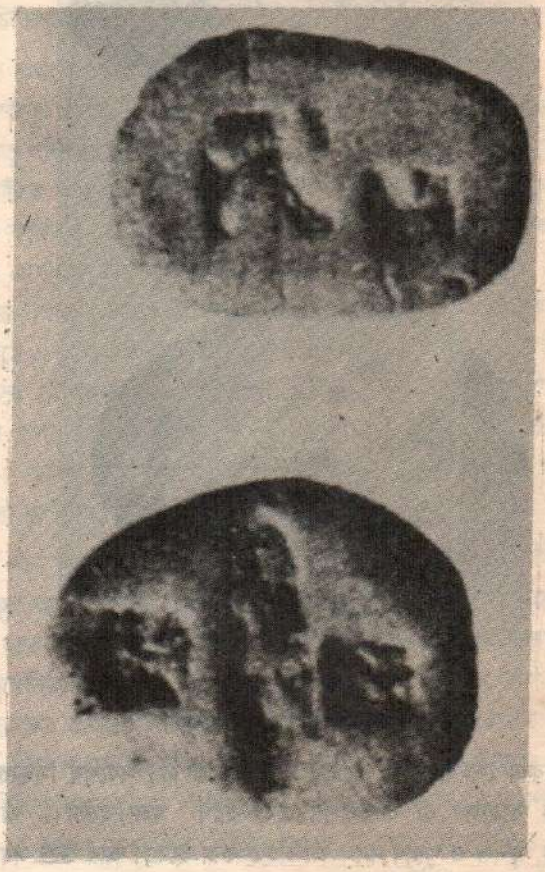


লিপিবিহীন ছাঁচে তৈরি মুদ্রা

আমলের পূর্বের কোন সোনার মুদ্রা এযাবৎ পাওয়া যায় নি। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রূপার তৈরি মুদ্রাগুলোকে কাহাপণ বা কারসাপণ এবং ধরণ বলা হতো। আর তামার তৈরি মুদ্রাগুলোকে মাশক, কৃনল ও পুরাণ নামে অভিহিত করা হতো। আর উক্ত সবমুদ্রাগুলোই প্রাচীন ছাপাঙ্কিত মুদ্রা ও লিপিবিহীন ছাঁচে তৈরি মুদ্রা হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কোন কোন সূত্র অনুযায়ী ধাতুর তৈরি সবধরনের মুদ্রাকেই কারসাপণ নামে অভিহিত করা হতো। তবে ওজন ও মুল্যমানের ভেদ অনুযায়ী এগুলোকে মাশক, কৃনল, পণ ইত্যাদি অভিধা প্রদান করা হয়েছিল। এইসূত্রে বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ আরও বিশ্বাস করেন যে রূপা নির্মিত কারসাপণগুলোকে

ধরন এবং তামার তেরি কারসাপণগুলোকে পুরাণ বলা হতো। এদের ধাতুর প্রকৃতি, আকার, আকৃতি ও ওজন মাত্রা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সম্ভবত, নিম্নোক্ত কারণগুলো এরজন্য দায়ী (ক) ধাতুবিদ্যার নিম্নমান, (খ) পরিমাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রীতির অভাব (গ) অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা বেআইনী ভাবে ধাতু অপসারণ, (ঘ) বাজার মূল্যের আনুপাতিক হারের উপর্যুপরি পরিবর্তন (ঙ) সময়ের বিবর্তনে চাপ ও তাপের প্রভাব ইত্যাদি। তবে গুপ্ত শাসনামলে মুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে আদর্শ রীতিনীতি বজায় রাখার প্রবণতা সূচিত হয়েছিল।

আলোকচিত্র – ৮



ছাপাঙ্কিত মুদ্রা

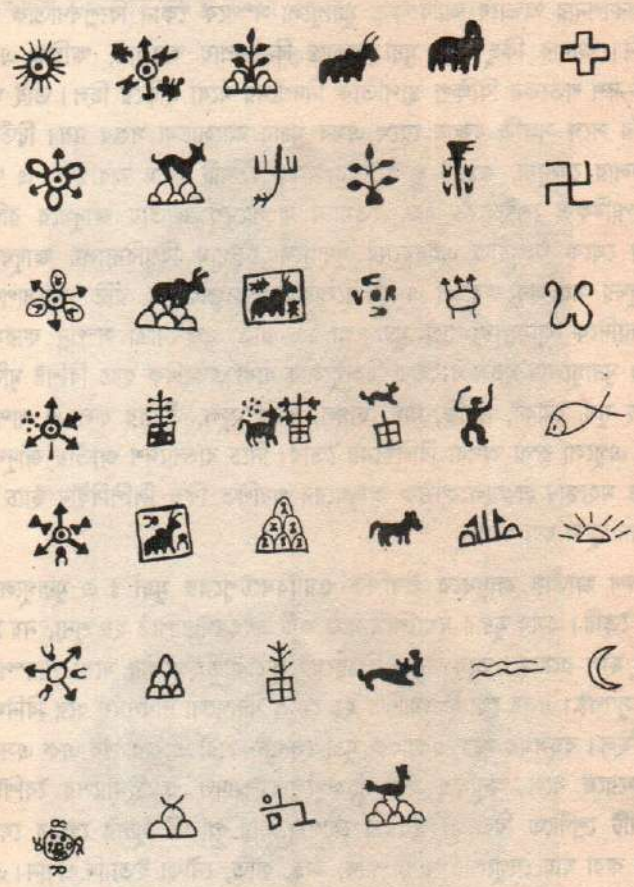
বাংলাদেশে লিপিবিহীন ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, ছাঁচের ছাপযুক্ত মুদ্রা ও ছাঁচে ঢেলে তৈরি মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এসবের প্রাপ্তিস্থানগুলো ঢাকা, ময়মনসিংহ,[১৫] কুমিল্লা, বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলে বিস্তৃত। তবে এগুলো সবই আকস্মিকভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কেবল ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মতো মহাস্থানগড়ে সুবিন্যস্ত স্তরবিন্যাস থেকে গুপ্তভাণ্ডার আকারে এ শ্রেণীভুক্ত কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বিছিন্নভাবে মহাস্থানগড়ে প্রচুর লিপি-বিহীন ঢালাই মুদ্রা তো বহুবার সন্ধানে এসেছেই। কিন্তু এ যাবৎ বিস্তারিত খনন প্রতিবেদন প্রকাশনার অভাবে আবিস্কৃত মুদ্রাগুলো সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণাত্মক তথ্য আহরণ সম্ভব হয় নি। আবার কিছু কিছু মুদ্রা অত্যন্ত বিনষ্ট-প্রায় অবস্থায়, ক্ষয়িষ্ণু এবং ভগ্নদশায় খ্রিস্টীয় সাত-দশ শতকের বিক্ষিপ্ত স্থাপত্যিক নিদর্শনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। তাই মহাস্থানগড়ের স্তর বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এসব মুদ্রার আলোচনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রত্নস্থলটি নরসিংদী জেলার কেন্দুয়া, ওয়ারী ও বটেশ্বর নামক তিনটি গ্রামে অবস্থিত। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো ছাপাঙ্কিত শ্রেণীভুক্ত এবং বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। অন্যান্য স্থান থেকে সংগৃহীত এইধরনের মুদ্রাগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংরক্ষণ করছে। এ মুদ্রাগুলোর অধিকাংশই ৩২ রতি কারসাপণ ওজনমাত্রা সম্পন্ন। অপরদিকে কুমিল্লায় প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো ১৬ রতি ওজনমাত্রা সম্পন্ন কারসাপণ(মান) শ্রেণীভুক্ত। এ মুদ্রাগুলোর বহুল ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর মধ্যে একাধিক হাত বিশিষ্ট মূর্তি অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রয়েছে সূর্য, নৌকা, চিংড়ি, মাছ, ছাগল, পাখি, ফুল, তীরের ফলা ও পাপড়ি সংবলিত বৃত্ত ইত্যাদি। এগুলো রূপা অথবা বিলিয়নের তৈরি। নিচে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত ছাপাঙ্কিত ও মহাস্থান প্রত্নস্থলকেন্দ্রিক জাদুঘরের প্রদর্শিত কিছু লিপিবিহীন ছাঁচে তৈরি মুদ্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত ওয়ারিবটেশ্বরের মুদ্রা ঃ এ মুদ্রাগুলোর প্রায় সব ক'টিই রূপার তৈরি। এসব মুদ্রার মুখ্যপিঠে গড়ে ৩টি এবং গৌণপিঠে হয় শূন্য, নয় তো দু'একটি প্রতীকীচিহ্নের ছাপ রয়েছে। তবে উভয় পিঠদ্বয়ের প্রতীকীচিহ্নগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা সুস্পষ্ট। এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে এ মুদ্রাগুলো দীর্ঘসময় ধরে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চালু ছিল। বহুসময় ধরে একাধিক মুদ্রা লেনদেনকারী একের পর এক এসব চিহ্নগুলো সংযোজিত করেছে বলে অনুমিত হয়। চিহ্নগুলোর আদল ও বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মুদ্রাগুলো তিনটি শ্রেণীতে বিভাজ্য হওয়ার যোগ্য। প্রায় প্রতিটি মুদ্রার ক্ষেত্রে যেসব চিহ্নের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় সেগুলোর মধ্যে পাখি, মাছ, হাতি, নৌকা ইত্যাদি প্রধান। এগুলো সবই ছাপাঙ্কিত মুদ্রার শ্রেণীভুক্ত।

---

১৫. এ. এস. এম. তাইফুর কর্তৃক মোট ৯টি ছাপাঙ্কিত মুদ্রা ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এরমধ্যে ৫টি চতুষ্কোণাকার ও ৪টি ডিম্বাকার। সব কটিই রূপার তৈরি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। N.K. Bhattasali, Catalogue of coins, Dhaka, 1936, p. 1.

রেখাচিত্র – ১৫



ছাপাঙ্কিত ও লিপিবিহীন ছাঁচ নির্মিত মুদ্রায় ব্যবহৃত কিছু চিহ্ন

মহাস্থানগড়ের লিপিবিহীন ছাঁচে তৈরি মুদ্রা ঃ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত অধিকাংশ মুদ্রা তামা দিয়ে তৈরি। তবে দু'একটি রূপার তৈরি মুদ্রাও রয়েছে। এদের উভয় পিঠে চিহ্ন বিধৃত আছে। বর্তমানে মহাস্থানগড় জাদুঘরে মোট ২৭টি এ জাতীয় মুদ্রা প্রদর্শিত রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র একটি রূপা দিয়ে তৈরি। বাকি সবক'টিই তামা গলিয়ে তৈরি হয়েছে। আকৃতির দিক থেকে এগুলো তিন শ্রেণীতে বিভাজ্য ; যথা– বর্গাকার, গোলাকার ও পত্রাকার। কেবল চারটি বর্গাকার মুদ্রায় চিহ্নগুলো অদ্যাবধি সুস্পষ্ট আছে। এগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মুখ্যপিঠে চিহ্নের সংখ্যা চারটি ; যথা– মকরধ্বজ, হাতি ও উটের শঙ্করজাত প্রাণী, টউরাইন এবং স্বস্তিক। অপরদিকে গৌণপিঠে রয়েছে তিনটি চিহ্ন ; যথা পাদমূলে বেড়া ঘেরা গুল্ম, শূন্যগর্ভ ক্রস ও তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির চূড়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি স্তূপ। তামায় তৈরি এ মুদ্রাগুলোর ওজন ১৯ রতি থেকে ২৩ রতির মধ্যে বিরাজ করছে। চারটি মুদ্রার বিন্যাসে একটি সহজাত পারম্পর্য লক্ষণীয়। ফলে এগুলো কোন শক্তিশালী শাসক কর্তৃক জারিকৃত বলে সহজেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় নমুনার মুদ্রাগুলো অত্যন্ত পাতলা, ছোট এবং তামায় তৈরি। এদের এক পিঠ জুড়ে রয়েছে সুদর্শন চক্র। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত উল্লিখিত মুদ্রাগুলোর চিহ্নগুলো ইয়ধেয়, কুনিন্দ, কৌশম্বী, উজ্জয়িন, বৃষি, তক্ষশীলা প্রভৃতি আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের জনপদের, মুদ্রাগুলোতে ব্যবহৃত প্রতীকীচিহ্নগুলোর অনুরূপ। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০–১০০ অব্দে এসব জনপদের অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ করে তিন শীর্ষ সংবলিত স্তূপ মৌর্য রাজবংশের রাজকীয় প্রতীক হিসেবে পরিচিত। টউরাইন (নন্দীপদ?) মৌর্য শাসনামলের প্রাথমিক পর্বের শিল্প নিদর্শনগুলোতে উপর্যুপরি ব্যবহৃত হতো। তাই স্বভাবতই এ মুদ্রাগুলোকে খ্রিস্টীয় ৩০০–১০০ অব্দে প্রচলিত নিদর্শন বলে ধরে নিতে বাঁধা থাকে না।

লিপিযুক্ত ছাঁচে তৈরি মুদ্রা

পশ্চিমি প্রভাবপুষ্ট উন্নতমানের ছাঁচে তৈরি মুদ্রা প্রচলনের কৃতিত্ব কুশান (৮৫–১৭৫ খ্রিঃ) রাজবংশের। এরা সোনায় তৈরি এবং রাজার প্রতিকৃতি সংবলিত মুদ্রা প্রচলন করেন। নওগাঁ জেলার মাহীসন্তোষ ও বগুড়ার মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী এলাকা থেকে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু ও বিকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত দু'টি মুদ্রাকে অনেক পণ্ডিত কুশান শাসনামলের মুদ্রা বলে অনুমান করেছেন। মুদ্রা শিল্পের বহুল বিকাশ ঘটে গুপ্তদের শাসনামলে। কারণ এরা সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের লিপি সংবলিত ছাঁচে তৈরি মুদ্রার প্রচলন করেন। অপরদিকে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানা সদরে অবস্থিত বিশাল মাটির দুর্গ এবং ফরিদপুর ও যশোরের সংলগ্ন এলাকা থেকে সন্ধান পাওয়া গেছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৪১২–১৩ থেকে ৪১৫ খ্রিঃ) একটি ও স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৪৫৫–৪৬৭ খ্রিঃ) তিনটি স্বর্ণমুদ্রা। এছাড়া যশোর অঞ্চলের মোহাম্মদপুর গ্রামে গুপ্তভাণ্ডার আকারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৫–৫৫ খ্রিঃ) ও স্কন্দগুপ্তের রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চল

থেকে প্রথম কুমারগুপ্তের শাসনামলে জারিকৃত দস্তায় তৈরি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে[১৬]। কোন কোন মুদ্রায় আবার রূপার কোটিংএর অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। প্রথম কুমার গুপ্তের শাসনামলে জারিকৃত এ ধরনের একটি তামার মুদ্রা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। অবশ্য এ ধরনের মুদ্রা মধ্য-ভারত ব্যতীত অপর কোথাও পাওয়া যায় নি। এসব মুদ্রার মুখ্যদিকে রাজমস্তক ও গৌণদিকে ময়ূর উৎকীর্ণ থাকত। মুদ্রার আকৃতি ছিল গোলাকার। মুদ্রালিপিতে রাজার নামসহ উপাধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া মুখ্যপিঠে তীরন্দাজ রাজা ও গৌণপিঠে উপবিষ্ট লক্ষ্মী মূর্তি বিধৃত করা হতো। অন্যান্য চিহ্নগুলোর মধ্যে বীণাবাদনরতা, রাণী, ময়ূর, অশ্বারোহী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তোত্তর আমলে উপ-মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও বেশকিছু স্থানীয় রাজ্য ও রাজার উদ্ভব ঘটেছিল। গুপ্তোত্তর আমলে রাজত্বকারী (খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতক) এইসব স্থানীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই স্বর্ণমুদ্রা জারি করেছেন। তাদের মুদ্রাগুলো যশোর, ঢাকার অদূরবর্তী সাভার ও ফরিদপুর অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এসব রাজন্যবর্গের মধ্যে কর্নসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদের চিরুটি স্টেশনের নিকটবর্তী অঞ্চল) শশাঙ্ক (আঃ ৬০৬-৩৪ খ্রিঃ), জয়নাগ (?), বীর সেন (?) এবং চন্দ্রবর্মণকোটের (ফরিদপুরে অবস্থিত) গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, ধর্মাদিত্য শ্রীনরেন্দ্র ভিনানি (আনুঃ ৫২৫-৫৭৫ খ্রিঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পরস্পর সম্পর্কবিহীন ও অজ্ঞাত পরিচয় নামসহ কয়েকটি মুদ্রা সাভার এবং ফরিদপুরে পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রার মধ্যে উৎকীর্ণ পৃথুবীর (পৃথবীরাজা/পথবল), শ্রীপ্রকান্ত, সুধন্যাদিত্য এবং ক্রমাদিত্য প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতীকী চিহ্নের বিচারে এগুলো রাজা, লক্ষ্মী ও ষাঁড় খচিত গুপ্ত অনুকৃত স্বর্ণমুদ্রা হিসেবে পরিচিত। এদের চিহ্নের মধ্যে তীরন্দাজ রাজা, উপবিষ্ট রাজা, ভাটাসহ ফুল ধৃত ছয় অথবা আট হাত বিশিষ্ট দেবী, শঙ্খ, চক্র, হাতি, পূর্ণচাঁদ, নন্দী, ঘোড়া, শাঙ্কবাকার পতাকা ও পাখি (হাঁস) উল্লেখযোগ্য। মুদ্রালিপির একটি বিশেষ অংশ ছিল 'শ্রী'। জয়নাগের মুদ্রায় 'শ্রীপ্রকান্তইয়াসহ' এবং শশাঙ্কের মুদ্রায় 'শ্রীশশাঙ্ক' লিপি উপস্থিত রয়েছে। বয়ন, কাঠামো ও ওজনের দিক থেকে এগুলো গুপ্ত অনুকৃত মুদ্রার শ্রেণীভুক্ত।

গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশের সমতটে (কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চল) পর পর বেশ কয়েকটি রাজবংশ রাজত্ব করত। এদের মধ্যে দেব, খড়্গ, রাত, নাত, চন্দ্র প্রমুখ রাজবংশের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মুদ্রার গোলাকার প্রান্তসীমায় বুটিদার বিন্দুর সমন্বয়ে বলয় রেখা অঙ্কন করা হতো। এগুলোর মধ্যে কোন কোন মুদ্রায় ইংরেজি 'এস' বর্ণমালা নমুনার চিহ্ন, ষাঁড় এবং আরও কিছু নতুন নমুনার চিহ্ন পাওয়া গেছে। একটি মুদ্রায় 'শ্রীবলভট্ট' লিপি রয়েছে। এ মুদ্রাটির আকৃতি গোলাকার এবং এটা সোনা দিয়ে তৈরি। একই নমুনার বৃক্ষ অঙ্কিত একটি মুদ্রায় 'সর্ব

---

১৬. Numasmatic Digest, Vol. 4, Part 1.

(নর?)' লিপি উৎকীর্ণ পাওয়া গেছে। অপর একটি একই জাতীয় মুদ্রায় 'বঙ্গাল মৃগঙ্কস্য' লিপি পাওয়া গেছে। এ মুদ্রায় পূজারিপাত্র (কমণ্ডলু) চিহ্ন আছে। এ মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে সমাচারদেবের পরবর্তীকালীন এবং খড়্গদের পূর্ববর্তী সময়ে রাজত্বকারী কোন রাজা কর্তৃক মুদ্রাটি জারি হয়েছিল।

এরপর আসে পাল, বর্মন ও সেন বংশের প্রসংগ। একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে এসব রাজবংশগুলোর রাজত্বকালে কোন মুদ্রা জারি করা হয় নি। খ্রিস্টীয় তের শতকের ঐতিহাসিক মীনহাজের বর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে এদেশে মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন ছিল। মহাস্থান ও পাহাড়পুরস্থ প্রত্নস্থলগুলোতে খননের ফলে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেছে। তবে গুপ্ত অনুকৃত একটি স্বর্ণ মুদ্রায় দেবপাল নাম পাওয়া গেছে। অপরদিকে ধর্মপালের বোধগয়া লিপিতে (২৬ রাজ্যারোহণ) 'ব্রম্মা', ভাতুরিয়া পাথর লিপিতে 'পুরান' এবং গয়ালিপিতে 'কারসাপণ' মুদ্রার উল্লেখ আছে। এছাড়া পাহাড়পুর থেকেও 'শ্রীবিগ্রহ' লিপি ও মাছের প্রতিকৃতি সংবলিত তামার তৈরি মুদ্রা পাওয়া গেছে। সেনদের তামার ফলকে অবশ্য চার ধরনের মুদ্রার উল্লেখ আছে ; যেমন- কপর্দক (সম্ভবত কড়ি), পুরাণ, চুরণি ও কারসাপণ। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে রাজত্বকারী চন্দ্রদের (আঃ খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতক) কিছু মুদ্রাও সিলেট এবং কুমিল্লায় পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রায় 'হরিকেল', 'পট্টিকের', 'বরক', 'পিরক', 'ইয়বিক্রিয়' ইত্যাদি লিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর প্রায় সবকটিই ছিল রূপা দিয়ে তৈরি। এভাবে দেখা যাবে, আদি ঐতিহাসিক পর্বে বাংলাদেশে সোনা ও রূপা উভয় ধাতুর তৈরি মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। এসবের মধ্যে সোনার মুদ্রাগুলোর ওজন ১৮৭°৪ গ্রেন থেকে ৮১°৩ গ্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে রূপার মুদ্রার ওজনের ক্ষেত্রে ইন্দোগ্রিক, 'দ্রামের' আদর্শ মান বজায় রাখা হতো। ময়নামতি (কুমিল্লা) টিলাশ্রেণীতে প্রাপ্ত অপর এক শ্রেণীর মুদ্রায় 'আকার' অন্তক নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। একটি মুদ্রায় এ নামটি 'ললিতাকর' পঠিত হয়েছে[১৭] সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাংলাদেশে ধাতু দুষ্প্রাপ্য। ফলে এদেশে ধাতুর তৈরি মুদ্রা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল এ কথা বলা সঠিক হবে না। বিশেষ করে পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড়ে মৃৎপাত্রে গুপ্তভাণ্ডার আকারে প্রচুর কড়ি সংরক্ষিত অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। এই আবিষ্কার থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে বাংলাদেশে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ে ধাতু মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও মূলত কড়িই ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম।

---

১৭. তাই কোন কোন পণ্ডিত সমতট অঞ্চলে খ্রিস্টীয় আট শতকে 'আকর' নামে একটি রাজবংশ রাজত্ব করতেন বলে ধারণা পোষণ করেন, B. N. Mukherjee, 'A survey of the Coinage of 'Harikela', Mamoirs series-7, coinage and Economy of North Eastern States of India, Varanasi, p. 20, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলার উপযোগী দ্বিতীয় কোন প্রমাণ আজও অন্যকোন সূত্র থেকে আহরণ করা সম্ভব হয় নি।

বাংলাদেশের মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষণাবতী থেকে সেন রাজা লক্ষণসেনের পলায়নের পর এদেশের দ্বার মুসলিম শাসকগণের নিকট চিরদিনের জন্য অবারিত হয়ে যায়। অতপর মধ্য-ঐতিহাসিক পর্যায়ের বাংলাদেশের ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা – স্থানীয় শাসক বা অর্ধ-স্বাধীন শাসনকর্তাগণের শাসনামল (১২০৪–১৩৩৮ খ্রিঃ), স্বাধীন সুলতানি শাসনামল (১৩৩৮–১৫৩৮ খ্রিঃ), শূর-আফগান শাসনামল (১৫৩৮–১৫৭৬ খ্রিঃ), মুগল শাসনামল (১৫৭৬–১৬৯৪ খ্রিঃ) ও নবাবি শাসনামল (১৬৯৫–১৭৬৫ খ্রিঃ)। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের প্রথম মুসলিম বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজী ও তার পরবর্তী শাসনকর্তা গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজীও মুদ্রা প্রচার করেন। তাদের মুদ্রাগুলো রূপা দিয়ে তৈরি।

অবশ্য তাদের মুদ্রাগুলোতে কোন নির্ধারিত ওজনমাত্রা বজায় ছিল না। এগুলোর আকৃতিও ছিল হয় গোলাকার, নয় বর্গাকার। পরবর্তী সময়ে রাজত্বকারী প্রায় সব সুলতান এবং শাসকের মুদ্রাই বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। আকৃতি ও ওজনের দিক থেকে মুগল সম্রাট শাহজাহানের মুদ্রাই ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ভারি। এরপর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নামে কিছুকাল মুদ্রা প্রচার অব্যাহত রেখেছিল।

ইসলামি শাসন পত্তনের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে মুদ্রার মুখ্যপিঠের মধ্যস্থলে কলেমা, এক প্রান্তে মুদ্রা প্রবর্তনের তারিখ এবং গৌণপিঠে শাসকের স্বঘোষিত উপাধিসহ নাম উল্লেখ করা হতো। এ মুদ্রায় কোন টাকশালের উল্লেখ থাকত না। এগুলোর গড় ওজন ১৬০ গ্রেন। পরবর্তী শাসকগণ মুদ্রার মুখ্যপিঠে একটি চতুষ্কোণাকার অংশ তৈরি করে সেখানে পূর্ণ নাম এবং গৌণপিঠের চতুষ্কোণাকার অংশে সমসাময়িক খলিফার নামসহ একপ্রান্তে টাকশাল ও মুদ্রা প্রচারের তারিখ উল্লেখ করতেন। এসব মুদ্রার সর্বাধিক ওজন ছিল ১৭০ গ্রেন।

স্বাধীন সুলতানি আমলে মোট ৬টি বংশ রাজত্ব করে। এসব বংশের শাসকগণের জারিকৃত মুদ্রার নমুনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বজায় ছিল। সোনারগাঁয়ের দু'জন শাসক ইওয়াজ খলজীর নমুনা অনুসরণ করতেন। তবে তাঁরা নিজ নিজ মুদ্রায় বাগদাদের খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনসহ সোনার গাঁ টাকশালের নাম উল্লেখ করতেন। অন্যদিকে আলাউদ্দিন আলী শাহ তাঁর মুদ্রায় ভিন্ন নমুনা অনুসরণ করেছিলেন। অতঃপর ইলিয়াস-শাহী বংশের শাসনামলে (১৩৪২–১৪১৫ খ্রিঃ) অখণ্ড বাংলাদেশের পত্তন হলে মুদ্রার নমুনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সোনা দিয়ে তৈরি মুদ্রার মুখ্যপিঠের মধ্যবর্তী অংশে রেখার সাহায্যে একটি গোলায়িত অংশ তৈরি করে এর মাঝখানে নিজ নাম উৎকীর্ণ করতেন এবং গৌণপিঠে চতুষ্কোণাকার অংশ তৈরি করে বৃত্তাকার ভঙ্গিতে নিজের বিবিধ উপাধিসূচক বাক্যসহ টাকশাল ও মুদ্রা প্রবর্তনের তারিখ উল্লেখ করতেন। তাঁর মুদ্রার ওজন ছিল গড়ে ১৬৮ গ্রেন। বিভিন্ন নমুনার ভিত্তিতে তাঁর মুদ্রাগুলোকে অধ্যাপক এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী সাহেব ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর

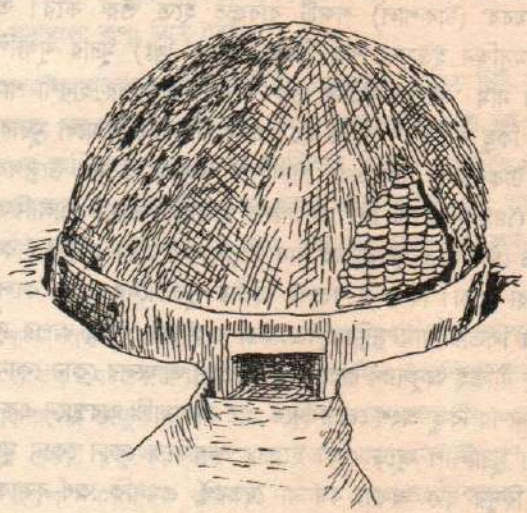
উত্তরাধিকারী যদিও একই নমুনা অনুসরণ করে মুদ্রা প্রচার করেন তথাপি এগুলোকে লিপিবিন্যাস ও অলংকরণের ভিন্নতা অনুযায়ী নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

এছাড়া তাঁর মুদ্রার অপর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদিন এবং একাধিক টাকশালের নাম উল্লেখকরণ উল্লেখযোগ্য। মুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী ও রাজা গণেশের বংশধরগণ মূলত একই রীতি অনুসরণ করতেন। তবে উপাধি গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য বজায় ছিল। এদিক থেকে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের (১৪১৫–৩৩ খ্রিঃ) মুদ্রাকে আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এর পরবর্তীকালে মাহমুদশাহী বংশের (পরবর্তী ইলিয়াসশাহী) সুলতানগণ ইলিয়াস শাহী আমলের মুদ্রানীতি পুনঃপ্রচলিত করেন। তবে এ সময় থেকে মুদ্রায় 'খাযানা' বা 'দারুয্যবর' (টাকশাল) শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আবার রুকুনউদ্দিন বারবক শাহ ও শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৫৯–১৪৮১ খ্রিঃ) মুদ্রার মুখ্যপিঠে কলেমা এবং গৌণপিঠে নিজেদের নাম উল্লেখ করতে শুরু করেন। অতঃপর হাবশী শাসনামলে (১৪৮৬–১৪৯৩ খ্রিঃ) আরও কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে মুদ্রার মুখ্যপিঠে কলেমা প্রচারের তারিখ ও টাকশালের নাম এবং গৌণপিঠে সুলতানের নাম উল্লেখকরণ উল্লেখযোগ্য। হুসেন শাহী বংশের (১৪৯৩–১৫৩৮ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠাতা মুখ্যপিঠে একটি গোলায়িত অংশ তৈরি করে তারমধ্যে কলেমা ও গৌণপিঠে সুলতানের নাম উল্লেখ করতেন। এছাড়া টাকশাল এবং মুদ্রণের তারিখও উল্লেখ করা হতো। কিন্তু এ বংশের দ্বিতীয় সুলতানের মুদ্রায় কলেমা উৎকীর্ণ করার পরিবর্তে সুলতানের পিতার নাম সন্নিবেশিত করা শুরু হয়। তাঁর অপর দু'জন উত্তরাধিকারী অবশ্য এই শেষোক্ত নীতিই অনুসরণ করতেন। সুলতানি আমলের কোন কোন মুদ্রার এক অথবা উভয় পিঠের প্রান্তদেশের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে প্রায় মাঝামাঝি অবস্থানে একটি ভাঁজ যুক্ত বলয় সৃষ্টি করে তারমধ্যে মুদ্রালিপি জুড়ে দেয়া হতো। অন্যদিকে কোন কোন মুদ্রায় একাধিক বৃত্ত দিয়ে ঘেরা একটি বিন্দুর বৃত্ত অথবা বর্গ বা দ্বৈতবর্গ, এমনকি অর্ধ-বৃত্তাকার খোলযুক্ত বৃত্ত ইত্যাদির মাঝখানে মুদ্রালিপি সন্নিবেশিত করা হতো।

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের শুর ও আফগান শাসকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের শাসন ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময়ে জারিকৃত মুদ্রাগুলোতে কিছু ভিন্নতা লক্ষণীয়। এগুলোর মুখ্যপিঠে কলেমা ও খোলাফায়ে রাশেদিনের নাম এবং গৌণপিঠে শাসকদের নাম উল্লেখ করা হতো। টাকশালের নামও উপস্থিত থাকত। ওজন ১৬০ থেকে ১৬৬ গ্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হতো। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহামতি আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬–১৬০৫ খ্রিঃ) বাংলাদেশে মুগলদের অনুপ্রবেশ সূচিত হয়।

মুগল আমলের মুদ্রাগুলো বহুনামে পরিচিত ছিল। যেমন— মোহর (সোনার মুদ্রা), রূপায়া (রূপার মুদ্রা)ও তঙ্কা (তামার মুদ্রা)। এছাড়াও ছিক্কা, মেহরাবী, রাশিচক্র, ফুলস, দাম, নিসার, পাঁচ মোহর, দশ মোহর ইত্যাদি বহুনামের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। তবে এদের মধ্যে কোন কোনটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো না। উদাহরণস্বরূপ নিসার নামক মুদ্রার উল্লেখ করা যায়। আকারে সর্বাধিক ক্ষুদ্রাকার এ মুদ্রা সাধারণত উৎসবের দিনে বিতরণের জন্য তৈরি করা

রেখাচিত্র – ১৬



বাংলাদেশে ব্যবহৃত মৃৎপাত্র পোড়ানোর বদ্ধচুল্লি

হতো। আবার কোন কোন মুদ্রা স্বাভাবিক মুদ্রার তুলনায় অনেক বড় আকারে তৈরি হতো। এগুলো সাধারণত কর প্রদান বা পদক বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হতো। কোন কোন মুদ্রার মাঝখানে বরফি আকারে ভূমি সংস্থান তৈরি করে তার মাঝখানে মুদ্রালিপি সংযোজিত হতো। আকবরের আমলে জারিকৃত মুদ্রাগুলোতেই এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকট। তবে জাহাঙ্গীরের আমলে জারিকৃত রাশিচক্র মুদ্রাগুলো নানা কারণে আকর্ষণীয়। এসব মুদ্রায় রাশিচক্রের সাথে জড়িত প্রাণীবাচক চিত্রও বিধৃত করা হতো।

একমাত্র সম্রাট আকবরের আমলে প্রচলিত আয়তাকার আকৃতি বিশিষ্ট মিহরাবী মুদ্রা ব্যতীত অপর সকল মুগল মুদ্রা গোলায়িত নমুনায় তৈরি হয়েছিল। এসব মুদ্রায় নাসতালীক, রয়হান, তওলীক ইত্যাদি হস্তলিপিবিদ্যার নমুনার হরফ দিয়ে সম্রাটের উপাধিসহ নাম, জুলুস বছর (রাজ্যারোহণের তারিখ), টাকশালের প্রতীক ও কদাচিৎ কলেমার উল্লেখ থাকত। মুদ্রালিপির ক্ষেত্রে ফারসির প্রাধান্য বজায় ছিল। আবার সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মুদ্রাগুলোতে কলেমা লিখন বর্জন করেছিলেন। টাকশালের প্রতীক হিসেবে সাধারণত ছত্রী, মাছ, প্রস্ফুটিত ফুলসহ লতা, উপবেশনের আসন ও পাতা বিধৃত করা হতো। লক্ষণীয় বিষয় এই যে সম্রাট আকবর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রচলন করতেন। এসব মুদ্রায় সম্রাটের প্রতিকৃতি, বাজপাখি (বিজয়ের প্রতীক), পাতিহাঁস (শান্তির প্রতীক?) ও রাজমুকুট পরিহিত তীরচালকের অনুগামী, অবগুণ্ঠিত নারী (স্মারক) ইত্যাদি প্রতীকও বিধৃত করা হতো। সম্রাট আকবর 'ইলাহী মুদ্রা' নামে আর একপ্রকার মুদ্রা প্রচলন করেন। এক্ষেত্রে কলেমা ও খোলাফায়ে রাশেদিনের নাম এবং গুণবাচক বিশেষণ বর্জন করা হয়। মুদ্রার ওজন ১৫ গ্রেন থেকে ১৮৭ গ্রেনের মধ্যে সীমিত ছিল। কখনও কখনও মুদ্রায় ফারসি বয়াতও উল্লেখ করা হতো। মুগল সম্রাটগণ মুদ্রায় যেসব উপাধি ব্যবহার করতেন তা-ও বড় বৈচিত্র্যময়।

মৃন্ময় তৈজস-পত্র

মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যে তৈজস পত্রের কথাই সবার আগে আসে। তবে মানুষ ঠিক কখন এগুলোর ব্যবহার শুরু করেছিল তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। অবশ্য উপমহাদেশের বেশ কয়টি প্রাগৈতিহাসিকযুগীয় প্রত্নস্থলে মধ্য-পাথর পর্যায়ের ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ারের সাথে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু মৃৎপাত্রের খোলামকুচি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে আজ অবধি যদিও মধ্য-পাথর পর্যায়ের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি তথাপি কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি প্রত্নস্থলে প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় হাতিয়ারের সাথে কিছু খোলামকুচির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলোর প্রকৃতি নির্ণয় করার মতো কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট থেকে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে বাংলাদেশের ঐতিহাসিকযুগীয় প্রত্নস্থলগুলো থেকে প্রচুর মৃৎপাত্র ও খোলামকুচি আবিষ্কৃত হয়েছে।

আলোকচিত্র ৯

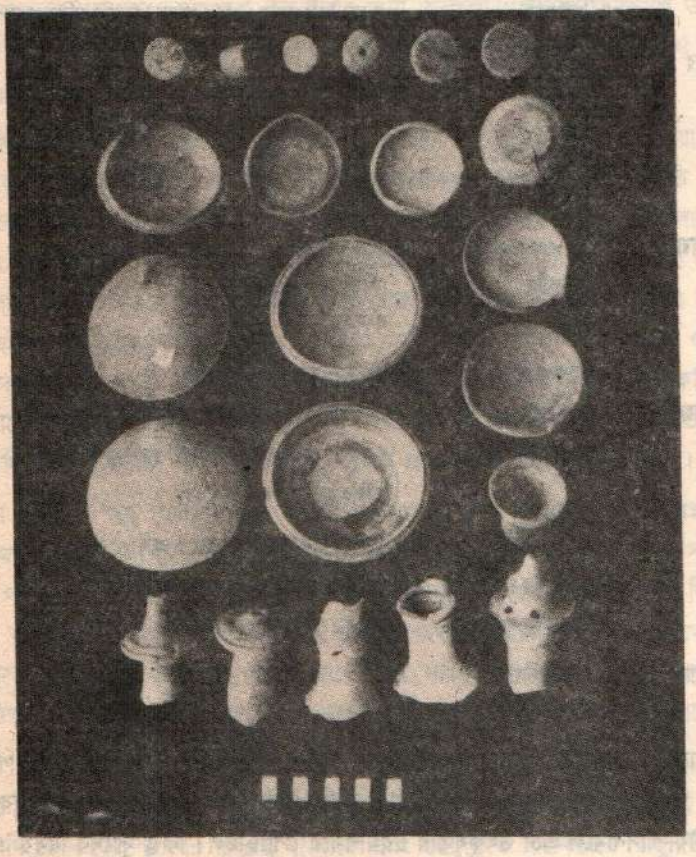


ক খ

চাকীতে ঘুরিয়ে পাত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপ

মৃৎপাত্র আলোচনার প্রাথমিক শর্ত ওয়্যার (ware) নির্ধারণ। এ উপমহাদেশে এ যাবৎ একাধিক নমুনার ওয়্যারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে হরপ্পা ওয়্যার, কালো ও লাল ওয়্যার, লাল ঔজ্জ্বল্যময় ওয়্যার, পিঙ্গল রঙের মৃৎপাত্র (ও.সি.পি), জরওয়ে ওয়্যার, মালয় ওয়্যার, চিত্রিত ধূসর ওয়্যার (পি. জি. ডাবলিউ) ও উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ ওয়্যার (এন.বি.পি) দগ্ধপূর্ব কালো প্রলেপ যুক্ত ওয়্যার বহুল আলোচিত। পরবর্তী অংশে এদের সাধারণ পরিচিতি মূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

আলোকচিত্র –১০



পাহাড়পুরে প্রাপ্ত বাদামি রঙের মৃৎপাত্র

নাম	সময়কাল	প্রধান সাথি প্রত্ননিদর্শন
হরপ্পা ওয়্যার	আঃ ২১৫০–১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	দগ্ধ অথবা অদগ্ধ ইটে তৈরি ইমারত, নালা, পয়ঃপ্রণালি, রাস্তা ও শৌচাগার সমেত নগরায়ন, ভাবলিপি, সংবলিত সীলমোহর ও সীলছাপ, তাম্র ও ব্রঞ্জ নির্মিত দ্রব্যাদি, হাতির দাঁত, হরিণের শিং, শঙ্খ, খড়িপাথর, অঙ্গারপাথর, অলঙ্কার ও ত্রিকোণাকার অদগ্ধ মাটির পিটক ইত্যাদি।
লাল ঔজ্জ্বল্যময় ওয়্যার	আঃ ১৮০০–১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	উচ্চ—হরপ্পা সভ্যতার সকল নিদর্শন ও হাড়ের তৈরি প্রত্নবস্তু

পিঙ্গল বর্ণের মৃৎপাত্র	আঃ ১৬০০–১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	তাম্র পর্যায়ের প্রায় সব প্রত্ননিদর্শন ও হাড়ে তৈরি প্রত্নবস্তু। তবে এ পর্যায়ে নগরায়নের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।
জরওয়ে ওয়্যার	আঃ ১৬০০–১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	–ঐ–
মালয় ওয়্যার	আঃ ১৭০০–১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	–ঐ–
চিত্রিত ধূসর ওয়্যার	আঃ ১০০০–৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	চওড়া মাটির প্রাচীর (নগরায়নের পুনঃ আবির্ভাব) ও লোহার পিন্ড।
উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ ওয়্যার[১৮]	আঃ ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ	ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, লিপিবিহীন ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা, লোহা নির্মিত প্রত্নবস্তু ইত্যাদি। এ পর্বে নগরায়ন ও রাজতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করে। এছাড়া স্থাপত্যিক কার্যাদিতে শৈল্পিক চেতনার স্ফুরণ শুরু হয়।
কালো ও লাল ওয়্যার	আঃ ২২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ	পূরাঐতিহাসিক যুগের তাম্র পর্যায় ও আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের লোহ পর্বের সকল নিদর্শন।
দ্যুপূর্ব কালো প্রলেপযুক্ত ওয়্যার	আঃ চার খ্রিঃ পূঃ থেকে খ্রিস্টীয় সাত-আট শতক	আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের সকল নিদর্শন

বাংলাদেশে একমাত্র বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আদর্শ উত্তরদেশীয় কালো রঙের পালিশকৃত ওয়্যারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ওয়্যার আদি–ঐতিহাসিক পর্যায়ের সূচনালগ্নের স্মৃতির ধারক। মৌর্য–শাসনামলে এটা উৎকর্ষতার চরমশিখরে পৌছেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ যাবৎ এ ওয়্যারের নিদর্শনাদি স্তরবিন্যাসের মূলঅবস্থা থেকে এর সাথি–প্রত্নবস্তুর সাথে অনাবৃত হয় নি। আর তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ ওয়্যারের স্থাননির্ণয়ের বিষয়ে আজও কোন সর্বজনগ্রাহী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

ওয়্যার নির্ণয়ের জন্য পাত্রের গড়ন, রূপ, পরিমাপ, অলংকরণ, বয়ন ও কাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করতে হয়। অপরদিকে পাত্রের গড়ন নির্ধারণের জন্য একটি পাত্রকে

---

১৮. এই ওয়্যারটি চলতি শতকের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত কেবল উত্তর ভারতীয় অঞ্চলসমূহের প্রত্নস্থলগুলোতে আবিস্কৃত হয়েছিল। তাই তৎকালে এই নামেই এর পরিচিতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্বাঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণে আবিস্কৃত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে অধিকাংশ গবেষক এই নামটি ব্যবহারের প্রসঙ্গ সতর্কভাবে এড়িয়ে চলেন।

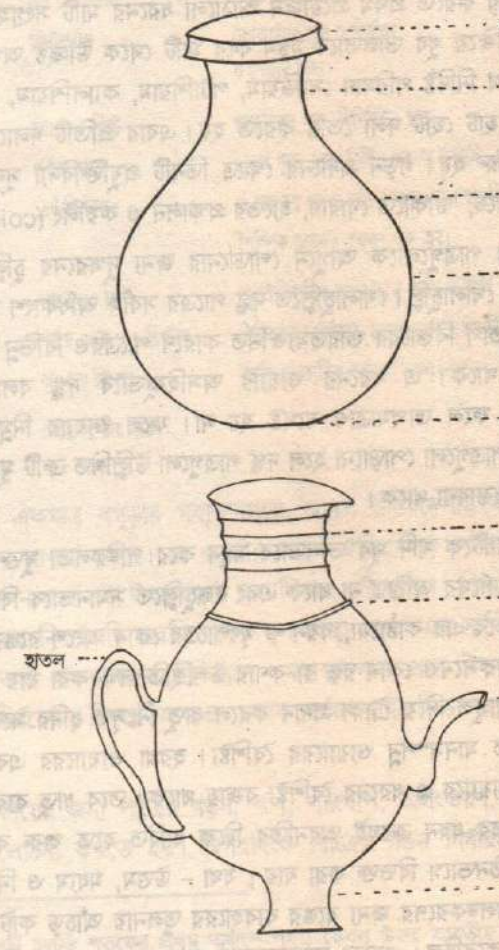
যথাক্রমে কানা, কাঁধ, ঘাড়, ধর এবং তলা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আবার মৃৎপাত্রের অলংকরণ সম্পর্কে অবহিতির জন্য অলংকারগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ; যথা – আঁচড় কাটা, অঙ্ককখচিত রঙিন প্রলেপযুক্ত ও অ্যাপ্লিক (applique) সমৃদ্ধ।

এবার ওয়্যারের বয়ন এবং কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় উপনীত হওয়া যাক। এ আলোচনায় মৃৎপাত্র তৈরির উপকরণগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং দগ্ধকরণ পদ্ধতি নির্ধারণই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এরজন্য সর্বপ্রথম মৃৎপাত্র তৈরির কৌশল আলোচনা করা প্রয়োজন। মৃৎপাত্র তৈরি করতে প্রথম প্রয়োজন আঠালো ধরনের মাটি সংগ্রহ করা। এরপর এ মাটিকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে খুব ভালভাবে মন্থন করে মাটি থেকে উচ্ছিষ্ট অপসারণ করা হয়। অতপর এই মাটির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, লোহা ও সিলিকা বাহিত পদার্থ মিশিয়ে ছোট ছোট দলা তৈরি করতে হয়। এবার প্রতিটি দলাকে একটি পাত্রের গড়ন প্রদানের পালা শুরু হয়। গড়ন প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি প্রযুক্তিবিদ্যা সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি প্রচলিত আছে, চাকীতে ঘোরাণ, হাতের প্রক্ষালন ও কয়লিং (coiling)।

গড়ন তৈরির পর পাত্রগুলোকে আগুনে পোড়ানোর জন্য দু'ধরনের চুল্লি ব্যবহৃত হতে পারে ; যথা– বদ্ধচুল্লি ও খোলাচুল্লি। খোলাচুল্লিতে দগ্ধ পাত্রের সর্বাঙ্গ অধিকাংশ সময় সমান তাপ পায় না। পাত্রের সর্বত্র তাপ বিস্তারের তারতম্যজনিত কারণে পাত্রেরও বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন রঙ ও বয়ন অর্জন করে থাকে। এ ধরনের ওয়্যার অসহিষ্ণুভাবে দগ্ধ বলা যেতে পারে। খোলাচুল্লিতে পোড়ানোর ফলে তাপমাত্রাও যথেষ্ট হয় না। ফলে ওয়্যার নিম্নমান লাভ করে থাকে। কিন্তু বদ্ধচুল্লিতে পাত্রগুলো পোড়ানো হলে দগ্ধ পাত্রগুলো উল্লিখিত ত্রুটি মুক্ত থাকে, অর্থাৎ উন্নতমান সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাত্র তৈরির পূর্বে মাটিকে যদি খুব ভালভাবে মন্থন করে পঙ্কিলতা মুক্ত করা হয় এবং মাটিতে যদি কোন জৈবপর্দাথের অস্তিত্ব না থাকে এবং বদ্ধচুল্লিতে সমানভাবে বিচ্ছুরিত উপযুক্ত তাপমাত্রায় পোড়ান হয় তবে এর কাঠামো, বয়ন ও মৃৎপাত্রের কোন অংশে রঙের কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। এমনকি, সেকসনেও কোন রন্ধ্র বা কণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। এ ধরনের পাত্র বা খোলামকুচিকে আঙ্গুল দিয়ে টোকা প্রদান করলে ধাতু নিঃসৃত ধ্বনির মতো শব্দ উৎপন্ন হয়। এ সবই হলো উন্নত মানসম্পন্ন ওয়্যারের বৈশিষ্ট্য। হরপ্পা ওয়্যারের এবং উত্তরদেশীয় কালোরঙের পালিশকৃত ওয়্যারে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। তবে ধাতু ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন শুরু হলে ওয়্যারের ধরন ক্রমেই অবনতির দিকে ধাবিত হতে শুরু করেছিল। আর এসব ওয়্যারের ধরনকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা – উত্তম, মধ্যম ও নিম্নমান সম্পন্ন। মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়ে অলঙ্করণের জন্য রঙের ব্যবহারের তুলনায় আঁচড় কাটা রীতি অধিক হারে অনুসৃত হতে শুরু করেছিল। এছাড়া মুসলমানদের শাসনামলের প্রথম দিকে মৃৎপাত্রের গায়ে ধাতু বা কাঁচ জাতীয় রঙিন পদার্থের একপ্রকার মোটা প্রলেপ আরোপের রীতি প্রচলিত হয়। এ ধরনের প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র গ্লেইজড (glazed) ওয়্যার নামে পরিচিত।

রেখাচিত্র – ১৭



সবচেয়ে বড় কথা এই যে মৃৎপাত্র ভঙ্গুর। তাই পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া মৃৎপাত্রের সংখ্যা খুবই কম। যা কিছু পাওয়া যায় তার সিংহভাগ জুড়ে থাকে খোলামকুচি। এদের মধ্যে কানা অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এককেন্দ্র এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যাসবিশিষ্ট একাধিক বৃত্তের সমন্বয়ে গঠিত মানচিত্রের উপর কানা অংশটি বসিয়ে একটি ভেঙে যাওয়া মৃৎপাত্রের আকার ও আকৃতি সম্পর্কে ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। আবার প্রত্যেক পর্যায় ও পর্বের ওয়্যার ও মৃৎপাত্রগুলো কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পাত্রের গড়ন এবং অলংকরণের রূপচিহ্ন বিন্যাসের মধ্যে সুস্পষ্ট থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আপাতত আদর্শ নমুনার উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ ওয়্যার শনাক্তকরণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত করা হলোঃ

(ক) এর সেকসন অত্যন্ত শীর্ণ, নিচ্ছিদ্র ও পিচ্ছিল। রঙ ধূসর, হালকা, লালচে বা নীলাভ প্রভাযুক্ত ;

(খ) মৃৎপাত্রের এক অথবা উভয় পিঠে কালো চকচকে রঙের বিচ্ছুরণ বজায় থাকে ;

(গ) পাত্রগুলো চাকীতে ঘুরিয়ে তৈরি ;

(ঘ) বদ্ধচুল্লিতে পাত্র দগ্ধ করা হতো ;

(ঙ) সর্বাঙ্গে রঙ বিভাজনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য বজায় থাকে না ;

(চ) মৃদু টোকা দিলে সুমিষ্ট শব্দ উচ্চারিত হয় ;

(ছ) মাঝারি আকৃতি, কানাবিহীন এবং তলা ও শরীর গোলাকার ;

(জ) এবং ওজন অত্যন্ত হালকা।

বাংলাদেশের আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের প্রত্নস্থলগুলোতে একাধিক নমুনার ওয়্যারের উপস্থিতি দেখা যায়। এরমধ্যে তিনটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। নিচে এদের আলোচনা করা হলো।

লালচে বাদামি রঙের ওয়্যার

সংখ্যার বিচারে এই ওয়্যারভুক্ত পাত্রের সংখ্যা সর্বাধিক। এদের সেকসন গড়ে ২ মিলিমিটার থেকে ৫-৬ মিমিঃ পুরু। বয়ন ও কাঠামোর দিক থেকে পাত্রগুলো মধ্যমান সম্পন্ন। সাধারণত পাত্রের উপরাংশে গৈরিক-বাদামি অথবা ধূসর-বাদামি রঙের দগ্ধপূর্ণ প্রলেপ বজায় থাকে। কোন কোন পাত্রের গলায় অথবা কাঁধে বা তলদেশে নকশাও বিধৃত পাওয়া যায়। নক্শার প্রধান প্রধান মোটিফ হলো জালি, ঢেউ, বরফি, চোখ, হেলান গোঁজ, সমান্তরাল রেখা, আম্রমঞ্জুরি, বহু প্যাঁচযুক্ত বলয় ইত্যাদি। পাত্রগুলোর মধ্যে সঞ্চয়াধার, সুবাসিত তরল পদার্থ সিঞ্চনাধার, পুষ্পাধার, তৈলপ্রদীপ, বাটি, সরপোশ, হাতাওয়ালা ধূপদান, চেটালপাত্র ইত্যাদির সংখ্যাই বেশি।

মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা নিম্নাংশ
ভেতরের দৃশ্য–বহির্দৃশ্য
মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা কাঙ্গা
সোলামকুচি থেকে মৃৎপাত্র অঙ্কনের বিভিন্ন দিক

রেখাচিত্র – ১৮

ধূসর রঙের ওয়্যার

এদের সেকসনের পুরত্ব উপরিল্লিখিত ওয়্যারের অনুরূপ। তবে পাত্রগুলোকে ও বয়ন প্রকৃতির বিচারে তিনটি মানে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন। উত্তম মানের ধূসর ওয়্যারে তৈরি পাত্রগুলো সাধারণত ক্ষুদ্রাকার হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সঞ্চয়াধার, দোয়াত ইত্যাদির সংখ্যাই বেশি। এদের উপরের অর্ধাংশের সর্বত্র কালচে-বেগুনি রঙের দগ্ধপূর্ব প্রলেপ বজায় থাকে। মাঝারি আকারের পাত্রগুলোর মধ্যে হাঁড়িকুড়ির সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে নিম্নমান সম্পন্ন পাত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি। সাধারণত রান্নার জন্য ব্যবহৃত হাঁড়িকুড়ি জাতীয় পাত্রগুলোর ক্ষেত্রেই এ ওয়্যারের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়। এগুলোর ক্ষেত্রে অলঙ্করণের উপস্থিতি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। তবে কোন কোন পাত্রের উপরাংশে তামাটে-লাল রঙের দগ্ধপূর্ব প্রলেপ আরোপিত হয়েছিল এমন নিদর্শনের অভাব নেই।

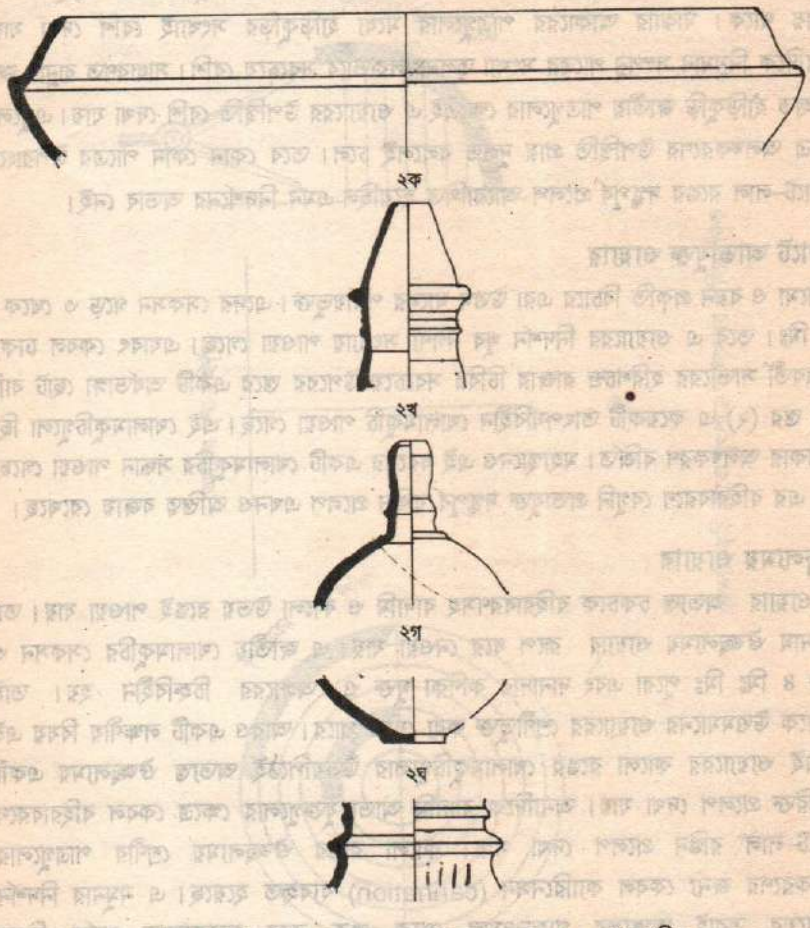
সাদাটে আভাযুক্ত ওয়্যার

কাঠামো ও বয়ন প্রকৃতি বিচারে এরা উত্তম মানের পর্যায়ভুক্ত। এদের সেকসন গড়ে ৩ থেকে ৪ মিঃ মিঃ। তবে এ ওয়্যারের নিদর্শন খুব নগণ্য সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এযাবৎ কেবল ঢাকার অদূরবর্তী সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার ঢিবির সবচেয়ে উপরের স্তরে একটি অর্ধভাঙ্গা ছোট বাটি এবং স্তর (২) এ কয়েকটি তাৎপর্যবিহীন খোলামকুচি পাওয়া গেছে। এই খোলামকুচিগুলো ছিল সর্বপ্রকার অলঙ্করণ বর্জিত। মহাস্থানেও এই ধরনের একটি খোলামকুচির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এর বহিরাবরণে বেগুনি প্রভাযুক্ত দগ্ধপূর্ব রঙিন প্রলেপ এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

ঔজ্জ্বল্যময় ওয়্যার

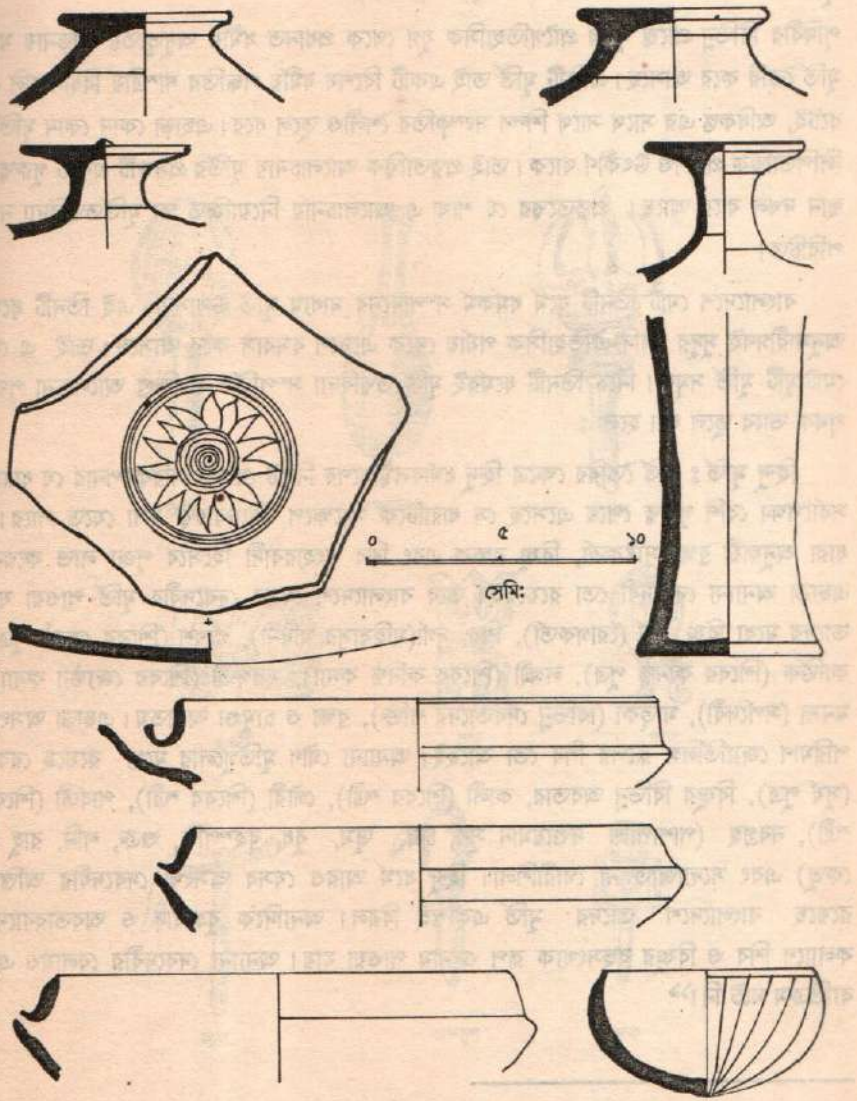
এই ওয়্যার অত্যন্ত চকচকে বহিরাবরণসহ বাদামি ও কালো উভয় রঙেই পাওয়া যায়। তাই এর নাম ঔজ্জ্বল্যময় ওয়্যার রূপে ধরে নেওয়া যায়। এ জাতীয় খোলামকুচির সেকসন ৩ থেকে ৪ মিঃ মিঃ পুরো এবং দানাদার কণিকা মুক্ত ও অঙ্গারের চিহ্নবিহীন হয়। তাই এদেরকে উত্তমমানের ওয়্যারের শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই ওয়্যারের কালো রঙের খোলামকুচিগুলোর উভয়পিঠেই অত্যন্ত ঔজ্জ্বল্যময় একটি অতিরিক্ত প্রলেপ দেখা যায়। অন্যদিকে বাদামি আভা যুক্তগুলোর ক্ষেত্রে কেবল বহিরাবরণে তামাটে-লাল রঙিন প্রলেপ দেখা যায়। কালো রঙের ঔজ্জ্বল্যময় শ্রেণীর পাত্রগুলোর অলঙ্করণের জন্য কেবল ক্যারিনেসন (carination) ব্যবহৃত হয়েছে। এ নমুনার নিদর্শন হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের গাহড়ওয়াল থেকে শুরু করে মহাস্থানগড় পর্যন্ত বিস্তৃত প্রত্নস্থলগুলোতে উত্তরদেশীয় কালো পালিশকৃত ওয়্যারের সাথি নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গেছে। অন্যদিকে তামাটে লাল আভার ঔজ্জ্বল্যময় ওয়্যারের উপস্থিতি কেবল আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ে দেখা গেছে। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত এ জাতীয় একটি খোলামকুচিতে মাছের আঁশ মোটিফ বিধৃত থাকতে দেখা গেছে।

রেখাচিত্র – ১৯



দণ্ড পূর্ব কালো প্রলেপযুক্ত ওয়্যার, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত

রেখাচিত্র – ২০



দগ্ধপূর্ব কালো প্রলেপযুক্ত ওয়্যার, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত

মৃৎপাত্র সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রত্নতত্ত্বের 'ক-খ-গ' বলে বিবেচিত হয়। কারণ প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই এ নিদর্শনটি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

মূর্তি

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রধানত ধর্মীয় অনুভূতির তাড়নায় মানুষ মূর্তি তৈরি করে আসছে। প্রতিটি মূর্তি তাই একটি বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতির শাস্ত্রীয় বিধানাবলি তো বটেই, অধিকন্তু এর সাথে সাথে শিল্প সংস্কৃতির শৈলীও তুলে ধরে। এছাড়া কোন কোন মূর্তিতে লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণও উৎকীর্ণ থাকে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় মূর্তির প্রসঙ্গটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রত্নতত্ত্বের যে শাখা এ আলোচনায় নিয়োজিত তা মূর্তিতত্ত্ববিদ্যা নামে পরিচিত।

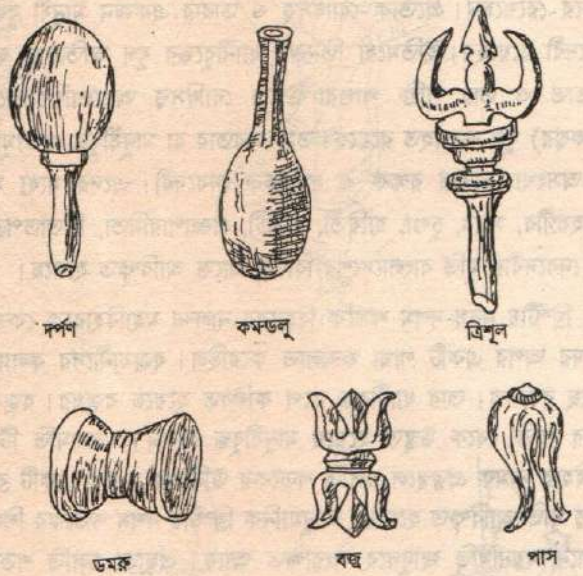
বাংলাদেশে মোট তিনটি ধর্মে ধর্মকর্ম সম্পাদনের মাধ্যম মূর্তি উপাসনা। এই তিনটি ধর্মের অনুসারীগণই সুদূর আদি-ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে এদেশে বসবাস করে আসছে। তাই এ দেশ মোটামুটি মূর্তি সমৃদ্ধ। নিচে তিনটি ধর্মেরই মূর্তি তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হলো ঃ

হিন্দু মূর্তি ঃ মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের নিকট দেবতা পরিকল্পনার যে ধারাটি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে সে ধারাটিকে সংক্ষেপে 'ত্রিদেবতত্ত্ব' বলা যেতে পারে। এ ধারা অনুযায়ী ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষক এবং শিব সংহারবাদী হিসেবে পূজা লাভ করেন। এছাড়া অন্যান্য দেবদেবী তো রয়েছেই। তবে বাংলাদেশে যেসব দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বিষ্ণু, সূর্য (রোগকর্তা), শিব, দুর্গা(মহিষাসুর মর্দিনী), গণেশ (শিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র), কার্ত্তিক (শিবের কনিষ্ঠ পুত্র), লক্ষ্মী (শিবের কনিষ্ঠ কন্যা), সরস্বতী (শিবের জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা), মনসা (সর্পদেবী), মাতৃকা (বিভিন্ন দেবতাদের শক্তি), ব্রহ্মা ও চামুণ্ডা অন্যতম। এছাড়া অসংখ্য পরিমাণ জ্যোর্তিলিঙ্গ রূপের শিব তো আছেই। অন্যান্য গৌণ মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে রেবন্ত (সূর্য পুত্র), বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, কালী (শিবের স্ত্রী), গৌরী (শিবের স্ত্রী), পার্বতী (শিবের স্ত্রী), নবগ্রহ (পাশাপাশি দণ্ডায়মান সূর্য, চন্দ্র, ভূম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু) এবং সদ্যোজাত না গোরীশিলা। হিন্দু ধর্মে আরও যেসব অসংখ্য দেবদেবীর অস্তিত্ব রয়েছে বাংলাদেশে তাদের মূর্তি একান্তই বিরল। অন্যদিকে বৃহ্যবাদ ও অবতারবাদের কল্যাণে শিব ও বিষ্ণুর বহুসংখ্যক রূপ ও নাম পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবদেবীর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।[১৯]

---

১৯. তাই সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী ড: এনামুল হক তাঁর Bengal Sculpturs stindu Iconography upto circa 1250 A.D, শিরোনামের গ্রন্থে হিন্দু মূর্তিগুলোকে মূলত বৈষ্ণব, শৈব, সৌরিয়, দেবী ও আনুসঙ্গিক এই চার ভাগে ভাগ করেছেন।

রেখাচিত্র – ২১



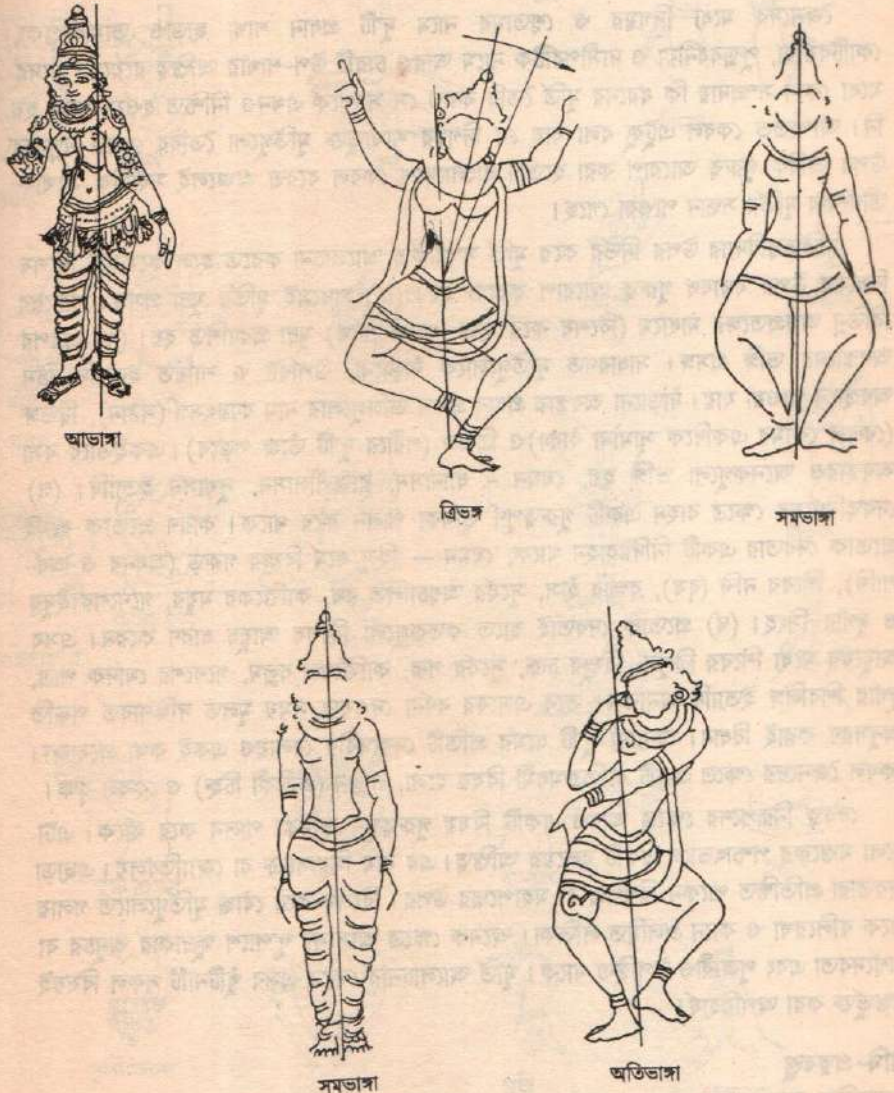
মূর্তির হাতে ধৃত কিছু আয়ুধ

বৌদ্ধ মূর্তি ঃ আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণ হিন[illegible] মহাযানী নামে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। বৌদ্ধধর্মে মহাযানীদের কল্যাণেই মূর্তি পজার সূত্রপাত ঘটে। আর মূর্তি তৈরির ভিত্তি হচ্ছে 'পঞ্চতথাগত' সম্পর্কিত মতবাদ। এই মতবাদের কেন্দ্রে রয়েছে আদিবুদ্ধ নামক এক মৌলিক সত্তা যা থেকে পর পর পাঁচটি যুগের জন্য পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ (অমিতাভ, অক্ষোভ্য), বৈরচন, অমোঘসিদ্ধি ও রত্নসম্ভর) নির্ধারিত রয়েছেন। কিন্তু এরা সর্বদা জাগতিক বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্যানে মগ্ন থাকেন বিধায় প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ একজন করে বোধিসত্ত্ব এবং তাদের স্ব স্ব প্রজ্ঞা বা তারার (শক্তি) মধ্যে নিজেদের নিজ নিজ যুগে বিভক্ত করে রেখেছেন। প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব ও তারার একজন মানুষী বুদ্ধ (অবতার) ও বহুসংখ্যক দেবদেবী রয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনজন ধ্যানীবুদ্ধের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে. বর্তমানে ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তার শক্তি পাণ্ডরা উদ্ভূত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের (পদ্মপানি, লোকনাথ, লোকেশ্বর) যুগ অব্যাহত রয়েছে। তার অবতার বা মানুষীবুদ্ধ শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য ভক্তের রক্ষক ও ধর্মরক্ষক দেবদেবী। এদের মধ্যে মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুবর, হেরক, জম্ভল, হয়গ্রীব, সম্বর, চুণ্ডা, হায়িতী, মারীচী, প্রজ্ঞাপারমিতা, সিতাতপত্র, অপরাজিতা, পার্ণশবরী প্রমুখ দেবদেবীর মূর্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আবিষ্কৃত হয়েছে।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকে বিহারের নালন্দা মহাবিহারকে কেন্দ্র করে বজ্রযান নামক হিনযানীদের অপর একটি শাখা জন্মলাভ করেছিল। বজ্রযানীদের কল্যাণে আদিবুদ্ধের স্থান লাভ করেছে বজ্রসত্ত্ব। তার ধ্যানীবুদ্ধ রূপে কল্পিত হয়েছে বজ্রধর। বজ্রধরের বোধিসত্ত্ব ঘন্টাপানি ও তার শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে মানুষীবুদ্ধ হেবজ। ময়নামতি টিলাশ্রেণীর ঢালে অবস্থিত ভোজবিহার নামক প্রত্নস্থলে চলতি শতকের উনিশের দশকে একটি ব্রঞ্জ নির্মিত বড় আকারের বজ্রসত্ত্ব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতকের শিল্পশৈলী বিশিষ্ট এ মূর্তিটি বর্তমানে ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া চলতি শতকের প্রথমার্ধে পাহাড়পুর বিহারেও একটি ক্ষুদ্রাকার হেবজ শক্তি (যব-উম) মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জৈন মূর্তি ঃ জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চব্বিশ জন তীর্থংকরের (ধর্ম প্রচারক) মূর্তি তৈরি করে উপাসনার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এরা হলেন ঋষভনাথ (আদিনাথ), অভিনাথ (অজিতনাথ), সম্ভবনাথ, অভিন্দনাথ, সোমতিনাথ, প্রদ্মপ্রভা, সুপার্শ্বনাথ, চন্দ্রপ্রভা, সুবিধিনাথ (পুষ্পদণ্ড), শিতলনাথ, শ্রেয়ংশনাথ, বসুপুষ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, শান্তিনাথ (কান্তিনাথ), ধর্মনাথ, কুন্তনাথ, অবনাথ (অরিষ্ঠনেমি), মল্লিনাথ (মল্লী), মনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বভনাথ ও মহাবীর। এদের মূর্তিগুলো সাধারণত কায়োৎসর্গ (সঠান) ভঙ্গিতে বিন্যস্ত থাকে। প্রত্যেকের একটি করে নির্ধারিত লাঞ্ছন ও বাহন থাকে। প্রত্যেক মূর্তির সাথেই একটি কেবল বৃক্ষ বিধৃত করা হয়। তীর্থংকরগণের একক মূর্তি ছাড়াও যুগ্ম মূর্তি (চতুর্বিংশতি পট্ট) থাকে। এছাড়া জৈনগণ বিবিধ পার্শ্বদেবতা, যক্ষ, যক্ষিণী, কেবল গাছ, অষ্টপ্রতিহার্য (স্বর্গীয় বৃক্ষ, সিংহাসন, ছাতা, শিরাশচক্র, পুষ্প প্রস্ফুটন, চামর, বাদ্যযন্ত্র), চতুর্বিংশতিপট্ট (চব্বিশ জন তীথংকরের একত্র সন্নিবেশ), সমবসরণ (তীর্থংকরের বক্তব্য প্রদান মূর্তি), শাসনদেবতা,

রেখাচিত্র – ২২



মূর্তির দেহের বিভিন্ন ভঙ্গি

দিকপাল, নবগ্রহ, ক্ষেত্রপাল, শলক পুরষ (মহামানব) প্রমুখদের মূর্তি তৈরি করত। হিন্দু দেবদেবীগণের মতো এদেরও অসংখ্য রূপ ও নাম রয়েছে। দেবীগণের মধ্যে সরস্বতী, অম্বিকা, বৈবতা, পদ্মাবতী অন্যতম। শালক পুরষগণের মধ্যে বহুবলী অন্যতম। এছাড়া জৈনগণ গণেশসহ আরও কয়েকজন হিন্দু দেবদেবীরও পূজা করে থাকে।

জৈনদের মধ্যে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর নামে দু'টি প্রধান শাখা ছাড়াও তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুন্ড্রবর্ধনীয়া ও দাসীপর্বটিক নামে আরও চারটি উপ-শাখার অস্তিত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় কি ধরনের মূর্তি তৈরি করত সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় নি। আপাতত কেবল এটুকু বলা যায় যে দিগম্বর শাখাভুক্ত মূর্তিগুলো তৈরির ক্ষেত্রে নগ্নতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো। বাংলাদেশে কেবল বরেন্দ্র অঞ্চলেই সর্বাধিক সংখ্যক তীর্থংকর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

মূর্তিতত্ত্ববিদ্যার উপর নির্ভর করে মূর্তি সম্পর্কিত আলোচনা করতে হলে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। (ক) প্রথমেই মূর্তির মুদ্রা প্রসঙ্গ। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের মাধ্যমে (বিশেষ করে হাত, পা ও চোখ) মুদ্রা প্রকাশিত হয়। (খ) এরপর অবস্থানের ভঙ্গি প্রসঙ্গ। সাধারণত মূর্তিগুলোকে দাঁড়ানো, উপবিষ্ট ও শায়িত ইত্যাদি তিন অবস্থানে পাওয়া যায়। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রধান প্রধান ভঙ্গিগুলোর নাম কায়ৎসর্গ (সঠান), দ্বিভঙ্গ (কেবল কোমর একদিকে স্যমান্য বাঁকা)ও ত্রিভঙ্গ (শরীরে দু'টি ভাঁজ পড়বে)। একইভাবে বসা অবস্থারও অনেকগুলো ভঙ্গি হয়, যেমন - ধ্যানাসন, রাজলীলাসন, সুখাসন ইত্যাদি। (গ) দেবত্বনির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই প্রত্যেক দেবতার একটি নির্দিষ্টবাহন থাকে, যেমন — হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুর গরুড় (অর্ধনর ও অর্ধ-পাখি), শিবের নন্দি (বৃষ), ব্রহ্মার হাঁস, সূর্যের অশ্বচালিত রথ, কার্ত্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর ও দুর্গার সিংহ। (ঘ) প্রত্যেক দেবতাই হাতে কতকগুলো বিশেষ আয়ুধ ধারণ করেন। এসব আয়ুধের মধ্যে শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, সূর্যের পদ্ম, কার্ত্তিকের বল্লম, গণেশের মোদক পাত্র, দুর্গার শিবলিঙ্গ ইত্যাদি অন্যতম। তবে এসবের বর্ণনা দেওয়ার সময় মূলত দক্ষিণাবর্ত পদ্ধতি অনুসরণ করাই বিধান। অন্যান্য দু'টি ধর্মের প্রতিটি দেবদেবীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। কেবল জৈনদের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় হলো, লাঞ্ছন (প্রতীকী চিহ্ন) ও কেবল বৃক্ষ।

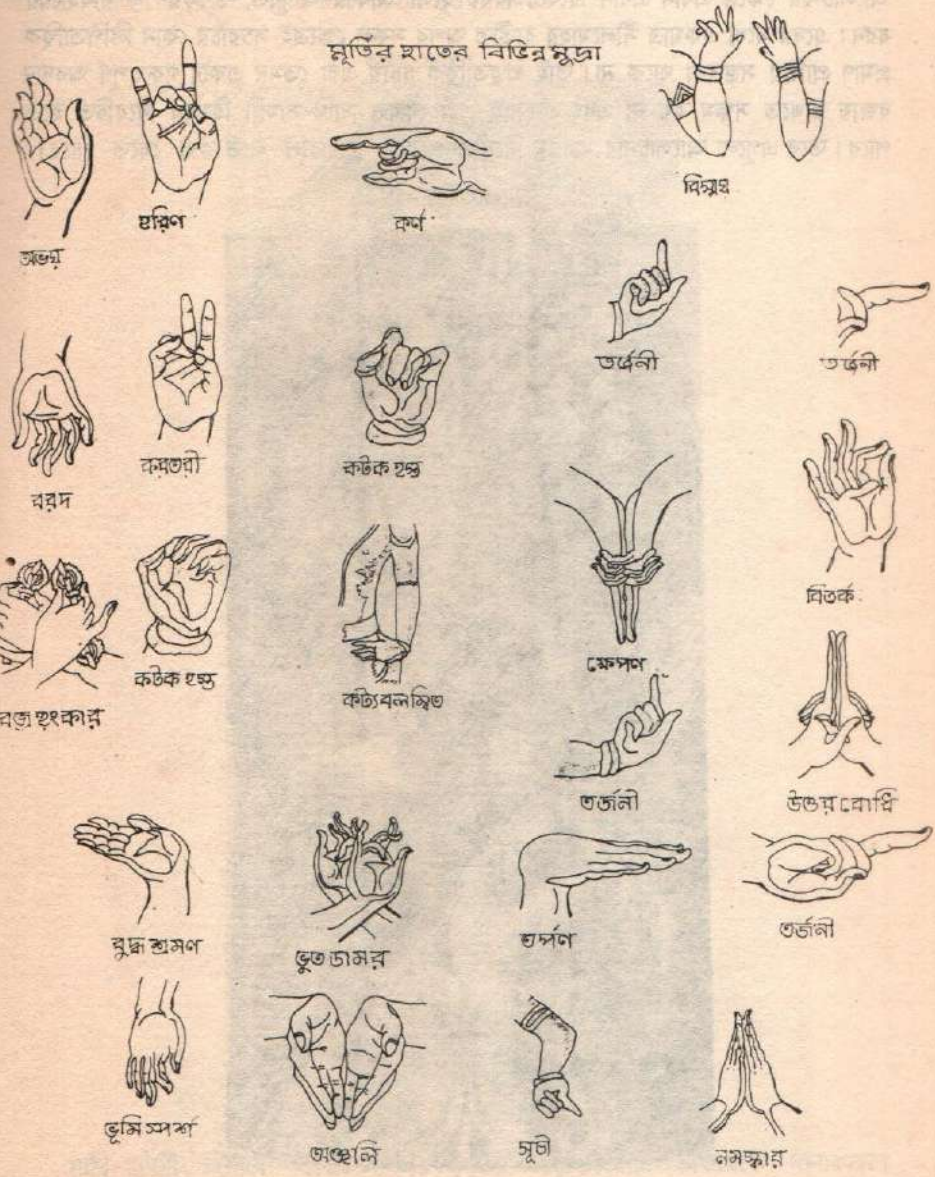
দেবত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা হলো মস্তকের পশ্চাৎভাগে একটি বলয়ের অস্তিত্ব। এর নাম সিরাসচক্র বা জ্যোতির্বলয়। এছাড়া দেবতারা প্রতিষ্ঠিত থাকেন বিশ্বপদ্ম বা মহাপদ্মের উপর। বিশেষ করে বৌদ্ধ মূর্তিগুলোতে গলায় থাকে বলিরেখা ও কানে প্রলম্বিত লতিকা। অনেক ক্ষেত্রে আসনের দু'পাশে ক্ষুদ্রাকার অনুচর বা পার্শ্বদেবতা এবং পূজারীও উপস্থিত থাকে। মূর্তি আলোচনার ক্ষেত্রে এসব খুঁটিনাটি সকল বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

সাথি-প্রত্নবস্তু

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আরও বহু নমুনার প্রত্নবস্তুর সন্ধান লাভ করা যেতে পারে। এসবের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী, অলংকার, জাঁতা, কারিগরী কাজের অস্ত্রপাতি, কৃষি কাজের সরঞ্জাম, কুমারের ঢেলা, বাটখারা, জালের কাঠি, বোতলের

রেখাচিত্র – ২৩

মূর্তির হাতের বিভিন্ন মুদ্রা



ছিপি, দোয়াত, দর্পণ ধারক, নিবেদনযোগ্য দ্রব্যাদি, প্রসাধন নির্বাহ উপকরণ, সীলমোহর, পিষ্টক, রান্নাঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, খেলনা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি অন্যতম। এসবের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো আকার-আকৃতি, উপকরণ ও ব্যবহারের ধরন। এদের মধ্যে একমাত্র সীলমোহর ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রেই সচরাচর কোন লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চায় এরা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান বজায় রাখতে সক্ষম হয় না এবং এজন্যই এরা কেবল সাথি-সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এগুলো আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত পরোক্ষ সূত্রাবলি লাভ করা যেতে পারে।

আলোকচিত্র -১১



উপবিষ্ট গরুড় কাঠের তৈরি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সৌজন্যে

যেমন (ক) যে স্থানে পাওয়া গেল সে স্থানটির প্রকৃতি নির্ণয়, (খ) ব্যবহারকারীগণের জীবন ব্যবস্থার প্যাটার্ণ ও (গ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্র নির্ধারণ।

আলোকচিত্র – ১২



জৈব মূর্তি দিনাজপুরে প্রাপ্ত

সাথি-সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত প্রত্নবস্তুগুলো প্রযুক্তিবিদ্যার দিকথেকে নানাকারণে বৈচিত্র্যময়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এদের উপকরণগুলোও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কারণ কোন কোন সাথি-প্রত্নবস্তু এমন সব দুর্লভ উপাদানে তৈরি হয় যার উৎসস্থল প্রত্নবস্তুটির প্রাপ্তিস্থল

থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে প্রাপ্ত উপরত্ন পাথরে তৈরি পুঁতিগুলোর উদাহরণ দেওয়া যায়। উপরত্ন পাথর তো দূরের কথা সাধারণ শ্রেণীর পাথরগুলোও এদেশে সহজলভ্য নয়। এমতাবস্থায় এ প্রসঙ্গে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত অনুমিতিটি প্রস্তাব করা যেতে পারে। পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড়ের সাথে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় দূরবর্তী রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আর এসব সূত্র ধরেই উপরত্ন পাথরের নিদর্শনগুলো এ অঞ্চলে এসেছিল। এভাবে দেখা যাবে যে, একেবারে প্রত্যক্ষভাবে না হউক, অন্তত পরোক্ষভাবে হলেও সাথি-সামগ্রীগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চায় কিছু না কিছু সহায়তা প্রদান করে থাকে।

আলোকচিত্র – ১৩



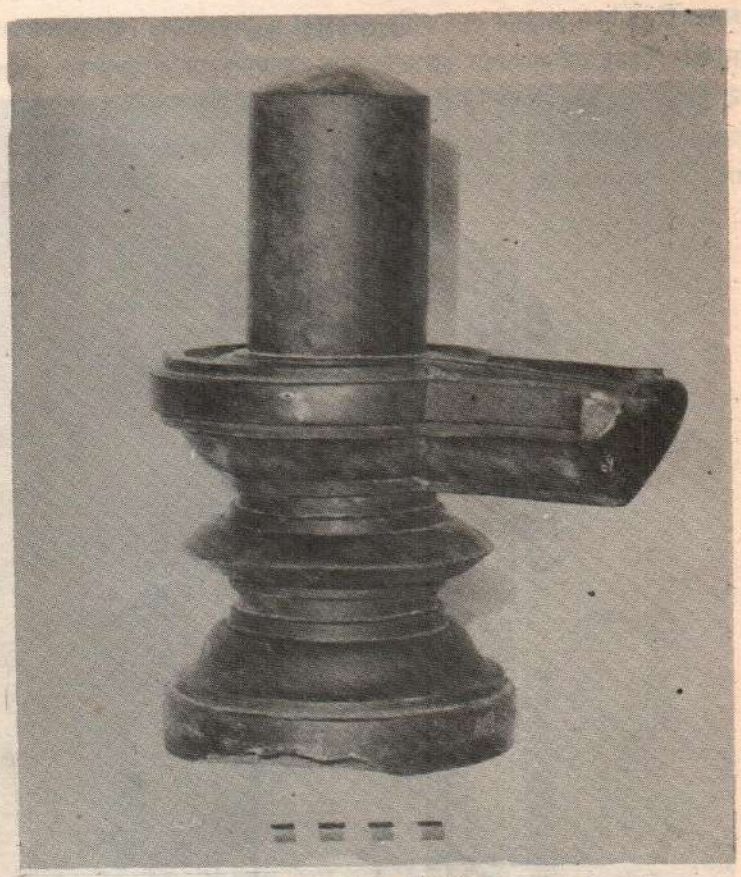
জনার্দন বিষ্ণু আঃ খ্রিঃ নয়-দশ শতক

আলোকচিত্র – ১৪



পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের বুদ্ধ

আলোকচিত্র -১৫



কালো পাথরের শিবলিঙ্গ

৫

ইমারত

বিরূপ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে মানুষ প্রতিটি যুগেই একটি নতুন প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছে। পুরাঐতিহাসিক যুগের এমন একটি নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড। এই যুগান্তর উদ্ভাবনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো মিশর, ইরাক, চিন ও পাকিস্তান-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ইট-পাথরের নির্মিত এসব স্থাপত্যিক নিদর্শনের সময়কাল কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর পিছিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার অব্দ থেকে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড শুরুর প্রমাণ পাওয়া গেছে।[২০] সে যুগে এতদ্‌অঞ্চলের মানুষ জমাটবদ্ধ কাদায় তৈরি ভিটির উপর প্রথমে কাদা ও পরে খাগড়াসহ কাদার দেয়াল তৈরি করে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছিল। এই স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড থেকেই আদি ঐতিহাসিক যুগে ইট-পাথরে তৈরি ইমারত[২১] নির্মিত হতে শুরু করেছিল। ইমারতাদির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ, দুর্গ, সমাধিসৌধ, স্মৃতিসৌধ, বুরুজ, সাঁকো, বাঁধ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি অন্যতম। কারণ এ নমুনার ইমারতাদির মধ্যে নির্মাণ সময়কালের সমসাময়িক মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যা সুস্পষ্ট প্রভাব বজায় রাখে। অধিকন্তু কোন কোন ইমারতে নির্মাতার নাম, সময়কাল, ইমারত নির্মাণের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সংবলিত পরিচিতি ফলক সংস্থাপিত থাকে। আর এই প্রতিটি তথ্যই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ভূমিকা পালন করে। তাই পুরাইতিহাস ও ঐতিহাসিক যুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডে বাস্তুশাস্ত্র > স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড > ইমারত সম্পর্কিত আলোচনার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের দেশে এ যাবৎ যেসব ইমারত আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর সিংহভাগ জুড়ে আছে ধর্মীয় ইমারত। এসব ইমারতের মধ্যে স্তূপ, বিহার, মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ অন্যতম। এছাড়া প্রাসাদ, রাস্তা, সেতু, দীঘি ইত্যাদিও রয়েছে। তবে

---

২০. বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম অধিবসতি আমলে কাদার গাঁথুনির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বিষয়ে সমীকরণ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২১. ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্কলনগুলোতে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডের রীতিনীতি সন্নিবেশিত রয়েছে। এমন দু'টি সঙ্কলনের নাম বাস্তুশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র। বাস্তুশাস্ত্রে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডকে বাস্তুকর্ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসাবে স্থাপত্যিক নিদর্শনাদিকে বাস্তুনিদর্শনও বলা যেতে পারে।

এগুলো সবই ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন। পরবর্তী অংশে এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

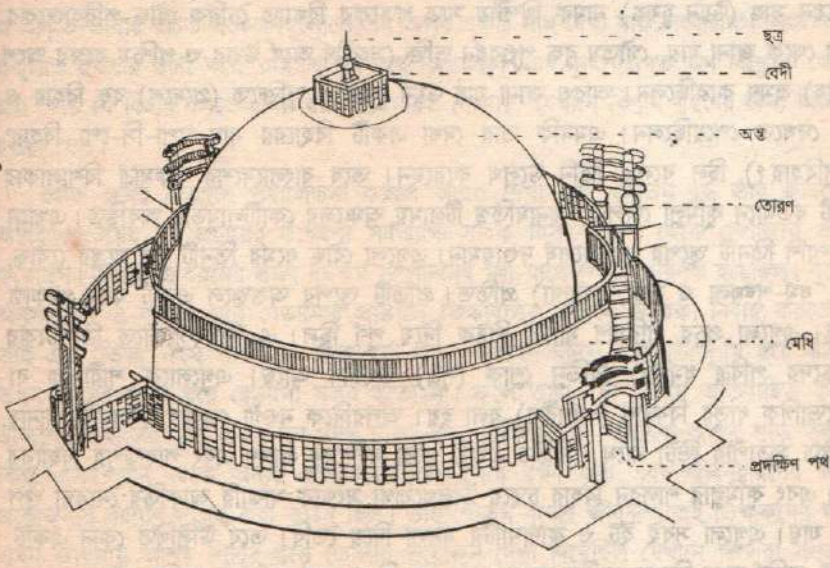
স্তূপ

ভারত উপমহাদেশের ইমারতাদির মধ্যে স্তূপই সর্বাধিক প্রাচীন বলে অনুমিত হয়েছে। তাই স্তূপের আলোচনা দিয়েই ইমারত সম্পর্কিত বক্তব্যের সূচনা করা যুক্তিযুক্ত। স্তূপ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গাদা বা ঢিবি। অবশ্য এ ধরনের ইমারত কখন এবং কি উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলার মতো কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। কেবল এটুকু বলা যায় যে প্রথমদিকে জৈনধর্মে স্তূপ নির্মাণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মেও স্তূপ নির্মাণ স্বীকৃতি লাভ করে। 'মহাপরিনির্বাণসূত্র' নামক সংকলন থেকে জানা যায় যে মহাপরিনির্বাণের (মৃত্যুর) পূর্বে গৌতম বুদ্ধ (সিদ্ধার্থ) তার দেহভস্মের উপর স্তূপ নির্মাণের জন্য পরোক্ষভাবে নিজ অনুগামীদের ইঙ্গিত প্রদান করে গিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর দেহভস্ম সাতটি ভাগে বিভক্ত করে আটটি জনপদের প্রতিনিধিদের কাছে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেহভস্মের প্রতিটি ভাগের উপর প্রতিটি জনপদ একটি করে স্তূপ নির্মাণ করেছিল। এছাড়া গৌতম বুদ্ধের মরদেহের দাহস্থান এবং কয়লার উপরও একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত, এ কারণেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিকল্প হিসাবে স্তূপের পূজা করতে শুরু করেছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজা প্রচলনের পরও এ প্রথা অব্যাহত ছিল।

প্রবাদ আছে যে বুদ্ধের দেহভস্মের উপর নির্মিত আটটি স্তূপের মধ্যে মৌর্য সম্রাট অশোক (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩–২৩২ অব্দ) সাতটি পুনঃউন্মোচিত করেছিলেন এবং এগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত দেহভস্ম পুনঃবিভাজন করে ভারতময় চুরাশি হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রবাদের সত্যনিষ্ঠতা যাচাই করার মতো কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। তবে যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত স্তূপগুলোর আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকৃতির মাটির গাদা বা ঢিবির সাথে তুলনীয় ছিল। এ অংশকে অণ্ড বলা হতো। মৌর্য শাসনামলে স্তূপ তৈরির জন্য প্রধান উপকরণ ছিল ইট। এরপর শুঙ্গ রাজবংশের শাসনামলে (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫–৭৫ অব্দ) স্তূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হয়। শুধু তাই নয়, এ সময় থেকেই স্তূপ স্থাপত্যের অঙ্গ বিন্যাস একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা লাভ করতে শুরু করে। শুঙ্গ শাসনামলে অণ্ডের আকৃতি একটু পরিবর্তন করে একটি আদর্শ অর্ধবৃত্তে পরিণত করা হয়েছিল এবং এর নিচে স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মেধি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া অণ্ডের উপরাংশে আরও একটি ছোট বেদী স্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যবর্তী স্থানে 'ইয়ুস্থি' নামের একটি দণ্ড পুঁতে দেওয়া হতো। ইয়ুস্থিতে উলম্ব ভাবে থরে থরে ক্রম হ্রস্বায়মান আকৃতির চাকতি (ছত্র) সাজিয়ে দেওয়া হতো। এই চাকতি সংবলিত দণ্ডকে ছত্রাবলি বলা হয়। এটা দূর থেকে অনেকটা সুচ্যাগ্র শিখরের মতো দেখাত। এছাড়া মেধির চারদিকে প্রদক্ষিণ করার মতো ঘূর্ণায়মান

পথ অবশিষ্ট রেখে এর প্রান্তসীমা বরাবর অলংকারিক বেড়া জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বেড়া সংবলিত প্রদক্ষিণ পথকে মহাবেদী বলা হয়। বেড়ার চারদিকে চারটি সুদৃশ্য তোরণও তৈরি করা হতো। সময়ের ক্রমানুবর্তিতার সাথে সাথে মেধি ও অণ্ডের উচ্চতাসহ ছত্রাবলিতে চাকতির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মেধির নিচে একটি চুতষ্কোণাকার উন্নীত সমতল স্থান দেখা যেত। এ পর্যন্ত একটি ছত্রাবলির মধ্যে সর্বাধিক তেরোটি চাকতি দেখা গেছে। এর ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকের দিকে নির্মিত স্তূপগুলো দেখতে অনেকটা ক্রমে সরু হয়ে উঠা স্তম্ভের সাথে তুলনীয় হয়ে পড়েছিল।

রেখাচিত্র – ২৪



স্তূপের বিভিন্ন অংশ বিভাজন

অণ্ডের শীর্ষদেশে অবস্থিত বেদীর উপর অথবা অন্তস্তলে একটি ভাণ্ড রাখা হতো। এরমধ্যে গৌতম বুদ্ধ বা অন্যকোন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর দেহভস্ম (সংকারাবশেষ/শারীরিক ধাতু) অথবা কোন ব্যবহৃত বস্তু (পারিভোগিক) সংরক্ষণ করা হতো। যেসব স্তূপে শারীরিক ধাতু সংরক্ষিত থাকত সেসব স্তূপকে 'শারীরিক স্তূপ' এবং যেসব স্তূপের ভাণ্ডে পারিভোগিক বস্তু থাকত সেগুলোকে 'পারিভোগিক স্তূপ' বলা হয়। তৃতীয় ধরনের স্তূপগুলো গৌতম-বুদ্ধের জীবদ্দশার স্মৃতিবিজড়িত প্রসিদ্ধ স্থানগুলোতে নির্মিত হয়েছিল। এ ধরনের স্তূপগুলোর নাম 'নিদ্দেশিক' বা ' উদ্দেশিক'। এছাড়া ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধরা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে ধর্মকর্মের অংশ হিসেবে তীর্থস্থানগুলোতে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী স্তূপ নির্মাণ করতেন। এ ধরনের স্তূপগুলোকে 'নিবেদন স্তূপ বা নৈবেদ্য স্তূপ' বলা হয়।

বাংলাদেশে এ যাবৎ কোন শারীরিক বা পারিভোগিক স্তূপ পাওয়া যায় নি। তবে অনেকের ধারণা, বগুড়া জেলার অধীন শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাসুবিহার গ্রামে একটি 'উদ্দেশিক স্তূপ' ছিল হিউয়েন সাঙ (উয়ন চুয়ঙ) নামক খ্রিস্টীয় সাত শতকের বিখ্যাত চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি (সংকীর্ণ অর্থে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অংশ বিশেষ) ভ্রমণ করেছিলেন। আরও জানা যায় উয়ন চুয়ঙ এ ভুক্তিতে (প্রদেশে) বহু বিহার ও স্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন। এমনকি তার দেখা একটি বিহারের নাম 'পো-সি-পো বিহার' (ভাসুবিহার?) ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে বাংলাদেশের একমাত্র বিশালাকার স্তূপটি বর্তমানে কুমিল্লা জেলার ময়নামতিস্থ টিলাময় অঞ্চলের কোটিলামুড়ায় অবস্থিত। এখানে পাশাপাশি তিনটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দণ্ডায়মান। এগুলো বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি মূল মন্ত্রের (বৌদ্ধ, জ্ঞান, ধর্ম-শৃঙ্খলা ও সংঘ, বৈরাগ্য) প্রতিভূ। প্রতিটি স্তূপের অন্তস্তলে একটি করে প্রকোষ্ঠ আছে। এগুলো প্রচুর পরিমাণ মাটির পিষ্টক দিয়ে পূর্ণ ছিল। এ পিষ্টকগুলোতে ত্রিপিটকের (বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ) বিভিন্ন শ্লোক (সূত্র) উৎকীর্ণ আছে। এগুলোকে শারীরিক বা পারিভোগিক ধাতুর বিকল্প (ধর্মশরীর) বলা হয়। অপরদিকে নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানায় অবস্থিত সত্যপীর ভিটা নামে পরিচিত একটি তারা মন্দিরের প্রাঙ্গণ এবং পাহাড়পুর বিহারের চত্বরে এবং কুমিল্লার শালবন বিহার চত্বরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাঝারি আকৃতির নৈবেদ্য স্তূপ দেখা যায়। এগুলো সবই ইট ও কাদামাটির মসলা দিয়ে তৈরি। তবে উল্লিখিত কোন একটি স্তূপেই মেধির অংশ বিশেষ ব্যতীত অপর কোন স্থাপত্যিক অঙ্গ বর্তমানে অক্ষত নেই।

প্রাচীন বাংলায় হস্তান্তরযোগ্য আকারেও প্রচুর পরিমাণ নৈবেদ্য স্তূপ তৈরি করা হতো। এগুলো তৈরির কাজে সাধারণত ব্রঞ্জ, পাথর ও কাদামাটি ব্যবহৃত হতো। এছাড়া কাদা দিয়ে তৈরি নৈবেদ্য স্তূপগুলো আবার দগ্ধ ও অদগ্ধ উভয় অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। কাদায় তৈরি অদগ্ধ নৈবেদ্য স্তূপের সন্ধান সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে কোটিলামুড়ায়। কুমিল্লা জেলার শালবন বিহার ও আনন্দ বিহার, নওগাঁয়ের পাহাড়পুর বিহার ও বগুড়ার ভাসুবিহার থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার নৈবেদ্য স্তূপ অনাবৃত হয়েছে। ব্রঞ্জ নির্মিত হস্তান্তরযোগ্য নৈবেদ্য স্তূপের সর্বাধিক আকর্ষণীয় সন্ধান সম্প্রতি হয়েছে চট্টগ্রাম জেলার ঝিউড়ি ও নরসিংদি

জেলার আশ্রাফপুর গ্রামে। পাথরে নির্মিত হস্তান্তরযোগ্য নৈবেদ্য স্তূপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যটি বর্তমানে নওগাঁ জেলার পত্নিতলা (নজিপুর) থানার অন্তর্গত যোগীরঘোফা গ্রামের প্রত্নস্থলে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ জাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, মহাস্থানগড় জাদুঘর এবং দিনাজপুর জাদুঘরেও কয়েকটি চমৎকার নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে আদর্শ স্তূপের সবকয়টি বৈশিষ্ট্যই বিধৃত দেখা যায়। তবে এসব নৈবেদ্য স্তূপে মেধির আকৃতি কখনও গোলাকার আবার কখনও চৌকো। অণ্ডের অংশ ঘন্টা এবং ছত্রাবলির অংশ আমলক আকৃতি ধারণ করেছে। তাছাড়া এদের গড়নে লম্বাটে ভাবটা এত বেশি প্রকট যে এগুলোকে কোন অবস্থাতেই খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকের চেয়ে অধিক প্রাচীন বলা যুক্তিযুক্ত হবে না।

বিহার

বৌদ্ধ ধর্মের সাথে জড়িত স্থাপত্যিক নিদর্শনের আলোচনায় স্তূপের পরই বিহারের স্থান। পালি ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত সংকলনগুলোতে এর অপর একটি নাম দেখা যায় 'সংঘারাম'। 'সংঘ' অর্থ একত্রিত হওয়ার স্থান, আর 'রাম' শব্দের অর্থ বিশ্রামস্থল। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে বিহার বলতে এমন ধরনের ইমারত বোঝায়, যেখানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য মিলিত হওয়া যেত।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্বত্যাগী সাধক হিসাবে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন। ক্রমেই এ ধরনের ভ্রমণ ধর্মকর্ম সম্পাদনের মূল মার্গে (পথ) পরিণত হয়েছিল। বুদ্ধের অনুসারীগণ এ ধরনের ঘুরে বেড়ানোর প্রাক্কালে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাই এরা 'ভিক্ষু' নামে পরিচিত। কিন্তু বর্ষা ঋতুর আগমন ঘটলে রাস্তাঘাট দুর্গম হয়ে উঠত। তখন তাদের পক্ষে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হতো না। ফলে তারা বর্ষা মৌসুম অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গুহা অথবা ঘন গাছে ঢাকা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সাময়িক আশ্রয় গড়ে তুলত। কিন্তু এসব স্থান থেকে অন্যত্র প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। তাই গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই ভিক্ষুকদের জন্য এমন জায়গায় আশ্রয় শিবির গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যেখানে ভিক্ষুরা সংঘবদ্ধ হয়ে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ, অন্যত্র প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ, পারস্পরিক ধর্মীয় আলোচনা, নিভৃতে ধ্যান সম্পাদন ইত্যাদি সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারতেন। এসব প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই বিহারে অবস্থিত রাজগৃহ নগরীর এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী গৌতম-বুদ্ধের নিকট সংঘারাম স্থাপনের উপযোগী ষাটটি গুহা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেছিলেন। এভাবেই গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশা থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য সংঘারাম বা বিহার নির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়েছিল। তবে মজার ব্যাপার এই যে জৈনদের মধ্যেও বিহার নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে রাজকীয় অথবা ধনাঢ্যগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহার নির্মিত হতো। এ বিহারগুলো শিলোৎখাত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের বিহার সাধারণত একটি হলঘরকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হতো। এগুলোর ভূমি-পরিকল্পনাও বিভিন্ন রকমের ছিল ; যেমন- বর্গাকার, আয়তাকার ও নলাকার। নলাকার হলঘরের ক্ষেত্রে নৌকার ছৈ-এর মতো ছাউনি দিয়ে ছাদ ঢেকে দেওয়া হতো। নলাকার হলঘরের একটি প্রান্তকে অর্ধ-গোলাকার রূপ দিয়ে ওটার মধ্যে নিবেদন স্তূপ বা বুদ্ধমূর্তি সংরক্ষণ করা হতো। এ ধরনের ভূমি-পরিকল্পনা অ্যাপসাইডাল (apsidal) নামে পরিচিত। এ অংশের ছাউনিও অনেকাংশে অর্ধ-নলাকার আকৃতিতে নির্মিত হতো। নলাকার অংশের অপর প্রান্তটি প্রবেশদ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হতো। নলাকার হলঘরের দু'পাশের বাহুগুলো বাইরের দিকে প্রসারিত করে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য সারিবদ্ধ সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ তৈরি করা হতো। এ ধরনের বিহার খ্রিস্টীয় তিন শতক থেকে হিনযান বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত হতে শুরু করেছিল। ভারতের সুধমা, কর্ণচপড়া, লোমশঋষি, নগারযোনীকণ্ডা প্রভৃতি স্থানের পাহাড়ের গুহাগুলোতে এ ধরনের বিহার দেখা যায়। পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধদের দ্বারা এসব বিহারের 'চৈত্যগৃহে' নৈবেদ্য স্তূপ গৌতম বুদ্ধের মূর্তি অথবা পবিত্র ধাতু সংরক্ষণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। এছাড়া সম্মুখভাগ বিচিত্র কারুকার্য দিয়ে শোভিত করে তোলা হতো।

শিলোৎখাত বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে আরও একটি ভূমি-পরিকল্পনা খ্রিস্টপূর্ব দুই শতক থেকে হিনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় অনুসরণ করে আসছিল। এ ধরনের বিহারের ক্ষেত্রে বর্গাকার অথবা আয়তাকারে একটি কেন্দ্রীয় হলঘর নির্মিত হতো। এদের ছাদ সমতল ছাউনি দিয়ে ঢাকা থাকত। অন্যদিকে প্রবেশপথের সম্মুখভাগে একটি ছাউনি যুক্ত প্রবেশ-মঞ্চও তৈরি করা হতো। হলঘরের অপর তিন অথবা দুই দিকে সারিবদ্ধ সংকীর্ণ ভিক্ষুকক্ষ তৈরি হতো। হলঘরে ভিক্ষুরা পারস্পরিক ধর্মীয় আলোচনার জন্য সমবেত হতো এবং ভিক্ষুকক্ষগুলো ভিক্ষুদের বিশ্রাম ও ধ্যান সমাপনের জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রতিটি ভিক্ষুকক্ষ একটি দরজা দিয়ে হলঘরের দিকে উন্মুক্ত থাকত। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে এ ধরনের বিহার নির্মাণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তবে সবচেয়ে আদর্শ নিদর্শনটি মহারাষ্ট্রের পুনা জেলার নিকটবর্তী পশ্চিমঘাটের ভাজ এলাকায় অবস্থিত। উপরে আলোচিত বিহারগুলোর মূল পরিকল্পনায় মহাযানী-বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিছু নতুন সংযোজনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছিল ; যেমন-সম্মুখভাগ এবং চৈত্যগৃহের অভ্যন্তর ভাগ নানা অলংকরণ দিয়ে সুশোভিত করে তোলা হলো। কোন কোন ক্ষেত্রে হলঘরের চারদিকে সারিবদ্ধ থাম থাকত। এ সারিবদ্ধ থাম ও ভিক্ষুকক্ষগুলোর অন্তবর্তী স্থানে একটি টানা বারান্দার স্থান সংকুলান করা হয়েছিল। একইধরনের থামের সারি হলঘরের সম্মুখভাগের বারান্দার ক্ষেত্রেও দেখা যেত। এ যাবৎ মহারাষ্ট্রের অজন্তায় এ ধরনের আটাশটি বিহার ও চারটি চৈত্যগৃহের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে আদর্শ নিদর্শনটি অজন্তার ১ নং গুহায় অবস্থিত। এছাড়া ইলোরার গুহা নং ৫ এবং ঔরাঙ্গাবাদের গুহা নং ৩-এ এমন একটি বিহারের নিদর্শন দেখা যায়। ধীরে ধীরে হলঘরের আকৃতিবৃদ্ধি পেয়ে চত্বরের আকৃতি ধারণ করতে থাকে এবং এরসাথে পাল্লা দিয়ে

হলঘরের চারদিকে থামসহ ভিক্ষুকক্ষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পরিকল্পনায় নির্মিত বিহারগুলো খ্রিস্টীয় ছয় শতক থেকে নির্মিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু পাথরের পাহাড় নেই সেহেতু এদেশে এ জাতীয় বিহারেরও অস্তিত্ব নেই।

বাংলাদেশে যেহেতু পাথর সুলভ নয় সেহেতু শিলোৎখাত বিহারের অস্তিত্বও নেই। তবে দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ঢাকা ও কুমিল্লায় বেশ কয়টি ইঁট নির্মিত বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম অংশে এদের বর্ণনা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, আবিষ্কৃত বিহারগুলো ব্যতীত চট্টগ্রামের লিউড়ি এবং নওগাঁয়ের জগদলে আরও দু'টি বিহার অন্তরীণ রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। এ যাবৎ আবিষ্কৃত বিহারগুলোর পরিমাপ বিভিন্ন রকম এবং এদের মধ্যে নওগাঁয়ের সোমপুর, মহাবিহারের আকৃতি সবচেয়ে বড়।

মন্দির

বাস্তুশাস্ত্রে দেবালয় বোঝাতে মন্দির শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষপর্বে রচিত শিল্পশাস্ত্রে মন্দিরের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যকে নরদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, দেহের যেমন প্রাণ থাকা প্রয়োজন তেমনি মন্দিরে দেবতা থাকা প্রয়োজন।[২২] মন্দির হচ্ছে দেহ এবং দেবতা হচ্ছে তার প্রাণ। অর্থাৎ দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মন্দির নির্মিত হতো। আরও সহজ করে বললে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মন্দির হচ্ছে এমন একটি ভবন যার মধ্যে দেবতার প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হয়। ভারতের তিনটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু) মধ্যে মন্দির তৈরি করার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে টিকে থাকা নিদর্শনগুলোর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু মন্দির। তাই হিন্দু মন্দিরের উপর নির্ভর করেই আমাদের পরবর্তী পর্যালোচনা।

মানুষের দেহের মতো মন্দিরেরও তিনটি মূল অংশ আছে। পায়ের অংশ মঞ্চ (জগতি), কটি থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশ গর্ভগৃহ (দেবাধার), কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত অংশ মস্তক (শিখর)। মস্তকে চুলের প্রতীক হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয় স্তূপি। তবে মন্দিরের এ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের আজও জ্ঞাত নয়।

হরপ্পা সভ্যতার স্মৃতির ধারক কোন প্রত্নস্থলেই এ যাবৎ এমন কোন স্থাপত্যিক নিদর্শন আবিস্কৃত হয়নি যাকে স্পষ্টভাবে মন্দির হিসাবে বিবেচনা করা যায়। বেদেও মন্দির সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নেই। তবে উচ্চ-গাংগেও উপত্যকায় প্রাপ্ত কয়েকটি স্থাপত্যিক নিদর্শন থেকে অনুমিত হয়েছে যে মন্দির স্থাপত্য উদ্ভবের একেবারে গোড়ার দিকে মন্দির ছিল একটি উঁচু মঞ্চের মতো স্থান, এর নাম 'থান'। খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকের দিকে এ ধরনের থানের অস্তিত্ব ছিল। এগুলোকে অনেকে মেগালিথিক দলম্যানের (Megalithic dolman) উত্তরসূরী বলেই মনে করেন। তবে ঠিক কবে থেকে মন্দির থানের আকৃতি ছেড়ে ইমারতের রূপ ধারণ

---

২২. মন্দির তৈরির পর পর মন্দিরে যে দেববিগ্রহ স্থাপন করা হয় বাস্তুশাস্ত্রে একে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হিসাবে উল্লেখ করা আছে।

করেছিল তাও সঠিক ভাবে বলা কঠিন। অতি-সম্প্রতি মথুরায় প্রাপ্ত চারটি প্যানেলে বিধৃত নতোন্নত নকশার দৃশ্যপটের উপর নির্ভর করে জানা গেছে, কুশান শাসনামলে (আঃ খ্রিস্টীয় এক-দুই শতক) মন্দিরের স্থাপত্যিক কাঠামো মোটামুটি একটা সাধারণ বিন্যাস অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ দু'টি ধাপের অন্তবর্তী সময়ে মন্দিরের স্থাপত্যিক বিন্যাসের স্বরূপটি কেমন ছিল।

আলোকচিত্র – ১৬



নহবতখানা, নীমতলি, ঢাকা

খ্রিস্টপূর্ব দুই শতক থেকে খ্রিস্টীয় এক-দুই শতকের মাঝামাঝি সময়ের প্রথম দিকে থানের তিন পাশে কাঠ বা ইঁট দিয়ে তৈরি অনুচ্ছ বেড়া সংযোজনের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে এ বেড়ার উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের থান এমন একটা আকার ধারণ করেছিল যা দেখতে অনেকটা নলাকার অথবা গোলাকার ছিল। এর কোন ছাদ ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই একটি দিক বাইরের দিকে উন্মুক্ত থাকত। নলাকার থানের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রান্তের বিপরীত দিকের প্রান্ত অর্ধ-গোলাকারে তৈরি হতো। এ অংশেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকত। উচ্চ-গাংগেয় উপত্যকায় এ ধরনের থানের কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে

এ অংশের উপর সমতল বিশিষ্ট ছাদ তৈরি হতে লাগল। সাঁচী, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের মন্দির দেখা যায়। এভাবে থান শেষপর্যন্ত ইমারতের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। এ পর্যায়ের আর এক বৈশিষ্ট্য হলো, মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে কেবল ইঁট ও পাথরের ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, এসব মন্দিরের সামনে প্রবেশ পথের মুখে একটি থাম সংবলিত বারান্দাও সংযোজিত হয়েছিল। মন্দিরের দেয়ালের বহিরাবরণ যদিও নিরাভরণ ছিল তথাপি এর বারান্দার অংশ অলংকৃত ছিল। তৃতীয়ত, এ পর্যায়ে মন্দিরের ভূমি-পরিকল্পনা চতুর্ভূজাকার রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

আলোকচিত্র – ১৭



দুআনী সরস্বতী মন্দির, পশ্চিম দিক থেকে ধারণকৃত দৃশ্য, দেওপাড়া, নেত্রকোণা

আলোকচিত্র – ১৮



বগুড়া শহরস্থ জৈন দেরাসোরহ

গুপ্ত শাসনামলে সমতল ছাদ বিশিষ্ট চতুর্ভুজাকার মন্দিরের পাশাপাশি শিখর সংবলিত মন্দিরও বিকাশ লাভ করেছিল। তবে এ ধরনের মন্দির স্থাপত্য উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী জেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করে চরম উৎকর্ষতা লাভে সমর্থ হয়েছিল। এছাড়া কোনরকের সূর্য মন্দির এবং খাজুরাহের মন্দিরগুলো উল্লেখযোগ্য। এসব মন্দিরের বেশিরভাগই খ্রিস্টীয় সাত থেকে বার শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

ছাদ নির্মাণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মন্দিরের স্থাপত্যিক বিন্যাসকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে ; যথা–উলস্তম এবং গপ। প্রথম ধারাটির অনুসরণে নির্মিত মন্দিরে একটি মাত্র বর্গাকার কক্ষ ছিল এবং এর উপরাংশ সমতল বিশিষ্ট ছাদ দিয়ে ঢাকা থাকত। দ্বিতীয় ধারার অনুসরণে নির্মিত মন্দিরগুলোরও একটি মাত্র কক্ষ ছিল। তবে এদের উপরাংশে ক্রম–হ্রস্বতা প্রাপ্ত কয়েকটি ধাপ সংবলিত একটি অধিন্যস্ত অট্টালক বসিয়ে দেওয়া হতো। এ ধারায় নির্মিত চূড়াগুলোর আর একটি নাম 'ভদ্র'। এ ধরনের মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন গুজরাটের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে দেখা যায়। আর এগুলোই হলো শিখর মন্দিরের পূর্বসূরী।

আদি–ঐতিহাসিক পর্যায়ের একেবারে শেষপর্ব থেকে শিখর মন্দির এককভাবে নির্মিত হতে শুরু করেছিল। আর এপর্ব শেষ হতে না হতেই মন্দির নির্মাণের এ ধারাটি উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিস্তৃততর ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে শিখরের আকৃতি অঞ্চল ভেদে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল। বিবিধ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যময় শিখরগুলোর মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য। একটির নাম রেখ বা শিখর দেউল ও দ্বিতীয়টি 'খাক্কর'।

রেখ–শিখর দেখতে লম্বা। এটা অত্যন্ত ধীর বিন্যাসে উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে সর্বোচ্চ শীর্ষদেশের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ ভেতরের দিকে বক্রতা অর্জন করে। দ্বিতীয়ত, এ শিখরের গায়ে আনুভূমিক শৈল্পিক রেখা থরে থরে সাজানো থাকে। এর চূড়ায় বসানো থাকে আমলক ও সর্বোপরি স্তূপি। এ ধরনের শিখর সমৃদ্ধ মন্দির 'রেখ দেউল' নামে পরিচিত। উত্তর ভারত, উড়িষ্যা এবং বিহার অঞ্চলেই সর্বাধিক সংখ্যক রেখ–দেউলের অস্তিত্ব দেখা যায়। রেখ–শিখরের ধাঁচে নির্মিত আর এক ধরনের শিখর দেখা যায়। এর নাম পীড়।* এ ক্ষেত্রে শিখরটি দ্রুত বিন্যাসে শীর্ণ হয়ে উপরের দিকে ধাবিত হয় এবং হঠাৎ করে সমতল শীর্ষে সমাপ্ত হয়। তবে এর উচ্চতা রেখ–শিখরের তুলনায় যথেষ্ট কম। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষদেশে পর পর আমলক ও স্তূপি থাকে। অন্যদিকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে উল্টানো নৌকার পৃষ্ঠদেশের মতো শিখর তৈরি হতো। এর উপর লম্বালম্বি ভাবে এক সারি ছোট গম্বুজ সাজান থাকে। এ ধরনের শিখর সংবলিত মন্দির 'খাক্কর দেউল' নামে পরিচিত।

উড়িষ্যার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিটি মন্দিরকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রতিটি অংশ এক একটি স্বতন্ত্র এককক্ষ বিশিষ্ট ইমারত। এরা পরস্পর একে অপরের গা ঘেঁষে সারিবদ্ধ ভাবে নির্মিত হতো। সারিটি শুরুর প্রান্ত ভাগে যে ইমারতটি থাকে সেটার নাম 'শ্রীমন্দির'। এর সামনে যথাক্রমে থাকে জগমন্দির, নটমন্দির ও ভোগমন্দির। শ্রীমন্দিরের চূড়ায় থাকে রেখ শিখর এবং অপর মন্দিরগুলোর উপর থাকে ভদ্রশিখর।[২৩] শ্রীমন্দিরের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি এবং অপর মন্দিরগুলো পর পর খর্বাকৃতি আকারে সম্মুখ ভাগে সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে। এছাড়া শ্রীমন্দির ও জগমন্দির একটি অপ্রশস্ত কিন্তু অলঙ্কৃত বারান্দা দিয়ে পরস্পর যুক্ত। শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহটি এমনভাবে নির্মিত হয় যে এরমধ্যে আলো–আঁধারের খেলায় পূর্ণ এক ঐন্দ্রজালিক

২৩. পীড় দেউলের অপর নাম।

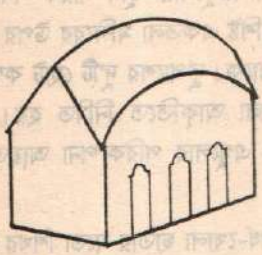
আবহ বিদ্যমান থাকে।

বাংলাদেশে উল্লিখিত ধরনের কোন মন্দির কখনও নির্মিত হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে নিয়মিত খননের ফলে যে আয়তাকার ইমারতের ভিত্তি অনাবৃত হয়েছিল, তা গুপ্ত শাসনামলের ছাদবিশিষ্ট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলেই অনুমিত হয়েছে। এরপর আসে মহাস্থানগড়ের উত্তর-পূর্ব কোণের অদূরে অবস্থিত গোবিন্দ ভিটায় অনাবৃত মন্দিরের প্রসংগ। এখানে দু'টি নির্মাণ যুগের দু'টি মন্দির পাওয়া গেছে। এগুলো খ্রিস্টীয় সাত-দশ শতকের মধ্যে তৈরি। পূর্ববর্তীটি চতুষ্কোণ আকৃতির। দ্বিতীয়টি বহুকক্ষ বিশিষ্ট মঞ্চাকার জগতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির কাঠামো। প্রায় একই জাতীয় অপর একটি মন্দির মহাস্থান সংলগ্ন গোকুল গ্রামেও ছিল। অপর দিকে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছাদের ধরন কেমন ছিল তা আমাদের জানা নেই, তবে এটা যে ক্রশাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল তা একপ্রকার নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উপরের দিকে ধাবিত এ মন্দিরের কেন্দ্রে একটি বর্গাকার নির্মিত অপ্রশস্ত কিন্তু সুগভীর ফাঁপা অংশ আছে। এর চারদিকের প্রতিটি প্রশস্ত দেয়ালের বিপরীত দিকে একটি করে বারান্দাসহ মণ্ডপ আছে। এর ফলে মন্দিরটি চতুর্মুখ বিন্যাস লাভ করেছে। বাস্তুশাস্ত্রে মন্দির নির্মাণের এ ধারাটিকে 'সর্বোতভদ্র' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে উপমহাদেশের আর কোথাও (লালমাই-ময়নামতি অঞ্চল ব্যতীত) এ ধরনের মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। এ প্রসংগে আরও উল্লেখ্য, চতুর্মুখ ধরনের মন্দির জৈনধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিকটেই অধিক সমাদৃত ছিল। জৈন মন্দিরকে 'দেরাসোরহ' বলা হয়। গোকুল, গোবিন্দভিটা ও যশোরের ভারতভয়না এবং পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের কাঠামো দেখে আপাতত আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বাংলাদেশে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল মন্দির নির্মাণ রীতি প্রচলিত ছিল।

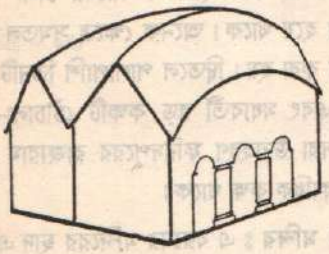
মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়ের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি (১৯৪৭ সাল) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্মিত বহু মন্দির এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আংশিক অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। এগুলোর শিখর এবং ছাদের বিন্যাস পর্যালোচনা করলে আরও কয়েকটি বিশেষ ধারার অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ডেভিড জে, মেক্কাচন বিশদ গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মন্দিরগুলোকে নিচের প্রধান প্রধান শ্রেণী-বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

চালা-বাংলা মন্দির ঃ চালা পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরের মধ্যে বাংলাদেশের চির পরিচিত কুঁড়ে ঘরের ছাউনি নির্মাণ রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই চালা-শিখর সংবলিত মন্দিরের অপর একটি নাম বাংলা মন্দির। চালার আকৃতির উপর নির্ভর করে আবার মন্দিরগুলোকে দোচালা-একবাংলা এবং চারবাংলা-একবাংলা হিসাবেও বিভক্ত করা হয়। এগুলোর প্রতিটি সাধারণত এককক্ষ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অন্যদিকে যখন দু'টি দোচালা-একবাংলাকে একটির সামনে অপরটি সংলগ্নভাবে বিন্যস্ত করা হয় তখন এর নাম হয় 'জোড়বাংলা'। এ ধরনের মন্দির সাধারণত দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয়। আবার একটি চারবাংলা-একবাংলা শিখরের উপর অপেক্ষাকৃত ছোট

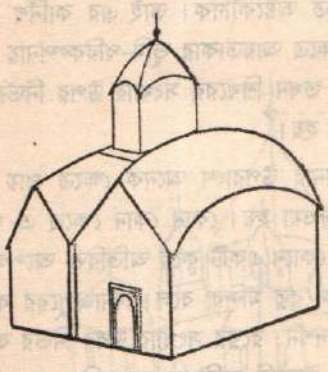
রেখাচিত্র – ২৫



দোচালা



জোড়বাংলা



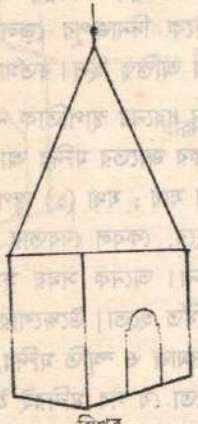
চারচালা সমেত জোড়বাংলা



চারচালা



আটচালা



শিখর

বাংলাদেশের কয়েক প্রকারের মন্দির

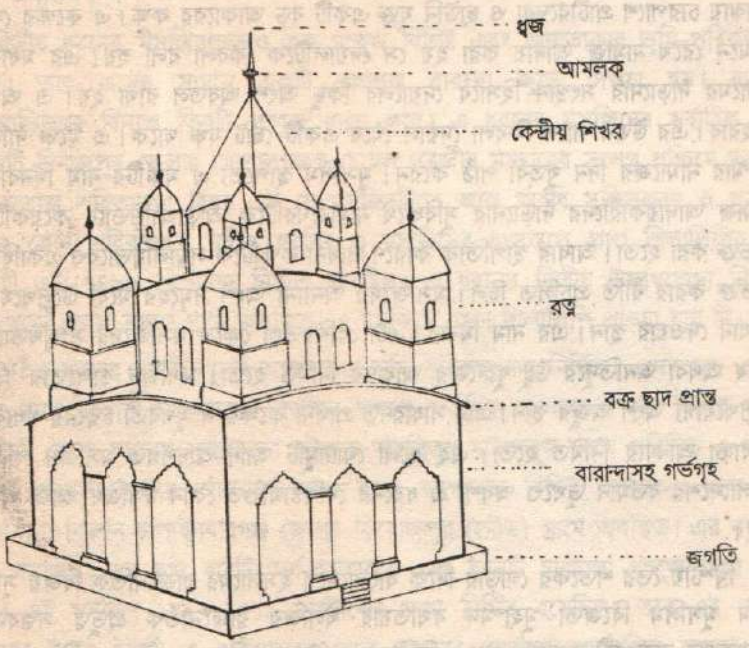
আকারের আর একটি চারবাংলা-একবাংলা তৈরি করে আটচালা-একবাংলা রূপ দেওয়া হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে আটচালার উপর আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট চারচালা বসিয়ে বারচালা-একবাংলা তৈরি করা হয়। এ ধরনের চালা-বাংলা মন্দিরগুলোর ভূমি-পরিকল্পনা স্বভাবতই আয়তাকার হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একতলা মন্দিরের উপর আর একটি তালা তৈরি করা হয়। দ্বিতলে পাশাপাশি তিনটি কক্ষ থাকে। দু'পাশের দু'টি ছোট কক্ষ দোচালা-একবাংলা এবং মধ্যবর্তী বড় কক্ষটি চৌচালা-একবাংলা আকৃতিতে নির্মিত হয়। এ ধরনের মন্দিরের সেরা উদাহরণ ফরিদপুরের রাজারাম মন্দির। এগুলোর পরিকল্পনা আয়তাকার এবং এরমধ্যে একাধিক কক্ষ থাকে।

শিখর মন্দির ঃ এ ধরনের মন্দিরের ছাদ একটি অর্ধ-খোলা ছাতার মতো শিখর দিয়ে ঢাকা থাকে। এ শিখর অত্যন্ত উচু এবং এটা স্তূপি দণ্ডের সূচাগ্র বিন্যাসের সাথে মিলিত হয়ে ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে যায়। এর ভূমি-পরিকল্পনা সাধারণত অষ্টকৌণিক। তাই এর কার্নিশ আটটি ধনুকের মতো বাঁকা অংশে বিভক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরের উপর একাধিক শিখর বসিয়ে দেওয়া হয়। তখন শিখরের সংখ্যার উপর নির্ভর করে 'পঞ্চ শিখর', 'নবশিখর' ইত্যাদি নামকরণ আরোপিত হয়।

রত্ন মন্দির ঃ মূল আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনার উপরাংশ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অন্ড আকারে নির্মিত একটি বড় অট্টালক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি বড় অন্ডকে কেন্দ্র করে ইমারতের প্রতিতলের কোণে একটি করে অতিরিক্ত অপেক্ষাকৃত ছোট অন্ড (রত্ন) থাকতে পারে। এ ধরনের মন্দিরকে 'রত্ন মন্দির' বলে। দিনাজপুরের কান্তজী মন্দির ও কুমিল্লার সতের রত্নমন্দির এর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। রত্নের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এ ধরনের মন্দিরগুলো 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'সতেরো রত্ন' ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত হয়। চলতি শতকের গোড়ার দিকে দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ গ্রামে এ ধরনের দু'টি মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে মন্দির দু'টি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যিক নমুনাগুলো পরস্পর একত্রিত হয়ে বঙ্গ উড়িষ্যা ভূখণ্ডে আরও কয়েকটি শংকর জাতের মন্দির আকৃতির জন্ম দিয়েছিল। এই আকৃতিগুলোকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা (১) স্তূপ শীর্ষ পীড় দেউল (২) এবং শিখর শীর্ষ পীড় দেউল। তবে লক্ষ রাখতে হবে, কেবল দেবতার মূর্তি স্থাপন করে পূজা প্রদানের জন্যই বাংলাদেশে মন্দির তৈরি হতো না। অনেক সময় সমাধি সংরক্ষণ, বিবিধ ধর্মীয় উৎসব পালন ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও মন্দির নির্মিত হতো। উদ্দেশ্যের ভিন্নতার জন্য এসব মন্দির বিভিন্ন নামে পরিচিত হয় ; যেমন —মঠ, সমাজ ও স্মৃতি মন্দির, দোলমঞ্চ, তুলসী মঞ্চ ইত্যাদি। তবে আরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো যে সব মন্দিরই ইঁট ও চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত। অনেকসময় এগুলো পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে সজ্জিত করা হতো। এসব ফলকে দেবদেবী ছাড়াও জ্যামিতিক, ফুলফল, জীবজন্তু মূল্যবান দ্রব্যাদি, লতাপাতা ইত্যাদি মোটিফসহ মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য বিধৃত করা হতো। এমন কি

রেখাচিত্র – ২৬



রত্নমন্দিরের বিভিন্ন অংশ বিভাজন

সমকালীন জীবনযাত্রার বিভিন্ন চিত্রও তুলে ধরা হতো। এ ধরনের মন্দিরের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ফরিদপুরের রাজারাম মন্দির, নেত্রকোনার সরস্বতী মন্দির ও পুটিয়ার পাঁচ আনী জমিদার বাড়ির কয়েকটি মন্দির।

মসজিদ

মুসলিম জাহান ও মসজিদ এ দু'টি শব্দ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ মুসলমানরা যেখানেই পৌঁছেছে প্রথমেই সেখানে মসজিদ তৈরি করেছে। মসজিদ বলতে যদিও প্রাথমিকভাবে নামাজের স্থান বোঝায় তথাপি প্রকৃত অর্থে এটা ছিল ইসলামের সকল আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়-রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কার্যালয়। এজন্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগে একটি মসজিদের তিনটি মূল অংশ ছিল ; যথা— জুল্লাহ্ (নামাজ ঘর), সাহন (চত্বর) এবং রিওয়াক (চারদিকের ছাউনি যুক্ত বারান্দা)। এসবের মধ্যে নামাজঘর বলতে বোঝায় চারপাশে প্রাচীরঘেরা ও ছাউনি যুক্ত একটি বড় আকারের কক্ষ। এ কক্ষের যে দেয়ালটি সামনে রেখে নামাজ আদায় করা হয় সে দেয়ালটিকে কিবলা বলা হয়। এর মধ্যবর্তী স্থানে ইমামের দাঁড়ানোর সংস্থান হিসাবে দেয়ালের কিছু অংশ অবতল রাখা হয়। এ অংশের নাম মিহরাব। এর উত্তর পাশে কিবলা দেয়াল ঘেঁষে একটি ছোট মঞ্চ থাকে। এ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইমাম জুম্মার নামাজের দিন খুতবা পাঠ করেন। মুসলিম স্থাপত্যে এ মঞ্চটির নাম মিনবার। এছাড়া নামাজ আদায়কারীদের দাঁড়ানোর সুবিধার্থে নামাজঘরটিকে আড়াআড়িভাবে কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করা হতো। আবার স্থাপত্যিক কারণে প্রার্থনা কক্ষটিকে লম্বালম্বিভাবেও একাধিক সারিতে বিভক্ত করার রীতি প্রচলিত ছিল। মসজিদের অন্যান্য অংশ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আযান দেওয়ার স্থান। এর নাম মিনার। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মসজিদের সম্মুখভাগের কোণ ঘেঁষে অথবা অনতিদূরে উঁচু বুরুজের আকারে নির্মিত হতো। মসজিদ স্থাপত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অজুর স্থান। এটা সাধারণত প্রার্থনা কক্ষের সম্মুখবর্তী চত্বরের মধ্যবর্তী স্থানে চৌবাচ্চা আকারে নির্মিত হতো। এই হলো মোটামুটি আদি-আদর্শগত মসজিদ পরিকল্পনা। বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডে অবশ্য এ ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন মসজিদ আজ আর অক্ষত নেই।

খ্রিস্টীয় তের শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় সূচিত হয়। প্রথম মুসলিম বিজেতা মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির রাজনৈতিক প্রভুত্ব সম্ভবত বরেন্দ্র (দিনাজপুর-রাজশাহী-বগুড়া) এবং মিথিলার (উত্তর বিহার) উপর বিস্তৃত ছিল। এ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল গৌড়-লক্ষনৌতি। এটা ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী চাপাইনবাবগঞ্জ ও মালদা জেলার সংগম স্থলে অবস্থিত ছিল। এরপর অনধিক এক শতাব্দির মধ্যে গোটা বাংলাদেশটাই মুসলমান শাসকদের করতলগত হয়ে পড়ার পর এদেশে ধীরে ধীরে বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী অংশে এদের লোকজ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডে যে সব মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো মূলত

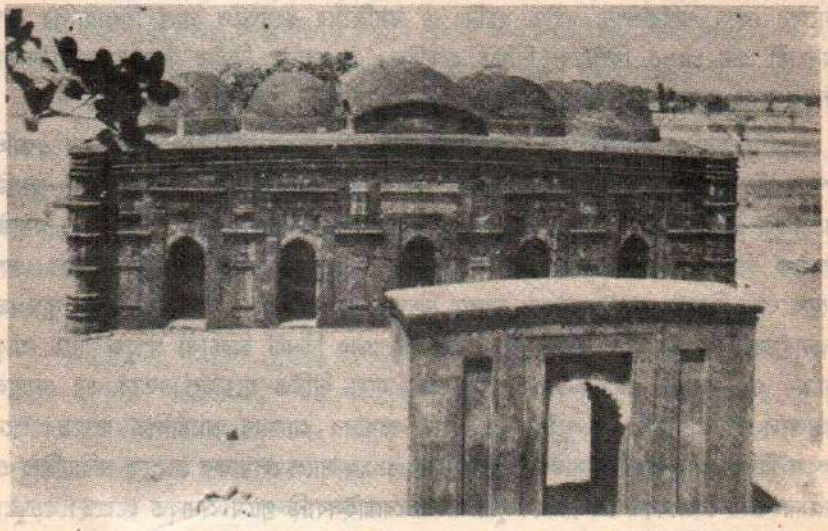
বিশিষ্ট এবং এগুলোতে কেবল জুল্লাহ অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ ধরনের মসজিদগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের মসজিদগুলো সবচেয়ে প্রাচীন। এদের ভূমি-পরিকল্পনা বর্গাকার এবং প্রতিটির ছাদ একটি মাত্র গম্বুজ ধারণ করে। এগুলো সাধারণত কোন ব্যা বা আইলে বিভক্ত থাকে না। এদের মিহরাবের সংখ্যা এক অথবা একাধিক হতে পারে। এ ধরনের মসজিদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ঢাকা শহরে অবস্থিত বিনত বিবির মসজিদ ও বিবি বেগনীর মসজিদ এবং নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত গোয়ালদী মসজিদ। বিনত বিবির মসজিদটি এর শিলালিপি অনুযায়ী ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণ ইঁট ও কাদা দিয়ে নির্মিত। তবে মসজিদের মূল বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার অধীন সোনারগাঁও থানার গোয়ালদি মসজিদ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাণ কাজে ইঁট ও পাথর যুগপৎভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মাণ কাজে ইঁট ও পাথরের এ যুগপৎ ব্যবহারকে বাংলার 'ইঁট-পাথর রীতি-বৈশিষ্ট্য' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের দেশজ স্থাপত্য রীতির অন্যতম দিক।

দ্বিতীয় ধরনের মসজিদগুলোও এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত। তবে এদের সামনে একটি অপ্রশস্ত বারান্দা জুড়ে দেওয়া হয়। বারান্দাটি আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত তিনটি গম্বুজ ধারণ করে। এ ধরনের মসজিদের সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শনটি দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জস্থ চেহেল গত্রজীর মাজারের সংলগ্ন পশ্চিমে অবস্থিত। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে মসজিদটিতে আজ অবধি সুস্থিতকরণ ও পুনরুদ্ধার কাজের কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। এ মসজিদের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী এটা ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ ধরনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নিদর্শনটি দিনাজপুরের সুরাহ্ নামক গ্রামে অবস্থিত। এ মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় ধরনের মসজিদগুলো আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত। এদের ছাদ একাধিক গম্বুজ দিয়ে ঢাকা। বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডে সর্বাধিক সংখ্যক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বাগেরহাট জেলা সদরের সুন্দরঘোনা মৌজায় অবস্থিত। ষাটগম্বুজ নামে পরিচিত এ মসজিদ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। বহুগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ফিরোজপুর (গৌড়) গ্রামে অবস্থিত। এর নাম ছোট সোনা মসজিদ। এর ছাদ বারটি অর্ধ-বলয়াকার এবং তিনটি চারচালা গম্বুজ দিয়ে আবৃত আছে। এই মসজিদ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে এর দেয়ালের অন্তস্তলে ইটের গাঁথুনী ও বহিরাবরণে বেলে পাথরের আস্তরণ আরোপিত রয়েছে। পনের গম্বুজ বিশিষ্ট আর একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ১৯৯২ সালে লেখকের নেতৃত্বে পরিচালিত এক খননের সময় নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার রোয়াইলবাড়ি গ্রামে অনাবৃত হয়েছে। বড়দুয়ারী নামে পরিচিত এ মসজিদে তিন সারি পাথরের থাম আছে। প্রতি সারিতে থামের সংখ্যা চারটি। ফলে এ মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের পনেরটি সমান বর্গক্ষেত্রের উপর ছোট সোনা মসজিদের মতো পনেরটি গম্বুজ বসানো থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে অনুমিত হয়। এ ধরনের আর একটি নিদর্শন দেখা যায় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরস্থ হজরত মখদুম শাহ দৌলার মাজার

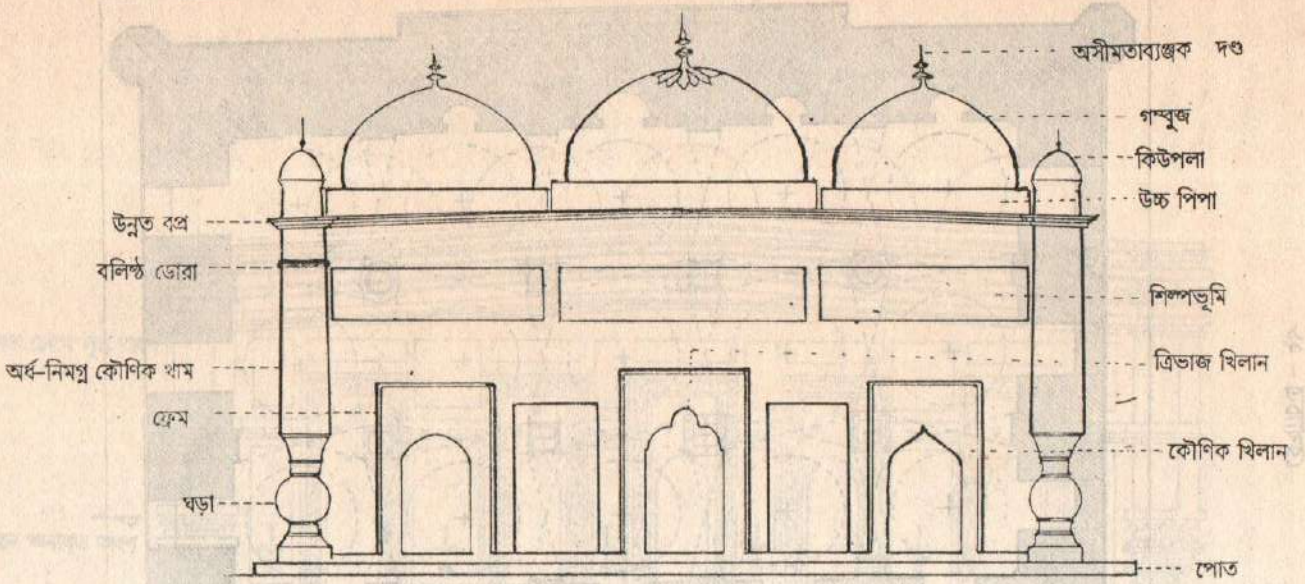
প্রাঙ্গনে। তবে শেষোক্ত দু'টি মসজিদে কোন শিলালিপি না থাকার কারণে এদের তারিখ নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয়নি। তবে স্থাপত্যিক বিন্যাস অনুযায়ী এগুলোকে খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকের পূববর্তী বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য এ মসজিদে ছোট সোনা মসজিদের মতো চালা গম্বুজ নেই। মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত মানকালীর কুণ্ড নামক ঢিবিতে আবিষ্কৃত অপর একটি মসজিদও পনের গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালে ঝিনাইদহ জেলার বারবাজার ইউনিয়নে অবস্থিত পীরপুকুর এবং সাত গাছিয়ায়ও আরও দু'টি বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এ সময়কালের অন্যান্য মসজিদের মধ্যে ফরিদপুরের পাতরাইলস্থ শাহী মসজিদ ; বগুড়ার শেরপুর মসজিদ, পাবনার চাট মোহর শাহী মসজিদ (১৫৮১-৮২ খ্রিঃ) ; সিলেটের শঙ্কর পাশা ও রুকন খানের মসজিদ ; পাবনার নবগ্রাম মসজিদ, নওগাঁয়ের কুসুম্বা মসজিদ, চাপাইনবাবগঞ্জের দারাসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯ খ্রিঃ), ধুনিচক মসজিদ (খ্রিঃ পনের শতক), খানিয়া দিঘি মসজিদ (আঃ খ্রিঃ পনের শতক) ; রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (খ্রিঃ ষোল শতক) বাগেরহাটের রনবিজয়পুর মসজিদ, বিবি বেগনী মসজিদ ও চুনাখোলা মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

আলোকচিত্র - ১৯



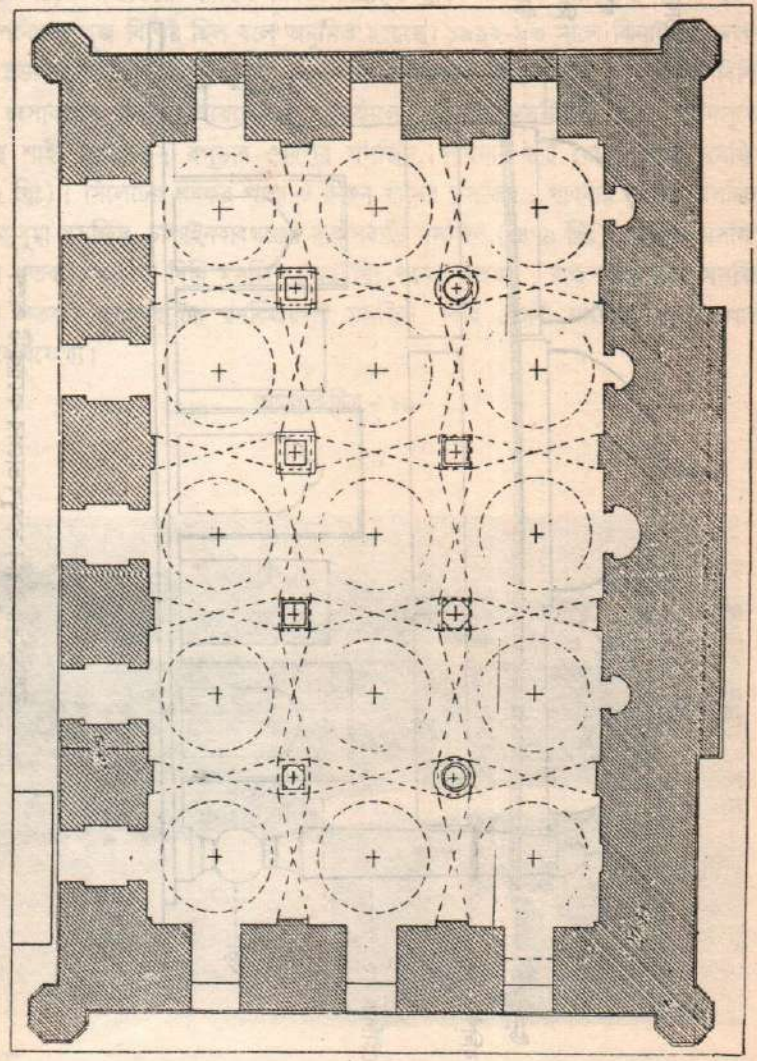
সাধারণ দৃশ্য : ছোটসোনা মসজিদ, গৌড়, চাপাইনবাবগঞ্জ

রেখাচিত্র – ২৭



মসজিদের প্রধান সম্মুখভাগের কয়েকটি অংশ

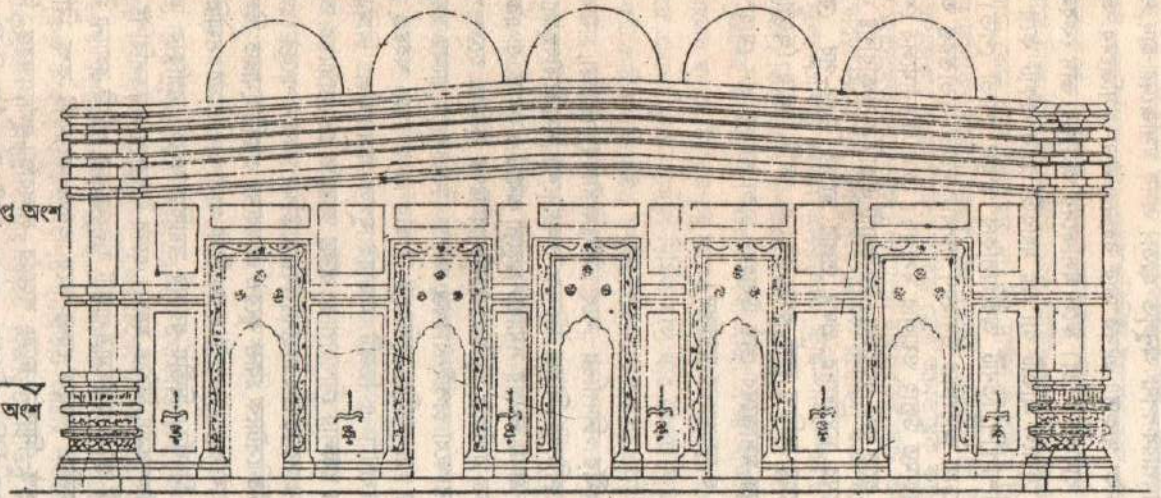
রেখাচিত্র – ২৮



বড়দুয়ারী মসজিদের ভিত্তি-পরিকল্পনা, কোটবাড়ি, রোয়াইল বাড়ি, নেত্রকোণা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে।

রেখাচিত্র – ২৯



বড়দুয়ারী মসজিদের প্রধান সম্মুখভাগের দৃশ্য, কোটবাড়ি, রোয়ালবাড়ি, নেত্রকোণা

BANGLADESH Library Dhaka

মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মুগল শাসনামলে অবিমিশ্রভাবে আয়তাকার ভূমিপরিকল্পনা অনুসৃত হতো। এসব মসজিদের ছাদ পাশাপাশি তিনটি কৌণিক গম্বুজ দিয়ে ঢাকা থাকত। এদের ভার বহনের জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে থামের পরিবর্তে সহায়ক খিলান ব্যবহৃত হতো। ফলে মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ কেবল তিনটি ব্যা দ্বারা বিভক্ত হতো। কিবলা দেয়ালে প্রতিটি ব্যা এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে অবতল মিহরাব থাকত। এদের ছাদে পাশাপাশি তিনটি অর্ধগোলাকার গম্বুজ শোভা পেত। এ পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদের সবচেয়ে আদর্শগত উদাহরণ লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরস্থ আজম শাহের মসজিদ ও গৌড়ের শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ। মুগল শাসনামলের শেষদিকে দ্বিতল আকারেও মসজিদ নির্মিত হতে শুরু করেছিল। নিচতলাটি একাধিক কক্ষবিশিষ্ট মঞ্চের আকারে তৈরি করা হতো। এ ধরনের মসজিদের প্রথম তলার ছাদের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অতিরিক্ত স্বল্পাকারের ঘরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এ ঘরটি চিল্লাহ্ (হুজুরখানা) হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এ ধরনের মসজিদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ঢাকা শহরস্থ খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ, বেগম বাজার মসজিদ ও মুসাখানের মসজিদ।

সমাধিসৌধ

মুসলমানদের ধর্মীয় নিদর্শনের মধ্যে সমাধিসৌধের (রওজা, মাজার ও দরগাহ) গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আকৃতিগত দিকের বিচারে বাংলাদেশের সমাধিসৌধগুলোকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের সমাধিসৌধগুলো একটি এককক্ষ ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত। এগুলো সাধারণত বর্গাকার ভূমি-পরিকল্পনার উপর নির্মিত হতো। বর্তমানে টিকে থাকা এ ধরনের ইমারতের মধ্যে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ফিরোজপুর গ্রামের হযরত শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর মাজার, রাজশাহীর কুমারপুর মাজার এবং ঢাকা শহরস্থ হাজি খাজা শাহবাজের মাজার উল্লেখযোগ্য। এ তিনটি মাজারই মুগল শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা,নারায়ণগঞ্জ জেলার মোগরাপাড়া থানার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ের অদূরবর্তী সাচিলপুর গ্রামে অবস্থিত যে কবর সমেত কবরাচ্ছাদন গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিঃ) সমাধি (?) বলে পরিচিত সেটাকে কেন্দ্র করেও এ ধরনের একটি ইমারত ছিল। এ অনুমান সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে বাংলাদেশে এ যাবৎ টিকে থাকা এ ধরনের সমাধিসৌধগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। দ্বিতীয় ধরনের সমাধিসৌধগুলো বর্গাকার অথবা আয়তাকার উভয় প্রকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত হতো। এদের উপরাংশ সমতলবিশিষ্ট ছাদ দিয়ে ঢাকা থাকত। এ ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে কেবলমাত্র একটি অলংকারিক গম্বুজ বসানো থাকত। সৌধের অভ্যন্তর ভাগে একটি কেন্দ্রীয় কক্ষকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি কক্ষ নির্মিত হতো। এ ধরনের সমাধিসৌধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঢাকা শহরের লালবাগ দুর্গাভ্যন্তরস্থ বিবিপরীর মাজার এবং নারায়ণগঞ্জ শহরস্থ বিবি মরিয়মের মাজার। দু'টি ইমারতই খ্রিস্টীয় সতের শতকে নির্মিত হয়েছিল। তৃতীয় ধরনের সমাধিসৌধগুলো অষ্টকোণাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত। এদের ছাদ কেমন ছিল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদানের মতো কোন উদাহরণ আমাদের জানা নেই। তবে ঢাকা শহরস্থ মোহাম্মদপুর এলাকার সাত মসজিদের পূর্বদিকে এই পরিকল্পনায় নির্মিত

একটি সমাধিসৌধ দেখা যায়। এ ছাড়া চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার রোহনপুরেও অনুরূপ একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রথমটির ছাদ যদিও ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল ; তথাপি অক্ষত অংশের চিহ্ন থেকে এটাকে সহজেই এক গম্বুজ এবং এককক্ষবিশিষ্ট ইমারত বলে ধরে নেওয়া যায়। ইটের আকৃতি, মসলা, অলংকরণ, দেয়ালের গায়ে পলেস্তরার অস্তিত্ব ও নির্মাণপদ্ধতির উপর নির্ভর করে এ সমাধিসৌধকে নিঃসন্দেহে মুগল শাসনামলে নির্মিত বলে ধরে নেওয়া যায়। দ্বিতীয় ইমারতটির ভেতরও বর্তমানে কোন কবর দেখা যায় না। এর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করে খিলান দরজা আছে। অন্য দু'দিকের খিলান দরজাগুলো সম্ভবত পরবর্তীকালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খিলানগুলো যে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ সেটা আনুভূমিক কার্নিশ থেকে একটু উঁচু। এর ছাদ একটি মাত্র অর্ধগম্বুজ দিয়ে ঢাকা। দেয়ালের বহিরাবরণ ছোট আকারের প্যানেল দিয়ে সজ্জিত। তাই এ ইমারত নিঃসন্দেহে মুগল যুগে নির্মিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। চতুর্থ ধরনের সমাধিসৌধগুলো বর্গাকার অথবা আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় এককক্ষবিশিষ্ট ইমারত হিসাবে নির্মিত হতো। কিন্তু এদের উপরাংশ চালা ছাদ দিয়ে ঢাকা থাকে। নারায়ণগঞ্জ জেলার মোগরাপাড়ায় এ ধরনের অনেকগুলো মাজার দেখা যায়। এসব মাজারগুলো মোহাম্মদ ইউসুফ ও মোহাম্মদ কামালের খানকা ইমারতগুচ্ছ নামেও পরিচিত। অলংকরণ, নির্মাণ উপকরণ এবং নির্মাণপদ্ধতির বিচারে এগুলো মুগল আমলে নির্মিত বলে ধরে নেওয়া যায়। পঞ্চম ধরনের সমাধিসৌধগুলো মূলত একটি প্রাচীর পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত চত্বর। এর এক বা একাধিক প্রান্তে একটি চিরাগদান (বাতি প্রজ্জ্বলনের অট্টালক) থাকে। চিরাগদান হলো ফলক আকারের একটি অতিরিক্ত স্থাপত্যিক সংযোজন। এর শীর্ষদেশ চালা আকৃতির ছাউনি দিয়ে ঢাকা থাকে। আর এর কবরের দিকস্থ বহির্ভাগে এক বা একাধিক কুলুঙ্গি দেখা যায়। এছাড়া উন্মুক্ত চত্বর জুড়ে সারিবদ্ধ অথবা বিক্ষিপ্তভাবে এক বা একাধিক কবর থাকে। কোন কোন কবর একটি আয়তাকারে নির্মিত কবরাচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা থাকে। এদের উপরিভাগ দেখতে নৌকার ছৈ ; কৌণিক খিলান, সমতল, এক বা একাধিক ধাপ বিশিষ্ট ইত্যাদি আকারের হয়ে থাকে। এ ধরনের মাজার নির্মাণ রীতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। সাধারণত মসজিদের আশেপাশে বা চত্বরে এ ধরনের কবরের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ প্রসংগে ছোট সোনা মসজিদ, বাঘা মসজিদ প্রভৃতি মসজিদের খোলা চত্বরের উল্লেখ করা যেতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে আঠার-উনিশ শতকের দিকে জোড়বালা মন্দিরের আকারেও কিছু সমাধি ভবন নির্মিত হয়েছিল। এ ধরনের সমাধি ভবনের অন্যতম উদাহরণ পটুয়াখালি জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থিত।

মুসলমানদের নির্মিত আর একধরনের ইমারতের নাম ইমামবাড়া। সাধারণত মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় কারবালার নিষ্ঠুর ঘটনার স্মৃতি জাগরুক রাখার উদ্দেশ্যে ইমামবাড়া তৈরি করে থাকে। এ ধরনের ইমারতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঢাকা শহরস্থ হোসনী দালান। আয়তাকার মঞ্চের উপর একটি বিরাট হলঘরকে কেন্দ্র করে এ বহুকক্ষ বিশিষ্ট ইমারতটি আঠার শতকের দিকে নির্মিত হয়েছিল। কক্ষগুলোতে কারবালার নিষ্ঠুর ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন দ্রব্যাদি সংরক্ষিত আছে। সবশেষে ঈদগাহের প্রসংগটি উল্লেখ না করলে মুসলিম স্থাপত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঈদগাহ বলতে নির্দেশ করে এমন একটি উঁচু খোলা চত্বর যেখানে নামাজিগণ ঈদের নামাজ সমাপনের উদ্দেশ্যে সমবেত হতো। এর কিবলার দিকে একটি টানা দেয়াল থাকে। এ দেয়ালে এক বা একাধিক মিহরাব শোভা পায়। এ ধরনের ইমারতের একটি চমৎকার নিদর্শন

ঢাকাস্থ ধানমণ্ডি এলাকায় দেখা যায়। এটা ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যান্য

খ্রিস্টানদের গির্জা, শিখদের গুরুদুয়ারা, জৈনদের মন্দির (দেরাসোরহ) ইত্যাদির অস্তিত্বও এ দেশে রয়েছে। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে রয়েছে শিখদের একমাত্র গুরুদুয়ারা। আর বগুড়া শহরের কেন্দ্রে আছে জৈনদের একমাত্র মন্দিরের নিদর্শন। গুরুদুয়ারাটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য আজ আর অক্ষত নেই। বগুড়া শহরের দেরাসোরহটি একটি একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট উত্তরমুখী চতুর্কৌণিক ইমারত। এর ছাদ সমতল ও কার্নিশ আনুভূমিক। তবে দক্ষিণাংশে একটি অনুচ্চ শিখর রয়েছে। এর নিচেই দেরাসোরহের গর্ভ গৃহ। সমতল ছাদের উপর দণ্ডায়মান শিখরের নিচপ্রান্তের (কাঁধে) প্রত্যেক দিকে এক সারি শিখর নক্‌শা আছে। সম্পূর্ণ ইট ও সুরকি দিয়ে তৈরি এ ইমারতের দেয়ালগাত্র পলেস্তরা করা। স্থাপত্যিক বিচারে এটা আঠার-উনিশ শতকের নিদর্শন। সবচেয়ে প্রাচীন গির্জাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনের অঙ্গনে অবস্থিত। এ স্বল্প পরিসরের গির্জাটি পর্তুগিজদের দ্বারা আঠার শতকে নির্মিত হয়েছিল।

আলোকচিত্র – ২০



দিনাজপুর রাজবাড়ির প্রধান তোরণ

এ যাবৎ বাংলাদেশে এ ধরনের নগণ্য সংখ্যক ইমারতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সবের মধ্যে দুর্গ ও সুরক্ষিত নগর কাটরা, হাম্মাম, দেউড়ি (নহবত খানা), হাওয়াখানা, প্রাসাদ, প্রহরীবুরুজ, সেতু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সময়ের ব্যাপ্তি ও সংখ্যার বিচারে এগুলোর মধ্যে দুর্গের প্রসংগটিই সবার আগে আসে। প্রাচীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং নগরায়নের ক্ষেত্রে দুর্গ একটি আবশ্যকীয় শর্তের ভূমিকা পালন করত। সেই সুদুর পুরা-ঐতিহাসিক যুগে এর সূত্রপাত। অপর দিকে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ে একাধিক ধরনের দুর্গ নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। তবে দুর্গ বলতে সংক্ষেপে এমন একটি স্থানকে নির্দেশ করে যেখানে শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার মতো ব্যবস্থাটি অব্যাহত রেখে নিরাপদে বসবাস করা যায়। বাংলাদেশে মাত্র দু'ধরনের দুর্গের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রথম ধরনের দুর্গগুলো হলো এমন একটি নির্ধারিত

আলোকচিত্র – ২১



বড় কাটারার দক্ষিণ তোরণ, ঢাকা।

স্থান, যার চারদিক কেবল পরিখা দিয়ে বেষ্টিত থাকত। একমাত্র দিনাজপুর অঞ্চলেই এ ধরনের দুর্গের অস্তিত্ব দেখা গেছে। দ্বিতীয় ধরনের দুর্গের ক্ষেত্রে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিখার পাশাপাশি উঁচু এবং প্রশস্ত প্রাচীরও নির্মাণ করা হতো। দুর্গ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন আকৃতির ভূমি-

পরিকল্পনা অনুসৃত হতো। তবে আয়তাকারে নির্মিত দুর্গের সংখ্যাই বাংলাদেশে বেশি। এ প্রসংগে আরও উল্লেখ্য, প্রাচীন জনপদের প্রতিটি প্রশাসনিক কেন্দ্রই সাধারণত দুর্গাকারে নির্মিত হতো। এ জাতীয় দুর্গগুলোকে সুরক্ষিত নগর হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। এছাড়া অস্থায়ী সেনাছাউনি হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উচুপ্রাচীর ঘেরা এবং ফটক সংবলিত ছোট বা মাঝারি আকারের দুর্গনির্মাণ করা হতো।

আলোকচিত্র – ২২



বর্তমান বড় কাটরার ভেতরের অংশ, ঢাকা

বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রাচীন সুরক্ষিত নগরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত রয়েছে। আকারের বিচারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্গ হলো চন্দ্রবর্মণকোট। এটা গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানা সদরে অবস্থিত। এদের সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। প্রায় একই পরিমাপের অপর একটি বিশাল দুর্গ পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত। এর নাম ভিতর গড়। একাধিক মাটির প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত এ দুর্গের অনুরূপ দুর্গ বাংলাদেশের অপর কোনপ্রান্তে দেখা যায় না। ১৯৮৪ সালে লেখক দুর্গ প্রাচীরের কোন একটি

স্থানে ইটের দেয়ালের অস্তিত্বও লক্ষ করেছিলেন। এছাড়া এর বিস্তীর্ণ অভ্যন্তরভাগের কোন কোন স্থানে কয়েকটি অনুচ্চ ঢিবি এবং জলাশয়ের অস্তিত্ব অদ্যাবধি বজায় রয়েছে। একটি ঢিবিতে বেলে পাথরে তৈরি একটি খাম পাদপটও পড়েছিল। এটি বেশ অলংকৃত এবং গুপ্ত শাসনামলের।

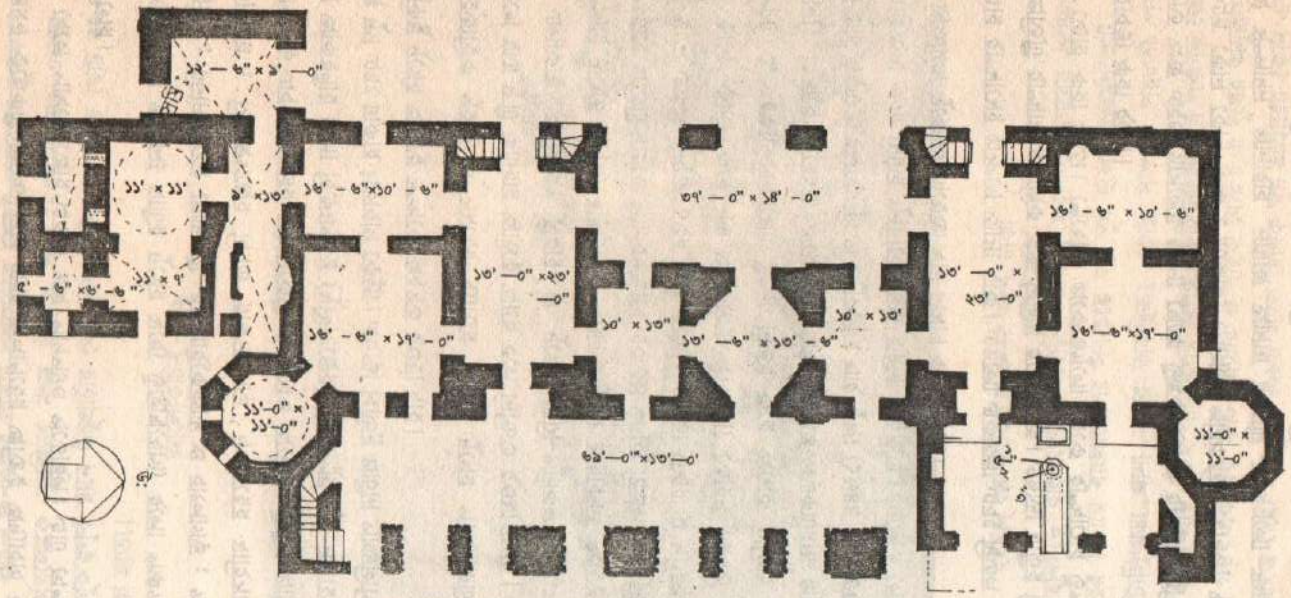
বাংলাদেশের অন্যান্য মাটির দুর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পঞ্চগড় জেলার বাহিরগড় (বোদেশ্বরী) ; দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট, বারপাইকেরগড় ও বাংলাগড় ; গাইবান্ধার দ্বারিয়ান দুর্গ ও কাটাদুয়ার ; সিরাজগঞ্জের বিরাট রাজার গড়, নওগাঁয়ের মাহিসন্তোষ ; নীলফামারির ধর্মপালের গড় এবং রংপুরের চাপড়াকোট ও আরও অনেক। ইটের প্রাচীর ঘেরা দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো বিক্রমপুরস্থ (মুন্সিগঞ্জের) ইদ্রাকপুর দুর্গ, নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা ও হাজিগঞ্জ দুর্গ এবং ঢাকার লালবাগ কেল্লা। এছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও কিছু দুর্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও সময়ের ব্যাপ্তির বিচারে দুর্গের পরই কাটরার স্থান। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র দু'টি কাটরার অস্তিত্ব আছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এরা ঢাকা শহরস্থ চক্ বাজার এলাকায় অবস্থিত। বিহার ও দুর্গের ভূমি-পরিকল্পনার সাথে কাটরার ভূমি-পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এগুলো সাধারণত আয়তাকারে নির্মিত হতো। আয়তক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুতে সারিবদ্ধভাবে একতল অথবা দ্বিতল কক্ষ নির্মাণ করা হতো। ফলে মধ্যবর্তী স্থানে একটি উন্মুক্ত চত্বর সৃষ্টি হতো। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ প্রতিটি বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে বড় আকারের জাঁকালো তোরণ নির্মিত হতো। এদের ভূমি-পরিকল্পনা ও কক্ষের বিন্যাসের উপর নির্ভর করে অনেক পণ্ডিত এগুলোকে সরাইখানা (লঙ্গরখানা) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। ঢাকা শহরস্থ বড়কাটরায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুযায়ী এটি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুবেদার শাহ সুজা (১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে) নির্মাণ করেছিলেন। এ কাটরার প্রায় ৩০০ মিটার পূর্বদিকে ছোট কাটরা অবস্থিত। প্রচলিত লোকপ্রবাদ অনুযায়ী এটা ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে সুবেদার শায়েস্তা খান নির্মাণ করেছিলেন।

এবার হাম্মামের প্রসংগে আসা যাক। এগুলো একতলা এবং দ্বিতল উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে। প্রতিটি হাম্মাম একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এছাড়া মাটির নিচেও হাম্মামের কিছু প্রকোষ্ঠ তৈরি করা হতো। শেষোক্ত প্রকোষ্ঠগুলো থেকে হাম্মামের উপরের কক্ষগুলো গরম রাখার ব্যবস্থা করা হতো।

মূলত অজু এবং গোসলের ধারণা থেকে উদ্ভূত হলেও হাম্মাম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। এর কোন কোন কক্ষ শৌচকার্য, পোশাক পরিবর্তন, গোসল, অজু, অবকাশ যাপন, ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন, পানাহার, নামাজ আদায় ইত্যাদি কাজগুলো সমাপনের জন্য ব্যবহৃত হতো। আবার একটি বড়ধরনের কক্ষ মিলনায়তন হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশে এ

রেখাচিত্র – ৩০



তাহ্ খানার ভিত্তি পরিকল্পনা, গৌড়, চাপাইনবাবগঞ্জ



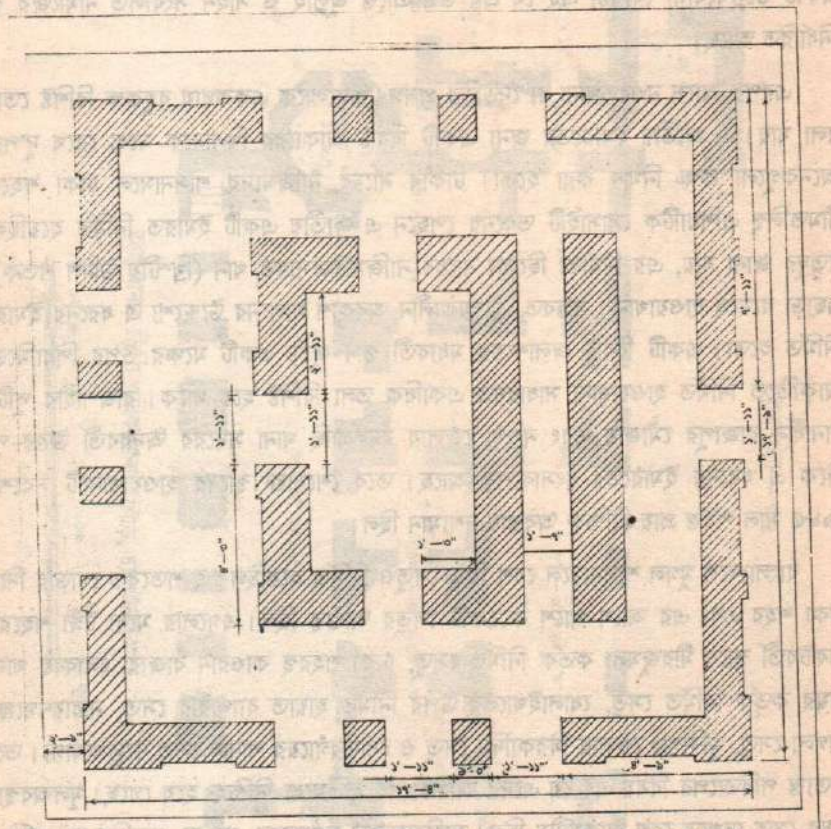
যাবৎ যে ক'টি হাম্মামের সন্ধান পাওয়া গেছে তারমধ্যে ঢাকা শহরস্থ লালবাগ দুর্গের দীওয়ান-ই-আম, চাপাইনবাবগঞ্জের ফিরোজপুর গ্রামের শাহ সুজার হাম্মাম, ঢাকা শহরস্থ জিঞ্জিরা হাম্মাম, সাতক্ষীরার জাহাজঘাটা হাম্মাম ও ঈশ্বরীপুর হাম্মাম এবং যশোরের মীর্যানগর হাম্মাম উল্লেখযোগ্য। এগুলো সবই বাংলাদেশে মুগল শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। সুজার হাম্মামের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এর উত্তরপ্রান্তে জুল্লাহ ও সাহন সংবলিত নামাজের স্থান নির্ধারিত আছে।

এরপর আসে নওবতখানা বা দেউড়ির প্রসঙ্গ। এগুলোকে এককথায় বহুকক্ষ বিশিষ্ট তোরণ বলা যায়। এ জাতীয় ইমারতের জন্য একটি বিরাট আকারের খিলানকে মধ্যে রেখে দু'পাশে অনেকগুলো কক্ষ নির্মাণ করা হতো। ঢাকার নায়েব নাজিমদের শাসনামলে ঢাকা শহরের নীমতলিস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনের পেছনে এ জাতীয় একটি ইমারত নির্মিত হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, এর নির্মাতা ছিলেন নায়েব নাজিম জেসারত খান (খ্রিস্টীয় উনিশ শতক)। এছাড়া রয়েছে হাওয়াখানা। সম্ভবত, গ্রীস্মকালীন অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ইমারত নির্মিত হতো। একটি বিরাট জলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে একটি মঞ্চের উপর পিরামিডের আকৃতিতে নির্মিত হাওয়াখানা সাধারণত একাধিক তলা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। রাজশাহীর পুটিয়া থানাধীন রাজাপুর মৌজায় এবং নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানা সদরের অদূরবর্তী উত্তর-পূর্ব দিকে এ ধরনের ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। তবে শেষোক্ত স্থানের হাওয়াখানাটি সর্বশেষ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় নিশ্চিহ্ন অবস্থায় দৃশ্যমান ছিল।

বাংলাদেশে মুগল শাসনামলে বেশ কিছু সেতুও নির্মিত হয়েছিল। এ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা শহর এবং এর আশে পাশে কয়েকটি সেতুর অস্তিত্ব ছিল। এগুলোর মধ্যে টঙ্গী শহরের নিকটবর্তী স্থানে মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত সেতু, ঢাকা শহরস্থ কাওরান বাজার এলাকায় খাজা অম্বর কর্তৃক নির্মিত সেতু, ধোলাইখালের উপর নির্মিত হায়াত ব্যাপারীর সেতু, নারায়ণগঞ্জের পাগলা সেতু, মুন্সিগঞ্জ জেলার মিরকাদিম সেতু ও সোনারগাঁয়ের পানাম সেতু উল্লেখযোগ্য। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে এদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মূলঅবস্থায় এসব সেতু দেখতে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এক বা একাধিক চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের সমন্বয়ে এসব সেতু নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া পাগলাপুলে কয়েকটি ছোট গম্বুজ ধারণকৃত বুরুজও ছিল। বর্তমানে দু'টো বুরুজ এবং একটি খিলানের অংশবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ শতকের গোড়ার দিকে সেতুর ধ্বংসাবশেষের উপর একটি হিন্দু মন্দির নির্মিত হয়েছে।

সবশেষে প্রাসাদের প্রসংগ। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে যেক'টি প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই খ্রিস্টীয় সতের শতকের পরে নির্মিত। প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে এগুলোর স্থান একান্তই গৌণ। কারণ এগুলো সবই জমিদারি আমলে নির্মিত হয়েছিল। এসব বাড়ির মধ্যে নাটোর সদরে

রেখাচিত্র – ৩১



হাওয়াখানার ভিত্তি-পরিকল্পনা, তারাপুর, পুটিয়া, রাজশাহী



অবস্থিত দিঘাপতিয়া জমিদার বাড়িটি বর্তমানে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে টিকে আছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে নাটোরের রাণী ভবানীর প্রাসাদ, পুটিয়া রাজবাড়ি, রংপুরের তাজহাট জমিদারবাড়ি, নওগাঁয়ের দুবলহাটি ও বলিহার প্রাসাদ, মানিকগঞ্জ জেলার বালিয়াটি প্রাসাদ, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা জমিদারবাড়ি, দিনাজপুর রাজবাড়ি ও ঢাকা শহরস্থ আহসান মঞ্জিল উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ইমারতটি বর্তমানে সংস্কার করে এর মূল বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ইট ও চুনসুরকি নির্মিত এসব প্রাসাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো বিশালাকার থামের সারি, জাঁকালো প্রবেশমঞ্চ এবং সম্মুখভাগের কার্নিশের মধ্যবর্তী অংশে একটি ত্রিকোণাকার আকৃতির অলংকারিক অট্টালক। থামগুলোর শিল্পশৈলীতে ডরিক (Doric), আইওনিক (Ionic), তাসকান (Tuscan) এবং করিনাথিঅ্যান (Corinthian) শৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৬

উপস্থাপনা

সুদূর অতীতের মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার পর প্রত্ননিদর্শন কোন একসময় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের দ্বারা পরিচালিত আবিষ্কারার্থে ভ্রমণ, জরিপ ও খননের মাধ্যমে অথবা আকস্মিকভাবে এসব নিদর্শনাদি বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার লাভ করে। কিন্তু উদ্ধার লাভের মধ্যেই প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম সীমিত থাকে না। কারণ প্রত্ননিদর্শন জড়বস্তু। এদের ভাষা নেই ; নেই চলৎ শক্তি। তদুপরি দীর্ঘদিন মাটির নিচে বন্দিদশার যাতনা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে এরা স্ব স্ব রূপবৈচিত্র্য হারিয়ে বিগত যৌবনা পৌঢ়ার মতো হয়ে পড়ে। তাই উদ্ধার প্রাপ্তির পরও তারা আড়ষ্ট থেকে যায়, যদি না এদের মূল রূপ পুনরুদ্ধার করে বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। আর এই দায়িত্বটি সমাপনের জন্য প্রত্নতত্ত্বে তিনটি পন্থা অনুসৃত হয় ; যথা – সংরক্ষণ, প্রদর্শনী ও গবেষণা, সংরক্ষণের মাধ্যমে সংরক্ষণাগার, প্রদর্শনের মাধ্যমে জাদুঘর ; আর গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশনা।

সংরক্ষণ

প্রতিটি প্রত্ননিদর্শন নিজ নিজ প্রাচীনত্ব, বৈচিত্র্যময় আকার-আকৃতি, উপকরণ, কাঠামো, বয়ন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার কারণে দেশ-বিদেশের নানা পেশার মানুষকে নানাভাবে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকার প্রসঙ্গ তো পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার মধ্যদিয়ে পর্যটন শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা যায়। মূলত এ কারণেই আজকাল উন্নতদেশগুলোতে নিজ তেল, ধাতু ইত্যাদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে তেমনি প্রত্ননিদর্শন নির্দেশ করতে সাংস্কৃতিক সম্পদ অভিধা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে এই মূল্যবান প্রত্ননিদর্শন ক্রমে ক্রমে বিকৃত অথবা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। প্রত্ননিদর্শনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এ কার্যক্রমটির নাম সংরক্ষণ।

বাংলা অভিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ শব্দের অর্থ 'বিশেষ প্রকারের সংরক্ষণ' বা 'অবিকৃত রাখা'। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমে তাই সংরক্ষণ বলতে বোঝায় এমন একটি উপায়, যার মাধ্যমে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের মূল অবস্থা অটুট রাখা যায়। কিন্তু প্রত্ননিদর্শন স্বভাবজাত কারণেই সংবেদনশীল, ভঙ্গুর ও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। কারণ এগুলোর মধ্যে তিনটি অবস্থা

বিরাজমান থাকে, যথা— (ক) বিকৃতির পূর্বাবস্থার দীর্ঘকালীন ব্যবহারজনিত ক্ষয়,পূর্ণ বিস্মৃত অবস্থায় দীর্ঘদিনের আলো-বাতাস বিহীন তাপ, চাপ ও বিরূপ পদার্থের সান্নিধ্য এবং (গ) আবিষ্কার পরবর্তী নতুন পরিবেশের প্রভাব। সুতরাং সংরক্ষণ কার্যক্রমটি খুব সহজসাধ্য তো নয়ই বরং সহজাত ভাবেই শ্রমসাধ্য, সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও গবেষণাধর্মী। আবার প্রত্ননিদর্শনাদি নানা উপাদানে তৈরি হয়ে থাকে। কিছু প্রত্ননিদর্শন জড় আবার কিছু জৈব উপাদানে তৈরি হয়ে থাকে। তদুপরি স্থাবর ও অস্থাবর পার্থক্য তো রয়েছেই। ফলে সংরক্ষণ কার্যক্রমে বিবিধ পেশাজীবীগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, যেমন - প্রত্নতত্ত্ববিদ, রসায়নবিদ ও প্রকৌশলী। আর এসব বিচারে প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণকে মোটামুটি একটি বহুপেশা নির্ভর কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

সংরক্ষণের ইংরেজি সমার্থক শব্দ কনজারভেশন (conservation)। এর দু'টি মূলধারা রয়েছে, যথা—ঐতিহ্যগত সংরক্ষণ এবং আধুনিক সংরক্ষণ। ঐতিহ্যগত সংরক্ষণের কোন সার্বজনীন আবেদন নেই। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৈচিত্র্যময় পরিবেশ-প্রকৃতি বিদ্যমান। কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলোতে সারাবছর জলবায়ু উষ্ণ ও সেঁতসেঁতে থাকে। বৃষ্টিপাতও হয় প্রচুর। অপরদিকে ইরান, আফগানিস্থান এবং ভারতসহ পাকিস্তানের কিছু অংশে সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকলেও জলবায়ু শুষ্ক ভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাত সঙ্ঘটিত হয় কদাচিৎ। আবার বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কিছু অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বছরের একটা সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও অবশিষ্ট অংশ বৃষ্টিপাত মুক্ত থাকে এবং আবহাওয়া কখনও উষ্ণ-সেঁতসেঁতে অথবা উষ্ণ-শুষ্ক থাকে। এসব ভিন্নতর পরিবেশের উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর একটি দেশে একটি বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যগত সংরক্ষণ পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং একটি দেশের ঐতিহ্যগত সংরক্ষণ পদ্ধতি অন্যএকটি দেশে কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতিকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর মাধ্যমে সকল দেশে সকল সময়ে প্রয়োগ করা যায়।

আধুনিক সংরক্ষণ বলতে বুঝায় সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত উদ্ভাবনীগুলোর উপর নির্ভরশীল সংরক্ষণ। এ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পর্যায়ক্রমে মোটামুটি তিনটি ধাপ অনুসরণের প্রয়োজন হয়। যথা—উদ্ধারকরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সুস্থিতকরণ (রাসায়নিক এবং কাঠামোগত)। তবে কাঠামোগত সুস্থিতকরণ অনেকক্ষেত্রে মেরামত, সংস্কার, পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু এইসব কর্মকান্ডেরই সামগ্রিক নাম সংরক্ষণ।[২৪] সুতরাং সংরক্ষণ একটি ব্যাপক অর্থবহ শিরোনাম। অন্যদিকে অর্থ যা-ই বহন করুক না কেন, এর উদ্দেশ্যটি কিন্তু এক ও অভিন্ন। উদ্দেশ্যটির সার কথা হলো, মূল কাঠামো ও বয়ন অটুট রেখে প্রত্ননিদর্শনের অস্তিত্ব রক্ষা করা।[২৫] বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করে

২৪. O.P. Agrawal, Care and preservation of Museum objects, New Delhi, 1977, pp. 5-6

২৫. The Second International Congress of Architects and Trechnians of

তোলার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপকে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচনা করা হলো।

উদ্ধারকরণ : প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম ও আকস্মিকভাবে আবিষ্কারের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া জাদুঘর কার্যক্রমের মাধ্যমেও প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার লাভ করে থাকে। কারণ জাদুঘরবিদ্যায় সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বলে গণ্য হয়। সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিখ্যাত জাদুঘরগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমে তো অংশ গ্রহণ করেই ; অধিকন্তু দান গ্রহণ, বিনিময়, ক্রয় ইত্যাদিরও আশ্রয় গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের ঢাকা জাদুঘরের (বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এ প্রসঙ্গটি 'বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম' এবং 'সমীকরণ' শিরোনামের অধ্যায় দু'টিতে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায়ই সাংস্কৃতিক সম্পদ লুটেরাদের নিকট হতে প্রচুর পরিমাণ প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার লাভ করে থাকে।

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : এ ক্ষেত্রে দু'টি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে। (ক) নিবন্ধন : প্রতিটি প্রত্ননিদর্শন উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণসহ নথিভুক্তকরণের নাম নিবন্ধন। এরপর প্রত্ননিদর্শনটি প্রয়োজনে যেখানেই হস্তান্তর করা হোক না কেন, প্রতিটি হস্তান্তর উক্ত নিবন্ধনের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হবে। তবে নিবন্ধন সম্পর্কিত কাজটি কেবল হস্তান্তরযোগ্য প্রত্নবস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (খ) সংরক্ষিত ঘোষণা : পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রত্ননিদর্শনকে সংরক্ষিত ঘোষণার জন্য নির্দিষ্ট আইন জারি করা রয়েছে। ভারত-উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯০৪ সালে এ জাতীয় একটি আইন জারি করা হয়েছিল। এই আইনটির শিরোনাম The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904)।

অতপর ১৯৩৮ সালে Archaeological works Code জারি করে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম নির্বাহের প্রণালিও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৩১ সালে এথেন্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর The Athens Charter of 1931 ঘোষিত হয়। তৎকালীন এ ধরনের অপরাপর আইনের মধ্যে Treasure Trove Act, The Antiquities (Export Control), Act, 1947 ইত্যাদি অন্যতম। এসব এ্যাক্ট, কোড ও চার্টার জারির মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ধ্বংস, হস্তান্তর, রূপান্তর ও মালিকানা ভোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও পেশাদারগণের অবাধ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানেও বাংলাদেশে নির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক আইন জারি রয়েছে। এসব আইনের বলে সরকার যে কোন প্রত্ননিদর্শন (ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত নিদর্শন ব্যতীত) সংরক্ষিত ঘোষণা করে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন।

সুস্থিতকরণ : অধিকাংশ প্রত্ননিদর্শনই আবিষ্কার অথবা উদ্ধারের প্রাক্কালে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় টিকে থাকে। লবণের প্রভাবে মাটি বা পাথরের নিদর্শনাদির বয়ন ও কাঠামো শিথিল হয়ে যায়। তাপের উত্থান-পতনের ফলে কাঠের তৈরি নিদর্শনে ফাটল ধরে। সেঁতসেঁতে অবস্থার

Historical Monuments Venice, 1964 Resolution 1 to 13

দরুণ লোহার উপর মরিচা এবং ব্রঞ্জের বা শঙ্কর ধাতুর উপর সবুজ আভাযুক্ত প্রলেপ বা মামড়ি তৈরি হয়। একইভাবে কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদজাত সংক্রমণ ও অম্লের প্রভাবে প্রত্ননিদর্শন প্রায় ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্ননিদর্শনের অবস্থা এমন নাজুক থাকে যে ঐ অবস্থায় স্থানান্তর অথবা প্রাপ্তিস্থলে রেখে দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে প্রাথমিক সুস্থিতকরণের প্রয়োজন হয়। এর আবার দু'টি ধারা রয়েছে, যথা—রাসায়নিক ও কাঠামোগত। এটি হলো একটি তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রত্ননিদর্শনের কাঠামো ও বয়নের শৈথিল্য দূরীভূত করা যায়। প্রথমে রাসায়নিক সুস্থিতকরণের প্রসঙ্গ আলোচিত হলো।

কাঠ, পোড়ামাটি ও পাথরের তৈরি নিদর্শনাদি (ইট, ফলক, মৃর্ত্তিকা, দেয়াল, পুঁতি, সীলছাপ, সীলমোহর, নিবেদন স্তূপ, খেলনা) সাধারণত খনিজ লবণ এবং উদ্ভিদজাত (লাইকেল, মস, আলজি) সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। তাই প্রথমে নিদর্শনকে পাতিত পানি দিয়ে ধুয়ে 'পেপার পাল্প' পদ্ধতিতে (শোষক কাগজের মন্ড) সেঁতসেঁতে ভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা সমাপ্ত করে ৩০°–৯০° সেলসিয়াস তাপ প্রয়োগ করে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর নিদর্শনটির গায়ে প্রয়োজনে ভাইব্রটন বা এ্যামনিয়াম বাই ক্লোরাইড (কাঠের ক্ষেত্রে মিথাইল এলকোহল) মেখে ব্রাস দিয়ে ঘষে লবণ বা উদ্ভিদজাত সংক্রমণ থেকে সৃষ্ট আকরিক দূর করা যায়। তৃতীয় পর্যায়ে পরিশোধিত স্থানটি পাঁচ থেকে ছয় দিন পর পর ৪–৫% ভাগ জলীয় জিঙ্ক সিলিকা ক্লোরাইড দিয়ে উপর্যুপরি ধুয়ে নিদর্শনটির বহির্দেশে ভিনাইল এসিটেট বা ৫% ভাগ মিথাইল সেথাক্রাইলেটের প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়। অপরদিকে ইট ও পাথরে তৈরি ইমারতের বা ধ্বংসাবশেষের উপর জন্ম নেওয়া বট, পাকুর ইত্যাদি প্রজাতির গাছ কেটে ফেলে অবশিষ্ট শিকড়ের মধ্যে সোডিয়াম আরসেলেটের দ্রবণ প্রবেশ করিয়ে বৃক্ষজাত ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে প্রত্ননিদর্শন রক্ষা করা যায়।

ধাতুর তৈরি প্রত্ননিদর্শনাদির ক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন হয় ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী আপেক্ষিক গুরুত্বতত্ত্বের (ধাতুর স্বাভাবিক ও পানিতে ডুবন্ত অবস্থার তারতম্যের হার) সাহায্য নেওয়া যায়।

তারতম্যের হার	ধাতু
১৯.৩২	সোনা
৮.৮৯	তামা
৭.১	দস্তা
১০.৫	রূপা
৭.৮৮	লোহা
৭.৩	টিন
১১.৩৪	সীসা
২১.৫	প্লাটিনাম
৮.৪ – ৮.৭	পিতল

এছাড়া metallographic analysis, X-ray with radioactive isotope of sodium, microscopic and spactroscopic study, clay Varve analysis ইত্যাদিরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এভাবে ধাতু ও সংক্রমণ চিহ্নিত করা সম্ভব হলে দেখা যাবে বালু বা আকরিক ধরনের কঠিন পদার্থের সাথে খনিজ লবণের সংমিশ্রণে ব্রঞ্জ ও শংকর ধাতুর তৈরি দ্রব্যাদির গায়ে নীলাভ সবুজ রঙের কঠিন আবরণ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে প্রত্ননিদর্শনকে ১০–১৫% ভাগ সোডিয়াম হেকটামিটা ফসফেটের দ্রবণ মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে ইমারশন হিটারের মাধ্যমে ১৮° সেলসিয়াস তাপ প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে ভাইব্রোটলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ফলে কঠিন আকরিক নরম হলে অপসৃত হওয়ার উপযোগিতা অর্জন করে। এরপর আকরিক অপসৃত নিদর্শনটি থেকে লবণ অপসারণের জন্য ৫% ভাগ সোডিয়াম সেসকিউ কার্বনেট মিশ্রিত পানিতে নিদর্শনটিকে ডুবিয়ে প্রতিদিন একবার করে ৯০° সেলসিয়াস তাপ প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি পনের থেকে বিশ দিন পর পর পানি পরিবর্তন করে দীর্ঘ কয়েক মাস এ তাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার পর যখন কনডাকটিভিটি যন্ত্রে একটি কনসটেন্ট রিডিং পাওয়া যাবে তখন বুঝতে হবে নিদর্শনটি সম্পূর্ণ লবণ মুক্ত হয়েছে। অবশ্য তাপ প্রয়োগের বিকল্প হিসাবে আলট্রাসনিক ক্লিনিং যন্ত্রেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।[২৬] সবশেষে শুশ্রুষাধীন নিদর্শনটিকে ৩০°–৪০ ° সেলসিয়াস তাপ প্রয়োগ করে শুষ্ক করে নিয়ে এর বহিরাবরণে পলিভিনাইল এসিটেট অথবা সালফার মুক্ত টলুইনের ২% ভাগ প্রলেপ আরোপ করতে হয়। একই পদ্ধতিতে লোহার নিদর্শনকেও মরিচা মুক্ত করা যায়। সর্বোপরি রয়েছে ইলেকট্রো প্লেটিং ব্যবস্থা।

চামড়ায় তৈরি প্রত্নবস্তু থেকে ধুলাবালি অপসারণের জন্য মিথাইল এলকোহল ব্যবহার করা হয়। এরপর প্রটিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ায় তৈরি নিদর্শনের আর্দ্রতা নিরূপণ করে যান্ত্রিক অথবা সূর্যের তাপ প্রয়োগ করে শুষ্ককরণের কাজ নিষ্পত্তি করা হয়। বাতাসে বিদ্যমান আর্দ্রতা ও সালফার ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়ায় সালফিউরিক অম্ল উৎপন্ন হয়ে কাগজ জাতীয় নিদর্শনকে ভঙ্গুর করে ফেলে। তাই প্রথমে অণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিদর্শনটিতে বিদ্যমান 'সেলুলজ' এর আকৃতি ও গঠন জেনে নিয়ে সেই অনুপাতে (সাধারণত ১% ভাগ) সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণ তুলার সাহায্যে নিদর্শনের বহির্দেশে মেখে দিতে হয়। তারপর নিদর্শনটিকে বৈদ্যুতিক চুল্লির মাধ্যমে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শুষ্ক করে নিয়ে প্রয়োজনে লাইমেশনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।[২৭]

---

২৬. তবে রূপার তৈরি নিদর্শনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে কেবল নিদর্শনের বহিরাবরণে সিলভার ডিপের দ্রবণ তুলার সাহায্যে মেখে দিয়ে বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব।

২৭. নিদর্শনের উভয় পিঠে .০০৩–.০০৪ মিলিমিটার পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন কাগজ লাগিয়ে তার উপর সেলিকন (সেলোকন) রিলিজ কাগজ সেঁটে দিয়ে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা ইমপ্রেগনেটর যন্ত্রের সাহায্যে ১২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাসহ চাপ প্রয়োগ করাকে লাইমেশন বলা হয়। তবে এ চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি সতর্কতা প্রয়োজন। নিদর্শন, সেলোকন ও পলিথিনের মধ্যবর্তীস্থান অবশ্যই বায়ু শূন্য হতে হবে এবং (খ) নিদর্শনের সর্বত্র সবসময় চাপ প্রয়োগ ও তাপের মাত্রা সমানুপাতিক হতে হবে।

এবার কাঠামোগত সুস্থিতকরণ প্রসঙ্গে আসা যাক। তবে বিষয়টির গভীরে যাওয়ার পূর্বে বলে নেওয়া ভাল যে, একটি প্রত্নবস্তু বা ইমারত বিভিন্ন অবস্থায় অনাবৃত হতে পারে ; যেমন--আংশিক ভাঙা, প্রায় সম্পূর্ণ ভাঙা, একাংশ বিলুপ্ত এবং ধ্বংসোন্মুখ। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাঙা অংশ ভবিষ্যতে যাতে আর ভাঙতে না পারে সে জন্য খুঁটিনাটি মেরামত অথবা বিলুপ্ত অংশ পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোন অবস্থাতেই প্রত্ননিদর্শনের ঐতিহাসিক মূল্য, শৈল্পিক মূল্য, শৈল্পিক বা স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বা মূল উপকরণের মৌলিকত্ব ক্ষুন্ন হবে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ যা-ই করা হোক না কেন সবকিছুকে প্রত্ননিদর্শনের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সমাপন করতে হবে। বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করে তোলার জন্য পরবর্তী অংশে একটি ইমারতের কাঠামোগত পুনরুদ্ধার বা সংস্কারের উদাহরণ প্রদান করা হলো।

ধরা যাক, একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের ভিত্তিসহ উত্তর দিকের দেয়ালের পূর্বাংশ ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালের পশ্চিমাংশ অক্ষত অবস্থায় এবং অবশিষ্ট অংশ বিলুপ্ত অবস্থায় আবিস্কৃত হয়েছে। অক্ষত অংশের দু'টি দেয়ালের ইটের পরিমাপ, গাঁথুনির প্রকৃতি এবং অলঙ্করণ ইত্যাদিও অভিন্ন। অপরদিকে একই অঞ্চলে অবস্থিত এবং সমসাময়িক সময়কালে নির্মিত এমন একটি ইমারত সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। সেটার সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতটির অক্ষত অংশ প্রত্যক্ষ সৌসাদৃশ্য বহন করছে। এমনক্ষেত্রে উভয় ইমারতের তুলনামূলক পর্যালোচনা সমাপনান্তে ভগ্ন অংশটি পুনঃনির্মাণ করা যেতে পারে। বর্তমানে জাপান ও শ্রীলঙ্কাসহ আরও কয়েকটি দেশে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। তবে এ ধরনের কাঠামোগত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে ঃ

ক. সংরক্ষণের জন্য এমন নিদর্শন নির্বাচন করতে হবে যেটা যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, স্থাপত্যিক ও শিল্প ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে।

খ. সংরক্ষণ শুরুর পূর্বে সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত নিদর্শনের বিশদ আলোকচিত্র ও নক্শা সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

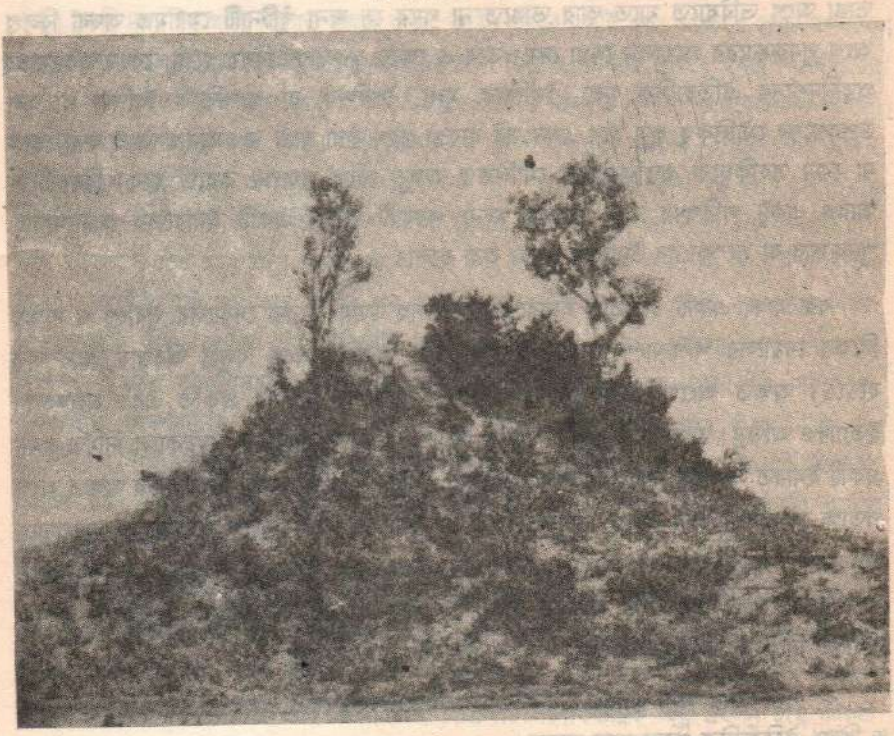
গ. সংরক্ষণ কাজে এমন সংরক্ষক নিয়োগ করতে হবে যিনি প্রত্ননিদর্শনটির শিল্প ঐতিহাসিক ও অন্যান্য মৌলিকত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

ঘ. প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত পুনরুদ্ধার কাজ কোন প্রকারেই সাধারণ নির্মাণ কাজের সাথে তো তুলনীয় নয়ই, বরং এটি একটি মৌলিক গবেষণাধর্মী অধ্যবসায়। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তড়িঘড়ি করে (যেমনটা আমাদের দেশে ঘটছে) সংরক্ষণ কাজ নিষ্পত্তি করা যাবে না।

ঙ. আরও মনে রাখতে হবে, '... যদি একটি নতুন নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয় তবে এটার মধ্যে প্রাচীনটির বয়ন, রঙ এবং বিন্যাসগত সাদৃশ্য বজায় থাকতে হবে ... ইমারতাদির

সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল ঐতিহাসিক ইমারতাদি, তাদের স্থাপত্য, কাঠামোগত বিন্যাস, উপকরণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।[২৮]

আলোকচিত্র –২৩



পাহাড়পুর ঢিবি, খনন পূর্ব দৃশ্য

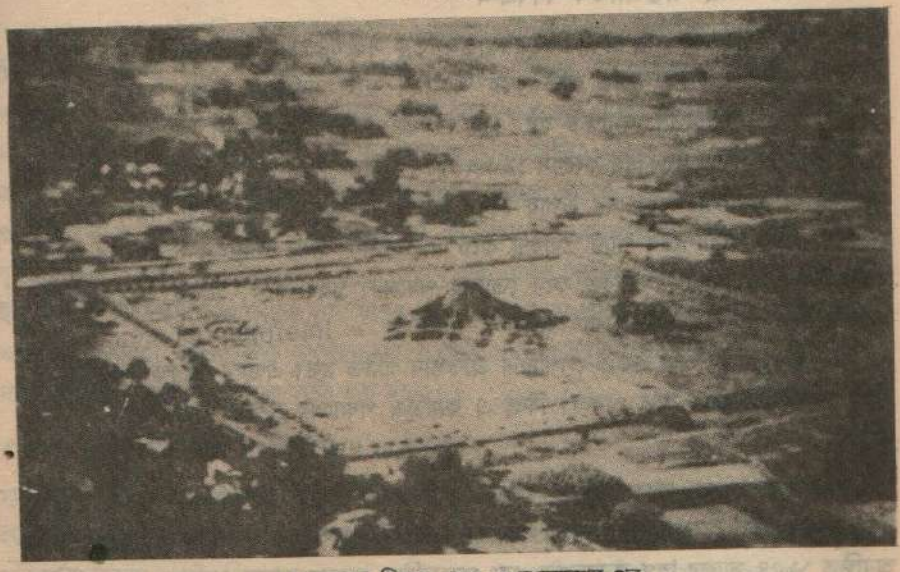
সবশেষে আরও বলতে হয় যে, মূলত উদ্ধারকরণ, নিরাপত্তা বিধান, রাসায়নিক সুস্থিতকরণ ও কাঠামোগত সুস্থিতকরণ (পুনরুদ্ধার অথবা পুনঃনির্মাণ) ইত্যাদি প্রতিটি ধাপই পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ এই প্রতিটি কাজই প্রত্ননিদর্শনকে ধ্বংসের হাত হতে উদ্ধার করে অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সুতরাং এই প্রতিটি ধাপকে একত্রে সংরক্ষণ বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণ হিসাবে ভারতের মহাবলীপুরাম ও কনরকের মন্দির দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয় মন্দির সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত। ফলে সমুদ্রের প্লাবন এবং ভূগর্ভস্থ ও বাতাসবাহিত লবণের প্রভাবে মন্দিরগুলো সংক্রামিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় মন্দির দুটির সংরক্ষণ কাজের অংশ হিসাবে নিয়মিত দেয়ালের

---

২৮. Dr. I.K. Sharma, Director, Antiquity of the Archaeological Survey of India, 'Conservation of historical monuments,' *Indian Calling*, New Delhi, December, 1992, p.8

বহির্দেশ থেকে লবণের প্রলেপ অপসারণসহ লবণ সংক্রমণ প্রতিষেধক আরোপিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মন্দিরগুলোর চারদিকে Casuaria নামক লবণ শোষক বৃক্ষের বনায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।[২৯] সুতরাং সংরক্ষণ কাজ বলতে মূলত বুঝায়, একটি গবেষণাগার, একটি রসায়নাগার ও একটি প্রকৌশলী শাখার যৌথপ্রয়াস।

আলোকচিত্র –২৪



পাহাড়পুর বিহার, খনন ও সংরক্ষণের পর

সংরক্ষণের গুরুত্ব

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, অম্ল, খনিজ লবণ, অঙ্গার ও উদ্ভিদজাত সংক্রমণ এবং তাপ-চাপের প্রভাবেই মূলত প্রত্নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতিগ্রস্ততা বলতে ভেঙ্গে যাওয়া, রঙের বা কাঠামোর পরিবর্তন হওয়া, কোন একটি অংশ বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি বোঝায়। কিন্তু এছাড়াও আরও বহুকারণ রয়েছে যারজন্য প্রত্নিদর্শনাদির অস্তিত্ব দিন দিন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এসব কারণের মধ্যে বিবিধ নির্মাণ কাজ পরিচালনা, কৃষি জমির সীমানা সম্প্রসারণ, নদীর ভাঙন, অতিবৃষ্টি , তাপমাত্রার দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি, ভূমিকম্প, বন্যা, নির্মাণ কাজের উপকরণ (ইঁট, পাথর) সংগ্রহ, অসচেতন মানুষের অহেতুক কৌতূহল, আর্দ্রতা, বায়ু দুষণ, তীব্র আলোক সম্পাত, যুদ্ধবিগ্রহ এবং আরও বহুকারণ রয়েছে। সুতরাং সংরক্ষণ কাজের পরিধি দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই সংরক্ষণ কার্যক্রমটিকে কেবল এর আভিধানিক অর্থের উপর নির্ভর করে বিচার করলেই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে না। বরং বলা চলে,

২৯. Ibid

সংরক্ষণ হলো একটি ধারণা যার মধ্যে প্রত্ননিদর্শনকে নানা প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখার উপায় নিহিত রয়েছে। সুতরাং এই ধারণা অনুযায়ী সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করা কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ। তাই এ কাজে এক দেশের সাথে অপর দেশের বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

ঐতিহাসিক ইমারতাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনটি চলতি শতকের তিরিশের দশক থেকেই গুরুত্ব লাভ করে আসছে। ফলে সর্বপ্রথম ১৯৩১ সালে এ বিষয়ে এথেন্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'ইনটারন্যাশনাল কংগ্রেস অন মডার্ণ আর্কিটেকচার' গঠিত হয়। এই কংগ্রেস ১৯৩৩ সালে 'টাউন প্লানিং চার্টার' প্রণয়ন করে এথেন্সের মূলনগর পরিকল্পনা সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় করে। এর অনুবৃত্তিতে ১৯৩৫ সালে লীগ অব নেশনস কর্তৃক 'ওয়াশিংটন প্যাক্ট' ঘোষণা করে ঐতিহাসিক ইমারতসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রয়াসকে উজ্জীবিত করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালে পৃথিবীর জাদুঘরগুলো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আইকম (ICOM = International council of Museums) নামে আর একটি পেশাদারি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এভাবে সংরক্ষণ কার্যক্রমের সীমা ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকল। কিন্তু এ কার্যক্রম পঞ্চাশের দশকে আরও বেগবান হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চাশের দশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মূলভূমিকা পালন করেছে ইউনেস্কো। এসব কাজের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রাক্কালে সাংস্কৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের উপর অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের 'হগ কনভেশন' এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক রীতিনীতি বিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়ন অন্যতম। অধিকন্তু ১৯৫৭ সালে প্যারিসে ঐতিহাসিক ইমারতের স্থপতি ও বিশেষজ্ঞগণের কংগ্রেসে আরও কিছুসংখ্যক সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক গঠিত হলো আইকক্রম (ICCROM- International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of the Cultural Property) ১৯৬৪ সালে এই কংগ্রেস ভেনিস চার্টার (The International Restoration Charter) প্রণয়ন করে। অতপর ১৯৬৫ সালে গঠিত হয় আইকমস (ICOMOS = International Council for Monuments and Sites)। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আইক্রক্রম। কারণ এর মূলকার্যক্রমে সংরক্ষণের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল ; যথা- (১) দলিলাদি সংগ্রহ, চর্চা এবং প্রচারকরণ (২) সহযোগিতা প্রদর্শন, উৎসাহিত করণ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন, (৩) বিশেষজ্ঞ যোগান এবং (৪) প্রশিক্ষণ প্রদান। এ প্রতিষ্ঠান জন্মের প্রথম লগ্নেই প্রায় শতাধিক সদস্য ও সহযোগী সদস্য রাষ্ট্র তালিকাভুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়।

ষাটের দশকের সূচনালগ্নে ইউনেস্কোর স্থাবর ও অস্থাবর প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণের নতুন সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। ১৯৭০ সালে সাংস্কৃতিক সম্পদ বেআইনীভাবে হস্তান্তর, আমদানি ও

রপ্তানি নিষিদ্ধকরণ ও প্রতিরোধ করণের উপর একটি অধিবেশন পরিচালনা করে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয় World Cultural and Natural heritage Convention. এর পরপরই বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচ্য ইমারত, ইমারতগুচ্ছ এবং প্রত্নস্থলের তালিকা প্রণয়নের শর্তাদি প্রণীত হয়। একইসাথে তালিকাভুক্ত সাংস্কৃতিক সম্পদগুলোর জন্য সাহায্য প্রদানের মাধ্যম ও প্রক্রিয়া সম্পর্কেও নীতিমালা প্রণীত হয়েছিল।

১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বঐতিহ্য তালিকায় স্থানলাভকারী প্রত্নস্থলের সংখ্যা চারশয়েরও অধিক ছিল। এরমধ্যে এ যাবৎ সশস্ত্র সংঘর্ষকালীন সময়ে বিধ্বস্ত ক্রোয়েশিয়ার দাবরুব্রিক ও কম্বোডিয়ার এ্যানকরভাট মন্দিরাদি, আসওয়ান বাঁধ থেকে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আবু সিম্বেল মন্দির এবং অগ্নুৎপাতে ধ্বংসোন্মুখ ইন্দোনেশিয়ার বরবিদুর মন্দির রক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত রয়েছে আরও সাতটি প্রত্নস্থলে। এসব প্রত্নস্থলগুলো হলো নেপালের কাঠমুণ্ড উপত্যকা, পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো, ভিয়েতনামের হিউ, যুগোশ্লাভিয়ার কুতুর, ইয়ামেনের সানা ও সিবম এবং বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও বাগেরহাট। ইউনেস্কোর কার্যাবলির আলোকে সংরক্ষণের ধরনটি কেমন তা তলিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে পরবর্তী অংশে বিশ্বঐতিহ্য তালিকাভুক্ত বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও বাগেরহাট প্রত্নস্থল দু'টিতে ইতিমধ্যে সম্পাদিত কাজগুলোর রূপরেখা তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সংরক্ষণ

সত্তরের দশকে পাহাড়পুর ও বাগেরহাট নামক দু'টি প্রত্নস্থলকে বিশ্ব তালিকাভুক্ত করণের জন্য ইউনেস্কোর নিকট আবেদন প্রেরণ করা হলে পর পর কয়েক দফা বিশেষজ্ঞ দল প্রত্নস্থল দু'টি পরিদর্শন করেন। এই বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন অনুযায়ী আশির দশকে প্রত্নস্থল দু'টি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো একটি মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই মহা-পরিকল্পনাটিতে মোটামুটি যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো হলো।

(১) খনন, (২) রাসায়নিক সুস্থিতকরণ, (৩) কাঠামোগত সুস্থিতকরণ, (৪) পরিবেশ উন্নয়ন, (৫) জাদুঘর স্থাপন, (৬) রসায়নাগার স্থাপন, (৭) সংরক্ষণ কাজে অংশ গ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, (৮) সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং (৯) দলিলজাতকরণ। সবশেষে এসব কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য একটি প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে।

মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নকারী বিশেষজ্ঞগণের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পাহাড়পুরস্থ বিহারের ক্ষতিগ্রস্থতার মূল কারণ, ইটের দেয়ালে দ্রবণীয় খনিজ লবণের সংক্রমণ। আর এ সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় মন্দিরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে এ সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। এই সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ মূলত দু'টি। (ক) মন্দিরের উপরাংশে ষাটের দশকে পরিচালিত পুনঃনির্মাণ কাজে যে চুন ব্যবহৃত হয়েছিল তাতে প্রচুর পরিমাণ খনিজ লবণ বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া পুনঃনির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটগুলোও অপ্রতুলভাবে দগ্ধ এবং সাধারণ মাটি দিয়ে তৈরি হওয়ায় এগুলো রন্ধ্রবহুল। এই রন্ধ্রগুলো বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আসা লবণ

সংরক্ষণের ভাগাড় হিসেবে কাজ করছে। (খ) বিহার চত্বরে বর্ষা মৌসুমে চারদিকের কৃষি জমি হতে পানি গড়িয়ে এসে সঞ্চিত হয়। আজকাল অধিক ফলনের জন্য কৃষি জমিতে বহুল পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই সারের একটি বিশেষ উপাদান খনিজ লবণ। স্বভাবতই বিহার চত্বরে বর্ষা মৌসুমে খনিজ লবণের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। বাষ্পীয়ভবন প্রক্রিয়ায় এই লবণ দেয়ালের গায়ে সঞ্চিত হয়। অপরদিকে দেয়ালের কোন কোন অংশে বছরের কোন সময়ই রোদ পড়ে না এবং সেঁতসেঁতে থাকে। ফলে এসব অংশে প্রচুর পরিমাণ লাইকেন আলজি, মস ইত্যাদি উদ্ভিদজাত সংক্রমণ অব্যাহত থাকে।

লবণ ও উদ্ভিদজাত সংক্রমণের ফলে ইঁট ও ইটের বাঁধন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে কেন্দ্রীয় ইমারত ধ্বসে পড়ার আশু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দেয়ালের কোন কোন স্থানে আশঙ্কাজনক-ভাবে ফাটল ও বহির্মুখী স্ফিতি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে অলঙ্কারযুক্ত ইঁট ও পোড়ামাটির ফলকগুলোর শৈল্পিক শৈলীগুলো ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছিল। এমনকি ইঁটগুলো ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে পড়াসহ কালচে রূপ ধারণ করতে শুরু করেছিল। এসব অবস্থা নিরসন কল্পে বিহার চত্বরে বাইরে থেকে পানি প্রবেশ রোধ করা এবং নিয়মিত চত্বর থেকে পানি অপসারণের উপযোগী একটি নর্দমা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অন্তরীণ অবস্থায় থাকা মূল বিহার চত্বরটিও একই সাথে অনাবৃতকরণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছিল, সংক্রামিত ইঁট, ফলক ও দেয়ালের অংশবিশেষ অপসারণ করে নতুনভাবে নির্মিত এবং সুস্থিতকরণ শেষে প্রতিস্থাপন করা হবে।

ইউনেস্কো প্রণীত মহা-পরিকল্পনা অনুযায়ী অদ্যাবধি লক্ষমাত্রা অর্জিত না হলেও আংশিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিহার চত্বরটি থেকে খননের মাধ্যমে প্রচুর মাটি অপসারণ করে একটি নির্ধারিত সমতল সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে চত্বরের বিভিন্ন অংশে নতুন কিছু স্থাপত্য নিদর্শন অনাবৃত হয়েছে। বিহারের বাইরের চারপাশেও জমি সমতল ও বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে পরিবেশ উন্নয়ন করা হয়েছে। আশঙ্কাজনকভাবে টিকে থাকা দেয়ালের বিভিন্ন অংশে পুনরুদ্ধার কাজ পরিচালনার ফলে উপস্থাপনা ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি বিহারের অদূরবর্তী পূর্বদিকে চারকক্ষ বিশিষ্ট একটি আকর্ষণীয় জাদুঘর স্থাপন করে খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিসহ বিহারটির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট তুলনামূলক তাৎপর্যবহভাবে দর্শকগণের নিকট উপস্থাপন করার কাজও শেষ হয়েছে। মহা-পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বাগেরহাট প্রত্নস্থলটির প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।

আপেক্ষিক তাৎপর্য ও বাংলাদেশের ভূমিকা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সংরক্ষণ কার্যক্রম মূলত একটি ধারণা। এই ধারণার রূপকার সংরক্ষক। তাকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা পেশাদারিত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। মনে রাখতে হবে একজন হাতুরে ডাক্তার যেমন একজন রোগীকে নিজের অজান্তে হত্যা করতে পারেন তেমনি একজন আনাড়ি সংরক্ষক সংরক্ষণের পরিবর্তে সাধারণ মেরামত কাজ পরিচালনা করে একটি

সাংস্কৃতিক সম্পদের ধ্বংসের কারণ হতে পারেন। সুতরাং কোন সংরক্ষণ কাজই গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতীত পরিচালনা করা উচিৎ নয়। পরিকল্পনাটি অবশ্যই পর্যাপ্ত আলোকচিত্র ও নকশা সংবলিত প্রামাণ্য দলিলজাতকৃত সুনির্দিষ্ট অবস্থার ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে। নতুবা মূল নিদর্শনটি কি ছিল এবং সংরক্ষণের পর তা কি দাঁড়ালো এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ঘটছে। খনন প্রতিবেদন প্রণয়ন বা প্রকাশ না হতেই পরিচালিত হচ্ছে সংরক্ষণ। প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। কারণ একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ব্যতীত অন্যকোন প্রতিষ্ঠানের সর্বাধুনিক সংরক্ষণ কাজ পরিচালনার উপযোগী রসায়নাগার পর্যন্ত নেই।

প্রদর্শনী

এই পুস্তকের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, লিপিতাত্ত্বিক সূত্রাদির উপর নির্ভর করে ইতিহাসের কেবল একটি কঙ্কালের কিছু বিচ্ছিন্ন হাড়াহাড্ডির সন্ধান লাভ করা যায়। এই হাড়হাড্ডিগুলো যথাযথভাবে জোড়াতালি দিয়ে মূল কঙ্কালটি তৈরি করার উপাদান তৈরি হয় প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। কিন্তু এই কঙ্কালটি পুস্তকের পাতায় ছাপার হরফে বা গবেষকের গবেষণাগারে কালির আঁচড়ে বন্দি থাকে। পাঠককে কেবল আঁচ করে নিতে হয় কঙ্কালের রূপরেখা। কিন্তু যদি ঐ হাড়হাড্ডি এবং ওগুলো জোড়াতালি দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় সরঞ্জামাদি প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায় তাহলে পাঠক হয়ে উঠেন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। তলন পুস্তকের পঠিত বিষয় তার নিকট সহজবোধ্য হয়ে উঠে। কেটে যায় ভাষার দ্ব্যর্থবোধক জটিলতা অথবা অসম্পূর্ণতার কুয়াশা। আর এরসাথে ইতিহাস পঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অর্জন করে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা দর্শকের মধ্যে জন্ম দেয় জাতি হিসাবে আত্মতৃপ্তি যা থেকে প্রস্ফুটিত হয় দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। ইতিহাস-ঐতিহ্যবিষয়ক বাস্তব শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশপ্রেম সৃষ্টির এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের একমাত্র মাধ্যম জাদুঘর।

মূলত জাদুঘর হচ্ছে একটি নিয়মিত প্রদর্শনী ব্যবস্থা যার মাধ্যমে এক বা একাধিক বিষয় সহজ, বস্তুনিষ্ঠ ও উপভোগ্যভাবে দর্শকগণের নিকট উপস্থাপিত করার আয়োজন করা হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস, শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা এবং আরও বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেবল বাংলাদেশেই রয়েছে সাধারণ জাদুঘর, প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, শিশু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর, নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, লোকশিল্প জাদুঘর, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব নির্ভর জাদুঘর এবং আরও বহুধরনের জাদুঘর। এগুলোর মধ্যে আকার, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার বিচারে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরই (সাবেক ঢাকা জাদুঘর) বোধকরি সবচেয়ে বড় স্থানের দাবিদার। বর্তমানে ধরন বিচারে যদিও এটি একটি সাধারণ জাদুঘর তথাপি এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের মধ্যদিয়ে। আর সেই স্মৃতি হিসাবে আজও এই জাদুঘরে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক শাখা বিদ্যমান। অবশ্য দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাদুঘর বরেন্দ্র জাদুঘর জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের ঐতিহ্যই ধরে

রেখেছে। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব জাদুঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, দিনাজপুর জাদুঘর, রংপুর জাদুঘর ও চাখার জাদুঘর অন্যতম।

ঢাকা জাদুঘর (বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ও বরেন্দ্র জাদুঘর এই শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান চালিয়ে স্ব স্ব নিদর্শনে সমৃদ্ধ। এসব সংগ্রহের মধ্যে ফেণি জেলার ছাগলনাইয়ায় প্রাপ্ত একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় হাতিয়ার এবং নরসিংদি জেলার ওয়ারিবটেশ্বর-কেন্দুয়ায় প্রাপ্ত পুরা-ঐতিহাসিক নমুনার লোহার কুঠারসহ আদি-ঐতিহাসিক যুগীয় ছাপাঙ্কিত মুদ্রাগুলো সর্বাধিক প্রাচীন। অন্যান্য নিদর্শনাদির মধ্যে বিক্রমপুর (মুন্সিগঞ্জ), সম্ভার (সাভার), চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা চাখার), চন্দ্রবর্মণকোট (কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ) প্রভৃতি প্রাচীন রাজধানীগুলোর স্মৃতিবহ বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শনও যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দারু ভাস্কর্যের যে অনন্য নিদর্শন সংগৃহীত ও প্রদর্শিত আছে তা অন্যান্য জাদুঘরে একান্তই বিরল। অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রহের মধ্যে মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, সিতাকোট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলোতে খননে উদ্ধার প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শনাদি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তামা ফলক, মুসলিম শাসনামলের কয়েকটি শিলালিপি, বিপুল পরিমাণ মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কারযুক্ত ইট, ভাস্কর্য এবং আরও বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত।

বরেন্দ্র জাদুঘরের মূলসংগ্রহ গড়ে উঠেছে বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রত্ন নিদর্শনাদি দিয়ে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এর সংগ্রহ এত সমৃদ্ধ যে কেবল নওগাঁ জেলাধীন নিয়ামতপুর থানা থেকে সংগৃহীত মূর্তির সংখ্যাই পঞ্চাশটিরও অধিক। বাংলাদেশে এ যাবৎ কালীন প্রাপ্ত কালো পাথরে নির্মিত সবচেয়ে বড় আকারের (১.৮ মিঃ × ৯১ সেমিঃ) সূর্য মূর্তিটিও এ জাদুঘরে প্রদর্শিত আছে। এ জাদুঘরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহের মধ্যে আরও আছে গুপ্ত শাসনামলের শিলাশৈলী বিশিষ্ট ব্রঞ্জের মঞ্জুশী (মহাস্থানের নিকটবর্তী বলাইধাপে প্রাপ্ত), আলেকজাণ্ডার কানিংহামের দেখা মহাস্থানগড়ের জৈন তীর্থকর মূর্তি, বিহরাইলে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধ (আঃ খ্রিঃ পাঁচ শতক) এবং যজ্ঞ মূর্তি। তাছাড়া বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ চলতি শতকের গোড়ার দিকে মাহিসন্তোষ ও কুমারপুরে অবস্থিত কয়েকটি প্রত্নস্থলে খনন পরিচালনা এবং পাহাড়পুর বিহারের খনন কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল। ফলে উল্লিখিত স্থানে খননে প্রাপ্ত কিছু প্রত্নবস্তু ও বরেন্দ্র জাদুঘরের সংগ্রহে ঠাঁই পেয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে আকস্মিকভাবে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু ছাপাঙ্কিত মুদ্রা অন্তর্ভুক্ত।

দিনাজপুর জাদুঘরের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে দিনাজপুর-বগুড়া-রংপুর অঞ্চলসহ ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের কিছু সংগ্রহ নিয়ে। এর সিংহভাগই মূর্তি। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে কিছু বেলে পাথরের থাম, একটি বেলে পাথরের অলসকন্যা ও গন্ধমাদভ বহনকারী একটি হনুমান মূর্তি ব্যতিক্রমধর্মী সংগ্রহ হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে। তবে এই জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে দেশের সর্বাধিক সংখ্যক তীর্থঙ্কর মূর্তি এবং বানগড় (গঙ্গারামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর) নামক

প্রত্নস্থলের নিদর্শনাদি। রংপুর জাদুঘরের সংগ্রহগুলোও মোটামুটি দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এ জাদুঘরে রয়েছে প্রচুরসংখ্যক আদিবাংলায় লেখা পাণ্ডুলিপি। প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে এমন অন্যান্য জাদুঘরগুলো মূলত প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক জাদুঘর। এ ধরনের জাদুঘরগুলোর মধ্যে পাহাড়পুর জাদুঘর, মহাস্থান জাদুঘর, ময়নামতি জাদুঘর ও লালবাগ দুর্গ জাদুঘর অন্তর্ভুক্ত। মূলত এসব জাদুঘর প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রত্নস্থলে খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু প্রদর্শন ও প্রত্নস্থলের পরিচিতি পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রত্নস্থলের নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে আকস্মিকভাবে উদ্ধার প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোও এসব জাদুঘরে ঠাই পেতে শুরু করে। ফলে প্রতিটি প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক জাদুঘরেরই বর্তমানে একটি বিরাট সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে।

প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক জাদুঘরগুলোর মধ্যে একমাত্র ময়নামতি জাদুঘরটির সংগ্রহে বেশকিছু প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার রয়েছে। ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে প্রাপ্ত এসব প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি। এসব হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ময়নামতি জাদুঘরসহ অন্যান্য প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক জাদুঘরগুলোর অবশিষ্ট নিদর্শনগুলোর সময়কাল খ্রিস্টীয় ছয় শতক থেকে উনিশ শতকে ন্যস্ত করা যায়। এ ছাড়া সম্প্রতি বরিশালের চাখার জাদুঘরে বরিশাল বিভাগ থেকে কিছু নতুন ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর। এই জাদুঘরে ময়নামতি, পাহাড়পুর ও মহাস্থানে প্রাপ্ত কিছু প্রতিনিধত্বকারী প্রত্ননিদর্শন প্রদর্শিত আছে। এছাড়া এর একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালাও আছে। এসব সংগ্রহের সিংহভাগ গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন আকস্মিক আবিষ্কার থেকে। এসব আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুদ্রা, মূর্তি, কামান, পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কারযুক্ত ইঁট, স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ ও কিছু দারুশিল্পজাত প্রত্নবস্তু অন্তর্ভুক্ত। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংগ্রহ হলো একটি মাছের ফসিল। চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকস্থ এলাকা থেকে সংগৃহীত এ ধরনের সংগ্রহ অন্যকোন জাদুঘরে নেই।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাদুঘরে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শনাদি সংগৃহীত রয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি জাদুঘর কিছু না কিছু আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান পরিচালনা করছে। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের রয়েছে একটি আধুনিক রসায়নাগার। ফলে জাদুঘর কার্যক্রমের মাধ্যমে কেবল প্রত্ননিদর্শন প্রদর্শনী বা উপস্থাপনের কাজ নিষ্পত্তি হচ্ছে বললেই সবকথা বলা হয় না বরং বলতে হয়, প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাদুঘরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গবেষণা

প্রত্নতাত্ত্বিক ও জাদুঘর ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের পরও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অবশিষ্ট থেকে যায়। এটি হচ্ছে প্রতিটি নতুন কর্মকাণ্ডের ফলাফল সম্পর্কে ইতিহাস-ঐতিহ্যের গবেষকগণকে অবহিতি প্রদান। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, ফলাফল প্রদানের উপায়টি কি হবে? উত্তরে বলব, অঙ্কের ফলাফল নির্ণয় করতে হলে যেমন বিভিন্ন সংখ্যাকে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ করতে হয় ; তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল বের করতে হলে অনুসন্ধানার্থে আবিষ্কার, জরিপ, খনন ইত্যাদির সাথে পূর্বথেকে জ্ঞাত বহুতথ্যের চুলচেরা হিসেবে নিকেষ করতে হয়। আর এরই নাম গবেষণা। কোন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য পরিচালিত এ ধরনের গবেষণার রূপটিকে প্রতিবেদন বলা যেতে পারে। এ প্রতিবেদনটিই পরবর্তী পর্যায়ে ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশনা আখ্যায় আখ্যায়িত হয়। সুতরাং প্রতিটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকাশনাকেই একটি 'বিজ্ঞানধর্মী সংবাদপত্র' হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

এ কথা বলাবাহুল্য যে, একটি প্রকৃত বিজ্ঞানধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন অনেকাংশেই কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক। অন্যদিকে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কখনও খুব গৌণ, আবার কখনও- বা মুখ্য ধরনের তথ্য আবিস্কৃত হতে পারে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, সদ্য আবিষ্কৃত তথ্যগুলো প্রকৃতির দিক থেকে যেমন হতে পারে বিক্ষিপ্ত ও নির্লিপ্ত, তেমনি সংখ্যার বিচারে বিপুল অথবা নেহাৎ নগণ্য। অথচ প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রাক্কালে এগুলোকেই করতে হয় পরস্পর সন্নিবেশিত। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম শুরু হয় অনুমানের ভিত্তিতে এবং প্রতি মুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয় অনিশ্চিত পরিস্থিতির অথচ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হয় নির্ধারিত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুযায়ী। আবার প্রতিবেদন প্রণয়নের মূলভিত্তি পর্যাপ্ত যুক্তি, সাক্ষ্য ও তথ্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের সাফল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানেই শেষ নয়, প্রতিবেদনের ভাষাও হতে হয় একইসাথে বিশ্লেষণাত্বক ও সহজবোধ্য। সুতরাং একটি সফল প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদন তথা প্রকাশনার মধ্যে নিম্নোক্ত বিন্যাস বজায় রাখার প্রয়োজন হয়।

প্রত্ননিদর্শনাদির প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা

প্রত্ননিদর্শনটি যদি কোন প্রত্নস্থল হয় তবে প্রতিবেদনের শুরুতেই নামকরণ, অবস্থান, সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা ও ভূপৃষ্ঠ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মাপসহ স্থানবিবরণ) ইত্যাদির উল্লেখ করতে হবে। একইসংগে এর ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, জীবজগৎ, আবহাওয়া, এবং নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত করে এর মাধ্যমে প্রত্নস্থলটির আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হয়। অন্যদিকে প্রত্নবস্তুর ক্ষেত্রেও প্রথমেই প্রাপ্তিস্থানের বিশদ বিবরণ প্রদানসহ নিদর্শনটির প্রাপ্তিকালীন অবস্থার বিবরণ, আকার, আয়তন, উপকরণ, নমুনা-

প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবহার উপযোগিতা, সাংস্কৃতিক নৈকট্য, আনুমানিক সময়কাল ইত্যাদি ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হতে হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য

আগেই বলা হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম বহুধরনের হয়ে থাকে। এরমধ্যে জরিপ, খনন, সংরক্ষণ, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব কার্যাবলি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনায় দেখা গেছে প্রতিটি কাজ সম্পাদনের জন্য একাধিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও বিবিধ পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, প্রত্নস্থল অথবা প্রত্নবস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীও একই দেশে বিভিন্নসময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোন একটি প্রতিবেদনে যদি সম্পাদিত কাজের ধরন, অনুসৃত পদ্ধতির ব্যাখ্যা এবং পদ্ধতিটি প্রয়োগের কারণ ইত্যাদি উল্লেখ না করা হয় তবে প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় সহজবোধ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম থাকে।

একটি প্রতিবেদনে যখনই সম্পাদিত কাজের ধরন উল্লেখ করা হয়, তখনই প্রশ্ন আসে কাজটি সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রশ্নটির উত্তরে এক বা একাধিক বিষয়ের অবতারণা করা যায়। আপাতত এসব বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হলো। ধরা যাক, আমাদের দেশে খ্রিস্টীয় ছয় থেকে আট শতকের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত সময়ে রাজত্বকারী রাজবংশগুলোর ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার মতো তথ্যের অভাব আজও অত্যন্ত প্রকট। একইভাবে, পুরা-ঐতিহাসিক যুগের বাংলাদেশ সম্পর্কেও আমরা একেবারেই অজ্ঞ। এমন আরও বহুসমস্যাই বাংলাদেশের ইতিহাসে বিদ্যমান। তাই খনন বা জরিপ পরিচালনার পূর্বে আমরা যদি এ ধরনের কোন একটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি শুরু করি তাহলে কাজটিতে অংশগ্রহণকারীগণ সেইদিকেই সজাগ থাকবেন এবং এর ফলে সম্পাদিত কাজটির স্বার্থকতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করা সহজ হয়। তাই যে কোন প্রতিবেদন প্রণয়নের শুরুতেই সম্পাদিত কাজটি কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল সে বিষয়টির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

অনুসৃত পদ্ধতি

একটি বিশেষ একঘেঁয়ে পদ্ধতি সকলক্ষেত্রে সফল ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হয় না। তাই প্রত্নস্থল বা প্রত্নবস্তুর নমুনার সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গতি বজায় রেখে প্রতিক্ষেত্রের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতিটি বেছে নেওয়ার মধ্যেই অভীষ্ট ফলাফল লাভের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এমতাবস্থায় একজন দক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ তার কাজ নিষ্পত্তির জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতিটিই বেছে নেবেন এটাই অভিপ্রেত। তাই যে কাজে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় সে পদ্ধতিটি সংশ্লিষ্ট কাজের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর অনুপস্থিতিতে প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা ও সহজবোধ্যতা বিনষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ

রাখা প্রয়োজন যে বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও সহজবোধ্যতা প্রতিবেদনের সুখপাঠ্যতা এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক।

প্রতিপাদ্য প্রত্ননিদর্শনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন হয় স্তরবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। প্রতিবেদনে আরও সংযোজন করতে হবে প্রতিটি স্তরে সঞ্চিত প্রত্ননিদর্শনের বিবরণ। এ বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে আবার প্রত্ননিদর্শনগুলোকে দু'টি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে, যথা– প্রত্নবস্তু ও ইমারত। ইমারতের আলোচনায় স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, নক্শা, নির্মাণসামগ্রী, অলংকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে হবে। অপরদিকে, প্রত্নবস্তুগুলোকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর ব্যবহারিক উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রত্নবস্তুগুলোর নমুনা বিভাজন করত আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। শেষাবধি একটি প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত এক নমুনাভুক্ত সকলপ্রকার প্রত্নবস্তু একটি অভিন্ন কাজে ব্যবহার উপযোগী ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন–পুঁতি, মৃৎপাত্র, খেলনা, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। অতপর প্রতিটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রত্নবস্তুগুলোকে তৈরির উপকরণ, প্রযুক্তিবিদ্যা, অলঙ্করণ ও ব্যবহার উপযোগিতার আওতাভুক্ত একটি অভিন্ন ইনডাস্ট্রির (Industry) অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। ভারত-উপমহাদেশের এ ধরনের অতি পরিচিত ইনডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে 'আহার মৃৎপাত্র ইনডাস্ট্রি, (Ahar Pottery Industry), সোনিয় পাথরের হাতিয়ার ইনডাস্ট্রি (Soan Stone Industry) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একই ইনডাস্ট্রির অভিব্যক্তি প্রকাশসূচক প্রত্নবস্তুগুলোর ঐতিহ্য যদি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাশাপাশি অনেকগুলো প্রত্নস্থলে পাওয়া যায় তখন ঐ ইনডাস্ট্রির ঐতিহ্যকে কালচার (Culture) বলা হয়। এমন একটি বিশেষ কালচারের ধারা যদি একটি অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকে তখন ঐ সংস্কৃতির (কালচার) ধারাটি নির্দেশ করতে সিভিলাইজেসন (Civilization = সভ্যতা) অভিধা ব্যবহৃত হয়।[৩০]

ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তু এবং ইমারতের প্রকৃতি নির্ণয় করা তুলনামুলকভাবে সহজ। কারণ এ যুগে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজত্বকারী একটি বিশেষ রাজবংশের শাসনামলে সাধারণত কিছু সুস্পষ্ট শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলা-ভারত ভূখণ্ডে রাজত্বকারী গুপ্ত (খ্রিস্টীয়

---

৩০. চলতি শতকের গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর তীরবর্তী মহেনজোদারো ও ইরাবতীর তীরবর্তী হরপ্পা নামক প্রত্নস্থলগুলোর প্রত্ননিদর্শনগুলো আবিষ্কার শুরুর পর্যায়ে 'সিন্ধু সংস্কৃতি' নামে অভিহিত হতো। ক্রমেই পার্শবর্তী আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নস্থলে একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহক আরও কিছু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যেতে শুরু করেছিল। তখন এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা নির্দেশ করতে 'সিন্ধু সভ্যতা' নামটির উদ্ভব সূচিত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে এ সভ্যতার বিস্তৃতি ভারতের গুজরাট ও হরিয়ানা, এমনকি উত্তরপ্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যেও লক্ষ করা গেছে। এসব উপর্যুপরি আবিষ্কার ও পুনঃআবিষ্কারের ফলে 'সিন্ধু সভ্যতা' নামটি অধুনা অচল হয়ে পড়েছে এবং এর স্থলে প্রথম আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলের নাম অনুসারে 'হরপ্পা সভ্যতা' অভিধাটি সমাদৃত হতে শুরু করেছে।

রেখাচিত্র – ৩২



পাল আমলে তৈরী মূর্তির অলঙ্কার

চার-ছয় শতক) ও পাল (খ্রিস্টীয় আট-বার শতক) শাসনামলে তৈরি মূর্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনার উপযোগী কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে।[৩১]

গুপ্ত-শাসনামল	পাল-শাসনামল
বেলে পাথরে তৈরি, ডিম্বাকার স্বর্গীয় দীপ্তিময় প্রসন্ন মুখ ও অর্দ্ধ নিমীলিত চাহনি	কালো পাথর, কিঞ্চিত গোলাকার তৃপ্তির আমেজ মাখা মুখমণ্ডল ও আনত চাহনি
শারীরিক গড়নে মাঝারি উচ্চতাসহ হৃষ্টপুষ্ট ভৌল বজায় থাকে	নমনীয় হৃষ্টপুষ্টতার সাথে সামঞ্জস্যময় লম্বাটে প্রকৃতা প্রকাশ পায়
গহনার স্বল্পতা	তুলনামূলক বেশি পরিমাণ গহনা
এক প্রস্ত বিশিষ্ট সরল পুঁতির মালা	একাধিক প্রস্ত বিশিষ্ট জটিল অলঙ্করণের হার
খর্বাকার শিরস্ত্রান	অপেক্ষাকৃত লম্বা শিরস্ত্রান
উপবীত ও বনমালার আকৃতি স্বাভাবিক	অস্বাভাবিক লম্বা বর্নমালা।
বক্রাকার উর্দ্ধদেশ বিশিষ্ট পট্টঠেস	কৌণিক প্রকৃতা বিশিষ্ট শিরোদেশের পট্টঠেস
পরিচ্ছদ স্বচ্ছ ও আটোসাটো পট্টঠেসের বর্ডার নিরাভরণ	পরিচ্ছদের বিন্যাস গাঢ় ও পরিধানের ধরন তুলনামূলকভাবে সামান্য ঢিলেঢালা অলঙ্কৃত

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসূচক প্রলক্ষণগুলো প্রাথমিকভাবে একটি লিপিবিহীন মূর্তির সময়কাল নির্ধারণ করা সম্ভব। এরপর মূর্তিটির প্রাপ্তিস্থল ঐ স্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং অন্যান্য প্রত্ননিদর্শনগুলোর তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনের বর্ণনাকে ধীরে ধীরে উপসংহারের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, প্রতিটি প্রত্নবস্তু ও ইমারত কোন না কোন বিস্মৃত মানুষের সৃষ্টি ভোগের নিমিত্তে বিস্মৃত মানুষ এগুলো প্রস্তুত করেছে। অন্যদিকে সবসৃষ্টিই স্রষ্টার অভিরুচির ধারক। এজন্যই প্রস্তুতকৃত প্রতিটি নিদর্শনে প্রস্তুতকারীর ব্যক্তিগত জীবনের এক বিমূর্ত ছবি প্রচ্ছন্ন থাকে। একইসাথে ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর আচার, আচরণ, জীবন প্রণালি, রীতিনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এগুলোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই প্রস্তুতকারীকে তার উৎপন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করতে হতো। তাই একটি প্রত্নবস্তু ও ইমারত কেবল একটি ব্যক্তিরই নয় বরং তার সমসাময়িক কালের আর্থ-

---

৩১. গাঙ্গেয় উপত্যকার সারনাথ ও মথুরাকে কেন্দ্র করে গুপ্ত শানামলের মূর্তি তৈরির ভিত রচিত হয়েছিল। অপরদিকে পাল মূর্তিশৈলীর জন্ম ও লালন ভূমি নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল। ফলে এ দুটি শাসনামলের মূর্তিশৈলীর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বজায় ছিল। গুপ্ত শাসনামলের মূর্তিগুলোতে রয়েছে নিরাভরণ ও ভাবগাম্ভীর্যময় শৈল্পিক সৌকর্য। আর পাল-আমলের নিদর্শনে রয়েছে অলঙ্কারিক ও সোল্লাসে প্রকাশ্যমান সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ।

সামাজিক, ধর্মীয়-রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল বিষয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। এভাবে দেখা যাবে, যে কোন প্রত্ননিদর্শনের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে গোটা প্রত্ননিদর্শনের সমসাময়িক কালের সকল অশরীরী অভিব্যক্তিগুলোও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই প্রতিবেদিত বিষয়ের মধ্যে উক্ত আলোচনার যে কোন একটি অন্তর্ভুক্ত না করা হলে প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয় সুসংহতি বিহীন হয়ে পড়ে।

সমন্বয়

যেকোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপসংহার। কিন্তু সঠিক উপসংহারে পৌছার পূর্বশর্ত সমন্বয়। সমন্বয় বলতে বোঝায়, যে কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রণীত হবে সে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল নতুন তথ্যের অন্তর্নিহিত সূত্রাদির পারস্পরিক সম্পর্কের মূল উৎসটি খুঁজে বের করা। এ প্রসঙ্গে নিচের উদাহরণটি তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি প্রত্নস্থলের তৃতীয় স্তর থেকে একটি বেলে পাথরে তৈরি বিষ্ণু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মূর্তির শৈল্পিক বিন্যাস (ডিম্বাকার মুখ, ভারসাম্যময় আটোসাটো গড়ন, একপ্রস্ত বিশিষ্ট কণ্ঠহার) ও তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপাদান (বেলে পাথর) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, মূর্তিটি গুপ্ত শাসনামলে প্রচলিত শৈলীর ধারা বহন করছে। দ্বিতীয়ত, এর সাথিসামগ্রী হিসাবে এমন কিছু ইঁট পাওয়া গেল সেগুলোর মাপ ইতিপূর্বে গুপ্ত শাসনামলের (আঃ ৩২৯-৫০০ খ্রিঃ) বলে প্রমাণিত ইঁটের মাপের সাথে অভিন্ন। তৃতীয়ত, প্রত্নস্থলটির যেস্তরে এ মূর্তিটি পাওয়া গেল তার অব্যবহিত উপরের স্তরটিতে একটি অনুকৃত গুপ্ত মুদ্রা সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং অব্যবহিত নিচের স্তরটিতে আদিম অকর্ষিত মাটি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। চতুর্থত, প্রত্নস্থলটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলে যে ইতিপূর্বে গুপ্ত শাসন বিস্তৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রামাণ্য সূত্র গবেষকগণের প্রকাশনায় সন্নিবেশিত রয়েছে। এই চারটি সূত্রের সমন্বয় (মূর্তির শিল্পশৈলী + ইটের পরিমাপ + স্তরবিন্যাস + ঐতিহাসিকসূত্র) ধরে আপাতত নিম্নোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। (ক) তৃতীয় স্তর থেকে অধিবসতি সময়কালটি শুরু হয়েছিল। (খ) অধিবসতি সময়কালটি গুপ্ত শাসনামলের সমসাময়িক। (গ) এই অধিবসতি সময়কালের মানুষগুলো ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বৈষ্ণব মতাদর্শের অনুসারী।

এবার খননে অনাবৃতকৃত প্রত্নবস্তুর শনাক্তকরণ প্রসঙ্গে আসা যাক। ধরা যাক, একটি প্রত্নস্থলের সবচেয়ে নিচে আদিম অকর্ষিত মাটি। এর অব্যবহিত উপরের স্তরটিতে একটি জমাটবদ্ধ মেঝের সাথে এমন একটি নিরেট ইটের গাঁথুনির ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া গেল যার সাথে একটি নিবেদন স্তূপের মেধির সাদৃশ্য রয়েছে। ইঁটগুলোর আকৃতি সোমপুর বিহারের (পাহাড়পুর) প্রথম নির্মাণ সময়কালের (খ্রিস্টীয় আট – নয় শতক) ব্যবহৃত ইঁটগুলোর অনুরূপ। এছাড়া ইঁটগুলো গাঁথার কাজে কাদামাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষের উপর যে স্তরটি রয়েছে তা একেবারেই সাংস্কৃতিক নিদর্শন বিবর্জিত এবং এর মাটি পলির অনুরূপ। এর উপর প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় স্তরটিতে আয়তাকার এমন একটি ছাদ ও কার্নিশবিহীন

ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল যার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এছাড়া কক্ষটির অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালের একাংশে মিহরাব আকৃতির একটি অবতল অংশও শনাক্ত করা সম্ভব হলো। আরও দেখা গেল, এর গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইটের আকার গৌড়ের দারাসবাড়ি মসজিদে ব্যবহৃত ইটের অনুরূপ। তাছাড়া মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঝিনুক গুঁড়োর চুন। একটি পাটকেলে একটি আরবি হরফের চিহ্নও লক্ষ করা গেল। এই স্তরটির উপরস্থ স্তরটি বর্তমানে ভূপৃষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরোক্ত সূত্রগুলোর পারস্পরিক সমন্বয় ঘটালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। (ক) এই প্রত্নস্থলটিতে প্রথম পাল-আমলে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। এই কর্মকাণ্ডের সাথে এক বা একাধিক স্তূপের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত। এরপর ধর্মকেন্দ্রটি বন্যার পানি বাহিতপললের নিচে চাপা পড়ে যায়। সবশেষে খ্রিস্টীয় চৌদ্দ-পনের শতকে এর উপর একটি মসজিদ নির্মিত হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে নতুন সন্ধানলব্ধ সূত্রাদির সমন্বয়ের মাধ্যমে কেবল একটি সম্ভাব্য শনাক্তকরণ ও সময়কালের ব্যক্তি সূচক বন্ধনী নিরুপণ করা যায়। কিন্তু সঠিক সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন হয় পাঠযোগ্য লিপিতাত্ত্বিক সূত্র। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নস্থলেই এ জাতীয় সূত্রাদি প্রাপ্তির আশা দুরাশা বৈকি আর কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাহাড়পুরস্থ বিহারটি অনাবৃত হওয়ার পূর্বে এর ঢিবি থেকে সর্বপ্রথম একজন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ দেবী মূর্তি উৎকীর্ণ একটি পোড়ামাটির ফলক কুড়িয়ে পেয়ে উক্ত ঢিবিতে একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বলে মন্তব্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু নিয়মিত খনন শুরু হওয়ার পর প্রত্নস্থলটি থেকে 'শ্রী সোমপুর শ্রী ধর্মপাল দেব মহাবিহার আর্য ভিক্ষু সংঘ' লিপিসহ কিছু সীলমোহর আবিষ্কৃত হওয়ার উপর নির্ভর করে আজ প্রায় সকল প্রত্নতত্ত্ববিদই একমত পোষণ করেন যে পাহাড়পুর নামটি অতি সাম্প্রতিককালে লোকমুখে প্রচলিত হয়েছে। এর প্রকৃত নাম সোম (চাঁদ) পুর (লোকালয়)। এখানে আবিস্কৃত স্থাপত্যিক নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি মহাবিহার বা সংঘ (দলবদ্ধ) সেটা আর্য (ব্যাপক অর্থে উন্নত) ভিক্ষুদের (বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রচারক) দ্বারা ব্যবহৃত হতো। উল্লেখ্য যে, পাহাড়পুরের সংলগ্ন দক্ষিণাংশের একটি গ্রাম অদ্যাবধি 'সোমপুর' নামের সাক্ষী হিসাবে 'ওমপুর' উচ্চারণে বেঁচে আছে। এসব তথ্যের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমেই এই উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে পাহাড়পুর বিহারের প্রকৃত নাম সোমপুর মহাবিহার। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, কে এর নির্মাতা?

খ্রিস্টীয় ষোল শতকের লামা তারনাথের বর্ণনা অনুযায়ী, বাংলার পাল-বংশের (৭৬৫-১১৭৫ খ্রিঃ) তৃতীয় নরপতি দেবপালই (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রিঃ) ছিলেন এ বিহারের নির্মাতা। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, পাল বংশের দ্বিতীয় নরপতি ধর্মপাল ছিলেন একজন বিখ্যাত নির্মাতা। বেশ কয়টি মহাবিহার নির্মাণের সাথে তাঁর নাম জড়িত। তাঁর রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য মোটামুটি স্থিতিশীলতা লাভ করেছিল। অপরদিকে দেবপাল জীবনের অধিকাংশ সময়ই ভারতের তদানীন্তন উদীয়মান শক্তি রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের সাথে লড়াই করে অতিবাহিত করেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে এত বিশাল আকৃতির বিহার নির্মাণের অবকাশ ছিল না। এ ছাড়া খননের ফলে

এমন কোন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি যার মধ্যে দেবপালের নাম উৎকীর্ণ ছিল। অথচ খননে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোতে 'শ্রী ধর্মপাল' নামের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পাহাড়পুর বিহারের উত্তরের সংলগ্ন গ্রামটি আজও ধর্মপুর নামে পরিচিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এবং আরও কয়েকটি সূত্র থেকে দেখা যায় যে, বরেন্দ্র (বর্তমান রাজশাহী-দিনাজপুর-বগুড়া) ছিল পালদের 'জনকভূ' (পৈতৃক ভূমি)। অতএব নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দ্বিতীয় পাল রাজা কর্তৃক জনকভূতেই সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। তাঁর শাসনামলে পাল-সাম্রাজ্য বাংলাবিহারের ভূখণ্ড ছেড়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। দেবপাল পৈতৃক সূত্রে এই নতুন ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন। তাঁর রাজধানীও ছিল বরেন্দ্রের বাইরে। অতএব, দেবপাল যদি বিহার নির্মাণ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই নিজ মহিমা প্রচারের জন্য নতুন বিজিত ভূখণ্ডেই তা করতেন। আর এটাই ছিল প্রাচীন ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম। এভাবে তারনাথের বক্তব্য সমর্থন না করে বরং ধর্মপালকে সোমপুর বিহারের নির্মাতা হিসেবে ধরে নেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে, এ বিহারে খনন পরিচালনার ফলে একাধিক বার পুনর্নির্মাণ পরিচালিত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, সম্ভবত দেবপালের শাসনামলে সোমপুর বিহারে কিছু পুনর্নির্মাণ পরিচালনা করা হয়েছিল। আর এ সূত্র ধরেই খ্রিস্টীয় ষোল শতকের লেখক তারনাথ তাঁকে সোমপুর বিহারের নির্মাতা হিসেবে উল্লেখ করার মতো ভুলটি করেছেন। এসবই হলো ঘটনাক্রমিক সাক্ষ্য প্রমাণ। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার চূড়ান্ত সমীক্ষায় এ ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য প্রয়োজন হয়, কঠোর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটি সূত্রের সাথে অপর সূত্রের যোগসূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করা।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হলো তার মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক আকার বিশিষ্ট প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু যদি কোন প্রত্নস্থলের স্তরবিন্যাস কোন কারণে বিনষ্ট হয়ে থাকে এবং স্থাপত্য নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ লুণ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে প্রতিবেদন প্রণেতাকে আরও ব্যাপক আকারের সমন্বয়ে ব্রতী হতে হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে স্তরবিন্যাস ধ্বংস হওয়ার কারণ ও সময়কাল। এটা নির্ণয়ের প্রথম শর্ত হলো, প্রত্ননিদর্শনের বিস্তৃতি ও বিনষ্টকৃত অংশের মাটির প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যদি এ অংশের মাটির সাথে খননকালীন সময়ের পার্শ্ববর্তী স্থানের মাটির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, এ স্তরবিন্যাস অতিসম্প্রতিকালে সংঘঠিত হয়েছে। সম্ভবত এটা ইট অপহরণকারী অথবা ঐশ্বর্য লুণ্ঠনকারীদের অপকীর্তির ফল। অপরদিকে, যে স্থান পর্যন্ত স্তরবিন্যাস ধ্বংস হয়েছে সে স্থানের সর্বনিম্ন স্তর থেকে যদি একটি নতুন ধরনের স্থাপত্যিক নিদর্শন অথবা পূর্ববর্তী দেয়ালের প্রস্থের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় তো প্রাকৃতিক অথবা রাজনৈতিক কারণে পূর্বোক্ত নিদর্শন ধ্বংস হয়েছিল এবং উক্ত ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এ অংশে যদি পূর্ববর্তী সময়কালের সামগ্রী পুনঃব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে পরবর্তী নির্মাণ কাজ অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল কোন জনগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত

হয়েছিল। আবার প্রথম নির্মাণ সময়কালের মেঝে এবং পরবর্তী নির্মাণ সময়কালের মধ্যে যদি একটি বাতাস বাহিত মাটির সাহায্যে গড়ে উঠা স্তরের অস্তিত্ব দেখা যায় তবে বুঝতে হবে, প্রথম ও দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের ধ্বংস ও দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের নির্মাণ কাজের মধ্যে সময়ের যথেষ্ট পার্থক্য বজায় ছিল। আবার এ দুই নির্মাণ কাজের স্থাপত্যশৈলী ও শিল্পশৈলী যদি একই প্রকার হয় এবং মেঝের অবস্থানের মধ্যে নতুন স্তর দেখা না যায় তবে ধরে নিতে হবে এ দু'টি নির্মাণ কাজ একই সময়কালের মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। অথবা প্রথম সময়কালের ইমারত ধ্বংসের অব্যবহিত পরপরই দ্বিতীয় সময়কালের পুনঃনির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দু'টি দেয়ালের সংযোগ স্থলে যদি কোন বণ্ড (bond) জাতীয় যোগসূত্রের অস্তিত্ব থাকে তাহলে বুঝতে হবে দু'টি দেয়াল একই নির্মাণ সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। অন্যদিকে দু'টি দেয়ালের মধ্যে যদি কোন বণ্ড অর্থাৎ যোগসূত্র না থাকে তাহলে বুঝতে হবে দু'টি দেয়ালের মধ্যে একটি মূল নির্মাণ সময়কাল এবং দ্বিতীয় দেয়ালটি পুনঃনির্মাণ সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। সাধারণত পরবর্তী পুনঃনির্মাণ সময়কালের দেয়াল মূল নির্মাণ সময়কালের দেয়াল থেকে কম গুরুত্ব বিশিষ্ট হয়। এছাড়া মূল ও পুনঃনির্মাণ সময়কালের স্তরগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত নির্মাণ সামগ্রীর উপকরণ ও অন্যান্য সূত্রগুলোর মধ্যে যদি কোন শ্রেণীগত পার্থক্য দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে, নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সময়কালের নির্মাতা ও পুনঃনির্মাতাদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় ছিল। এমন একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল হলো ময়নামতির শালবন বিহার। এ বিহারে বন্যগুপ্ত (৫০৭–৮ খ্রিস্টাব্দ), দেব, রাত, খড়্গ, চন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলো রাজা ও রাজবংশের নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

এবার মহাস্থানগড়ের মতো একটি বিশাল আকৃতির প্রত্নস্থলের প্রসংগে আসা যাক। এ প্রত্নস্থল শুধু যে কেবল আকারের দিক থেকেই বিস্তৃত ছিল তা নয়, বরং এর ইতিহাসও ছিল দীর্ঘ। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে এখানে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তারপর এ সুরক্ষিত নগরটি প্রায় উনিশ শতক পর্যন্ত বিবিধভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা শাসকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে এদেশে বহুপ্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীর গতি পরিবর্তন, রাজা ও রাজ্যের উত্থান-পতন, বহিরাক্রমণ ইত্যাদি সঙ্ঘটিত হয়েছিল। একটি পর্যায়ে এদেশে চরম রাজনৈতিক অরাজকতাও বজায় ছিল (মাৎস্যন্যায়)। আবার বহুদিন এ অঞ্চল তদানীন্তন রাজাদের মূল কর্মস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেছে। ফলে মহাস্থানগড়ের ১.৫২৪ মিঃ × ১.৩৭১ মিঃ এলাকার অধিকাংশস্থানে বর্তমানে কোন সুবিন্যস্ত স্তরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, একইস্তরে বিভিন্ন শাসনামলের শৈলীসূচক ব্রতবস্তুও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিগত শতকে মৌর্য-শাসনের শৈলীসূচক একটি ব্রাহ্মী লিপি আকস্মিকভাবে এই প্রত্নস্থলের ভূমিপৃষ্ঠ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবার খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের লিপিবিহীন ছাপাঙ্কিত ধাতু মুদ্রা এ প্রত্নস্থলে গুপ্ত শাসনামলের নিদর্শনের সাথে অনাবৃত হয়েছে। অপরদিকে স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রায়ই পুনঃব্যবহৃত উপকরণের অস্তিত্ব দেখা যায়। একটি বিশেষ সময়কালের নিদর্শনের ভগ্নাংশের

উপর সরাসরি অপর একটি সময়কালের স্থাপত্য কীর্তির অস্তিত্বও লক্ষ করা গেছে। তাই মহাস্থানগড়ে স্তরবিন্যাস নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে খনন পরিচালনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সময়ানুক্রমিকতা প্রণয়নের কাজটি অনেকাংশেই বিপদজনক অবস্থায় উপনীত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালে খনন পরিচালনার প্রাক্কালে ফ্রান্স থেকে আগত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি নথিভুক্তকরণের জন্য ইউনিট-লেভেল পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন শাসনামলের প্রত্নবস্তু ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর অবস্থান লক্ষ করে সমগ্র প্রত্নস্থলটির জন্য একটি অভিন্নস্তরবিন্যাসের স্বরূপ নির্ণয় করা।

উপরিলিখিত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে একটি প্রত্নস্থলের প্রকৃত অবস্থার উপর নির্ভর করেই খনন পদ্ধতি অনুসৃত হয়। আর এ খননের ফলাফলগুলোর সমন্বয়ের জন্য যথেষ্ট তথ্য নিদের্শনা, গভীর অনুশীলন ইত্যাদি অনুসরণ করা প্রয়োজন। আর তা করা হলেই একটি দীর্ঘসময়ের ইতিহাস ও বিস্তৃত প্রত্নস্থল সম্পর্কে সম্যক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য এরিয়াল আলোকচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এবার প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলের খনন প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রসংগে আসা যাক। এ ক্ষেত্রে মানুষ কোন্ বৃহৎ মানবধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানার জন্য দৈহিক নৃতত্ত্ব, ফুল, ফল, প্রাণী প্রাচীন জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে হয়। এমনকি, মাটিতে ফ্লোটিং মেশিনের সাহায্যে ছেঁকে শস্যকণার আঁশ সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সে শস্যকণার আঁশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষা করে ফল বা শস্য সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করতে হয়। তারপর যদি সে যুগের ফুল ও ফল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয় তাহলে তার উপর ভিত্তি করে তদানীন্তন জলবায়ু সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। একই সাথে মাটির স্তরের গঠন বিশ্লেষণ করে ভূতাত্ত্বিক সময়কাল নির্ধারণ করাও সহজ হয়। এমনি করে প্রাণীবিদ্যা, মৃত্তিকাতত্ত্ব, আবহাওয়াবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বহুশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ একটি বিশেষ প্রত্নস্থলের সময়কাল নির্ণয়সহ ঐ সময়ের মানুষ এবং তাদের জীবন-যাপন প্রণালির সম্পর্কে একটি সাধারণ সমীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। অধিকন্তু ঐ বিশেষ সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত যুগে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের বিস্মৃত মানুষের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং আলোচ্য প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যা তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমেও একটি বিশেষ উপসংহারে উপনীত হওয়ার অবকাশ থাকে।

সমন্বয়ের কাজটি সফল করে তোলার প্রয়োজনে যে কোন স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। কিন্তু প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার জন্য প্রতিটি বিবরণকে যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরতে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রত্নরসায়নবিদ বা প্রত্ন-প্রকৌশলী এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নক্শা, সারণী ও আলোকচিত্র সংযোগ করবেন। নক্শা প্রতিবেদনের বক্তব্যকে পরিস্ফুটিত, সারণী সংক্ষেপিত ও আলোকচিত্র বস্তুনিষ্ঠতা প্রদান করে।

উপসংহার

প্রতিবেদনের উপসংহার অংশে প্রতিবেদনকারী উপরে আলোচিত প্রতিটি বিষয়ের আলোকে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং ইতিপূর্বে জানা অন্যান্য সূত্র, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে শক্তিশালী যুক্তিতর্কের অবতারণা করবেন। ফলে তাঁর পক্ষে একটি নিজস্ব মতামত উপহার প্রদান করা সম্ভব হবে। তবে সকলক্ষেত্রেই প্রতিবেদনকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ থাকতে হবে ঃ

ক. ভাষার সাবলীল গতি।

খ. বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও

গ. সত্যনিষ্ঠতা

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। সবশেষ কথা হলো, প্রকাশনার বিষয়বস্তু হবে গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ। অর্থাৎ এমনভাবে প্রকাশনার পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে যেন সাধারণ পাঠক সহজেই সম্পাদিত কাজের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পরিণতি অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং সকল পর্যায়ের তথ্যঅনুসন্ধানী গণযুক্তি খণ্ডন অথবা যুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা লাভে সমর্থ হয়ে উঠেন।

সবশেষে যা না বললেই নয়, তা হলো, প্রকাশনাবিহীন যেকোন প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মূল্যহীন বিবেচিত হয়।

৭

বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম

মানচিত্রের ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৩১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব-দ্রাঘিমাংশে ১৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার (৫৫,৯৯৮ বর্গ মাইল) এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের অবস্থান। এর উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মেঘালয় ও ত্রিপুরা ; পূর্বে আসাম, মিজোরাম ও বার্মা ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বপর্যন্ত এ ভূভাগটি এবং এর অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত হতো। অঞ্চলগুলোর নামের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন (আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের পশ্চিম অংশ), বরেন্দ্র (খ্রিস্টীয় আট-বার শতকের রাজশাহী বিভাগ), লক্ষণোতি (খ্রিস্টীয় বার-তের শতকের বরেন্দ্র অঞ্চল), সমতট (খ্রিস্টীয় চার-বার শতকের মেঘনা উপত্যকা), হরিকেল (খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতকের চট্টগ্রাম-সিলেট অঞ্চল), বরকমণ্ডল (খ্রিস্টীয় ছয় শতকের ফরিদপুর) প্রভৃতি অন্যতম। এসব অঞ্চলের উপর কখনও বিচ্ছিন্নভাবে আবার কখনও-বা একছত্রভাবে বিভিন্ন ছোটবড় রাজা ও রাজবংশ রাজত্ব করেছে। সুতরাং এর সর্বত্রই অসংখ্য প্রত্ননিদর্শনাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সম্ভব।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রত্ননিদর্শনাদি খ্রিস্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবহেলিত ও অজ্ঞাত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তরীণ হয়েছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেঙ্গল ডিস্ট্রিক রেকর্ডস প্রণয়ন, নীলকুঠি স্থাপনের সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন ও ভূমি জরিপের নক্শা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ব্রিটিশ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকর্তা এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিলেন। এরপর উনিশ শতকে উল্লিখিত সম্পাদিত কার্যাদির প্রতিবেদনের সূত্র ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের দেশীবিদেশী পণ্ডিতবর্গ এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেন। এসব পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বুকানন হেমিলটন, এস. মার্টিন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে বুকানন মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রত্নস্থলগুলোর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (১৯০৭-১২)। এরপর মার্টিন ১৮৩৮ প্রকাশ করেন তাঁর ছয় খণ্ডের 'দি হিস্টরি, এনটিকুইটিজ, টপগ্রাফি এণ্ড ষ্ট্যাটিসটিকস অব ইস্টার্ণ বেঙ্গল' নামক প্রতিবেদন। এরমধ্যে দেশের প্রায় সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের অবস্থান, কিংবদন্তি ও ঐতিহ্য সংক্ষিপ্তাকারে স্থান লাভ করে। ১৮৬৭ সালে গৌড় দাস বসাক লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি গবেষণা পত্রিকার মাধ্যমে বাঘেরহাটের প্রত্ননিদর্শনাদির

দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় 'এ রিপোর্ট অন দি ডিস্ট্রিক যেসর'। এ প্রতিবেদনে যশোর জেলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক-ইমারতসমূহের বর্ণনা স্থান লাভ করেছিল।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, ১৭৭০ থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্নিদর্শনাদি সুধী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিল। ঠিক এ সময়েই ভারতে জন্ম লাভ করে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (১৮৬১) নামক একটি বিভাগ ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় খ্রিস্টীয় সাত শতকের চৈনিক পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙের ভারত ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। এই ভ্রমণবৃত্তান্তে মহাস্থানগড় ও ময়নামতি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নিদর্শনাদির দিকনির্দেশনা সন্নিবেশিত ছিল। আর তাই উক্ত দিকনির্দেশনার সূত্র ধরেই 'ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের' তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৭১-৭২ সালে, এইচ. বেভারিজ ১৮৭৪ সালে, ই. ভেসেই ওয়েষ্টম্যাকট ১৮৭৫ সালে ও সি. জি. ও. ডোনেল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থল অধ্যুষিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ ভ্রমণ শেষে বিভিন্ন মাধ্যমে নিজ নিজ মতামত প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ অবস্থায় আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৭৯-৮০ সালে দ্বিতীয় দফা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন।

দ্বিতীয় দফা ভ্রমণ কালে কানিংহাম চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার গৌড়, জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল, বগুড়ার ভাসুবিহার, ও মহাস্থানগড়, নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ পরিদর্শন করেন। এবারের ভ্রমণ প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, নরপতির ধাপ (ভাসুবিহার) নামক ঢিবিতে উয়ন চুয়ঙ বর্ণিত 'পো-সি-পো' বিহারের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে। এছাড়া তিনি মহাস্থানগড়কে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের পুণ্ড্রনগর হিসাবে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি পাহাড়পুরস্থ 'গোপাল চিতার পাহাড়' (বর্তমান পাহাড়পুর বিহার) নামক ঢিবিতে সীমিতাকারের খনন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্থানীয় (বলিহার এস্টেটের) জমিদার বিধান চন্দ্র রায়ের প্রবল বাঁধার সম্মুখে খনন অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়ে নিজ কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল আঠার শতক।

উনিশ শতকে প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চায় এগিয়ে এলেন তদানীন্তন বাংলার সুধী সমাজ। তাঁরা স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সংক্রান্ত তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ নিয়ে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯০৯ সালে অনুষ্ঠিত এই পরিষদের রাজশাহী সম্মেলনে রমাপ্রসাদ চন্দ্র এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১৯১০ সালে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী এই পরিষদের সদস্যরা উক্তবছরেই রাজশাহীর গোদাগাড়ি এবং জয়পুরহাটের কাঞ্চনপুর এলাকায় একটি সীমিতাকারের আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। এ অনুসন্ধানের ফলে কেবল গোদাগাড়ি এলাকা থেকে বত্রিশটি মূল্যবান মূর্তি সংগৃহীত হয়েছিল। ফলে ঐ বছরই রাজশাহীতে বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ এবং এর অঙ্গসংগঠন হিসাবে বরেন্দ্র

জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী নয় বছরের মধ্যে এ পরিষদ গোদাগাড়ি থানার গাছিপুর ও দেওপাড়া এবং নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানাধীন মাহিসন্তোষে অবস্থিত কয়েকটি সাংস্কৃতিক ঢিবিতে খনন পরিচালনা করে। ১৯১৮ সালে মাহিসন্তোষে অবস্থিত রাজবাড়ি নামক ঢিবিতে আবিষ্কৃত হয় একটি বহুগম্বুজ মসজিদের (১৫০৭ খ্রিঃ- ৯৯২ হিঃ) কাঠামো।[৩২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদের তত্ত্বাবধানে যখন দেশের পশ্চিম অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম বেগবান হয়ে উঠছিল, ঠিক তখন ১৯১৩ সালে দেশের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা জাদুঘর। এই জাদুঘরের তৎকালীন (১৯১৪-৪৭ সাল) অধিকর্তা প্রখ্যাত পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৯১৭ সালের মধ্যে ফরিদপুরের চন্দ্রবর্মনকোট (কোটালিপাড়া), ঢাকার সাভার (সাভার) ও কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলে সরজমিনে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।

১৯২৩ সালে স্থানীয় কিছু উৎসাহী জনগণ ঢাকার সাভারের রাজাসনে ঢিবিতে এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ১৯২১ সালে রাজশাহী জেলার বিহরাইল গ্রামের রাজবাড়ি নামক ঢিবিতে খনন পরিচালনা করে দু'টি কর্মকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত করে। ১৯২১ সালে ঢাকা জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী তার বিখ্যাত পুস্তক Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dhaka Museum প্রকাশ করেন। এছাড়া ১৯২২-২৩ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র গবেষণা সমিতি জাদুঘর ও দীঘাপতিয়ার শরৎ-কুমার রায়ের সাথে পাহাড়পুরে এক যৌথখননে অংশগ্রহণ করে। ১৯২৪ সালে বর্ধনকোটের কুমার শৈলেশ রায় রংপুরের বিরাট নামক স্থানের একটি ঢিবিতে খনন কাজ পরিচালনা করে একটি মন্দিরের কাঠামো অনাবৃত করেন। একই সাথে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের উদ্যোগে সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন কিছু জরিপও পরিচালিত হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জরিপ পরিচালিত হয়েছিল যশোরের ভারত ভয়না ও ঢাকার সাভারে।

১৯২৮ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ এককভাবে মহাস্থানগড়ে প্রথম খনন পরিচালনা শুরু করে। ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল পাহাড়পুর খনন। ১৯৩৪-৩৫ সালে মহাস্থানগড়ের অদূরবর্তী দক্ষিণ দিকস্থ লক্ষিন্দরের মেধ (বেহুলার বাসর ঘর), স্কন্ধের ধাপ এবং দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরের অধীন বৈতান ঢিবিতেও খনন পরিচালিত হয়েছিল। এরমধ্যে স্কন্ধের ধাপের কোন খনন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নি। তাছাড়া বহুসংখ্যক প্রত্নস্থল সংরক্ষিত ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৪২ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের উদ্যোগে লালমাই

---

৩২ এ. বি. এম হুসাইন, 'মাহিসন্তোষের মুসলিম নিদর্শনের ইতিহাস', ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা ১৩৭৬, বাংলা, পৃঃ ২৮০

ময়নামতি টিলাশ্রেণীতে জরিপ পরিচালিত হলে[৩৩] জরিপকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীকালে আঠারটি প্রত্নস্থল সংরক্ষিত ঘোষিত হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করলে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে পরিণত হয়। সে সময় পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য করাচিতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ। এ বিভাগটির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অফিস শুরুর দিকে রাজশাহী শহরে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালে উক্ত অফিসটি লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থানান্তর করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এভাবেই প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে একটি সরকারি অফিসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৫৫-৫৭ সালে এ বিভাগ লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে জরিপ পরিচালনা করে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রত্নস্থল শনাক্ত করে। ফলে সংরক্ষিত ঘোষিত প্রত্নস্থলের সংখ্যা বিশে উন্নীত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বপর্যন্ত এই অফিসটি মোট ১৪৬টি পুরাকীর্তি সংরক্ষণসহ মোট চারটি প্রত্নস্থলকেন্দ্রিক জাদুঘর এবং তিনটি ব্যক্তি জীবনীমূলক জাদুঘর পরিচালনা করত। এছাড়া মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তর ভাগ ও সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত দিনাজপুরের সিতাকোর্ট ; কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির শালবন রাজার বাড়ি ঢিবি, কোটিলামুড়া, চারপত্র মুড়া ; চাপাইনবাবগঞ্জের দারাসবাড়ি মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ জেলার সাহেবগঞ্জ ঢিবি এবং ঢাকা শহরের লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্বাংশের বুরুজে খনন পরিচালিত হয়েছিল। অন্যান্য কাজের মধ্যে আর যা উল্লেখযোগ্য তা হলো একটি প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নাগার স্থাপন। তবে সবকয়টি সম্পাদিত কাজই ঐতিহাসিক যুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নিষ্পত্তি করেছিলেন তদানীন্তন ঢাকা জাদুঘরের অধ্যক্ষ খ্যাত পণ্ডিত এ. এইচ. দানী। কারণ তিনিই প্রথম এ অঞ্চলের পণ্ডিতগণের মধ্যে তার লেখনীর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময়ে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় হাতিয়ারগুলোর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর ঢাকার মোহাম্মদপুরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান দপ্তর স্থাপিত হয়। এ অধিদপ্তরের প্রত্নতত্ত্ব, খনন ও অনুসন্ধান, উৎকীর্ণলিপি ও মুদ্রা এবং প্রকাশনা নামে মোট চারটি শাখা ছিল। এসব শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরটি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী স্বাধীনতাপূর্ব অফিসটির যাবতীয় কার্যাদি নিষ্পত্তি করণে নিয়োজিত ছিল। এরমধ্যে বিভিন্ন প্রত্নস্থলসহ ইমারত ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ এবং খনন অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেসব প্রত্নস্থলে ১৯৭১-৮৪ সময়কালে খনন পরিচালিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে নওগাঁয়ের পাহাড়পুর বিহার ; বগুড়ার মহাস্থানগড় সংলগ্ন মঙ্গলকোট, বিহার (তোতামার পণ্ডিতের ধাপ) ও ভাসুবিহার (নরপতির ধাপ) ; কুমিল্লার রূপবান কন্যার মুড়া, রাণীর বাঙলো ও আনন্দ রাজা

---

৩৩. T.N. Ramchandran 'Recent Archaeological Discoveries Along the Mainamati-Lalmai Range : Tippera District, East Bengal', B.C. Law volume (ed- by Bhandarcar and others), Poona, 1946, pp. 220-30

বাড়ি এবং চাপাইনবাবগঞ্জের দারাসবাড়ি অন্যতম।

১৯৮৪ সালের পর অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন করে সাজান হয়। এর ফলে পূর্বের চারটি প্রধান শাখার পরিবর্তে চারটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হয়। এ চারটি আঞ্চলিক অফিস বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালনার বাস্তব ক[illegible] নিষ্পত্তি করছে। বিগত এই এক যুগ ধরে মহাস্থানগড়ের উত্তর ও পূর্ব বাহুসহ সংলগ্ন এলাকায় গোদাইবাড়ি ধাপ ; নওগাঁয়ের জগদলের রাজবাড়ি ঢিবি, পাহাড়পুর বিহারের পূর্ব বাহুসহ চত্বরের বিভিন্ন অংশ, হলুদ বিহার ; দিনাজপুরের চোরচক্রবর্তী ধাপ ও অরুণধাপ ; ঢাকার সাভারস্থ হরিস চন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবিসহ লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ ভাগের ঢিবির বিভিন্ন অংশ ; নেত্রকোণার রোয়াইলবাড়ি দুর্গ এবং কুমিল্লার ময়নামতির ইটাখোলা মুড়া, ময়নামতি মাউণ্ড-এ ১, ভোজবিহার এবং রাণীর বাঙলো ঢিবিতে খনন পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তর অহরহ আকস্মিকভাবে সন্ধানলব্ধ বহু প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করছে। কিন্তু প্রকাশনার অভাবে এসবের অধিকাংশই রয়ে যাচ্ছে গবেষকগণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যাদি নিষ্পত্তি করছে। অবশ্য এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি কেবল আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান, প্রকাশনা, সংগ্রহ ও সেমিনার আয়োজনের মধ্যে সীমিত। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র জাদুঘর, ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস পরিষদ, শিল্পকলা একাডেমী, বাঙলা একাডেমী, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চা কেন্দ্র অন্যতম। সবচেয়ে সুখের বিষয় এই যে সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়েছে। ফলে এই প্রথম এদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের দ্বার অবারিত হলো। এছাড়া ১৯৯৭ সালে 'বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চা কেন্দ্রের' উদ্যোগে ঢাকায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় ইতিপূর্বে এতবড় সুধী সম্মেলন আর কখনই অনুষ্ঠিত হয় নি। সম্মেলনের শেষে প্রখ্যাত পণ্ডিত এনামুল হকের সম্পাদনায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশকিছু মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে।

দীর্ঘ দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উপরে বর্ণিত প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ফলে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। তাই এ পুস্তকের পরবর্তী অংশে ফলাফলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তবে বক্তব্যের সহজ বোধগম্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে প্রথমে কেবল সেসব প্রত্নস্থলের বর্ণনা দেওয়া হলো, যেসব প্রত্নস্থলে ইতিমধ্যে খনন পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, খনন কাজে যেহেতু সকল মাপঝোক উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শুরু করা হয় সেহেতু প্রত্নস্থলগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রেও দেশের ভৌগোলিক বিস্তৃতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শুরু করে দক্ষিণাবর্ত ক্রম অনুসরণ করা হলো।

বিরাট ঃ এ যাবৎ খনন পরিচালিত হয়েছে এমনসব প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর রংপুর জেলার বিরাট নামক ঢিবিটিই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মাঝারি আকারের এই ঢিবিটিতে ১৯২৪ সালে বর্ধনকোটের জমিদার কুমার শৈলেশ চন্দ্র রায় ব্যক্তিগত ঔৎসুক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে খনন পরিচালনা করে ৫৯.৪ মি: × ৪৫.৭ মি: পরিমাপের একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছিলেন। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এর কাঠামোতে ৫.৩ বর্গ মিটার পরিমাপের একটি গর্ভগৃহ, সম্মুখবর্তী একটি মণ্ডপ এবং চারপাশে চারটি প্রবেশ-দ্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মেঝে পাথর পট্ট দিয়ে বাঁধান ছিল। দেয়ালগুলো ইঁট ও কাদার মসলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এমনকি ১৯২৫-২৬ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের কর্মকর্তা আর. ডি. ব্যানার্জি এর মেঝের একপ্রান্তে একটি কালোপাথরে তৈরি চমৎকার নদর্মার বেড়ও দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে দেয়ালের অলঙ্করণের জন্য এই ইমারতে পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের অনুরূপ পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হয়েছিল। ইমারতটির ভিত তৈরির জন্য পরস্পর ছেদক একাধিক আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি দেয়াল তৈরি করে মধ্যবর্তী ফাঁপা অংশগুলো কাদা মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল। এই স্থাপত্যিক কাঠামোর অনুরূপ ধ্বংসাবশেষ বগুড়ার গোকুল মেধ ও গোবিন্দ ভিটা, দিনাজপুরের বৈগ্রাম এবং যশোরের ভারতভয়নায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং ধ্বংসাবশেষটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। (ক) মূল ইমারতটি একটি মন্দির, (খ) বিধ্বস্ত মন্দিরটিতে একটি নির্মাণ ও একটি পুন:নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব রয়েছে এবং (গ) প্রথম নির্মাণ সময়কালটি খ্রিস্টীয় ছয় শতক এবং পুন:নির্মাণ সময়কালটিকে খ্রিস্টীয় নয় দশক শতকে ন্যস্ত করা যায়।

মেড়টিলা ঃ বর্তমান গোবিন্দগঞ্জ জেলার সাহেবগঞ্জ এলাকায় করতোয়া নদীর তীরবর্তী একটি স্থানে মেড়টিলার অবস্থান। ১৯৫৯ সালে পরিচালিত খননের ফলে এ ঢিবিতে আয়তাকার পরিকল্পনায় ইঁট দিয়ে তৈরি একটি বিধ্বস্ত ইমারতের কাঠামো আবিষ্কৃত হয়। মাঝখানে উন্মুক্ত চত্বর, পশ্চিম বাহুতে পাঁচটি কক্ষ এবং অপর তিনটি বাহুর অক্ষত অংশগুলো পর্যবেক্ষণ করে লুপ্ত ইমারতটিকে একটি ক্ষুদ্রাকার বিহার বলে অনুমিত হয়। এর পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৬.৪৫মি: এবং ৩.৭৭ মি:। মধ্যবর্তী উন্মুক্ত চত্বরটি ৩৮.৭ মি: বর্গাকার। কক্ষগুলোর পেছনের দেয়াল ৩.২৫ মি: এবং সম্মুখের দেয়াল ২.১৩ মি: চওড়া। এছাড়া কক্ষগুলোর সম্মুখে ২.৬১মি: চওড়া টানা বারান্দার চিহ্নও পাওয়া গেছে। প্রতিটি কক্ষ কেবল একটি মাত্র দরজা দিয়ে সম্মুখবর্তী টানা বারান্দার দিক থেকে প্রবেশযোগ্য ছিল। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে উন্মুক্ত চত্বরের দিকে বর্ধিত বারান্দার অস্তিত্বও লক্ষ করা গেছে। খননকারী কর্মকর্তার অভিমত অনুযায়ী এই বিহারটি সম্ভবত পূর্বদিক থেকে প্রবেশযোগ্য ছিল। সবচেয়ে নিচের স্তরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে একটি পোড়ামাটির নিবেদন স্তূপ, অলঙ্কৃত ইঁট ও কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক উল্লেখযোগ্য। এসব ফলকে লোকায়ত শিল্পের ঐতিহ্যবাহক জীবজন্তু ও মানুষের মূর্তি বিধৃত ছিল। অলঙ্কৃত ইঁটগুলোতে পদ্মফুল, ঝুলন্ত মালা, বিবিধ ফুল ও পাতা ইত্যাদি নকশার অস্তিত্ব রয়েছে। অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে ছিল গোল বা পিপাকৃতির উপরত্ন পাথরের গুটিকা,

খেলনা, চুড়ি, বর্শাফলক, অস্পষ্ট লিপিযুক্ত একটি মূর্তির খণ্ডাংশ ও একটি ব্রঞ্জ নির্মিত ক্ষুদ্রাকার উপবিষ্ট নরমূর্তি। স্তরবিন্যাস ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর শিল্পশৈলীর বিচারে খননকারী কর্মকর্তা এই ইমারতকে খ্রিস্টীয় আট-বার শতকে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার বলে অভিমত পোষণ করেছেন।

উপরিল্লিখিত বিহারের উপরের স্তরে দ্বিতীয় অধিবসতি সময়কালের কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এরমধ্যে রয়েছে চাকাচিক্যময় উজ্জ্বলনীল রঙের টালির ভগ্নাংশ, কিছু চুন-সুরকীর জমাটবদ্ধ মেঝে, খোলামকুচি ও হরিণের শিং। ফলে এই অধিবসতি সময়কালটিকে খ্রিস্টীয় পনের-ষোল শতকে ন্যস্ত করা যায়।

মেড়টিলা খনন শেষে এরা প্রায় দেড় কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত অপর আর একটি ছোট আকারের ঢিবিতেও খনন কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। ফলে এ ঢিবিতে একটি স্বল্প পরিসরের থাম সংবলিত কক্ষের ভিত্তির অংশ উদঘাটিত হয়েছিল। খনন পরিচালনাকারী কর্মকর্তা এ ইমারতে দু'টি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি অনাবৃত ইমারতাংশকে একটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হিসেবেও মন্তব্য প্রদান করেছেন।[৩৪]

রোয়াইলবাড়ি : নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের অদূরে এই প্রত্নস্থলটির অবস্থান। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে খনন পরিচালনার ফলে এই প্রত্নস্থলে প্রায় তিন হেক্টর পরিমাপে (উত্তর-দক্ষিণে লম্বা) নির্মিত একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। দুর্গ প্রাচীরের বহির্দেশ মাটির তৈরি, কিন্তু এর অভ্যন্তরভাগে আজও ইটের গাঁথুনীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। দুর্গটির পশ্চিম দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে পরিখা (বর্তমানে প্রায় মজা) দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকের প্রাচীর ঘেঁষে প্রবাহিত রয়েছে বেতাই নামে একটি শীর্ণকায় নদ। এছাড়া দুর্গের অভ্যন্তরভাগের উত্তরাংশে অপর একটি অভ্যন্তরীণ প্রাচীর ঘেরা চত্বরও (উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৫ মি: × পূর্ব-পশ্চিমে ১৫১মি:) আবিস্কৃত হয়েছে। চত্বরটির দক্ষিণাংশে একটি পুকুর আছে। এই পুকুরের কেবল তলদেশ ব্যতীত চারটি দিকই ইট দিয়ে শান বাঁধান। এর অদূরবর্তী উত্তরে আরও একটি প্রাচীর ঘেরা চত্বর অনাবৃত হয়েছে। এর পরিমাপ ১৫৫মি: (উত্তর-দক্ষিণ) × ১৪৫ মি: (পূর্ব-পশ্চিম)। এ অংশের দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি সুদৃশ্য তোরণেরও অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

সর্বউত্তরের সর্বাপেক্ষা স্বল্পাকারের চত্বরটির তোরণের দুই পাশে সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ রয়েছে। একই ধরনের প্রকোষ্ঠের সারি পূর্ববাহুতেও রয়েছে। প্রকোষ্ঠগুলোর অভ্যন্তর ভাগের খোলা চত্বরের দিকে উন্মুক্ত। এছাড়া উত্তরবাহু ঠেস দিয়ে ইতিপূর্বে একটি মাঝারি আকারের ঢিবি ছিল। এই ঢিবিতে একটি চতুর্ভুজাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দ্বিতল ইমারতের কাঠামো অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় উন্মোচিত হয়েছে। তবে এর দক্ষিণাংশে পূর্বদিক থেকে আরোহণযোগ্য একটি প্রশস্ত সিঁড়ির অস্তিত্ব আজও প্রায় অটুট অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া এর পূর্বদেয়ালের

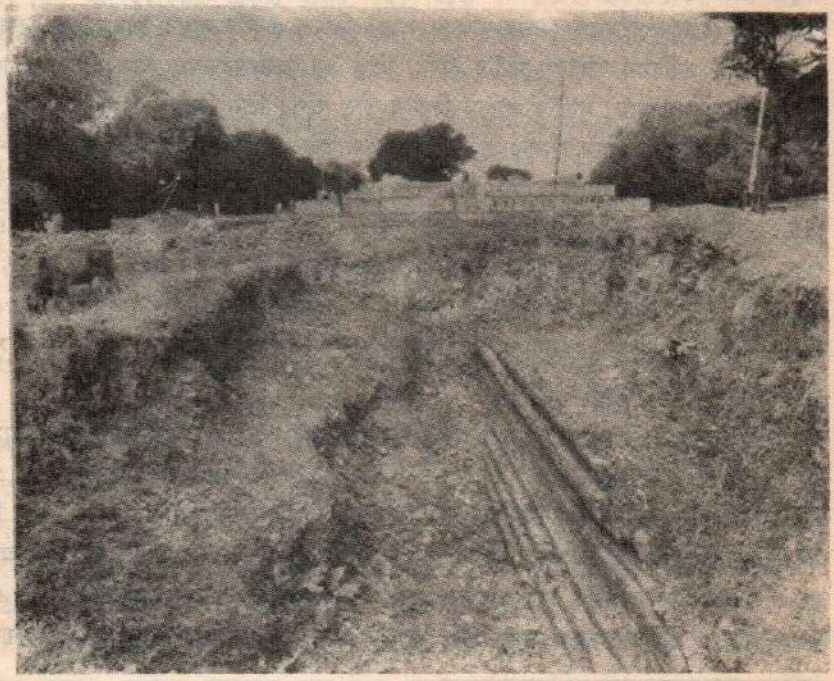
৩৪ . নাজিমুদ্দিন আহমেদ, 'সাহেবগঞ্জের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ', আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২১৪-২১৯

বহির্দেশে অলঙ্করণের জন্য রঙিন প্রলেপ যুক্ত টালি ইট ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের কাছাকাছি অর্থাৎ দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অদূরবর্তী স্থানে ইতিপূর্বে বড়দুয়ারী নামে আর একটি ঢিবি ছিল। এই ঢিবিতে ১৯৯২ সালে লেখকের নেতৃত্বে পরিচালিত খননে একটি পনের গম্বুজ বিশিষ্ট ইটের তৈরি মসজিদে ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। স্থাপত্যিক শৈলীর ভিত্তিতে এই মসজিদকে খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকে নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া যায়।

বড়দুয়ারী মসজিদের সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কোণে বিক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলো ইটের তৈরি কবরাচ্ছাদন রয়েছে। এছাড়া দুর্গের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য পাথরের টুকরো, কালো ও বেগে পাথরের থাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মসজিদের ইটের গাঁথুনীতে চুনের মসলা ও বিভিন্ন মোটিফ খচিত ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অনুমান করা যায়, এ দুর্গ সম্ভবত সুলতানী আমলের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্নস্থলটির স্তরবিন্যাস থেকেও এ অনুমানের যথার্থতা সম্পর্কে সমর্থন লাভ করা যায়।

আলোকচিত্র - ২৫



হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি, খনন পরবর্তী দৃশ্য।

হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি : ঢাকা শহর থেকে আনুমানিক ২৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সাভার বাস স্টেশনের অনতিদূরস্থ পূর্বদিকের একটি ঢিবির নাম 'হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি'। মজিদপুর গ্রামে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলের অদূরবর্তী পূর্বদিকস্থ রাজাসন নামক অপর একটি ঢিবি থেকে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৌদ্ধধর্মীয় প্রত্নবস্তু এবং গুপ্ত অনুকৃত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৩৫] ফলে অনুমিত হয় যে এ প্রত্নস্থলে খ্রিস্টীয় সাত শতকের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মীয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[৩৬] এর অনুবৃত্তিক্রমে এই প্রত্নস্থলগুলোতে ১৯১৮ সালের দিকে একজন স্কুল মাস্টার ও প্রখ্যাত পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর উদ্যোগে দু'দফা সীমিতাকারের খননও পরিচালিত হয়েছিল। এরফলে প্রত্নস্থলটি থেকে বিচ্ছিন্ন ধরনের কিছু স্থাপত্যিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল মাত্র। কিন্তু অত্যধিক ধ্বংসাবস্থার দরুন স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। তবে কার্ণিশ অলঙ্কৃতকরণের জন্য ব্যবহারের উপযোগী কিছু পোড়ামাটির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের বহির্দেশে সারিবদ্ধ ধ্যানীবুদ্ধ বিধৃত রয়েছে। ফলে অনুমিত হয়েছিল, রাজাসন ও মজিদপুরের স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষগুলো নিঃসন্দেহে একটি বিস্মৃত মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্মৃতির ধারক। গত আশির দশকের শেষদিক থেকে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হরিশ চন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবিতে কয়েক দফা খনন পরিচালিত হয়। ১৯৯০-৯১ সালের খননে লেখক নিজেই নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনার ফলে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিতে একটি মাঝারি আকারের নিবেদন স্তূপ এবং এর সংলগ্ন দক্ষিণে একটি বিহারের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। স্তূপটির কেবল মেধি ও অন্তের অংশবিশেষ বর্তমানে অক্ষত রয়েছে।

এ অংশে তিনটি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। প্রথম নির্মাণ সময়কালে মেধিটির পরিমাপ ২৬.২১মি: × ২৬.২১ মি: ছিল। এর চারপাশে ৪.৪১ মি: প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে ১.৩৭ মি: চওড়া বেষ্টনী প্রাচীর। বর্গাকার মহাবেদীর প্রদক্ষিণ পথে প্রবেশের জন্য চারদিক থেকে চারটি আরোহণ মঞ্চ ছিল বলেও ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয়েছে। দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালে স্তূপটিকে চারদিকে অতিরিক্ত ১.৮২ মি: বর্ধিত করা হয়েছিল। ফলে প্রদক্ষিণ পথের প্রস্থ দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র ১.২১ মি:। এছাড়া এই নির্মাণ তিন দিকের আরোহণ মঞ্চ অবলুপ্ত করে কেবল দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র আরোহণ মঞ্চ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এরপর তৃতীয় নির্মাণ সময়কালে মেধি ও বহিঃপ্রাচীরকে 'একবিংশতি রথ' মঞ্চের আকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া এ নির্মাণ সময়কালের স্থাপত্যিক নিদর্শনের উপর ৬১ সেমি: পুরো নিরেট

---

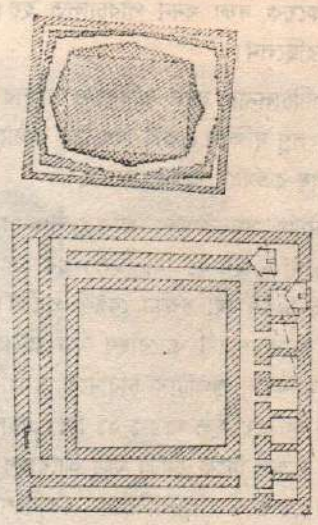
৩৫. N.K. Bhattasali, Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dhaka Museum, Dhaka, 1972 (Reprint), p. 32 ;

৩৬. এছাড়া এ রাজাসন থেকে খ্রিস্টীয় সাত শতকে প্রচলিত শৈলীর লিপি ও একটি দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তি উৎকীর্ণ একটি ডিম্বাকার পোড়ামাটির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছিল, K.N. Dikshit, 'Napukur, Sabhar, Dhanuka, and Sibsagar', Archaeological Survey of India : Annual Report, 1927-28, p. 111

BANSDOC Library
Accession No. 18407

রেখাচিত্র – ৩৩

(শেকল দত্ত নয়, ১৯৮৯ খ্রি: পর্যন্ত অনাবৃত অংশ)



স্তূপ ও বিহারের ভিত্তি পরিকল্পনা, হরিশ চন্দ্র রাজার প্রাসাদ টিবি, সাভার, ঢাকা

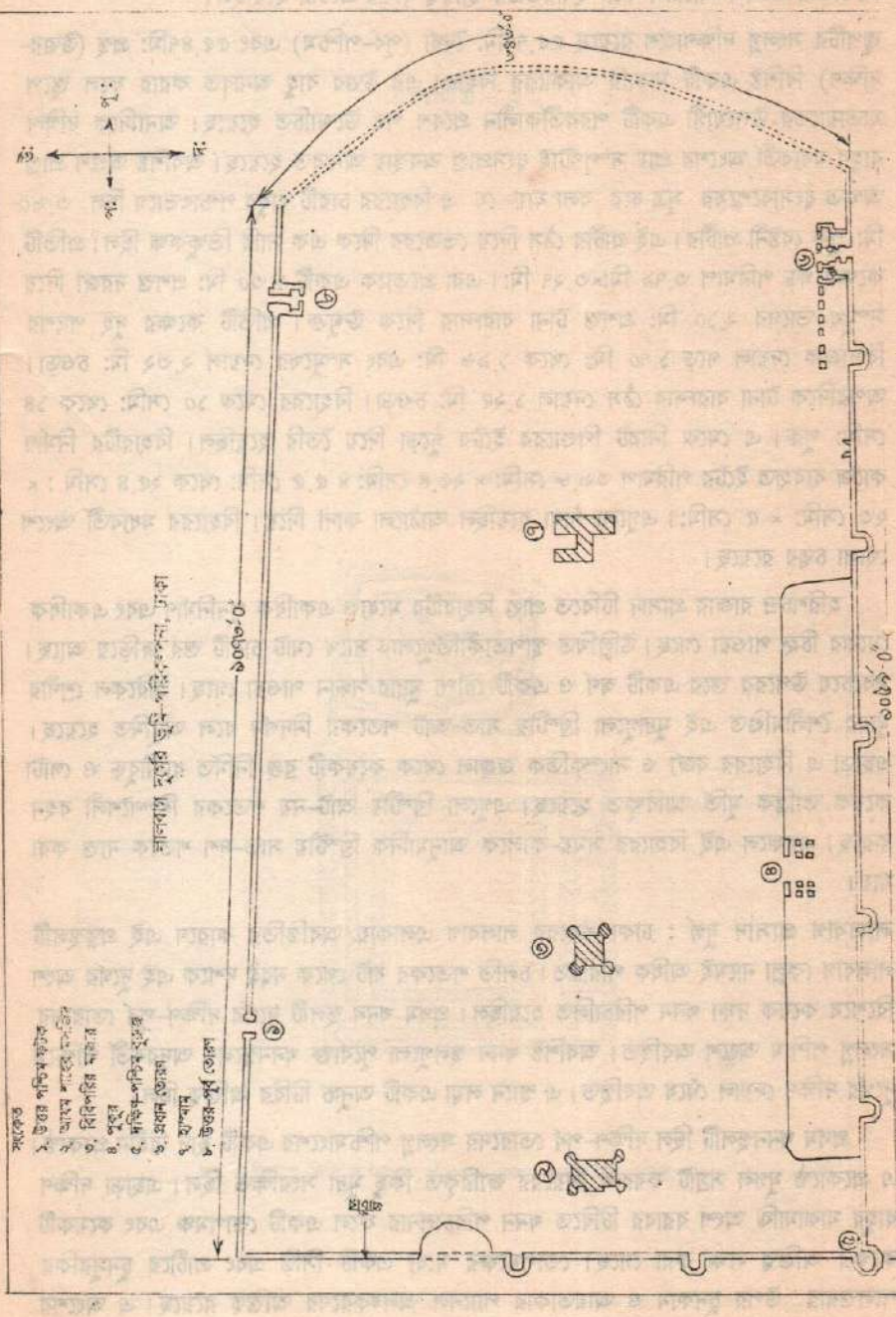
পিণ্ডাকার প্রলেপ আরোপ করে ইমারতটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হয়েছিল।

স্তূপটির সংলগ্ন দক্ষিণাংশে রয়েছে ৫৫.৭৭মি: দৈর্ঘ্য (পূর্ব-পশ্চিম) এবং ৫৫.৪৭মি: প্রস্থ (উত্তর-দক্ষিণ) বিশিষ্ট একটি মাঝারি আকারের বিহার। এর উত্তর বাহু অনাবৃত করার ফলে স্তূপে যাতায়াতের উপযোগী একটি পরবর্তীকালীন প্রবেশ পথ উন্মোচিত হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী অংশের প্রায় সম্পূর্ণটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে প্রাপ্ত অক্ষত ধ্বংসাবশেষের সূত্র ধরে বলা যায় যে এ বিহারের চারটি বাহুর পশ্চাৎভাগে ছিল ৩.৬০ মি: পুরু বেষ্টনী প্রাচীর। এই প্রাচীর ঠেস দিয়ে ভেতরের দিকে এক সারি ভিক্ষুকক্ষ ছিল। প্রতিটি কক্ষের গড় পরিমাপ ৩.৭৯ মি:×৩.২৭ মি:। এরা প্রত্যেকে একটি ১.৩০ মি: প্রশস্ত দরজা দিয়ে সম্মুখ ভাগের ২.১০ মি: প্রশস্ত টানা বারান্দার দিকে উন্মুক্ত। প্রতিটি কক্ষের দুই পাশের বিভাজক দেয়াল গড়ে ১.৭০ মিঃ থেকে ১.৯৬ মি: এবং সম্মুখের দেয়াল ২.৩২ মি: চওড়া। অপরদিকে টানা বারান্দার ঠেস দেয়াল ১.২৫ মি: চওড়া। বিহারের মেঝে ১০ সেমি: থেকে ১৪ সেমি: পুরু। এ মেঝে নিরেট পিণ্ডারের ইটের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয়েছিল। বিহারটির নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৩৬.৮ সেমি: × ২৫.৪ সেমি: × ৫.৫ সেমি: থেকে ২৫.৪ সেমি : × ২৩ সেমি: × ৫ সেমি:। এগুলো গাঁথা হয়েছিল আঠালো কাদা দিয়ে। বিহারের মধ্যবর্তী অংশে খোলা চত্বর রয়েছে।

হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবিতে প্রাপ্ত বিহারটির মধ্যেও একাধিক পুনর্নির্মাণ এবং একাধিক মেঝের চিহ্ন পাওয়া গেছে। উল্লিখিত স্থাপত্যকীর্তিগুলোর সাথে মোট চারটি স্তর জড়িয়ে আছে। সবচেয়ে উপরের স্তরে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। হরিকেল শ্রেণীর মুদ্রার শৈলীমণ্ডিত এই মুদ্রাগুলো খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে। এছাড়া এ বিহারের বর্জ্য ও সাংস্কৃতিক জঞ্জাল থেকে কয়েকটি ব্রঞ্জ নির্মিত ধ্যানীবুদ্ধ ও গোটা কয়েক তান্ত্রিক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকের শিল্পশৈলী বহন করছে। এরফলে এই বিহারের সময়-কালকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সাত-দশ শতকে ন্যস্ত করা যায়।

লালবাগ প্রাসাদ দুর্গ : ঢাকা শহরের লালবাগ এলাকায় অবস্থিতির কারণে এই প্রত্নস্থলটি লালবাগ কেল্লা নামেই অধিক পরিচিত। চলতি শতকের ষাট থেকে নব্বই দশকে এই দুর্গের অংশ বিশেষে কয়েক দফা খনন পরিচালিত হয়েছিল। প্রথম খনন স্থলটি দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব তোরণের সংলগ্ন পশ্চিম অংশে অবস্থিত। অবশিষ্ট খনন স্থলগুলো পূর্বোক্ত খননস্থলের অদূরবর্তী পশ্চিমে দুর্গের দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষে অবস্থিত। এ স্থানে লম্বা একটি অনুচ্চ ঢিবির অস্তিত্ব ছিল।

প্রথম খননস্থলটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব তোরণের সংলগ্ন পশ্চিমাংশের একটি ছাদ বিহীন প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠে মুগল সম্রাট ফররুখ শিয়রের জারিকৃত কিছু মুদ্রা সংরক্ষিত ছিল। এছাড়া দক্ষিণ বাহুর মাঝামাঝি অংশ বরাবর ঢিবিতে খনন পরিচালনার ফলে একটি তোপমঞ্চ এবং কয়েকটি কক্ষের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। তোপমঞ্চের মধ্যে একটি সিঁড়ি এবং প্রাচীরে চুনসুরকির পলেস্তরার উপর চুনকাম ও আয়তাকার প্যানেল অলঙ্করণের অস্তিত্ব রয়েছে। এ অংশের


সংকেত
১. উত্তর পশ্চিম কক্ষ
২. আয়ন মাহুত মন্দির
৩. বিবিপরির মাজার
৪. পুকুর
৫. দক্ষিণ-পশ্চিম বুরুজ
৬. প্রধান তোরণ
৭. আঙ্গন
৮. উত্তর-পূর্ব তোরণ
লালবাগ দুর্গের ভূমি পরিকল্পনা, ঢাকা
১০৫৩'-০"
১০৫৩'-০"
প্রবেশ

রেখাচিত্র - ৩৪

বরাবর উত্তরে গোপন সুরঙ্গ নামে একটি অর্ধ-উন্মোচিত ইমারতের সংলগ্ন অঞ্চলে ১৯৮৭-৮৮ সালে খনন পরিচালনার ফলে আরও দু'টি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রথমত, কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে দুর্গাভ্যন্তরে পানি সরবরাহ করা হতো। এই পানি একটি পাকা নালীর মাধ্যমে গড়িয়ে এসে পরীবিবির মাজারের বিপরীতে অবস্থিত একটি চৌবাচ্চায় সঞ্চিত হতো। অতপর এ স্থান থেকে দুর্গাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য স্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় আহরিত পানি সরবরাহ করা হতো। দ্বিতীয়ত, চৌবাচ্চার পেছনে দক্ষিণ বাহুর সংলগ্ন দুর্গাভ্যন্তর ভাগের দেয়ালের মুখে কিছু প্যানেল চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া মাটির সাথে মিশে ছিল প্রচুর খোলামকুচি। ফলত অনুমিত হয় যে এ অংশে কিছু আবাস কক্ষের অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা নিরাপত্তাজনিত কারণে উঁচু চাতালের উপর বসবাস করা সমীচীন ভেবেছিল। আর তাই তারা উক্ত কক্ষগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে ধ্বংস করেছিল। এই সন্দেহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯১-৯২ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ তোপমঞ্চের অংশে পুনরায় খনন পরিচালিত হয়। এবারও প্রতিরক্ষা প্রাচীরটির গায়ে প্যানেলের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এছাড়া প্যারাপিট থেকে নিচের দিকে অবতরণের জন্য একটি সিঁড়ি ব্যবহৃত হতো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সিঁড়ির মুখে কয়েকটি কক্ষের অস্তিত্ব আজও অক্ষত রয়েছে।

ময়নামতি : কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৯ কি: মি: পশ্চিমে এ প্রত্নস্থলের অবস্থান। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮ কি: মি: লম্বা, গড়ে ৪.৫ কি: মি: প্রশস্ত এবং ৫-৮ মি: উঁচু এ প্রত্নস্থল মূলত একটি টিলা শ্রেণী। এই টিলাশ্রেণীর ঢালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংস্কৃতিক ঢিবির সন্ধান পাওয়া গেছে। সবগুলো ঢিবিতে আজও খনন পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। যেসব ঢিবিতে খনন পরিচালিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে টিলা শ্রেণীর প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত শালিবাহন রাজার (শালবাহন রাজা) বাড়ি নামক ঢিবিটি অন্যতম। ১৯৫৫ সালে এ ঢিবিতে খনন পরিচালনার ফলে ১৬৭.৫৪ সেমি: বর্গাকারে নির্মিত একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এই বিহারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উন্মুক্ত চত্বরের অবস্থান। এর চারদিকে রয়েছে চারটি বাহু। প্রতিটি বাহুর পশ্চাৎদেশস্থ বহি:প্রাচীর ৫.৩ মি: পুরু। এই দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ ভিক্ষুকক্ষ। এগুলো বিভিন্ন পরিমাপে নির্মিত। এদের সংখ্যা সর্বমোট ১১৫। প্রতিটি কক্ষ একটি মাত্র দরজা দিয়ে সম্মুখবর্তী ২.৫৯ মি: চওড়া টানা বারান্দার সাথে যাতায়াতযোগ্য। ভিক্ষুকক্ষগুলো গড়ে ৩.৬৬ মি: × ৩.৩৫ মি: পরিমাপে নির্মিত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রস্থের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে কিছু কিছু কক্ষের পরিমাপ পরিবর্তন করা হয়েছে। এরা পরস্পর থেকে ১.৫২ মি: পুরু দেয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন। কোন কোন কক্ষের পশ্চাৎ দিকের দেয়াল সংলগ্ন মেঝের উপর অনুচ্চ বেদী এবং দেয়ালে করবল্ড পদ্ধতিতে নির্মিত কুলঙ্গী রয়েছে। অন্যান্য কক্ষগুলোতে রয়েছে তিনটি করে (corbelled) খিলান সংবলিত কুলঙ্গী। এছাড়া প্রত্যেক বাহুর সর্বশেষ প্রান্তস্থ কক্ষগুলো আকারে ও প্রকৃতিতে অন্যান্য কক্ষগুলো থেকে ভিন্নতর।

শালবন রাজার ঢিবিস্থ বিহারের উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে মূল বাহু থেকে বাহিরের

দিকে বর্ধিত এবং ২২.৫৬ মি: বিস্তৃত একটি তোরণ। বিহারের বাইরের দিক থেকে (উত্তর থেকে ধাবিত) ৫৩.৪মি: দীর্ঘ একটি জমাটবদ্ধ পথ এসে এ অংশে মিশেছে। এ পথ ধরে অগ্রসর হয়ে একটি বর্ধিত অংশ অতিক্রম করার পর ভেতরে রয়েছে একটি ১০.৬ মি : × ৭.১ মি: পরিমাপের হলঘর। এর দু'পাশে রয়েছে একটি করে অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, প্রহরী কক্ষ এবং সম্মুখে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলঘর। শেষোক্ত হলঘরের দক্ষিণাংশে সংস্থাপিত হয়েছে একটি সোপানশ্রেণী যা দিয়ে বিহারের অভ্যন্তর ভাগের খোলা চত্বরে অবতরণ করা যায়। এই সোপানশ্রেণী থেকে বরাবর ১৫.৮৫ মি: দক্ষিণে অর্থাৎ বিহারের খোলা চত্বরের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

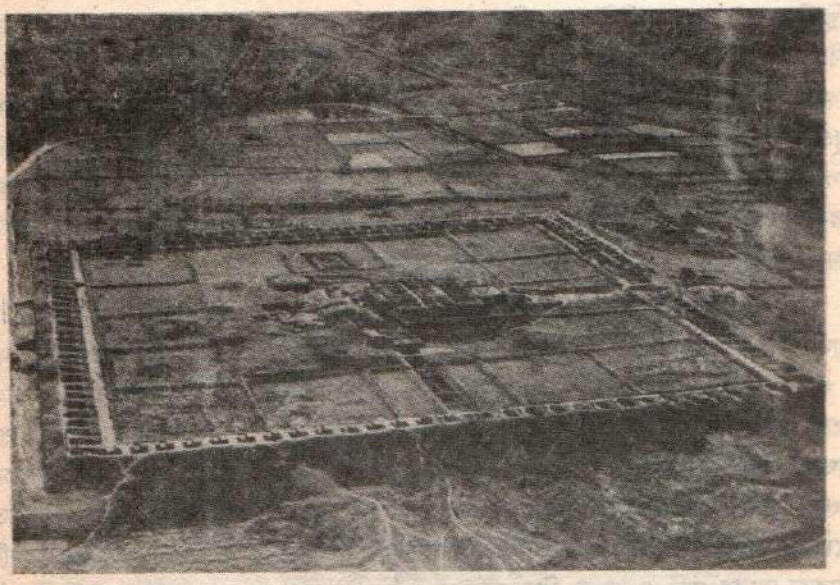
মন্দিরটিতে মোট ছয়টি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেলেও বর্তমানে চারটি নির্মাণ সময়কাল সহজে চিহ্নিতকরণযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। তবে উল্লিখিত পুন:পৌনিক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের ফলে মন্দিরটির মূল কাঠামো অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অবশ্য খননে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের অভিমত অনুযায়ী, মূল মন্দিরটি পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ক্রশাকার পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল। উত্তরমুখী এই মন্দিরে আরোহণের জন্য বিহারের প্রবেশ-দ্বারের বরাবরে রয়েছে এই মন্দিরের সোপান শ্রেণী।

শালবন বিহারের উন্মুক্ত চত্বরে কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়া আরও কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এরমধ্যে সর্ব প্রথমেই আসে কেন্দ্রীয় মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি পূর্বমুখী ইমারতের ভগ্নাংশের প্রসঙ্গ। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই আয়তাকার ইমারতে পাশাপাশি দু'টিকক্ষের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে পূর্ব দিকেরটি একটি হলঘর এবং পশ্চিম দিকেরটি একটি অপ্রশস্ত কক্ষ। এর চারদিক একটি ঘূর্ণায়মান প্রদক্ষিণ পথ দিয়ে বেষ্টিত। এর অনতিদূরস্থ দক্ষিণ-পূর্ব চত্বরাংশে আরও একটি ছোট ইমারতের ধ্বংশাবশেষের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। আয়তাকারে নির্মিত এই ইমারতের চারকোণে চারটি গোলাকার দেয়াল মধ্যস্থিত থামের অবস্থানে কৌতূহলপ্রদ। এছাড়া বিহার অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আরও কিছু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হলঘরটি সম্ভবত ভিক্ষুদের ভোজনালয় হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং এটি বিহারের শেষ নির্মাণ সময়কালে নির্মিত হয়েছিল আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় মন্দির এবং উন্মুক্ত চত্বর সংলগ্ন প্রতিটি বাহুর দেয়ালের কোন কোন অংশ পোড়ামাটির ফলক দিয়ে সজ্জিত ছিল।

এ বিহারে প্রচুর পরিমাণ প্রত্নবস্তুও অনাবৃত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ধাতু ফলক লিপি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ফলকগুলো থেকে সমতটে রাজত্বকারী খড়্গ (আঃ ৬৩০-৭০০ খ্রিস্টাব্দ) ও দেব (আ: খ্রিস্টীয়, আট শতক) নামে দু'টি বংশের কয়েকজন রাজার বংশপঞ্জি পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা দেববংশীয় রাজা ভবদেবের রাজত্ব কালে বিহারটি নির্মিত হয়েছিল এবং চন্দ্র শাসনামল (আঃ ৮৫০-১০৫০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এ বিহারে ভিক্ষুদের আনোগোনা অব্যাহত ছিল তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্য অপর্যাপ্ত। কারণ বিহারের সবচেয়ে প্রাচীন সময়কালের স্তরে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় একটি তাম্রফলক অনাবৃত হয়েছিল। এই

তাম্রফলকটি মহারাজ বন্যগুপ্ত (আঃ ৫০৬–৭ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক জারিকৃত ছিল বলে অনেকেই অভিমত পোষণ করেছেন। আর এ অভিমত সত্য বলে ধরে নিলে দেখা যাবে, শালবন নামক প্রত্নস্থলে খ্রিস্টীয় ছয় শতকেই স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। অপর দিকে বিহারের একটি ভিক্ষুকক্ষের সর্বনিম্নতল থেকে কুফিক বন উৎকীর্ণ একটি রৌপ্য মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে অত্যধিক ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার জন্য এর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আলোকচিত্র – ২৬



শালবনবিহারের এরিয়াল দৃশ্য, ময়নামতি, কুমিল্লা

শালবন বিহার থেকে প্রায় ৩ কি:মি: উত্তরে অবস্থিত আনন্দ রাজার বাড়ি নামক ঢিবিতে ১৯৭৬–৮২ সালে খনন পরিচালিত হয়েছিল। ফলে এ ঢিবিতে শালবন বিহারের অনুরূপ আর একটি বিহারের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। এর প্রতিটি বাহু বাইরের দিক থেকে ১৯৮.১২ মি: দীর্ঘ। এ হিসাবে এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহার। দু'টি নির্মাণ সময়কাল, দশটি স্তর ও সাতটি জমাটবদ্ধ মেঝে সংবলিত এ বিহারের কেন্দ্রেও একটি ক্রুশাকার মন্দির, প্রতি বাহুতে বিভিন্ন পরিমাপের কক্ষের সারি ও টানা বারান্দা, দেয়ালের অংশ বিশেষে বিভিন্ন নকশা সংবলিত ইট ও পোড়ামাটির ফলক, উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে বাইরের দিকে বর্ধিত তোরণদ্বার এবং উন্মুক্ত চত্বরে বিচ্ছিন্ন কিছু ইমারতের অস্তিত্ব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরের চারপাশে ১.৩৭ মি: প্রশস্ত জমাটবদ্ধ ঘূর্ণায়মান পথও রয়েছে। বিহারের প্রতিটি বাহুরপশ্চাৎ দেয়াল ২.৮৯ মি:, সম্মুখের দেয়াল ১.৮২ মি: এবং কক্ষগুলোর বিভাজক দেয়াল ১.৮২ মি: চওড়া। তবে এই বিহারের দক্ষিণ বাহুর অনতিদূরে বাইরের অংশে পাঁচটি মৃৎপাত্র তৈরির ভাটি অনাবৃত হয়েছে।

BARD Library Dhaka

কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা ভবদেবের (আঃ খ্রিষ্টীয় আট শতক) কলিকাতা তাম্রশাসনটি সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ বিহারের সংলগ্ন ভূমিতেই আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এর পূর্ববাহুসহ আরও কয়েকটি ভিক্ষুকক্ষে এখনও খনন পরিচালনা অসমাপ্ত রয়েছে। এসব অংশে খনন পরিচালিত হলে সম্ভবত আরও কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হতে পারে। খননে প্রাপ্ত পাঁচশত প্রত্নবস্তু, প্রচলিত নাম (আনন্দ রাজার বাড়ি টিবি) এবং শালবন বিহারে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে আনন্দদেবের নাম উল্লিখিত থাকার উপর নির্ভর করে আপাতত ধরে নেওয়া হয়েছে যে এ বিহারটি দেব বংশের তৃতীয় নরপতি আনন্দ দেব কর্তৃক আনুমানিক খ্রিস্টীয় আট শতকে নির্মিত হয়েছিল। এ বিহারে খননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে বিহারের পশ্চিমাংশে প্রাপ্ত একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয়ভাবে লভ্য কোমল পলল-শিলা কেটে এটা তৈরি করা হয়েছিল। অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে অনুকৃত গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা, ছোট একটি কানের স্বর্ণ নোলক, পট্টিকেরা জাতীয় একটি রৌপ্য মুদ্রা, একটি পোড়ামাটির পিষ্টক, তারা মূর্তি, সীল,চারটি ব্রঞ্জ নির্মিত ক্ষুদ্রাকার মূর্তি, একটি চমৎকার ব্রঞ্জের রেকাবী এবং কিছু পাথরের মূর্তি। এছাড়া সংলগ্ন ভূমির পৃষ্ঠদেশ থেকে আকস্মিকভাবে একটি কাঁধ যুদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক হাতকুঠারেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

আনন্দ বিহার থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি টিবির নাম কোটিলা মুড়া। ১৯৫৫-৫৭ সালে খননের ফলে এর শিরোদেশে ৮৫.৩৪ মিঃ (উত্তর- দক্ষিণ) × ৬৮.৫৮ মি: (পূর্ব-পশ্চিম) পরিমাপের একটি অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা চত্বর উন্মোচিত হয়। পূর্বদিক থেকে একটি অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে এই চত্বরে আরোহণ করা যেত। সিঁড়ি দিয়ে আরোহণের পর প্রথমেই পড়বে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে সাজান তিনটি আয়তাকার হলঘর। এর চারদিকের সংলগ্ন ভূমি জমাটবদ্ধ করে বাঁধান। সর্বদক্ষিণের পশ্চাতে রয়েছে একটি মণ্ডপ। এদের পশ্চাতে রয়েছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত একটি মঞ্চ। এর উপর দু'টি ভিন্ন আকৃতির তিনটি নিবেদন স্তূপের মেধি ও অন্তের কিয়দংশ উত্তর-দক্ষিণে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে। তিনটি স্তূপের এই সমাবেশের মধ্যে বৌদ্ধ মহাযানী ত্রিতত্ত্বের ধারণা সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। দু'পাশের দু'টি স্তূপের অন্তস্তল নিরেট। কিন্তু মধ্যবর্তী স্তূপটির অন্তস্তল ধর্মচক্রের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। ধর্মচক্রটির কেন্দ্রে রয়েছে গোলাকার শূন্যগর্ভ অংশ। এ অংশ থেকে সূর্যোদয়ের কিরণচ্ছটার মতো উৎসারিত আটটি লম্বাকার প্রকোষ্ঠ আছে। এই তিনটি স্তূপের পশ্চিমে আরও নয়টি এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আরও কিছু ছোট আকারে নির্মিত নিবেদন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কয়েকটি অগ্নিকুণ্ডলীর অংশবিশেষ। তবে এসব নিদর্শন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়কালে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়েছে।

কোটিলা মুড়ার ত্রিরত্ন স্তূপের অন্তস্তল থেকে কিছু বোধিসত্ত্ব ও লোকনাথ মূর্তি, অদগ্ধ মৃত্তিকায় তৈরি ক্ষুদ্রাকার নিবেদন স্তূপ ও ধর্মীয় শ্লোক সংবলিত পোড়ামাটির পিষ্টক অনাবৃত হয়েছে। লোকনাথ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলো স্থানীয়ভাবে লভ্য ধূসর রঙের কোমল পললশিলা

পট্টের উপর নতোন্নত বিন্যাসে তৈরি করা হয়েছে। স্তরবিন্যাস, স্থাপত্যশৈলী ও অন্যান্য পরোক্ষ সূত্রাবলির উপর নির্ভর করে এই স্তূপগুলোর সময়কাল খ্রিস্টীয় সাত থেকে তের শতকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কোটিলা মুড়ার সর্বোচ্চস্তর থেকে একটি আব্বাসীয় স্বর্ণ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রাটি খলিফা আবু আহমেদ আবদুল্লাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক জারিকৃত।

আলোকচিত্র -২৭



রূপবান মুড়ায় প্রাপ্ত বেলে পাথরের বুদ্ধ

কোটিলা মুড়ার দুই কিলোমিটার দক্ষিণে ১৯০ মি: × ১৮০ মি: × ৩ মি: পরিমাপের একটি টিবি আছে। লোকমুখে ভোজরাজার বাড়ি নামে পরিচিত এ টিবিতে ১৯৯৪ সালে খনন

পরিচালনার ফলে এর উত্তরাংশের ভূমিতে পূর্ব-পশ্চিমে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছয়টি কক্ষের ভিত্তির অংশ উন্মোচিত হয়েছে। কক্ষগুলোর গড় পরিমাপ ৪.২০ মি : × ৪ মি: × ২.৮০ মি:। এদের পেছনের দেয়াল ৩.৮০ মি:, সম্মুখের দেয়াল ১.৪৫ মি: এবং বিভাজক দেয়ালগুলো ১.৫০ মিঃ চওড়া। শুধু তাই নয়, এদের সম্মুখে ২.১০ মিঃ প্রশস্ত একটি টানা বারান্দার অস্তিত্ব রয়েছে। টানা বারান্দাটির সম্মুখের দেয়াল ১.১০ মিঃ পুরু। এছাড়া কক্ষগুলোর পশ্চিমাংশে ১.৯০মি: প্রশস্ত একটি ফাঁকা অংশও আছে। এ ফাঁকা অংশটি সম্ভবত বিহারের তোরণ-দ্বার হতে পারে। এই উন্মোচিত অংশের সাথে ঢিবিটির অবশিষ্ট অংশের ভূপৃষ্ঠ পর্যালোচনা করে অনুমিত হয় যে এ প্রত্নস্থলে একটি চতুর্ভুজ আকৃতির বিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

আলোকচিত্র – ২৮



ভোজ বিহারে অনাবৃত ব্রঞ্জ নির্মিত ব্রজসত্ত্ব

ভোজরাজার ঢিবির মধ্যবর্তী অনুচ্চ অংশে খনন পরিচালনার ফলে একটি ইট-কাদামাটি নির্মিত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এই স্থাপত্যিক নিদর্শনের দক্ষিণ দিক ব্যতীত অপর প্রতিটি দিকে একটি করে সংলগ্ন কক্ষ রয়েছে। উত্তর দিকস্থ কক্ষটির দক্ষিণের দেয়াল ঠেস দিয়ে একটি অনুচ্চ বেদী তৈরি হয়েছিল। ফলে কক্ষগুলোকে একটি

ক্রশাকার মন্দিরের মণ্ডপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই স্থাপত্যিক নিদর্শনের চারদিকে ২.১০ মি: প্রশস্ত একটি প্রদক্ষিণ পথ আছে। প্রদক্ষিণ পথটি আবার একটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। দক্ষিণের অংশে অদ্যাবধি খনন পরিচালিত হয় নি।

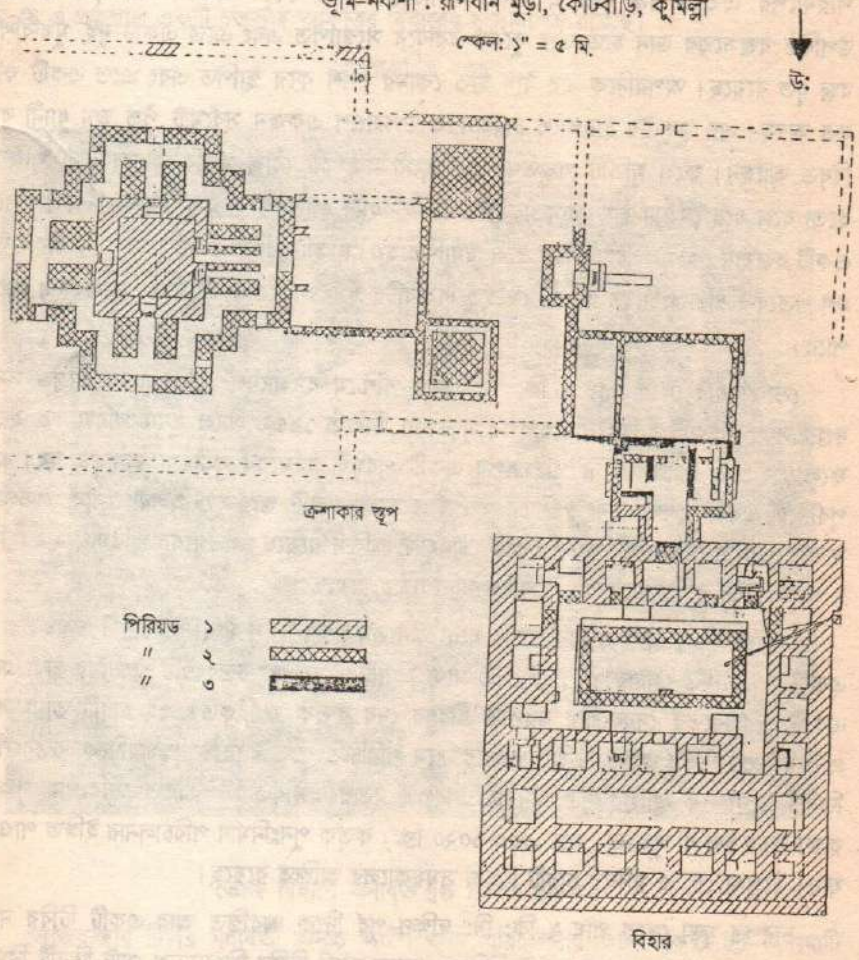
এ প্রত্নস্থলে অনাবৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলক। ফলকগুলোতে নতোন্নত বিন্যাসে বাংলাদেশের লোকজশিল্পের বিবিধ দৃশ্য স্থান লাভ করেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু হলো একটি ব্রঞ্জ নির্মিত আদর্শ আকৃতির বজ্রসত্ত্ব মূর্তি। ১.৪০ × ১.২০ মি: পরিমাপের এতবড় ব্রঞ্জ মূর্তি এ যাবৎ বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় নি। উপবিষ্ঠ বজ্রসত্ত্বের ডান হাত তার বুকের বরাবরে সংস্থাপিত এবং এতে একটি দুই মুখবিশিষ্ট বজ্র ধৃত রয়েছে। অপরদিকে এর বাঁম হাত কোমর স্পর্শ করে স্থাপিত এবং এতে একটি ঘন্টা ধৃত আছে। এর মুকুটের চারপাশে চারজন ও উপরাংশে একজন সর্বমোট পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধ বিধৃত আছেন। ফলে মূর্তিটি পঞ্চতথাগত বিশ্বাসী বজ্রযানী বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের দ্বারা পূজিত হতো বলে ধরে নেওয়া যায়। এমতাবস্থায়, ভোজবিহারে প্রাপ্ত স্থাপত্যিক নিদর্শনাদি নিঃসন্দেহে একটি বজ্রযান কেন্দ্রিক বিহার ছিল বলে প্রমাণিত হয়। মূর্তিটির শিল্পশৈলী যেহেতু খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতকের ধারা প্রবাহের ধারক, সেহেতু বিহারটির সময়কালকেও, ঐ সময়ে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

ভোজবিহার থেকে প্রায় ৪ কি. মি: উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশ রেজিমেন্টের বিগ্রেড সদর দপ্তর সংলগ্ন একটি ঢিবির নাম চারপত্র মুড়া। এ ঢিবিতে ১৯৫৬ সালে খনন পরিচালিত হয়। ফলে ৩২.১মি: × ১৬.৭৫মি: পরিমাপের একটি পূর্বমুখী মন্দিরের কাঠামো অনাবৃত হয়। এর পূর্বদিকে একটি হলঘর এবং পশ্চিমে গর্ভগৃহ রয়েছে। চারটি স্তম্ভ যুক্ত হলঘর থেকে গর্ভগৃহে যাতায়াতের জন্য মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছাদযুক্ত অলিন্দ রয়েছে। গর্ভগৃহের পরিমাপ ২.২৫ মি: × ৩ মি:। এর বহির্দেয়ালে রথ প্রক্ষেপণ সন্নিবেশিত রয়েছে।

চারপত্র মুড়ায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো লিপি সংবলিত চারটি তাম্রফলক ও একটি ব্রঞ্জ নির্মিত স্মারকাধার। এগুলোর মধ্যে তিনটি তাম্রফলক চন্দ্রবংশীয় রাজাদের দ্বারা এবং একটি দেবপর্বতের দেববংশীয় নরপতি বীরধর দেব কর্তৃক জারিকৃত। এই চারটি তাম্রফলক প্রাপ্তির উপর নির্ভর করেই ঢিবিটি চারপত্র নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অপরদিকে, চন্দ্রবংশীয় তিনটি তাম্রফলক প্রাপ্তির সূত্র অনুযায়ী চারপত্র মুড়ায় অনাবৃত মন্দিরটিতে চন্দ্রবংশীয় পঞ্চম রাজা লড়হ চন্দ্র বা লুদ্ধচন্দ্র (আঃ ১০০০-১০২০ খ্রিঃ) কর্তৃক পুনঃনির্মাণ পরিচালনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এ মন্দিরে চারটি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব রয়েছে।

চারপত্র মুড়া থেকে প্রায় ২ কি: মি: দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত আর একটি ঢিবির নাম রূপবান মুড়া। ১৯৮৪-৮৫ সালে এই ঢিবিতে খননের ফলে ঢিবির শিরোদেশে মোট তিনটি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্বসহ বেশ কিছু স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। ঢিবির মধ্যবর্তী স্থানে প্রথম নির্মাণ সময়কালে ২৮.১৯ মি: × ২৮.১১ মি: পরিমাপের একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

রেখাচিত্র – ৩৫



এরমধ্যে একটি পুনঃনির্মাণের অস্তিত্ব রয়েছে। ভিত্তি পরিকল্পনার দিক থেকে এ মন্দির বহু কোণাকার ক্রশাকার শ্রেণীভুক্ত। এর কেন্দ্রস্থ একটি চতুস্কোণাকার নিরেট অংশকে ঠেস দিয়ে প্রতিটি দিকে একটি করে কক্ষ ছিল। প্রতিটি কক্ষ নিজ নিজ সম্মুখ ভাগে উন্মুক্ত।

পূর্বদিক ব্যতীত অপর তিন দিকের কক্ষগুলোর পরিমাপ সমান এবং প্রত্যেকে একটি করে বেদী ধারণ করছে। পূর্বদিকের মূল কক্ষটি পাশাপাশি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। একটি প্রকোষ্ঠে বেলে পাথরে নির্মিত একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি সংরক্ষিত ছিল। এই মন্দিরের চারদিকে একটি প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ দিয়ে বেষ্টিত ছিল। এর বাইরের প্রান্তদেশে মূল মন্দিরের ভূমি-পরিকল্পনার সমান্তরালে দেয়ালের চিহ্নও লক্ষ করা যায়। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণের কক্ষগুলোর বেদীর উপর একটি করে ব্রঞ্জের ভাঙ্গা টুকরা পাওয়া গেছে। ফলে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, প্রথম নির্মাণ সময়কালের মন্দিরটি ধ্বংস হলে ক্ষুদ্রাকার মূর্তিগুলো অপসারণ করা হয়, কিন্তু পূর্বদিকের কক্ষটির বৃহৎ মূর্তিটি অপসারণ করা সম্ভব হয় নি। এরপর ধ্বংসাবশেষের উপর সাংস্কৃতিক জঞ্জাল সরিয়ে দ্বিতীয় নির্মাণসময়কালের নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এ মন্দিরের পরিমাপ দাঁড়িয়েছিল ২৭.৭ মিঃ (লম্বা) × ২১.৫ মিঃ (প্রশস্ত)।

মন্দিরটির লাগোয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আরও কিছু স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। অত্যন্ত ভগ্নাবস্থার জন্য এদের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। তবে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের নিদর্শনটির দৈর্ঘ্য ১.৫০ মি: ও প্রস্থ ৫৫ সেমি: এবং এটি যে একটি নিবেদন স্তূপের মেধি অংশ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমানে কেবল এর তিন ধাপ ইটের গাঁথুনী অক্ষত রয়েছে। এছাড়া এটা নিচের দিকে আরও কিছুদূর বিস্তৃত ছিল বলেও অনুমান করা গেছে। ঢিবিটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি ক্ষুদ্রাকার বিহারের ভিত্তি পরিকল্পনাও অনাবৃত হয়েছে। আয়তাকার এ বিহার পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫.৪ মি: লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৫.৬১ মি: প্রশস্ত। প্রতিটি বাহুতে রয়েছে সারিবদ্ধ ভিক্ষুকক্ষ। এছাড়া রয়েছে সীমানা প্রাচীর। উল্লেখ্য যে, সীমানা প্রাচীরের বাইরের পূর্বদিকে সাত ধাপ সংবলিত অপর আর একটি দেয়ালের অংশবিশেষ অনাবৃত হয়েছে। এর পুরুত্ব ১.১৫ মিঃ। এই স্থাপত্যিক ভগ্নাবশেষগুলোতে মোট তিনটি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব রয়েছে।

রূপবান মুড়ায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে আমলক শিলা, পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কৃত ইট, পাঁচটি গুপ্ত ক্ষয়িষ্ণু স্বর্ণমুদ্রা, পট্টিকের ধরনের তিনটি রৌপ্য মুদ্রা ও একটি ব্রঞ্জের হাতল অন্যতম। পোড়ামাটির ফলকগুলোতে নতোন্নত বিন্যাসে শূকর, চক্র, নর্তক যোদ্ধা, ফুলদানি, কিন্নর, আমলক শিলা, মালা মুখে হাঁস, মানুষ আহার রত কুমির, সাপের ফণা, শশ্রুধারী পুরুষ, শাপলা, বিভিন্ন ভঙ্গিতে নারী ইত্যাদি মোটিফ বিধৃত রয়েছে। অলঙ্কারিক ইটগুলোতে ধাপ যুক্ত পিরামিড, পদ্ম পাপড়ি, শিকল, জ্যামিতিক নকশা, ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। মন্দিরের পূর্বদিকের একটি কক্ষে প্রাপ্ত বেলে পাথরের বুদ্ধ মূর্তিটির উচ্চতা ২৫৬ মিটার। এর শিল্পশৈলীতে খ্রিস্টীয় সাত আট শতকে প্রচলিত রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এছাড়া খননের পূর্বে এ প্রত্নস্থলের ভূমি পৃষ্ঠ থেকে একটি সঞ্চয় পাত্রে গুপ্তভাণ্ডার আকারে সংরক্ষিত কিছু নিবেদন

প্রকৃতির বুদ্ধ মূর্তির আকস্মিক আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছিল। তবে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলোর মধ্যে পরবর্তীকালে কেবল তেরটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

রূপবান মুড়ার লাগোয়া উত্তরে ইঁটাখোলা মুড়া নামে আর একটি খননস্থল অবস্থিত। মাঝখানে ১৯৮৮–৮৯ অর্থ বছর বাদ দিয়ে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিয়মিত খনন পরিচালনার ফলে এ খননস্থলে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। খননস্থলের দক্ষিণাংশ জুড়ে আছে ৪৫.৬ মি: (শুধু পশ্চিম) × ২৪.৯ মি: (উত্তর–দক্ষিণ) পরিমাপের একটি আয়তাকার চত্বর। চত্বরটির মাঝখানে প্রথম নির্মাণ সময়কালের ২.৫ মি: চওড়া একটি জমাটবদ্ধ প্রদক্ষিণ পথ ঘেরা ধ্বংসপ্রায় ইমারতের ভিত্তি পরিকল্পনা আবিষ্কৃত হয়েছে। নিরেট বর্গাকারে (১৩.১ মি : × ১৩.১ মি:) নির্মিত এই ইমারতের পূর্বদিকে ২.৪ মি: × ২.১ মি: পরিমাপের একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষের উপর পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে আরও চার বার পুন:নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। প্রতিটি পুন:নির্মাণ সময়কালে ইমারতটির মেঝের উচ্চতা বৃদ্ধি সহ আরও কিছু আনুষঙ্গিক ইমারত সংযোজিত হয়ে ছিল। তৃতীয় পুন:নির্মাণ সময়কালের মেঝেতে মূল অবস্থায় একটি অতিকায় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য মূর্তির দেহের নিম্ন অর্ধাংশ অনাবৃত হয়েছে। চুনবালির তৈরি এত বড় নিদর্শন এ যাবৎ আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। এ আবিষ্কারটি সংঘটিত হওয়ার ফলে বিস্মৃত ইমারতটিকে একটি বৌদ্ধ মন্দির হিসাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ইঁটাখোলা মুড়া খননস্থলে সদ্য আবিষ্কৃত মন্দিরের দেয়ালের বহির্গাত্র মোটামুটি নিরাভরণ। তবে কোন কোন স্থানে কদাচিৎ প্যানেল নকশার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এছাড়া এই মন্দিরটি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে স্থাপত্যিক কাঠামো অনুসৃত হয়েছে তাও সম্পূর্ণ নতুনত্বের দাবিদার। পরবর্তী বিভিন্ন অংশে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এসব নির্মাণ কাজগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রকোষ্ঠের কাঠামো অন্যতম। সম্ভবত এগুলো পূজারীদের আবাস কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমিত হয়েছে।

ইঁটাখোলা মুড়া মন্দির বরাবর উত্তরে এবং ৪৮.৭ মি: দূরত্বে এ খননস্থলের দ্বিতীয় স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষটি অনাবৃত হয়েছে। খনন সমাপ্তির পর দেখা গেছে যে, এটি ছিল ৩৯.৬ মি: × ৩৯.৬ মি: পরিমাপের একটি বিহার। এর অক্ষত অংশে অদ্যাবধি মোট তিনটি পুন:নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথম নির্মাণ সময়কালে বিহারটিতে মোট বিশটি ভিক্ষুকক্ষের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে এই সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে। স্থাপত্যিক নিদর্শনের সঙ্গে কিছু প্রত্নবস্তুও আবিষ্কৃত হয়েছে। এসবের মধ্যে তিনটি সোনার পিণ্ড, একটি রূপার মুদ্রা, ব্রঞ্জের মূর্তিকা, অলঙ্কৃত ইট, পোড়ামাটির সীলছাপ ও মৃৎপাত্র অন্যতম। ইঁটাখোলা মুড়ায় আবিষ্কৃত মন্দির, বিহার ও প্রত্নবস্তুগুলোর সময়কাল খ্রিস্টীয় সাত থেকে চৌদ্দ শতকে ন্যস্ত করা যায়।

লালমাই–ময়নামতি টিলা শ্রেণীর সবচেয়ে উত্তর অংশে অবস্থিত একটি খননস্থলের নাম রাণীর বাঙলো। এ প্রত্নস্থলে সর্বপ্রথম ১৯৬৮ সালে খনন পরিচালনার ফলে কেবল একটি প্রাক–ইসলামি শাসনামলের সীমানা দেয়ালের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। অতপর ১৯৯৬–৯৭

অর্থ বছরে খনন পরিচালনার ফলে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন অনাবৃত হয়। সদ্য অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি মূল নির্মাণ ও তিনটি পুন:নির্মাণের চিহ্নাদি বিদ্যমান। প্রথম নির্মাণ সময়কালের ইমারতটির ভিত্তি পরিকল্পনা ক্রশাকার ছিল। এটি ৪৪.৪ মি: বর্গাকার পরিমাপে নির্মিত। দ্বিতীয় পুন:নির্মাণ সময়কালে ক্রশাকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর ১৫.৬ মি: × ১৪.৪ মি: পরিমাপের নিরেট কাঠামোর পূর্বপ্রান্তে ২.২ মি: বর্গাকার প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছিল। তৃতীয় পুন:নির্মাণ সময়কালে দ্বিতীয় পুন:নির্মাণ সময়কালের স্থাপত্যিক কাঠামোটির উপর ১২.৬ মি: × ১১.৭ মি: পরিমাপের আর একটি ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া এ সময়কালে পূর্বপাশের বেষ্টনী প্রাচীরের বিপরীতে কয়েকটি আনুষঙ্গিক কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। চতুর্থ নির্মাণ সময়কালের ইমারতটি এতবেশি পরিমাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এর সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রদান সম্ভব নয়। এসব স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষগুলোর সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিছু পোড়ামাটির ফলক এবং অলঙ্কৃত ইটও পাওয়া গেছে।

রাণীর বাঙলো ঢিবিতে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বেশকিছু চিত্র বিধৃত ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি চিত্রে চার হাত বিশিষ্ট নরসিংহী, রাজহাঁস, ময়ূর, কিন্নরী, হাল কর্ষণরত কৃষক, শৃঙ্গারে রত ষাঁড় ও গাভী, মহিষের পিঠে নারী-আরোহী ইত্যাদি অন্যতম। শিল্পশৈলী বিচারে এরা খ্রিষ্টীয় আট-নয় শতকে প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের ধারক। অলঙ্কৃত ইটগুলোর মোটিফে রয়েছে পদ্ম পাপড়ি, ধাপময় পিরামিড ইত্যাদি। সুতরাং এটা এক প্রকার নিশ্চিত যে, রাণীর বাঙলো ঢিবির বিস্মৃত ইমারতটি একটি সুশোভিত ধর্মীয় ইমারত ছিল।

এযাবৎ মাত্র ৪.৫ মি: গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা সম্ভব হয়েছে। ফলে পাঁচটি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্তর (৫) সম্পূর্ণরূপে সাংস্কৃতিক জঞ্জাল বিবর্জিত। তাই এ স্তরটিকে আদিম অকর্ষিত স্তর হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। তবে সম্পূর্ণ প্রত্নস্থলের একটি পূর্ণাঙ্গ স্তরবিন্যাস দাঁড় করাতে হলে খনন এলাকা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।

ময়নামতি টিলাশ্রেণীতে অবস্থিত অপরাপর খননকৃত ঢিবির মধ্যে ময়নামতি মাউণ্ড-১ এ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ ঢিবিতে খননের ফলে কিছু বিচ্ছিন্ন ইটের দেয়ালের চিহ্ন ব্যতীত অন্যকোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। ফলে এ প্রত্নস্থলের বিলুপ্ত ইমারতের স্থাপত্য বা স্তরবিন্যাস সম্পর্কে বিশদ কিছু বলার অবকাশ নেই।

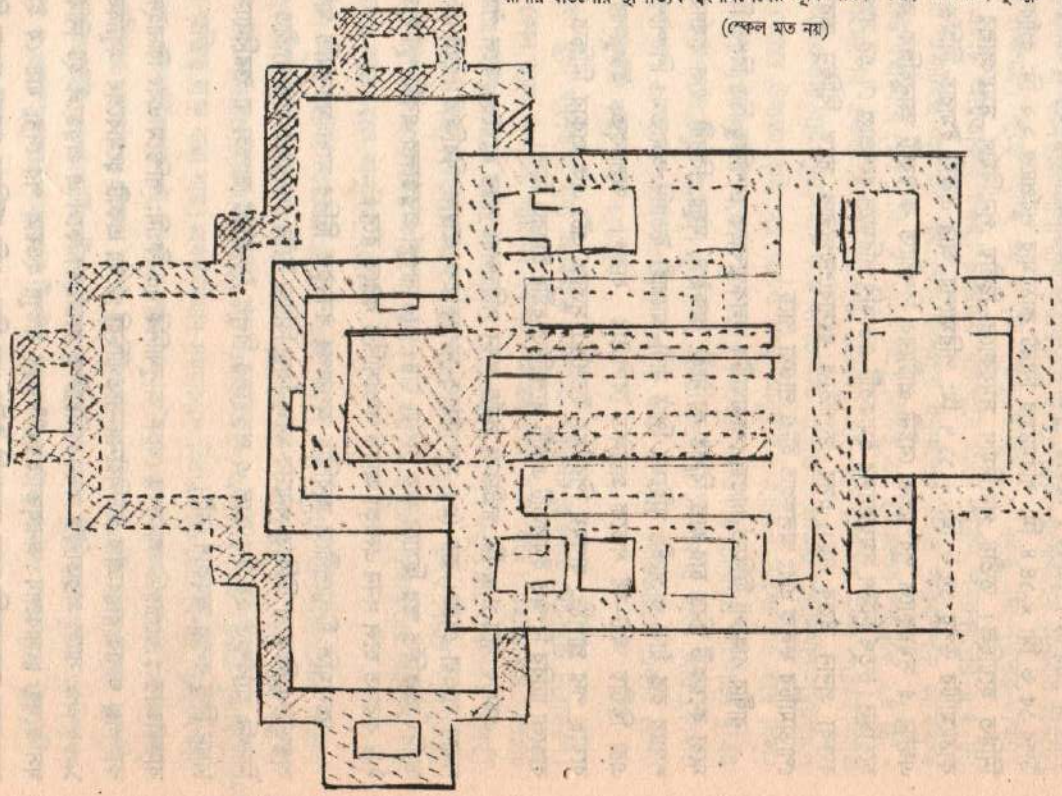
বারবাজার ঃ যশোর জেলা সদর থেকে আনুমানিক ২০ কি:মি: পশ্চিমে এবং ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানার বারবাজার ইউনিয়নের সাতগাছিয়া গ্রামের একটি ধ্বংসাবশেষ অধ্যুষিত ভূমিতে ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালিত হয়েছিল। ফলে এ প্রত্নস্থলে ইট নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়।[৩৭] খনন সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখা যায় যে ইমারতটির অভ্যন্তরে আড়াআড়ি ভাবে চারসারি ইটের থাম ছিল। প্রতি সারিতে থামের সংখ্যা ছিল ছয়টি।

---

৩৭. হাবিবা খাতুন ও খন্দকার আলমগীর, 'সাতগাছিয়া মসজিদ' ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৯৮ বাংলা

রেখাচিত্র – ৩৬

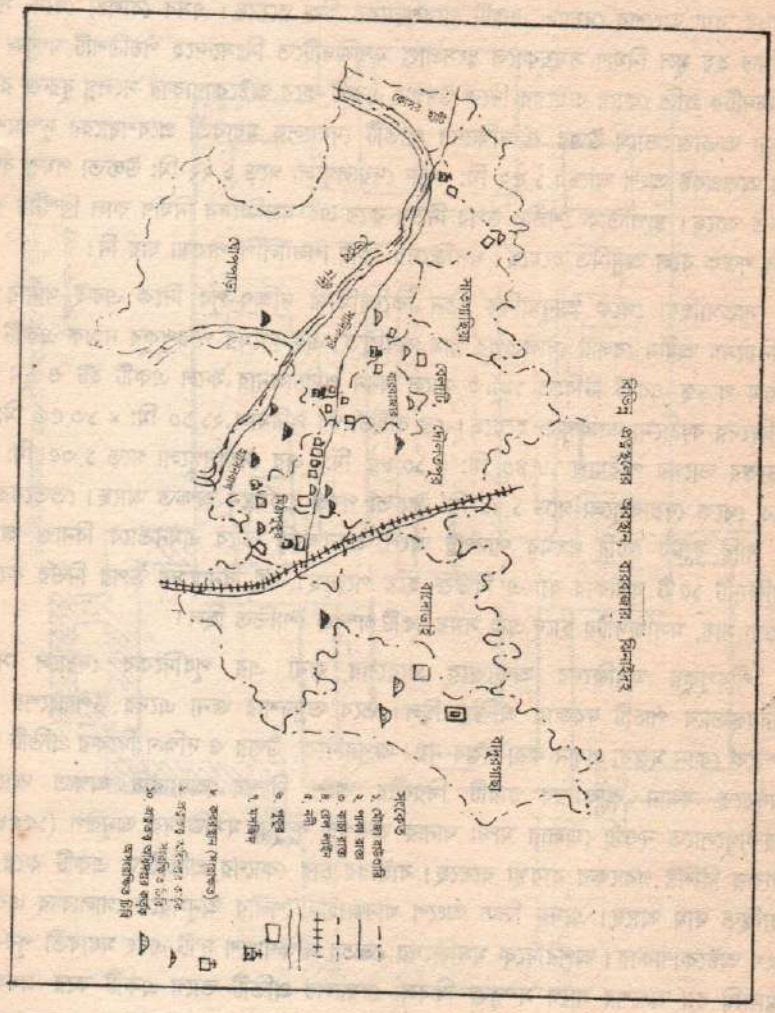
রাণীর বাঙলোর স্থাপাত্যক ধ্বংসাবশেষের ভূমি-পরিকল্পনা, ময়নামতি, কুমিল্লা
(স্কেল মত নয়)



ফলে এই বিরাট আকারের হলঘরটি আড়াআড়িভাবে (উত্তর-দক্ষিণ) ৫টি আইল (Aisle) ও লম্বালম্বিভাবে (পূর্ব-পশ্চিম) সাতটি ব্যা-এ (bay) বিভক্ত ছিল বলে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অপরদিকে এর পূর্বদেয়ালে সাতটি দরজা, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রত্যেকটিতে একটি করে দরজা এবং পশ্চিম দেয়ালের ভিতরের মুখে ছয়টি মিহরাব এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবের লাগোয়া উত্তরের 'ব্যা' অংশের দেয়ালে একটি প্রবেশদ্বারের চিহ্ন রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই অনুমিত হয় মূল নির্মাণ সময়কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটিতে নিঃসন্দেহে পঁয়ত্রিশটি গম্বুজ ছিল। মসজিদটির প্রতি কোণে বাইরের দিকে উদ্গত একটি করে অষ্টকোণাকার সংলগ্ন বুরুজ রয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরভাগে উত্তর ও দক্ষিণের প্রতিটি দেয়ালের মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দু'টি করে অন্তপ্রবৃষ্ট অংশ আছে। ১.৫২ মি: পুরু দেয়ালগুলো গড়ে ১.২২ মি: উচ্চতা পর্যন্ত বর্তমানে অক্ষত আছে। স্থাপত্যিক শৈলীর উপর নির্ভর করে এই মসজিদের নির্মাণ কাল খ্রিস্টীয় পনের-ষোল শতক বলে অনুমিত হয়েছে। মসজিদের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি।

সাতগাছিয়া থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একই থানার একই ইউনিয়নের অধীন বেলাট দৌলতপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের পীরপুকুর নামক একটি দীঘির পশ্চিম পাড়স্থ একটি ঢিবিতে ১৯৯৩ সালে খনন পরিচালনার ফলে একটি ইট ও চুন নির্মিত মসজিদের কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বহির্ভাগের পরিমাপ ২১.১০ মি: × ১৩.৫৫ মি: এবং অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ১৮.৪০ মি: × ১০.৮৫ মি:। এর দেয়ালগুলো গড়ে ১.৩৫ মি: চওড়া। মেঝে থেকে দেয়ালগুলো গড়ে ১.৭০ মি: উচ্চতা পর্যন্ত বর্তমানে অক্ষত আছে। ভেতরের অংশে দুই সারি ইটের তৈরি থামের পাদপট্ট অংশ আড়াআড়ি ভাবে এমনভাবে বিন্যস্ত আছে যে মসজিদটি ১৫টি বর্গাকার ব্যা-এ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই বিন্যাসের উপর নির্ভর করে ধরে নেওয়া যায়, মসজিদটির ছাদে এক সময় ১৫টি গম্বুজ শোভিত ছিল।

পীরপুকুর মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য এর পূর্বদিকের দেয়ালে সমদূরত্বে সারিবদ্ধভাবে পাঁচটি দরজার অস্তিত্ব ছিল। তবে ভগ্নদশার জন্য এদের উপরাংশের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান করা সম্ভব নয়। অপরদিকে, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রতিটি দেয়ালে সমদূরত্বে সমান আকারের চারটি খিরকীর অংশ বিশেষ অদ্যাবধি অক্ষত আছে। এ খিরকীগুলোতে নওগাঁ জেলার মান্দা থানার অন্তর্গত কুসুম্বা মসজিদের অনুরূপ (১৫৫৮ খ্রিঃ) ফোঁকর বিশিষ্ট গবাক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। বাইরের চার কোণের প্রতিটিতে একটি করে দেয়াল মধ্যস্থিত থাম আছে। এদের ভিত অংশে খানজাহান শৈলীর অনুসরণে গোলাকার এবং উপর অংশ অষ্টকোণাকার। অপরদিকে মসজিদের ভেতর দক্ষিণাংশে দু'টি এবং মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি ব্যা-অংশের সাথে সম্পৃক্ত কিবলা দেয়ালের প্রতিটি ভাগে একটি করে অর্ধবৃত্তাকারে অবতল মিহরাব আছে। এরমধ্যে সর্বউত্তরের মিহরাবটি অপর দু'টির তুলনায় আকারে বড়। মধ্যবর্তী বড় মিহরাবটির সংলগ্ন উত্তরে কিবলা দেয়াল ঠেস দিয়ে ১.৮ মি: × ৩০.১০ সেমি: পরিমাপের এবং আট ধাপ বিশিষ্ট একটি অনুচ্চ মিম্বার রয়েছে। এর উত্তরে মসজিদের উত্তর-পশ্চিমাংশ জুড়ে আছে একটি মঞ্চ। খিলান করা ছাদের আকারে এই মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।



রেখাচিত্র – ৩৭

পূর্বদিক থেকে দশ ধাপ বিশিষ্ট একটি সোপান শ্রেণী দিয়ে আরোহণ যোগ্য এই মঞ্চটির উচ্চতা ৩ মি: দৈর্ঘ্য ৩.৮৫ মি: এবং প্রস্থ ৩.৮ মি:। সম্পূর্ণ ইট ও সুরকির মসলায় নির্মিত এই মসজিদের দেয়ালের কোন কোন স্থানে চুনবালির পলেস্তরার অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এর ইটগুলোর পরিমাপ ১৮ সেমি: × ১৮ সেমি: × ৫ সেমি: থেকে ১৫সেমি: × ১৫ সেমি: × ৪ সেমি:। এই মসজিদের কেবল মিহরাব অংশে যৎসামান্য অলঙ্কৃত ইটের নক্শার অস্তিত্ব রয়েছে। স্থাপত্যিক শৈলীর ভিত্তিতে এ মসজিদের সময়কাল খ্রিস্টীয় ষোল শতকের শেষ অর্ধাংশে ন্যস্ত করা যায়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোন শিলালিপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পীরপুকুরের প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে হাসিলবাগ মৌজায় নুনগোলা নামক আর একটি বিশালাকার দিঘি আছে। লোকমুখে অবগত হওয়া যায় যে নুনগোলা নামে পরিচিত এ দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটি মাঝারি আকারের ঢিবি ছিল। ১৯৯৪ সালে খনন পরিচালনা করে এ ঢিবিতে একটি ১০.১৬ মি: × ১০.০৬ মি: পরিমাপের মসজিদের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। ইট ও চুনবালির মসলা নির্মিত-এর দেয়ালগুলো গড়ে ১.৬৯ মি: পুরু। এর চার কোণের প্রতিটিতে একটি করে সংলগ্ন বুরুজ রয়েছে। এদের ধর অংশের মধ্যবর্তী স্থানে পরস্পর থেকে ৪ সেমি: দূরত্বে একটি করে মোট দু'টি ব্যাণ্ড (band) রয়েছে। ব্যাণ্ডগুলো ১৩ সেমি: প্রশস্ত। এই মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকের দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণের প্রতিটিতে একটি করে খিলান-দরজা রয়েছে। এদের উপরাংশ ভাঁজ যুক্ত খিলান সংবলিত। পূর্বদেয়ালের মধ্যবর্তী খিলানদ্বারটি অন্যান্য খিলানদ্বার থেকে আকারে বড়। পূর্বদেয়ালের খিলানদ্বারগুলোর বিপরীতে কিবলা দেয়ালে তিনটি অন্ত:প্রবৃষ্ট মিহরাব রয়েছে। মধ্যের মিহরাবটি আকারে বড়। তবে প্রতিটি মিহরাবই ফল ও লতাপাতা খচিত অলঙ্কৃত ইট দিয়ে শোভিত। অত্যন্ত ভগ্নদশার জন্য এই মসজিদের অন্যান্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট ও তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হয় নি।

১৯৯২-৯৩ সালে গলাকাটার অদূরবর্তী স্থানগুলোতে অবস্থিত জোড়বাংলা, গলাকাটা ও খড়ের ঢিবিতে (মাতারাণী ঢিবি) খনন পরিচালিত হয়। জোড়বাংলা ঢিবিতে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষটি একটি মসজিদের স্মৃতি বহন করছে। বর্গাকৃতির এ মসজিদের প্রতিটি বাহু ৯.৪৪ মি: দীর্ঘ। এর দেয়াল ১.৪১ মি: চওড়া। মসজিদের ভেতরের পরিমাপ ৬.৬০ মি: × ৬.৬০ মি:। এর কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব ও পূর্বদেয়ালে তিনটি খিলানদ্বার আছে। মিহরাবগুলো অলঙ্কারযুক্ত ইট দ্বারা সুশোভিত। এছাড়া প্রার্থনা কক্ষ ও বারান্দার কিছু কিছু অংশেও অলঙ্কৃত ইটের নকশার অস্তিত্ব রয়েছে। এরপ্রতি কোণায় রয়েছে একটি করে অষ্টকোণাকার সংলগ্ন বুরুজ। মসজিদ অঙ্গনে প্রবেশের জন্য উত্তর-পূর্ব কোণে একটি তোরণ-দ্বার রয়েছে। এই তোরণ হতে উত্তর দিকে পুকুরের (জোড়বাংলা পুকুর) পাড়ে অবতরণের জন্য পাকা ও প্রশস্ত ঘাট রয়েছে। খননে প্রাপ্ত উৎকীর্ণলিপির একটি ভগ্নাংশ হতে জানা যায় যে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি হিজরি ৮০০ সনে নির্মিত হয়েছিল।

জোড়বাংলা মসজিদ থেকে আনুমানিক ১৫০ মি: পূর্বে গলাকাটা ঢিবির অবস্থান। খননের পর এর সংলগ্ন ভূমিতে একটি ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। এর বাইরের দিকের পরিমাপ ১১.৯১ মি: (পূর্ব–পশ্চিম) এবং ৮.৫৭ মি: (উত্তর–দক্ষিণ)। ভেতরের দিকের পরিমাপ ৯.৩১ মি: ও ০.৯১ মি:। সম্পূর্ণ ইঁট নির্মিত এই মসজিদের দেয়ালগুলো ১.৩০ মি: চওড়া। এর চার কোণের প্রতিটিতে একটি করে সংলগ্ন অষ্টকৌণিক বুরুজ আছে। পূর্বদিক থেকে তিনটি দরজা দিয়ে এই মসজিদে প্রবেশ করা যেত। অপরদিকে, এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রতিটি দেয়ালে দু'টি করে ফোঁকর যুক্ত গবাক্ষ রয়েছে। কিবলা দেয়ালে রয়েছে পাশাপাশি তিনটি মিহরাব। মধ্যবর্তী মিহরাবটি আকারে অপর দু'টি থেকে বড়। তবে প্রতিটি মিহরাবই লতাপাতা, ফুলফল ইত্যাদি খচিত অলঙ্কৃত ইঁট দ্বারা শোভিত। মসজিদের অভ্যন্তরে বার কোণ বিশিষ্ট দু'টি কালো পাথরের থাম পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ফলে মসজিদটি সুলতানি আমলের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

খড়ের দিঘি বা মাতারাণী ঢিবিতে খনন পরিচালনার ফলে পূর্ব–পশ্চিমে ১৪ মি: এবং উত্তর–দক্ষিণে ১২ মি: স্থান জুড়ে বিস্তৃত একটি গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এই গোরস্থানে ইঁট–সুরকি নির্মিত কবরাচ্ছাদন সংবলিত ১২টি কবর ও কঙ্কাল সংবলিত ৮টি কবরের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোন কোন কবরাচ্ছাদন নৌকার ছৈ আকারে, আবার কোনটি সমতল পৃষ্ঠদেশ বিশিষ্ট মঞ্চের আকারে ইঁট ও সুরকি দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। ফলে এদের সময়কাল খ্রিস্টীয় ষোল–সতের শতকে ন্যস্ত করা যায়।

ভারতভয়না ঃ একটি গ্রামের নাম ভারতভয়না। গ্রামটি যশোহর জেলার কেশবপুর থানার গৌরিঘোনা ইউনিয়নে অবস্থিত। এটি একটি স্থানীয় কাঁচা পথ দিয়ে সাতক্ষিরা–দৌলতপুর জেলা পরিষদ সড়কের সাথে সংযুক্ত। বুড়িভদ্র নামে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া একটি নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামে পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ১২.২০ মিঃ উঁচু একটি ঢিবি আছে। এর পাদদেশের বেড় ২৫০ মিঃ। ১৯২২ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের একজন প্রধান কর্মকর্তা সর্বপ্রথম এ ঢিবি পরিদর্শন করেন। তাঁর মতে এ ঢিবিতে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত রয়েছে। কিন্তু ১৯৮৫ সালে এ ঢিবিতে আংশিক খনন পরিচালনা করার ফলে মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী গোকুলমেড়ে এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের আহিচ্ছত্রে প্রাপ্ত ইমারতের কাঠামোর অনুরূপ একটি কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমানে অক্ষত কাঠামোর অংশবিশেষ দেখে মনে হয়, বিলুপ্ত ইমারতটি একটি সুউচ্চ ইটের মঞ্চ। এই মঞ্চের শিরোদেশে ভূমি থেকে ১১.৮৮ মিঃ উচ্চতায় একটি চতুষ্কোণাকার ইমারত তৈরি হয়েছিল। মঞ্চ তৈরির জন্য প্রথমে পরস্পর ভেদকারী কতকগুলো সমান্তরাল দেয়াল নির্মিত হয়েছিল। ফলে মঞ্চটির মধ্যে কতকগুলো আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছিল। পরে শক্ত ধরনের মাটি দিয়ে এই প্রকোষ্ঠগুলো ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল। খননের ফলে মাত্র ৪০টি প্রকোষ্ঠ অনাবৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এদের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি। আকার ও আয়তনে এদের পরস্পরের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। এদের মধ্যে পূর্ণভাবে উন্মোচিত ৮টি প্রকোষ্ঠের পরিমাপ ২.১৮ মিঃ × ১.৪৬ মিঃ, ২.২৮ মিঃ × ১.২১ মিঃ, ২.১৬মিঃ × ১.৪৬মিঃ, ২

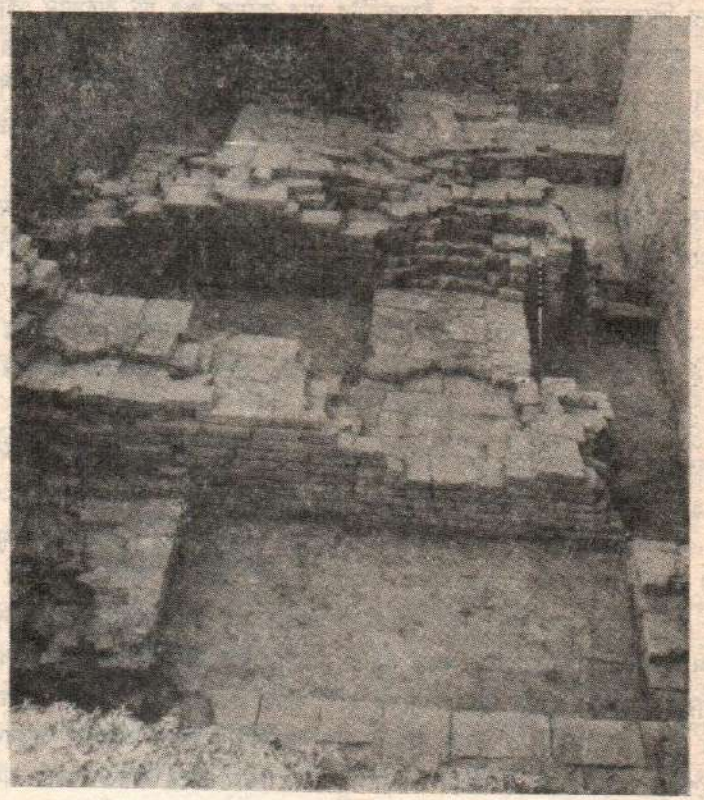
মিঃ × ২.১০ মিঃ, ২.২৭ মিঃ × ১.১৪ মিঃ, ১.৪১মিঃ × ১.৪১ মিঃ, ২.৬৩ মিঃ × ১.৩৫ মিঃ এবং ১.১২ মিঃ × ২.১৯ মিঃ।

মঞ্চের শিরোদেশে অবস্থিত মূল ইমারতটির মাত্র কয়েক স্তর ইঁট বর্তমানে কোন কোন স্থানে মূল অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ফলে কেবল এটুকু অনুমান করা সম্ভব যে এর ভিত্তির দেয়ালগুলো ৭১ সে:মি: চওড়া ছিল। এছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত। তবে এর বাইরের দিকের পরিমাপ ১১.৩০মিঃ × ১১.৩০মিঃ। এটা পরস্পর ৪টি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ২.৮০মিঃ চওড়া। এছাড়াও এর চারপাশে আরও কিছু দেয়ালের অংশবিশেষ বর্ণনার অযোগ্য অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। তবে এগুলো মূল নির্মাণ সময়কালের পরবর্তীকালে নির্মিত বলে অনুমিত হয়েছে। ইমারতটি সর্বোতভাবে কাদা ও ইঁট দিয়ে তৈরি। ইঁটগুলোর পরিমাপ ৩৪সেমিঃ × ২৩সেমিঃ × ৫ সেমিঃ, ৩৪.৫সেমিঃ × ২২সেমিঃ × ৫.৫ সেমিঃ, ৩৪সেমিঃ × ২৩সেমিঃ × ৬সেমিঃ, ৩৫সেমিঃ × ২৩সেমিঃ × ৫.৫সেমিঃ, ৩৫.৫সেমিঃ × ২৩.৫ সেমিঃ × ৫.৫সেমিঃ, ৩৫সেমিঃ, × ২৪সেমিঃ × ৫ সেমিঃ, ৩৬সেমিঃ × ২৩.৫সেমিঃ × ৬সেমিঃ এবং ৩৬.৫সেমিঃ × ২৩সেমিঃ × ৫.৫সেমিঃ।

ভারতভয়না টিবির সর্বোচ্চ স্থান থেকে সর্বমোট ৬.৬৫ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালিত হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র দু'টি স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। স্তর (১) এর একটি উপ-স্তর এবং স্তর (২) এর আটটি উপ-স্তর রয়েছে। এছাড়া স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও একটি মূল নির্মাণ ও একটি পুনঃনির্মাণ সময়কালের ইঙ্গিত বজায় রয়েছে। যেহেতু টিবির উপরাংশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং খনন অকর্ষিত মাটি পর্যন্ত পরিচালিত হয় নি সেহেতু প্রত্নস্থলটির প্রকৃত স্তরবিন্যাস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় নি। অপরদিকে অনাবৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে কেবল বারটি নিদর্শন। এদের মধ্যে মানুষের মূর্তি খচিত পোড়ামাটির ফলকের ভাঙ্গা টুকরা, অলঙ্কৃত ইঁট, খোলামকুচি ও মৃন্ময় তৈল প্রদীপ অন্তর্ভুক্ত। ইটের আকৃতি, প্রত্নবস্তুসমূহের সাধারণ শৈলী ও ইমারতের স্থাপত্যিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ভারতভয়নায় অনাবৃতকৃত নিদর্শনটিকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যায়।

রাজবাড়ি ঃ এ প্রত্নস্থলটি রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৩২ কিঃ মিঃ উত্তরে তানোর থানার বিহরাইল নামক গ্রামে অবস্থিত। চারদিকের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইঁট-পাটকেল পরিবেষ্টিত অবস্থায় এই প্রত্নস্থলটি চলতি শতকের গোড়ার দিকে জঙ্গলাবৃত টিবির আকার ধারণ করেছিল। ১৯২১ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের উদ্যোগে টিবিটিতে খনন পরিচালিত হলে কিছু স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে পড়ে। স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষে যেটুকু দেয়াল অক্ষত ছিল তা ইঁট ও কাদার তৈরি এবং দেয়ালগুলো ১.৩ মিঃ থেকে ১.৪ মিঃ চওড়া ছিল। এছাড়া এর সংলগ্ন এলাকা থেকে বেলে পাথরে তৈরি একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তিও আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই ধারণা প্রচলিত আছে যে এ প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষটি সম্ভবত একটি গুপ্ত আমলের বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতি বহন করছে।

আলোকচিত্র – ২৯



ভারতভয়নায় অনাবৃত প্রকোষ্ঠ

দারাসবাড়ি ঃ চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার ফিরোজাবাদ মৌজায় এ প্রত্নস্থলের অবস্থান। ভারতের মালদা জেলার সীমান্ত সংলগ্ন এ প্রত্নস্থলে ১৯৭৫ সালে খনন পরিচালনার ফলে ইট নির্মিত একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। চতুষ্কোণাকারে নির্মিত এ ইমারতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি উন্মুক্ত চত্বর এবং চারবাহুর প্রত্যেকটিতে এক সারি করে প্রকোষ্ঠ রয়েছে। খোলা চত্বরে প্রবেশের জন্য উত্তর বাহুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে একটি মাত্র প্রবেশ-পথের সংস্থান লক্ষ করা যায়। প্রতিটি কক্ষ কেবল একটি দরজা দিয়ে খোলা চত্বর থেকে যাতায়াত যোগ্য। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি শিলালিপিও উদ্ধার করা হয়েছিল। শিলালিপিটির পাঠ থেকে ইমারতটিকে সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের শাসনামলে (১৪৭৪–৮২ খ্রিস্টাব্দে) নির্মিত একটি মাদ্রাসা বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আলোকচিত্র – ৩০



ভারতভয়নায় অনাবৃত পোড়ামাটির নরমুণ্ড

বারদুয়ারী ঃ বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামুরহাট জেলার ভারত সীমান্তবর্তী চৌগাছা নামক গ্রামে এ প্রত্নস্থলের অবস্থান। পণ্ডিতগণের নিকট গ্রামটি মুসলিম শাসনামলের মাহিসন্তোষ নামেও পরিচিত। এ প্রত্নস্থলে ১৯১৮ সালে তদানীন্তন বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে খনন পরিচালিত হলে একটি বহুগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের কাঠামো অনাবৃত হয়। এর পশ্চিমের দেয়ালে পাঁচটি মিহরাব, পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণের প্রতিটিতে দু'টি করে দরজার চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তর ভাগে দু'সারি (প্রতি সারিতে চারটি করে থাম) থাকায় বিলুপ্ত মসজিদটিকে দশ গম্বুজ বিশিষ্ট হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। এর দেয়ালগুলোর গাঁথুনীতে ইট ও কাদামাটি ব্যবহৃত হলেও বহির্ভাগে পাথর পট্টের আচ্ছাদন ছিল। থাম এবং মিহরাবও পাথরের তৈরি। কয়েকটি থাম আজও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একটি মিহরাব বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত

আছে। অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি প্রত্নস্থলে স্তূপাকারে ছড়িয়ে আছে। এর সংলগ্ন স্থান থেকে হুসেন শাহী আমলে নির্মিত মসজিদের শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে এ প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত মসজিদটি হুসেন শাহী আমলের নিদর্শন।

সীতাকোট ঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার ফতেহপুর মারাশ গ্রামে সীতাকোট নামক প্রত্নস্থলের অবস্থান। ১৯৬৮ ও ১৯৭২-৭৩ সালে দু'টি পর্যায়ে এ প্রত্নস্থল খনন পরিচালনার ফলে ৬৫.২২ মিঃ বর্গাকারে নির্মিত একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।[৩৮] এর উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে বিহার অঞ্চলে প্রবেশের উপযোগী একটি তোরণের স্থান সঙ্কুলান করা হয়েছে। এর বরাবর দক্ষিণের বাহুতে বিহার অঙ্গনের দিকে বর্ধিত একটি হলঘর আকৃতির মন্দির রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর প্রতিটির মধ্যবর্তী অংশেও একটি করে একই ধরনের হলঘরের চিহ্ন বিদ্যমান। প্রতিটি হলঘরে মূর্তি স্থাপনের উপযোগী পাকা মঞ্চের উপস্থিতি থেকে অনুমিত হয় যে এই হলঘরগুলো পূজামণ্ডপ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রবেশ-পথটি মূল বাহু থেকে কিছুটা বাইরের দিকে উদগত। এর দু'পাশে প্রহরী কক্ষেরও অস্তিত্ব রয়েছে। পূর্ববাহুর উত্তর অংশে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি যাতায়াতযোগ্য পথের সংস্থান রয়েছে।

হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ টিবিতে আবিষ্কৃত বিহারের মতো সীতাকোট বিহারের মধ্যবর্তী অংশেও একটি খোলা চত্বর আছে। এর উত্তর বাহুতে ৮টি এবং অপর তিনটি বাহুর প্রতিটিতে ১১টি করে কক্ষ রয়েছে। এদের পরিমাপ ৬.৭০মি: × ৩.৩৫মিঃ এবং ৩.৫০ মিঃ × ৩.৩৫মিঃ। তবে পূর্ববাহুর তিনটি কক্ষ ছাড়া বাকি সব কয়টি অদ্যাবধি অন্তরীণ অবস্থায় আছে। কক্ষগুলোর পশ্চাদদেশের দেয়াল ২.৪৩ মিঃ চওড়া। দেয়ালগুলো ১.২১মিঃ থেকে ৩.৬৫মিঃ উচ্চতা পর্যন্ত টিকে আছে। সম্মুখের দেয়াল ১.৬৭মিঃ এবং বিভাজক দেয়ালগুলো ৯১ সেমিঃ থেকে ১.৩৭মিঃ চওড়া। প্রতিটি কক্ষ একটি করে দরজা দিয়ে সম্মুখের টানা বারান্দার সাথে যুক্ত। অবশিষ্ট তিনদিকের দেয়ালের প্রতিটিতে একটি করে ক্রমঃপুরণ পদ্ধতিতে নির্মিত কুলঙ্গীর উপস্থিতি দেখে মনে হয়, কক্ষগুলো আবাসকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। দরজাগুলো ৯১সেমি: থেকে ১.৫২মিঃ প্রশস্ত। টানা বারান্দাটির প্রস্থ ২.৫৯মিঃ এর সম্মুখবর্তী ঠেস দেয়াল ১.২১ মিঃ চওড়া ও ৭৬সেমিঃ উঁচু। এর কোন স্থানে থামের চিহ্ন দৃশ্যমান নয় বলে ধরে নেওয়া যায় যে বারান্দাটিতে কোন ছাদ ছিল না। আবাস কক্ষগুলোর মেঝে ইটের গুঁড়ো পিটিয়ে তৈরি হয়েছিল।

নির্মাণ কাজে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো কাদা দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। বিহারটিতে একটি মূল নির্মাণ সময়কাল ছাড়াও একটি পুনঃনির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। স্থাপত্য কীর্তিরাজির সাথে প্রচুর পরিমাণ মৃৎপাত্র, খোলামকুচি এবং লোহার তৈরি পেরেক ও খিল পাওয়া গেছে। স্থাপত্যশৈলী অনুযায়ী বিহারটি খ্রিস্টীয় পাঁচ-সাত শতকে নির্মিত বলে অনুমিত হয়েছে।

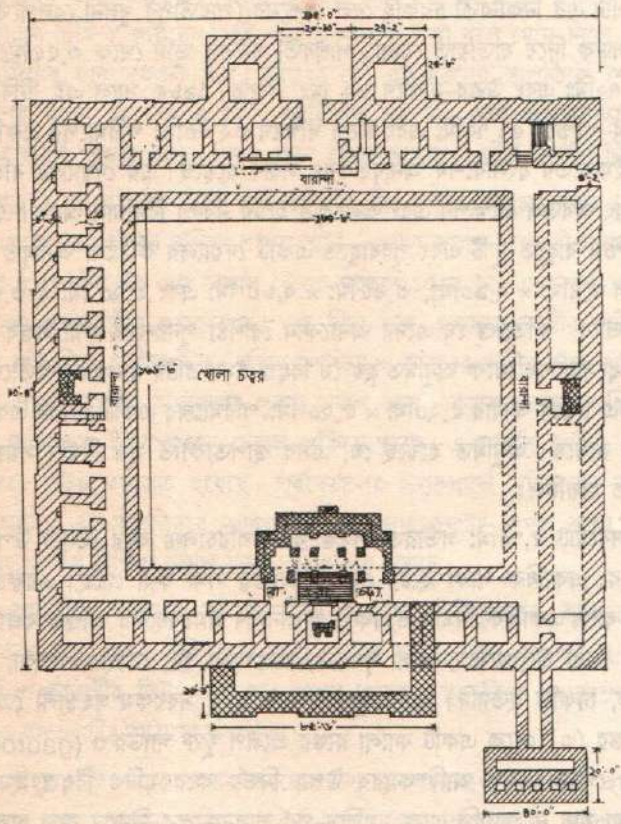
চোরচক্রবর্তী ধাপ ঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার খানপুর ইউনিয়নের অধীন চোরচক্রবর্তী

---

৩৮. নিজামুল হক, 'সীতাকোট বিহার', ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৯ বাংলা

রেখাচিত্র – ৩৮

সিতাকোট বিহারের ভিত্তি-পরিকল্পনা,
দিনাজপুর



গ্রামে আলোচ্য প্রত্নস্থলটির অবস্থান। ১৯৮২-৮৩ সালে এ প্রত্নস্থলের ঢিবিতে খনন পরিচালিত হলে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত কক্ষের কাঠামো, জমাটবদ্ধ মেঝে ও খোলামকুচি অনাবৃত হয়েছিল। সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এই স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই অনুমান করা সম্ভব হয় নি। খননে অংশ গ্রহণকারীগণের সঙ্গে মৌখিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল এটুকু অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছিল যে বিলুপ্ত ইমারতের অক্ষত অংশে অন্তত দু'টি নির্মাণ আমলের অস্তিত্ব আছে। ইটের আকৃতি ও গাঁথুনীর কাজে কাদামাটির ব্যবহার থেকে আরও অনুধাবন করা সম্ভব যে এ স্থানে নিঃসন্দেহে একটি প্রাক্-মুসলিম আমলের স্থাপত্যিক নিদর্শনের অস্তিত্ব ছিল।

অরুণধাপ ঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার চক দিনাত মৌজায় অরুণধাপ নামক ঢিবিটি অবস্থিত। এটা এর নিকটবর্তী চরকাই রেল ষ্টেশনের (পার্বতীপুর খুলনা রেলপথের) সাথে চরকাই-নবাবগঞ্জ সড়ক দিয়ে যাতায়াত যোগ্য। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৩.৫৫মিঃ উঁচু এই ঢিবি পূর্ব-পশ্চিমে ৭২মিঃ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬২ মিঃ বিস্তৃত। ১৯৮৫ সালে এই ঢিবিতে খনন পরিচালনা করে পূর্ব-পশ্চিমে ৫১.৭২মিঃ এবং উত্তর দক্ষিণে ৩২.৮০মিঃ পরিমাপের একটি ইঁট ও কাদামাটি নির্মিত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃতকরণ সম্ভব হয়েছে। এর দেয়ালের বহিরাবরণে কয়েকটি উত্তল এবং অবতল প্রক্ষেপণ এবং অলংকৃত ইটের নকশা বিদ্যমান আছে। এর উত্তর বাহুতে তিনটি, পশ্চিম বাহুতে দু'টি এবং পূর্ববাহুতে একটি দেয়ালের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। কক্ষগুলোর পরিমাপ ৫.৭মি: × ২.৯০মিঃ, ৩.৬৫মি: × ২.৮০ মি: এবং ৩.২০ মি: × ৩.৩০ মি.। কিন্তু এগুলো এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যে এদের অন্যকোন বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উপরের স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে বিধ্বস্ত ইমারতটির মাঝখানে অতীতে একটি উন্মুক্ত চত্বর ছিল। এ চত্বরে আবার ৫.২০মি: × ৫.২০ মি: পরিমাপের একটি হলঘর এবং একটি সিঁড়িপথের অস্তিত্ব রয়েছে। অনুমিত হয়েছে যে, এসব স্থাপত্যকীর্তি মূল নির্মাণ সময়কালের পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল।

অরুণ ধাপে সর্বমোট ৫.৭০মি: গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা করে তিনটি উপ-স্তরসহ মোট ছয়টি স্তর এবং একাধিক পাকা ইটের মেঝের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এরফলে ধরে নেওয়া যায়, অরুণ ধাপে একাধিক নির্মাণ ও একটি পুনঃনির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব বজায় ছিল। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত ইঁট, লোহার শলাকা, জালের কাঠি, পুঁতি, গুলতি, চাকতি ইত্যাদি। মৃৎপাত্রগুলোর মধ্যে প্রায় সবরকম গৃহস্থালী তৈজসপত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্তর (৩) থেকে একটি কালো রঙের প্রলেপ যুক্ত গ্যাডরুণ্ড (gadrooned) খোলামকুচি পাওয়া গেছে। এসব আবিস্কারের উপর নির্ভর করে যদিও বিধ্বস্ত ইমারতটির বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করা যায় না তথাপি একে মুসলিম-পূর্ব শাসনামলের নির্দশন বলে ধরে নেওয়া যায়। এছাড়া এর সংলগ্ন জমির ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি কালো পাথরের সূর্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ সংগৃহীত হয়েছে। ফলে অনুমিত হয়, অরুণ ধাপের সর্বশেষ সময়কালের ইমারতাদি সম্ভবত কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ বিশেষের চিহ্ন বহন করছে। শিল্পশৈলী অনুযায়ী মূর্তিটি খ্রিস্টীয় দশ-

এগার শতকের প্রচলিত বৈশিষ্ট্য বহন করছে।

গোবিন্দস্বামী মন্দির ঃ দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর থানার বৈগ্রাম নামক গ্রামে এ প্রত্নস্থলটির অবস্থান। চলতি শতকের গোড়ার দিকে প্রত্নস্থলটিতে একটি ঢিবির অস্তিত্ব ছিল। ১৯৩৪–৩৫ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের উদ্যোগে ঢিবিটিতে খনন পরিচালিত হলে একটি ইঁট নির্মিত ইমারতের কাঠামো অনাবৃত হয়ে পড়ে। চারদিকে ছাদ যুক্ত ঘূর্ণায়মান পথের কেন্দ্রে একটি মাত্র বর্গাকার কক্ষ নিয়ে এ ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এর একটি চত্বরও ছিল। চত্বরটি ঠেসে জমাটবদ্ধ মাটি দিয়ে তৈরি। এ মন্দিরের সন্নিকটবর্তী স্থানে আকস্মিকভাবে ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের একটি গুপ্ত তাম্রফলকও আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই তাম্রফলকে গোবিন্দস্বামী মন্দির নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। তাই পণ্ডিতগণ বৈগ্রাম ঢিবিতে আবিষ্কৃত ইমারতের কাঠামোটিকে গোবিন্দস্বামী মন্দির হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই চিহ্নিতকরণকে সত্য বলে মেনে নিলে আরও বলতে হয়, বিলুপ্ত মন্দিরের ছাদ সমতল ছিল। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের স্থাপত্যিক শৈলী বিশিষ্ট মন্দির বাংলাদেশের অপর কোথাও এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। তবে ধ্বংসাবশেষের সাথে কয়েকটি পাথরের বাজুবন্ধ পাওয়া গেছে। কোন কোন বাজুবন্ধে সাপের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল।

মহাস্থানগড় ঃ বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১২ কিঃ মিঃ উত্তরে মহাস্থানগড়ের (২৫° – ৫০' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৯° ৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান। এখানে রয়েছে পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিপৃষ্ঠ থেকে গড় প্রায় ৪.৫৬ মিঃ উঁচু এক বিশাল (উত্তর–দক্ষিণে ১৫২৪ মিঃ এবং পূর্ব–পশ্চিমে ১৩৭১ মি:) প্রাচীর ঘেরা দুর্গ–নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এর তিন দিক একসময় গভীর পরিখা এবং পূর্বদিক করতোয়া নদী দিয়ে বেষ্টিত ছিল। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের প্রাচীর ঘেঁষে পরিখার চিহ্ন আজও দৃশ্যমান। এ দুর্গ–নগরীর বাহুগুলোর গুরুত্ব সকল স্তরে একপ্রকার নয়। অধিকাংশ স্থানে মাটির প্রাচীরের অভ্যন্তরে ইটের চওড়া দেয়াল লুকিয়ে আছে। এ দেয়াল তৈরির ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে পাথর পট্টও ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বদেয়ালের উত্তরপ্রান্তে মুনিরঘোন নামে একটি বর্ধিত অংশও আছে। এর অনতিদূরে আরও পশ্চিমে 'জাহাজঘাটা' নামক স্থানে দেয়ালের বাইরের সংলগ্ন অংশে কিছু বিক্ষিপ্ত নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছে।

দুর্গ–নগরীটির অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন অনুচ্চ ঢিবিগুলোতে ইতিমধ্যে বহুবার খনন পরিচালিত হয়েছে। এসব ঢিবিগুলোর মধ্যে খোদার পাথর, ভিটা, মানকালির ভিটা, পরশু রামের বসতবাটি ও বৈরাগীর ভিটা অন্যতম। খননে অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মন্দির, মসজিদ ও বসতবাটির কাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব বাহুর দক্ষিণ প্রান্ত গড়ের সবচেয়ে উঁচু এলাকা। এখানে রয়েছে হযরত শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার নামে একজন সুফি সাধকের সমাধি এবং মুগল সম্রাট ফররুখ শিয়রের আমলে নির্মিত একটি মসজিদ। দুর্গ প্রাচীরসহ বিভিন্ন ইমারতে ব্যবহৃত ইটের মাপ, মসলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কোন কোন স্থানে পুন:ব্যবহৃত ইটের প্রমাণও রয়েছে। এমনকি, মূল নির্মাণ আমলের ইমারতের উপর একাধিক পুন:নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব রয়েছে।

১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম এ প্রত্নস্থলের উত্তর বাহুর পূর্বপ্রান্ত থেকে ৭৬ মি: দক্ষিণ–পশ্চিমে

অবস্থিত বৈরাগীর ভিটা নামক ঢিবির পাদমূল পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে উত্তর-দক্ষিণে পরস্পর সমান্তরালে ধাবিত দু'টি পরীক্ষামূলক এবং এদের সমকোণে ভেদকারী অপর একটি খাদ স্থাপন করে খনন কাজ শুরু হয়েছিল। ফলে পূর্বদিকস্থ খাদের বিভিন্ন স্থানে মাত্র ১১.৫ সেমি: গভীরতায় বেশ কয়েকটি পোড়ামাটির বেড় যুক্ত কূপ এবং ২৫.৪ সেমি: × ২১.৫ সেমি: × ৫.৮ সেমি: পরিমাপের ইঁট দিয়ে গাঁথা অত্যন্ত জরাজীর্ণ দেয়ালের কিছু চিহ্ন পরস্পর সম্পর্ক বিহীন অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। এর নিচে আরও ৬১ সেমি: গভীরতায় খনন অব্যাহত থাকার পর ভূগর্ভস্থ পানি বের হয়ে আসে। ফলে খনন বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে পশ্চিম দিকস্থ খাদের ৯১.৫ সেমি: গভীরতায় পরস্পর সমান্তরালে ধাবিত দু'টি ঢাকনা যুক্ত নর্দমাসহ একটি মেঝের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। নর্দমা দু'টি ১৬ সেমি: থেকে ২০ সেমি: প্রশস্ত। খনন খাদগুলোতে প্রাপ্ত উপরত্ন পাথরের (কার্ণেলিয়ান, চ্যালসেডনী) পুঁতি, পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকার খেলনা মূর্তি এবং মৃৎপাত্রগুলোকে এদের নমুনা প্রযুক্তিবিদ্যার বিচারে প্রাথমিক পাল আমলে (খ্রিস্টীয় আট-দশ শতক) তৈরি বলে ধরে নেওয়া যায়।

এরপর বৈরাগীর ভিটায় খনন পরিচালিত হয়। এর পরিমাপ ৯১.৪৪ মি: × ৭৯.০২ মি:। খননের পূর্বে এ ঢিবি সংলগ্ন স্থান থেকে ৩.৪৮ মি: উঁচু ছিল। এস্থানে খনন পরিচালনা করার ফলে সবচেয়ে নিচের স্তরে একটি ইমারতের ভিত্তির অংশ বিশেষ অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। এটার পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ২৯.২৬মি: এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২.৮০মি:। তবে এর উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব কোণদ্বয় ব্যতীত অপর কোণদ্বয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অক্ষত কোণদ্বয় অন্তঃপ্রবৃষ্ট আকৃতিতে বিন্যস্ত। অক্ষত অবস্থায় পাওয়া দেয়ালের ভিত্তির বহির্মুখে একটি গোলায়িত উত্তলাকার রেখা এবং দু'টি তরঙ্গায়িত প্রক্ষেপণ বিদ্যমান। উত্তর-দক্ষিণে ১০.৯ মি: লম্বভাবে বিন্যস্ত একটি পাকা নর্দমা এ ইমারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ভিত্তি দেয়াল থেকে মা ১.৫২ মি: দূরত্বে অবস্থিত নিষ্কাশিত তরল পদার্থ ধারক একটি শোষক পাত্রের মুখে সমাপ্ত হয়েছে। এসব পরোক্ষ তথ্যের উপর ভিত্তি করে খনন প্রতিবেদকগণের পক্ষে ইমারতটিকে একটি মন্দির হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে যে স্থানে নর্দমার মুখ অবস্থিত সে স্থানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল মন্দিরের গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসাবে যে মূর্তি ছিল তার পূঁজা অর্চনায় ব্যবহৃত তর্পণ জল নিষ্কাশনের জন্যেই সম্ভবত নর্দমা এবং এ নর্দমা দিয়ে নিষ্কাশিত জলধারণের জন্য অপর প্রান্তদেশে ধারণপাত্রটি স্থাপিত হয়েছিল।

নর্দমা তৈরির জন্য পাথরের খণ্ড (সম্ভবত জানালার কাঠামোর পুন:ব্যবহৃত বাজু) সারিবদ্ধ ভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের উপরিভাগে পানি বহনের জন্য অর্ধনলাকার নালী খোদাই করা হয়েছিল। নর্দমায় ব্যবহৃত প্রতিটি পাথর খণ্ডের কোন না কোন অংশে নতোন্নত অর্ধপদ্ম কীর্তিমুখ, সমকোণী ধার বিশিষ্ট নকশাগুচ্ছ, পেঁচানো রেখা ইত্যাদি মোটিফের অস্তিত্ব ছিল। এ ধরনের মোটিফ সাধারণত গুপ্ত শাসনামলের অন্তিম অধ্যায়ে (খ্রিঃ ছয় শতক) ব্যবহৃত থামগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। ফলত ধরে নেওয়া যায় যে পূর্ববর্তী সময়কালের কোন ইমারতে

ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত পাথর দিয়ে এ নর্দমা ও ইমারতটি পাল আমলের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়েছিল।

উল্লিখিত মন্দিরের অনতিদূরের দক্ষিণে অপর একটি ইমারতের কাঠামোর চিহ্ন পাওয়া গেছে। অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য এর পূর্ণবৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব না হলেও এটা যে পূর্ব-পশ্চিমে ৩৩.৮৩ মি: এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৭.৩৭ মি: পরিমাপের ছিল তা অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। এর উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী অংশে একটি প্রবেশমঞ্চের অবস্থান দেখে ইমারতটিকে উত্তরমুখী বলে ধরে নেওয়া যায়। এছাড়া এর পূর্বপ্রান্তে একটি ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে যাওয়া ইঁট বিছানো মেঝের অস্তিত্ব চিহ্নিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সংলগ্ন অন্যান্য অংশেও টালি বিছানো দেখা গেছে। এ মেঝেটি ধার-বহির্মুখী বিন্যাসে ইঁট বিছিয়ে তৈরি কতকগুলো ১.১৪ মি: × ১.০৭ মিঃ পরিমাপের ভাগে বিভক্ত। এছাড়া আরও কিছু গৌণ ধরনের এবং শনাক্তকরণের অযোগ্য স্থাপত্যিক কীর্তিরাজি সংলগ্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কুণ্ডলাকৃতির চৌবাচ্চা উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ দিকস্থ এ মন্দিরের মেঝেটি উত্তর দিকস্থ মন্দিরের মেঝের চেয়ে ৬১ সেমি: উঁচুতে অবস্থিত। এ মেঝেটি এক স্তর বিছানো ইটের উপর ১৫ সেমি: পুরো ইটের গুঁড়ো ঠেসে জমাটকৃত বিন্যাসে তৈরি হয়েছে। একই ধরনের মেঝে সোমপুর বিহার চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে পাওয়া গেছে। মেঝেটির অবস্থানের সূত্র ধরে শেষোক্ত মন্দিরটিকে পাল আমলের অন্তিম অধ্যায়ে (এগার-বার শতক) নির্মিত বলে অনুমিত হয়েছে। এ সময়কালে মন্দিরের চারপাশে একটি বেষ্টনী প্রাচীরও নির্মিত হয়েছিল। ৯১.০৫ সেমি: পুরু এ প্রাচীরের কেবল পূর্ব-পশ্চিমে ধাবমান ৫৩.৭৪ মিঃ লম্বা একটি অংশ মন্দিরের উত্তর দিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পাল শাসনামলের আরও কিছু স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ এ স্থানে অনাবৃত হয়েছে। তবে অত্যন্ত ভগ্নাবস্থার জন্য এদের ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়।

পাল-শাসনামলের স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের নিচে ১.৮২ মি:, ২.৪৩ মি:, ২.৭৪ মি: ও ৩.৬৫ মি: গভীরতায় অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আমলের আরও কিছু নিদর্শন অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় রক্ষিত ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচের স্তরের কীর্তিরাজিতে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৩৮সেমি: থেকে ৩৫.০৫ সেমি: × ২৫.০৫ সেমি:। এর উপরের স্তরের কীর্তিরাজির ইঁট তুলনামূলক ভাবে একটু ছোট। এসব এবং আরও কিছু পরোক্ষ সূত্রের উপর নির্ভর করে খনন প্রতিবেদকগণের ধারণা, পাল আমলের ইমারতের নিচে রাজকীয় গুপ্ত (খ্রিঃ চার-পাঁচ শতক) এবং পরবর্তী গুপ্ত (খ্রিঃ ছয় শতক) শাসনামলের নিদর্শন লুকিয়ে আছে। পাল ও পরবর্তী গুপ্ত আমলের স্থাপত্যিক নিদর্শনের মধ্যবর্তী স্থানে গচ্ছিত সাংস্কৃতিক জঞ্জালগুলো এত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে যে এটা মাৎস্যন্যায় আমলের (আঃ ৬৫০-৭৫০ খ্রিঃ) একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরে।

এরপর বৈরাগীর ভিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৯১মি: লম্বা অপর আর একটি খাদ স্থাপন করা হয়। এ খাদের সর্বশেষ প্রান্তে একটি মন্দির ও কয়েকটি পাতকুয়া বেষ্টিত স্থানে একটি মেঝে এবং এর সংলগ্ন স্থানে আরও কয়েকটি পাতকুয়া এবং প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে এরা

এত ভগ্নাদশা এবং গাদাগাদি অবস্থায় বিদ্যমান যে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সময়কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তথাপি পরবর্তী অংশে এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

চারদিকে ঘূর্ণায়মান প্রদক্ষিণ পথ সহ ৭.৩১মি: × ৯.৭৫ মি: পরিমাপের একটি বড় আকারের কক্ষ, ১.৫২ মি: উচু ভিত্তিমূল, পাঁচ ধাপের একটি সোপান শ্রেণী যুক্ত প্রবেশপথ এবং পূর্ব দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিদ্যমান ৯১.০৫ সেমি: × ৬৮.০৫ সেমি: পরিমাপের একটি বেদী নিয়ে মূল মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পর পর দু'টি ধাপে মেরামত ও সংযোজন কাজ চালানোর ফলে এর পরিমাপ দাঁড়িয়েছিল ১২.০৩ মি: × ১০.৯৬ মি:। পুনর্নির্মাণকালীন সংযোজনের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো দক্ষিণ দিকস্থ একটি বারান্দা, উত্তর দিকস্থ ঠেস দেয়াল, পূর্ব দিকস্থ বারান্দা, দু'পাশের কয়েকটি কক্ষ ইত্যাদি। এছাড়া পূর্বোক্ত সময়কালের মেঝেটিকে আরও ৪৬ সেমি: উচু করা হয়েছিল। সংলগ্ন এলাকার অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে আছে দক্ষিণের একটি পাকা মঞ্চ এবং একটি পোড়ামাটির বেড় যুক্ত কুয়া। এছাড়া মন্দির চত্বরের চারদিকে ১.৫২ মি: দূরত্বে আর একটি দেয়ালের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গেছে। খনন প্রতিবেদকগণের মতে মূল মন্দিরটি খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। আর সংস্কার সংযোজনের কাজগুলো পরিচালিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় দশ-এগার শতকে। অন্যদিকে মন্দিরের প্রায় ৩০.৪৮ মি: পূর্বদিকে একটি বর্গাকার (৫.৭৯ মি:) এবং ২.৭৪ মি: উঁচু একটি জমাটবদ্ধ মঞ্চ অবস্থিত। এটা ৩৫.০৫ সেমি: থেকে ৩৮ সেমি: × ২৫.০৫ সেমি: × ৬.০৫ সেমি: পরিমাপের ইঁট দিয়ে তৈরি। এর সংলগ্ন ভূমিতে পোড়ামাটির বেড় যুক্ত পাঁচটি কূপের (প্রতিটির ব্যাস ৯১.০৫ সেমি:) অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলো খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে।

মন্দিরের অদূরবর্তী উত্তর-পূর্ব অংশে ২.৭৪মি: থেকে ৩.৬৫মি: গভীরতায় কিছু পয়ঃপ্রণালির চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে. এসব নিদর্শন এবং এদের সাথী প্রত্নবস্তুগুলো গুপ্ত শাসনামলে প্রচলিত শৈলীর ধারা বহন করছে।

বৈরাগীর ভিটা সংলগ্ন লইএর পুকুর নামক স্থান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্ব প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে, ইউনিট লেবেল পদ্ধতিতে ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ উদ্যোগে খনন অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু খননের ফলাফল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতো কোন তথ্য আজও প্রকাশিত হয় নি। তাছাড়া খননের গভীরতা অদ্যাবধি আদিম অকর্ষিত মাটি পর্যন্ত পৌঁছেনি। এমতাবস্থায় মহাস্থানগড়ের গোটা স্তরবিন্যাস নির্ধারণ করতে হলে আরও বিস্তৃত স্থানে খনন অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হবে। ফরাসি দলীয় নেতা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সুধী সমাবেশে যে ভাষণ ও স্লাইড প্রদর্শন করেছেন তার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, মহাস্থানগড়ের বিলুপ্ত সুরক্ষিত নগরীর মূল নগর-পরিকল্পনা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখেই এ খনন পরিচালিত হয়েছে।

ফরাসি খনন দলের নেতার বিশ্লেষণ ও স্লাইড প্রদর্শনী থেকে আরও জানা যায় যে, ইতিমধ্যে খননের ফলে বেশকিছু নতুন উপকরণ উদঘাটন সম্ভব হয়েছে। প্রথমেই মৃৎপাত্র। এ যাবৎ অসংখ্য খোলামকুচি ও মৃৎপাত্র অনাবৃত হয়েছে। এরমধ্যে কিছু খোলামকুচি রোমান রুলেটেড (Rouletted) বৈশিষ্ট্য বহন করছে। এছাড়া আরও কয়েকটি খোলামকুচি মসৃণ লাল উজ্জ্বল এ্যারেটনের (Arretine) ওয়্যারবৈশিষ্ট্য বহন করছে। এই অনুমিতি শেষ অবধি সত্য প্রমাণিত হলে মহাস্থানগড়ের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবে। কারণ এ দু'টি ওয়্যার খ্রিস্টপূর্ব তিন থেকে খ্রিস্টীয় এক শতকের মাঝামাঝি সময়কালে সুদূর রোম থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে বহুল প্রচলিত ছিল। ভারতের যেসব প্রত্নস্থলে এসব ওয়্যার পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে পণ্ডিচেরীর আরিকামাদু, মহীশূরের ব্রহ্মগিরি ও চন্দ্রাবতী এবং পশ্চিমবঙ্গের তমলুক অন্যতম। এসব প্রত্নস্থলে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম থেকে এটাও এক প্রকার নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ঐসব প্রত্নস্থলের সাথে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে রোমের বাণিজ্যিক লেনদেন অনুষ্ঠিত হতো। সুতরাং মহাস্থানগড়ে এ্যারেটিন এবং রুলেটেড খোলামকুচি আবিষ্কারের সূত্র ধরে আপাতত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে খ্রিস্টীয় দুই-তিন শতকের মাঝামাঝি সময়কালে মহাস্থানগড়ের সুরক্ষিত নগরীটি ব্যবসা-বাণিজ্য ও জন সমাগমের দিক থেকে অত্যন্ত জমজমাটি ছিল। সম্ভবত তদানীন্তন কালে এই নগরীর সাথে ভারতের বিখ্যাত বন্দরগুলোসহ রোমের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।

মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত অন্যান্য প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে একটি মুদ্রার গুপ্তভাণ্ডার অন্যতম। গুপ্তভাণ্ডারটিতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলোর প্রায় সবকয়টিই ছাপাঙ্কিত মুদ্রা। নেহাৎ নগণ্য কয়টি মুদ্রা ছাঁচে তৈরি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয় এবং এগুলোর চিহ্নাদি ইতিপূর্বে পাওয়া এই নমুনার মুদ্রাগুলোর অনুরূপ নয়। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার জন্য এদের চিহ্নাদি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। অপরদিকে ছাপাঙ্কিত মুদ্রাগুলোর গৌণপিঠে ব্যবহৃত চিহ্নাদির উপর নির্ভর করে এদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মুদ্রাগুলোর গৌণপিঠ সম্পূর্ণ চিহ্নবিহীন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলোর গৌণপিঠে একটি মাত্র চিহ্ন বিধৃত রয়েছে। তবে উভয়শ্রেণীর মুদ্রার মুখ্যপিঠে একাধিক চিহ্নে ছাপ অঙ্কিত রয়েছে। এসব চিহ্নাদির মধ্যে প্রায় সবক'টি মুদ্রায়ই সূর্য, উজ্জয়িন ও লতাপাতার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই চিহ্নগুলো উচ্চগাঙ্গেয় এলাকায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন ধরনের ছাপাঙ্কিত মুদ্রা পশ্চিম ভারতীয় কয়েকটি প্রত্নস্থলের আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের গোড়ার দিকের স্তরগুলোতেই সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে। মুদ্রার আকৃতি বিচারেও নতুন সন্ধানলব্ধ এসব মুদ্রাগুলোকে আরও দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত মুদ্রাগুলো বর্গাকার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মুদ্রাগুলো আয়তাকার। এদের গড় পুরুত্ব ২.৫ মিলিমিটার থেকে ৩ মিলিমিটার।

বাংলাদেশ-ফরাসি যৌথ খননে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে কিছু শুঙ্গ শাসনামলের বৈশিষ্ট্যময় ফলক, একটি ব্রঞ্জের দর্পণধারাসহ কিছু তৈজসপত্র, অসংখ্য পোড়ামাটির জালের কাঠি, সিঞ্চনাধারের উর্দ্ধাংশ, বোতলের ছিপি, ডেবার (dabber), পাথরের মূর্তির ভগ্নাংশ,

জমাটবদ্ধ মাটি, উপরত্ন পাথরের পুঁতি, সোনার টুকরা, পোড়ামাটির মূর্তিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে একাধিক নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ যুগের বিক্ষিপ্ত দেয়াল, কূপ ও নর্দমা। জমাটবদ্ধ মেঝে, বেডযুক্ত পাতকুয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এসবের নমুনা ও শৈলীতে নতুন আবিষ্কার হিসাবে গণ্য করার মতো কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় নি।

গড়ের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে পূর্বপ্রাচীর ধরে প্রায় ৩০ মিটার দক্ষিণে অগ্রসর হলে মুনিরঘোনের অবস্থান। এ খনন স্থলে বৈরাগীর মুড়া খননের সময়কালে খনন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ স্থানে পূর্বদেয়ালের ৩০.৪৮মি: লম্বা অংশ ভেতরের দিকে (পশ্চিমে) সর্বাধিক ৩০.৪৮ মি: অন্তঃপ্রবৃষ্ট করে নির্মিত হয়েছে। এ ব্যতিক্রমধর্মী দেয়ালাংশের উত্তর বহির্মুখের দুই প্রান্তের প্রত্যেকটিতে একটি করে অর্ধগোলাকার বর্ধিত তোপমঞ্চের চিহ্ন রয়েছে। মুনিরঘোন এবং এ অংশের প্রাচীর অন্তস্তল পূরণ-করণ পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণের বহির্মুখ দুটির প্রত্যেকটিতে রয়েছে ৬১ সেমি: প্রশস্ত দেয়াল। এ দু'দেয়ালের মাঝে ১.৫২ মি: পরিমাপের শূন্য স্থানটি পাটকেল দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে। ফলে বেষ্টনী প্রাচীরটির মোট পুরুত্ব দাঁড়িয়েছে ৩.৩৫মি:। এখানে প্রাচীরের উচ্চতা ৩ মি:। দেয়ালের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইটের দৈর্ঘ্য ২৩সেমি: থেকে ২০ সেমি:, প্রস্থ ২৫ সেমি: থেকে ১২.৮ সেমি: এবং পুরুত্ব গড়ে ৫ সেমি:। ইটের এ পরিমাপের উপর নির্ভর করে এর নির্মাণের সময়কালকে পাল শাসনামলে ন্যস্ত করা যায়।

মুনিরঘোন এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন মেঝেটি প্রাচীরের পাদমূলে পাওয়া গেছে। এরথেকে ১.৮৩ মি: উঁচুতে আর একটি মেঝে অবস্থিত। ফলত ধরে নেওয়া যায়, প্রথম পুন:নির্মাণ সময়কালে প্রাচীরের গোড়ার অংশ ঢালু বিন্যাসে শান বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর উপর নদী বাহিত পলির স্তর পাওয়া গেছে। এছাড়া এ অংশে করতোয়া নদী পূর্বদিক থেকে এসে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে। নদী তার স্বাভাবিক নিয়মে বাঁক ফেরানোর বিপরীত তীরে আঘাত হানে, আর করতোয়া নদীর এমন একটি বাঁকেই মুনিরঘোনের অবস্থান। বর্ষা মৌসুমে এ আঘাত প্রবলতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। সম্ভবত করতোয়ার এ আঘাত থেকে দুর্গ প্রাচীর রক্ষা করার জন্যই এ স্থানে প্রথম পুন:নির্মাণ সময়কালে প্রাচীর অন্ত:প্রবৃষ্ট করা হয়েছিল এবং আঘাতের তীব্রতা প্রাথমিকভাবে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে অন্ত:প্রবৃষ্ট অংশের মুখে শান বাঁধান ঢালু অংশটি তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পুন:নির্মাণ সময়কালে এ শানবাঁধান অংশকে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে এর উপর বাড়তি কিছু নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। সবশেষে নিরাপত্তার প্রয়োজনে নদী পথের উপর সতর্ক প্রহরা বজায় রাখার সুবিধার্থে বুরুজের উপরাংশে ইটের তৈরি তোপমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল।

দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে মুনিরঘোনের উত্তরে (বিশ্রামাগার সংলগ্ন বটগাছের বিপরীত দিক) বুরুজের মতো আর একটি স্থান রয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে এ স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করে প্রাচীরের বাইরের অংশে চারটি মূল নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এ স্থানের শিরোদেশে শেষ নির্মাণ সময়কাল খ্রিস্টীয় পনের-ষোল শতক, এর নিচে খ্রিস্টীয় বার-তের শতক, অতপর খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতক ও এর তলদেশে গুপ্ত শাসনামলের (খ্রিস্টীয় ছয় শতক)

স্তরবিন্যাস লক্ষ করা গেছে। গুপ্ত শাসনামলে স্তরটির নিচে অধিকতর প্রাচীন আমলের কিছু নিদর্শন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এসবের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে খনন পরিচালনাকারী কর্মকর্তা ডঃ নাজিম উদ্দিন আহমেদ ধারণা করেছেন, এ স্থানে শুঙ্গ শাসনামলে (খ্রিঃ দুই-এক শতক) জনবসতি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গুপ্ত শাসনামলের স্থাপত্যিক কার্যকলাপের নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে উত্তর দিকে পরস্পর সমান্তরালে ধাবিত ৫.৩০ মি: প্রস্থ বিশিষ্ট দু'টি দেয়াল। এগুলো যদিও ২২মি: অগ্রসর হয়ে হঠাৎ থেমে গেছে তথাপি এদের অনতিদূরে আবার একই ধরনের দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ দেয়ালগুলোর উপরাংশের একটি স্থানে একটি সমতল মঞ্চের পৃষ্ঠদেশে কিছু খুঁটি সংযোগ উপযোগী গর্ত এবং পরবর্তীকালে নির্মিত একটি পাকা রাস্তার অস্তিত্ব ছিল। দেয়ালটির উপর ছাইয়ের প্রলেপ দেখা গেছে। ফলে অনুমিত হয়েছে যে এ দেয়াল অগ্নিসংযোগের ফলে ধ্বংস হয়েছিল।

গুপ্ত শাসনামলের দেয়ালের বিপরীত দিকে এবং বর্তমানে দৃশ্যমান বুরুজের ভেতরের দক্ষিণ দিকে আরও দু'টি দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। এদের একটি উত্তর-দক্ষিণ এবং অপরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বভাবে বিন্যস্ত হয়ে উত্তরপ্রান্তে একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়েছে। শেষোক্ত দেয়ালটির একাংশে একটি প্রবেশদ্বারের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। এর নিচে অপেক্ষাকৃত বড় আকারে নির্মিত এবং সুনির্দিষ্ট ঢাল যুক্ত আরও একটি প্রাচীর দেখা যায়। এর সাথে গুপ্ত আমলের লিপিযুক্ত একটি সীলছাপ পাওয়া গেছে। এর উপর ভিত্তি করে এসব স্থাপত্য কীর্তিরাজিকে রাজকীয় গুপ্ত আমলের (খ্রিস্টীয় পাঁচ-ছয় শতক) নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

গুপ্ত শাসনামলে নির্মিত দেয়ালের ধ্বংসাবশেষের উপর কোন কোন স্থানে পাল শাসনামলে নির্মিত প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। শেষোক্তটির এক স্থানে অলিন্দসহ প্রহরীকক্ষ এবং প্রবেশ পথেরও চিহ্ন রয়েছে। পরবর্তীকালে এর উপরই বর্তমানে দৃশ্যমান বুরুজটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বুরুজটির ইটের গাঁথুনীতে পাথর পট্টের বৃত্তাকার শ্রেণীবদ্ধ অবস্থান দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত, বুরুজের নিচে এবং পাল আমলের দেয়ালের ধ্বংসাবশেষের উপর কোন কোন স্থানে বালির স্তরের অস্তিত্ব ছিল। এসবের উপর ভিত্তি করে খননের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, 'খুব সম্ভব করতোয়ার বাৎসরিক প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।' একই সাথে তিনি আরও বলেছেন, 'সম্ভবত এ স্থানে করতোয়া বার বার গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে, আর তা প্রতিরোধের জন্যই বুরুজ তৈরি করা হয়েছিল।'

দুর্গ প্রাকারের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য এ পর্যন্ত কেবল উত্তর ও পূর্ব বাহুতে খনন পরিচালিত হয়েছে। ১৯৭০-৭১, ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরগুলোতে যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম কোণ, উত্তর বাহুর পশ্চিমাংশ এবং উত্তর বাহুর পূর্বাংশে খনন পরিচালিত হয়েছে। অতপর ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরগুলোতে যথাক্রমে পূর্ববাহুর উত্তরাংশ এবং মধ্যবর্তী অংশে খনন পরিচালিত হয়। এসব খননের ফলে উত্তর ও পূর্ববাহুতে একাধিক

মেরামতের চিহ্নসহ মূল চারটি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৯৭০-৭১ সালে সুরক্ষিত নগরটির উত্তর-পশ্চিম কোণে খনন সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ স্থানে মোট ৭.৪৬মি: গভীরতা পর্যন্ত খনন চালিয়ে ছয়টি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেলেও কেবল স্তর ৫ থেকে উপরের দিকে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। স্তর (১) এর বৈশিষ্ট্য হলো, এটা সাংস্কৃতিক নিদর্শন মুক্ত বাদামি রঙের বেলে মাটি দিয়ে তৈরি।

১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে উত্তর প্রাচীরের পূর্বদিকে ৭৬ মি: অংশে (কাটাদুয়ার এলাকায়) মোট ৩৯টি বর্গে সর্বোচ্চ ১২.৪৯মি: গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা করে ২১টি স্তর চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। ১১.৬৮ মি: গভীরতায় আদিম অকর্ষিত মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। এ খননস্থলের সবচেয়ে নিচের স্তরে যে দেয়ালটি উন্মোচিত হয়েছে তার ভিত্তির অংশ ৩.৯৬ মি: প্রশস্ত। এ দেয়ালটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উপরের দিকে উঠার ফলে এর অক্ষত উপরাংশের প্রস্থ দাঁড়িয়েছে ২.৭৯ মি: । দেয়ালটি নির্মাণের জন্য যেসব ইঁট ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর গড় পরিমাপ ৪২ সেমি: × ২৫.৫ সেমি: × ৬.৫ সেমি: এবং সবচেয়ে বড়গুলোর পরিমাপ ৪৮ সেমি: × ২৫.৫ সেমি:× ৬.৫ সেমি:। অন্যান্য ইঁটগুলোও প্রায় একই মাপের। এ পরিমাপের উপর নির্ভর করে দেয়ালটি গুপ্ত শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিতি দাঁড়িয়েছে। এ দেয়ালের ভিতরে গড়ে ১.৫২ মি: উপরে দক্ষিণাংশ বরাবর অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ৩২ সেমি: × ২৩ সেমি: × ৪ সেমি: ইঁট দিয়ে অপর আর একটি দেয়াল নির্মিত হয়েছে। দুর্গাভ্যন্তরের দিকে প্রাচীরের মুখে (দক্ষিণ) দ্বিতীয় দেয়ালের নিচের অংশে থাকের অস্তিত্ব এবং দুর্গের বাইরের দিকে প্রাচীরের মুখ (উত্তর) গুপ্ত শাসনামলের দেয়ালের সাথে মিলিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বর্তমানে অক্ষত উপরাংশের প্রস্থ ৩.৩৫ মি: নির্ণয় করা সম্ভব হলেও ভিত্তির প্রস্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তবে এর একাধিক স্থানে ছোট-খাট মেরামতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ দেয়াল পাল শাসনামলের প্রথম অধ্যায়ে নির্মিত হয়েছিল। একই শাসনামলের শেষদিকে পুন:ব্যবহৃত ইঁট দিয়ে এর উপর গড়ে ২.০৮ মি: পুরু আর একটি দেয়াল নির্মিত হয়েছিল। এ দেয়ালের বিভিন্ন স্থানেও একাধিক মেরামতের চিহ্ন বিদ্যমান। এর উপর পরবর্তীকালে ১.৫০ মিঃ পুরু প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। তবে এ দেয়ালটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় উন্মোচিত হয়েছে। খুবসম্ভব এটি মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক অধ্যায়ের নিদর্শন। চতুর্থ বা শেষ নির্মাণ সময়কালে নির্মিত এ দেয়ালে ব্যবহৃত ইঁটের পরিমাপ ১৯ সেমি : × ১৭ সেমি: × ৪ সেমিঃ , ১৯ সেমি: × ১৫ সেমি: × ৪ সেমি:, ২০ সেমি: × ১৯ সেমি: × ৫ সেমি: এবং ১৯ সেমি: × ১৯ সেমি: × ৫ সেমি:। একই মাপের ইঁট দিয়ে তৈরি একটি বুরুজের চিহ্ন অন্য একটি খনন খাদে পাওয়া গেছে।

১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরে উত্তর বাহুর মধ্যবর্তী অংশে প্রাচীরসহ দু'টি তোরণ, একটি সিঁড়ি ও দু'টি বর্ধিত গোলায়িত তোপমঞ্চ অনাবৃত হয়েছে। প্রথম তোরণটি দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে ৪৪২ মি: পূর্বদিকে অবস্থিত। এর নাম 'সনাতন সাহেবের গলি'। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ৫.২ মি: প্রশস্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫.৭৯ মি: দীর্ঘ। মূল তোরণের অভ্যন্তর ভাগের দু'পাশে

এবং উত্তরের বহির্দেয়ালে অপ্রশস্ত প্রহরী কক্ষেরও চিহ্ন রয়েছে। ইটের আকৃতি ও গাঁথুনীর ধরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তোরণটি পাল আমলের নিদর্শন। তবে এর নিচে আরও দু'টি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন দেয়ালের অংশবিশেষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সুতরাং এ দেয়ালগুলোকে খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতকের নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া যায়। পরবর্তী পুন:নির্মাণের সময়কালে এ তোরণের উত্তর মুখের দু'পাশে একটি করে বর্ধিত গোলায়িত তোপমঞ্চ এবং দক্ষিণ মুখের পূর্বাংশে থাক যুক্ত ঠেস দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রহরী কক্ষগুলো বন্ধ করে দিয়ে তোরণের অভ্যন্তর ভাগে ৮১ সেমি: প্রশস্ত ঠেস দেয়াল তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। গাঁথুনীর ধরণ ও ইটের আকৃতি প্রমাণ করে এ স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডগুলো মুসলিম শাসনামলে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এদের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটগুলোতে পুন:ব্যবহার জনিত এবং কারিগরী ক্ষেত্রে নিম্নমানের প্রভাব সুস্পষ্ট।

সনাতন সাহেবের গলিতে অনাবৃত এ তোরণ থেকে ৬.৪০ মি: পূর্বদিকে অপর আর একটি পাথর নির্মিত তোরণের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এ তোরণের পূর্বাংশের বাহু ১.৫২ মি: পর্যন্ত বর্তমানে অক্ষত আছে এবং পশ্চিমাংশ পূর্বে বর্ণিত ইট নির্মিত তোরণ তৈরির সময় ধ্বংস করা হয়েছে। শেষোক্ত বিনষ্টকৃত অংশের কেবল সবচেয়ে নিচে এক সারি পাথর ব্যতীত উপরের স্তরগুলোর পাথরের টুকরোগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তোরণের উন্মুক্ত স্থানটি মাত্র ১.৫৭ মি: প্রশস্ত। এ অংশের মধ্যে রয়েছে এক স্তর পাথর খণ্ড বিছান পথ। এছাড়া দুর্গাভ্যন্তরের বহির্মুখে তোরণের সামনে একটি এক স্তর পাথর বিছান ২.৮৯ মি: পরিমাপের পাকা মেঝে আছে। পাথরের টুকরোগুলোর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকার ও পরিমাপের খাঁজের অস্তিত্ব দেখে এগুলোকে পুন:ব্যবহৃত বলে ধরে নেওয়া যায়। তাছাড়া এ তোরণের অক্ষত অংশটুকু পূর্বে আলোচিত ইট নির্মিত মূল তোরণের সমান্তরালে পাওয়া গেছে। আর এসব পরোক্ষ সূত্রের উপর নির্ভর করে পাথর নির্মিত তোরণটিকে পাল শাসনামলের প্রথম অধ্যায়ে নির্মিত বলে অনুমিত হয়েছে। এছাড়া পাল শাসনামলের দেয়ালটি ঘেঁষে নির্মিত একটি দুই শাখায় বিভক্ত সোপান শ্রেণীও অনাবৃত হয়েছে। এ স্থানে স্তরের সংখ্যা মোট ছয়টি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে মুনিরঘোন থেকে প্রায় ৩০ মি: দক্ষিণে অবস্থিত একটি বড় ভাঙ্গা অংশের দু'পাশের দেয়াল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অগভীর খনন চালিয়ে ২১৩ মি: দৈর্ঘ্য পর্যন্ত দেয়াল ভগ্নপ্রায় অবস্থায় উদঘাটন করা হয়। তবে এ স্থানটিতে স্তরবিন্যাস ও নির্মাণ-পুনঃনির্মাণের চিহ্নাদি একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা থেকে আপাতত কেবল এটুকু বোধগম্য হতে পারে যে সর্বশেষ নির্মাণ সময়কালের দেয়ালটি ৩.৩৫মি: চওড়া ছিল।

১৯৬০-৬১ অর্থ বছরে পরিচালিত সীমিতাকারের খননের অনুবৃত্তিক্রমে ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে পুনরায় হযরত শাহ সুলতান মাহী সাওয়ারের রওজার ১০ মি: পশ্চিমে এবং দোরাব শাহ তোরণ থেকে নির্গত মহাস্থান বাজার-মথুরা সড়কের বাঁম দিকের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত ঢালু স্থানটিতে পুনরায় খনন পরিচালনা করা হয়। এ অংশে সাংস্কৃতিক নিদর্শনের জঞ্জালের মধ্যে সর্বাধিক ১২.৮০মি: গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা করে মোট ১৫টি স্তরের সন্ধান পাওয়া

গেছে। আর সন্ধানলব্ধ স্থাপত্যিক নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কক্ষ, প্রাচীর, মেঝে ইত্যাদি সংবলিত একটি বিশাল ইমারতের বহির্দেয়ালের উত্তর-পশ্চিম কোণসহ উত্তর ও পশ্চিম বাহুর কিছু অংশ। উত্তর বাহুটি চিহ্নিত কোণ থেকে ৬.৭০ মি: অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকস্থ রওজার ঢিবি এবং পশ্চিম বাহুটি দক্ষিণ দিকে ২১.৩০ মি: অগ্রসর হয়ে বর্তমানে দৃশ্যমান কবরস্থানের নিচের দিকে ধাবিত হয়েছে। রওজা ও কবর অপসারণ সম্ভব নয় বলেই সদ্য অনাবৃত ইমারতটির বিস্তৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু অবহিত হওয়া সম্ভব হয় নি। তবে পশ্চিম বাহুর বহির্মুখে পোড়ামাটির ফলক স্থাপনের স্থান সংকুলানের মতো ৪.২৬ মিঃ লম্বা একটি প্যানেলের সারি রয়েছে। কয়েকটি প্যানেলে দু'একটি পোড়ামাটির ফলক মূল অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরবর্তী সময়ে এ ইমারতটিতে দু'টি পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজ (পুনঃনির্মাণ) পরিচালিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম বাহুর উত্তরাংশ ঘেঁষে ১৫.২৪মি: × ১৫.২৪ মি: পরিমাপে একটি বর্গাকার কক্ষ সংযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এর পরিমাপ ১৮.২৮ মি: × ১৮.২৮ মি: এ উন্নীত করা হয়।

উপরে বর্ণিত ইমারতটির দক্ষিণ দিকস্থ উপরাংশের একটি স্থানে পরবর্তীকালে নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দু'টি ইট বিছানো মেঝেসহ কিছু বিক্ষিপ্ত দেয়ালের অংশ বিশেষের অস্তিত্ব দেখে এ স্থানে দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত অনুধাবন করা যায়। কিন্তু স্থাপত্যিক নিদর্শনটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশটাই দক্ষিণ দিকস্থ আধুনিক কবরস্থান ও ঈদগাহের নিম্নে অবস্থিত বলে এর বিস্তৃতি এবং কাঠামোগত বিন্যাস সম্পর্কে পূর্ণতথ্য আহরণ করা সম্ভব হয় নি। শুধু তাই নয় প্রথম নির্মাণ সময়কালের স্থাপত্যিক নিদর্শনের পশ্চিম বাহুর উপরও দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালে আরও কিছু স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালে নির্মিত এ স্থাপত্যিক নিদর্শনটি একটি বর্গাকার (৬.৪০ মি: × ৬.৪০ মি:) নিরেট ইমারতের ধারণা প্রদান করে। এর কেন্দ্রস্থলে ৫১ সেমি: × ৫১ সেমি: পরিমাপের একটি শূন্যগর্ভ স্থান রয়েছে। এ বিন্যাস স্তূপের ভূমি-পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্যময়। এর পশ্চিম বাহুর অংশ বিনষ্টকৃত অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। এছাড়া এ সময়কালে সম্পূর্ণ ইমারতগুচ্ছটিকে ১.৫২মি: পুরু একটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। বেষ্টনী ভুক্ত এলাকার পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ৩২.৯১ মি: এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৪.৬৮ মি:। এ বেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি তোপমঞ্চের সংযোজনও লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালে স্তূপটির পশ্চিমের সংলগ্ন ভূমিতে অপর একটি প্রাচীর ঘেরা চত্বরের মাঝখানে ৫.৭৯মি: × ৫.৭৯ মি: বর্গাকার পরিমাপের আরও একটি নিরেট ইমারতের ভিত্তির অংশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর স্থাপত্যিক বিন্যাসেও স্তূপের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। এ স্তূপটির অবস্থান যেহেতু দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের স্তূপটির উপরের স্তরে সেহেতু এটিকে তৃতীয় নির্মাণ সময়কালের নিদর্শন বলে গণ্য করা যায়। এর উপরে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়কালে (সর্বশেষ নির্মাণ সময়কাল : চতুর্থ) নির্মিত আরও কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে এ নিদর্শনগুলো এত বেশি জরাজীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে যে এদের

বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রূপে শনাক্তকরণের অযোগ্য।

১৯৯০–৯১ অর্থ বছরে অনাবৃত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কৃত ইঁট, খেলনা, পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকার গোলক, মৃৎপাত্র, বেলে পাথরে তৈরি মূর্তির ভগ্নাংশ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব নিদর্শনাদির নমুনা এবং শৈলী গুপ্ত ও পাল আমলের বৈশিষ্ট্যের ধারক। বিশেষ করে কার্নিশের থাক্ থাক্ উদ্‌গত বিন্যাস, থাকগুলোতে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার, পাদপট্টের অংশে গোলায়িত ভাবে কাটা ইটের সাহায্যে তৈরি বিভিন্ন প্রক্ষেপণ ইত্যাদি এ ধারণাকে আরও যথার্থ করে তোলে।

মাহীসওয়ারের মাজার থেকে প্রায় ১৮৫ মি: উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হলে একটি অনুচ্চ ঢিবির অবস্থান লক্ষ করা যায়। এ ঢিবির উপর রয়েছে একটি মাঝারি আকারের বটগাছ এবং ২.৮৫ মি: × ৭১ সেমি: ×৭৩.৫সেমি: পরিমাপের একটি বেলে পাথরের খণ্ড। মূলত এ বিরাটাকার পাথর খণ্ডের উপস্থিতির কারণেই ঢিবিটি স্থানীয় জনগণের নিকট খোদার (খোদাই) পাথর ঢিবি (ভিটা) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৯০৭ সালে বগুড়া কালেক্টরেটের একজন প্রকৌশলী এ ঢিবিতে খনন কাজ পরিচালনা করেন। এরফলে ঢিবির ভূপৃষ্ঠ থেকে ১.৫২ মি: গভীরতায় ৭.৩১ মি: × ৪.৫৬ মি: পরিমাপের একটি পূর্বমুখী ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল। এর মেঝেটি ছিল পাথরের পট্ট বিছান এবং ভিত্তির ৯১.৪ সেমি: উচ্চতা পর্যন্ত দেয়ালও ছিল পাথরের তৈরি। দেয়ালের বাকি অক্ষত উপরাংশ ছিল ইঁট ও কাদা দিয়ে গাঁথা। এছাড়া খননের ফলে তিনটি পাথরের থামজাতীয় খণ্ড পাওয়া গেছে। এগুলো এবং ঢিবির উপর পড়ে থাকা বিরাট পাথর খণ্ডটির বিভিন্ন অংশে আজও টিকে থাকা বিবিধ পরিমাপের অগভীর খাঁজগুলো দরজা বা জানালার বাজুর সর্দল ধারণের উপযোগী। এসব পরোক্ষ তথ্যের আলোকে অনুমিত হয়েছে যে ইমারতটির থাম এবং দরজা ও জানালার বাজুতে পাথর খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়া ঢিবির উপর বর্তমানে পড়ে থাকা পাথর খণ্ডটির এক পাশের মধ্যবর্তী অংশে একটি অলঙ্কারিক কীর্তিমুখ খোদাই করা আছে। খননের ফলে সন্ধানলব্ধ তিনটি পাথর খণ্ডের মধ্যে একটিতে তিনজন উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধের একটি সারি দেখা যায়। বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের সংরক্ষণে রক্ষিত এ বেলে পাথর খণ্ডে উৎকীর্ণ প্রতিটি ধ্যানী বুদ্ধ একটি খিলান কুলঙ্গীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মধ্যের ধ্যানী বুদ্ধটি অক্ষোভ্য। ৬৮.০ সেমি: × ২০ সেমি: × ১৮ সেমি: পরিমাপের এ পাথর খণ্ডের এক পাশে একজন উপাসককে অঞ্জলি মুদ্রায় বিধৃত করা হয়েছে। এসব আলামত এবং ইমারতের পূর্বমুখীতার উপর ভিত্তি করে এটা অনুমিত হয়েছে যে এ ঢিবিতে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে।

খোদাই পাথর ভিটার ৯১.৪৪ মি: উত্তরে মানকালীর ভিটা নামক ঢিবি অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে এ ঢিবিতে অগভীর খনন কাজ পরিচালনা করে একটি ২৬.৩৬ মি: × ১৫.৮৪ মি: মেঝায়তন বিশিষ্ট মসজিদের কাঠামো অনাবৃত হয়। এর চার পাশের ইটে গাঁথা পলেস্তরা বিহীন দেয়ালগুলো ছিল ১.২৪ মি: থেকে ১.৫২ মি: মোটা। এর সম্মুখে ছিল ৭.৬২ মি: প্রশস্ত খোলা চত্বর। ইমারতটির পূর্বদেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ ও পশ্চিম দেয়ালে পাঁচটি মিহরাবের চিহ্ন ছিল।

মধ্যবর্তী মিহরাবটি এবং দেয়ালের বহির্মুখ জ্যামিতিক-পুষ্পক, পদ্ম পাপড়ি ও পিরামিড মোটিফ খচিত ইঁট দিয়ে শোভিত ছিল। আয়তাকার মেঝের উপর সমদূরত্বে অবস্থিত দুই সারি থামের ভিত ইমারতটি ধ্বংসের পরও অক্ষত ছিল। ফলে এ ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগ পনেরটি চতুস্কোণাকার অংশে বিভক্ত ছিল, আর এর ছাদে ছিল পনেরোটি গম্বুজ। তবে গম্বুজের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার মতো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে মিম্বর (ভাষণ মঞ্চ), একটি মোকাব্বিরের আসন, মাকবারা (বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত প্রাচীর ঘেরা স্থান) ও দু'টি অধ্যয়ন আসন-মঞ্চছিল। এসবই প্রাক-মুগল আমলে প্রচলিত মসজিদ স্থাপত্য শৈলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর সংলগ্ন পশ্চিমাংশে রয়েছে একটি ডোবা আকারের গর্ত।

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এ ঢিবি পরিদর্শন কালে এর ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব অসংখ্য অলঙ্কৃত ইটের উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন যেগুলো স্পষ্টত:ই মন্দির স্থাপত্যের সাথে জড়িত ছিল। দ্বিতীয়ত, ১৯৬৫-৬৬ অর্থ বছরের খনন কালে এর বিভিন্ন স্তরের সাংস্কৃতিক জঞ্জালের মধ্যে কিছু শুঙ্গ শাসনামলে প্রচলিত শৈলীর পোড়ামাটির ফলক ও উত্তর ভারতীয় ঔজ্জ্বল্যময় কালো খোলামকুচির অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। তৃতীয়ত, চলতি শতকের গোড়ার দিকে প্রভাষ চন্দ্র সেন নামে একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এ ঢিবিতে একটি অসমাপ্ত জৈন মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন (বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে)। চতুর্থত, এ ঢিবিতে কানিংহামের দেখা অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন মূর্তি খচিত অসংখ্য অলঙ্কৃত ইঁট, একটি ব্রঞ্জ নির্মিত ক্ষুদ্রাকার গণেশ ও গরুড় এবং একটি নীলাভ পথেরের বেদী। এসব সূত্র ধরে অনুমিত হয় যে মানকালীর ভিটা ঢিবিতে একাধিক অধি বসতি আমলের অস্তিত্ব ছিল। এসব অধিবসতি আমলে এ স্থানে কখনও জৈন এবং কখনও হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। তবে উক্ত ইমারতগুলোর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তা নিশ্চিত করে বলার মতো কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই।

মানকালীর ভিটা থেকে প্রায় ১৮৫ মি: উত্তরে পরশুরামের বসত ভিটা নামে আর একটি ঢিবি আছে। এ ঢিবিতে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে প্রথম সাধারণ খনন পরিচালনার ফলে পরস্পর সংযুক্ত দু'টি পাকা কক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বড়টির পরিমাপ ৫.২৩মি: × ৩.৪০ মি: এবং ছোটটির ২.৮৯ মি: × ৩.৪০ মি:। এরপর ১৯৬১ সালে এ ঢিবিতে পুনরায় খনন পরিচালনা করা হয়। ফলে একটি মূল প্রাচীর বেষ্টনী এবং অপর একটি আভ্যন্তরীণ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত একটি খোলা চত্বরসহ একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট ইমারতগুচ্ছের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিতি লাভ সম্ভব হয়েছে। কক্ষগুলোর মেঝের উপরিভাগে এক ধাপ পাথরের পট্ট বিছান ছিল। বাইরের দিকে প্রাচীর বেষ্টনীর পূর্ববাহুতে দু'টি রক্ষীঘর সংযোজিত একটি মূল প্রবেশ তোরণ ছিল। একইভাবে ভিতরের প্রাচীরের পূর্ববাহুতেও একটি সাধারণ গোছের প্রবেশদ্বার ছিল। এ প্রবেশে পথটি একটি সোপানশ্রেণী দিয়ে অভ্যন্তর ভাগের কক্ষগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। ইমারতগুচ্ছটি একটি খোলা চত্বরকে কেন্দ্র করে চারটি বাহুতে

বিন্যস্ত ছিল। এর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণের প্রতিটি বাহুতে পরস্পর সংলগ্নভাবে দু'টি কক্ষ আছে। পূর্ব ও পশ্চিমের বাহু দু'টিতেও অনুরূপ কক্ষের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রাচীর বেষ্টনীর বাইরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দক্ষিণমুখী একটি কক্ষ রয়েছে। এর উত্তর দেয়ালের বিপরীতে ছাদে আরোহণের সোপানশ্রেণী ছিল।

পরশুরামের বসতভিটার ইমারতগুলো চুনসুরকিতে গাঁথা মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত ছোট ছোট ইঁট দিয়ে তৈরি। পুরাতন ইমারত থেকে সংগৃহীত বেলে পাথরের সর্দলকে দরজার নিম্নাংশে গোবরাট হিসেবে ব্যবহারের চিহ্ন লক্ষ করা গেছে। এছাড়া দেয়ালের গায়ে রয়েছে বালি ও সুরকির পলেস্তরা এবং চুনের প্রলেপ। এসবের উপর নির্ভর করে এ ইমারতগুচ্ছকে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকে নির্মিত বসতবাটির নিদর্শন বলে অনুমান করা যায়। সর্বোপরি এ ইমারতের সাংস্কৃতিক জঞ্জালের মধ্য থেকে ১৮৩৫ ও ১৮৫৩ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত দু'টি মুদ্রা প্রাপ্তি উপরিল্লিখিত অনুমানকে আরও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে।

উনিশ শতকে নির্মিত বসতবাড়ির তাৎক্ষণিক নিচের স্তর থেকে মুসলিম শাসনামলের বৈশিষ্ট্য সূচক গ্লেইজড (glazed) খোলামকুচি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর পরবর্তী নিম্নদেশের স্তর থেকে এমন সব পোড়ামাটির ফলক অনাবৃত হয়েছে যেগুলো নিশ্চিতভাবে পাল শাসনামলে প্রচলিত শিল্পশৈলীর ধারক। এসব পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করে খননে অংশ গ্রহণকারী প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা এই যে পরশুরামের প্রাসাদ ঢিবিতে সর্বমোট তিনটি অধিবসতি সময়কাল ছিল। সবচেয়ে নিচের প্রথম সময়কালটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় আট শতক, দ্বিতীয়টি (মধ্যবর্তী) খ্রিটীয় পনের-ষোল শতক এং সবচেয়ে উপরের তৃতীয়টি উনিশ শতকের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পরশুরামের বসতভিটা থেকে অনুর্ধ ৫০ মি: পূর্বদিকে একটি কূপ আছে। এর উপরিভাগের পরিধি ৩.৭৮ মি:। বর্তমানে ইটপাটকেলে পূর্ণ এবং জলশূন্য এ কূপটি স্থানীয় জনগণের নিকট 'জীয়ৎকুণ্ড' (জীবনী শক্তি লাভে গহব্বর) নামে পরিচিত। এর বহির্মুখসহ ভূপৃষ্ঠ থেকে উদগত বেড়ের অংশ ইঁট দিয়ে বাঁধান আছে। কূপের ভিতরের অংশ মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত নমুনার ছাপ যুক্ত ছোট আকৃতির ইঁট ও চুনসুরকিতে গাঁথা। এছাড়া দক্ষিণ অংশের উপর থেকে নিচ দিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এক সারি পাথর খণ্ড এবং উত্তর দিকে মুখের কাছে কূপের ভিতরের দিকে প্রসারিত আরও একটি বড় আকারের পাথর খণ্ড আছে। শেষোক্তটি সম্ভবত কূপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য এবং অন্যান্যগুলো সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এসব পাথর খণ্ড দরজা-জানালার বাজু এবং গৌরিপট্টের নলাকার ঠোঁট অংশের নমুনাভুক্ত। এছাড়া পাকা গাঁথুনির বহির্মুখে রয়েছে বালি ও সিমেন্টের পলেস্তরা। এসবের উপর নির্ভর করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলোতে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, কূপটি পরশুরামের বসতবাড়ির দ্বিতীয় অধিবসতি আমলে খ্রিস্টীয় পনের-ষোল শতক) খনন করা হয়েছিল। আর পাথরের টুকরাগুলো পুরাতন কোন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পরশুরামের বসতবাটির সর্বশেষ অধিবসতি সময়কালেও (কোম্পানি শাসনামলে) এ কূপ ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত কোম্পানি শাসনামলের শেষদিকে অথবা বৃটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে এ স্থানে বসবাসকারী

কোন সরকারি কর্মকর্তা এর বহির্মুখে সিমেন্ট-বালির পলেস্তরা সংযোজিত করেছিলেন। অবস্থানের নৈকট্য, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিচারে এ কূপকে পরশুরামের বসতভিটার দ্বিতীয় নির্মাণ আমলের নির্মাতাদের দ্বারা খননকৃত এবং তৃতীয় নির্মাণ আমলের নির্মাতাদের দ্বারা সংস্কারকৃত বলে অনুমিত হয়। এ অনুমান সত্য বলে ধরে নিলে বলতে হয়, এ দু'টি সময়কালেই কূপটি ব্যবহৃত হতো।

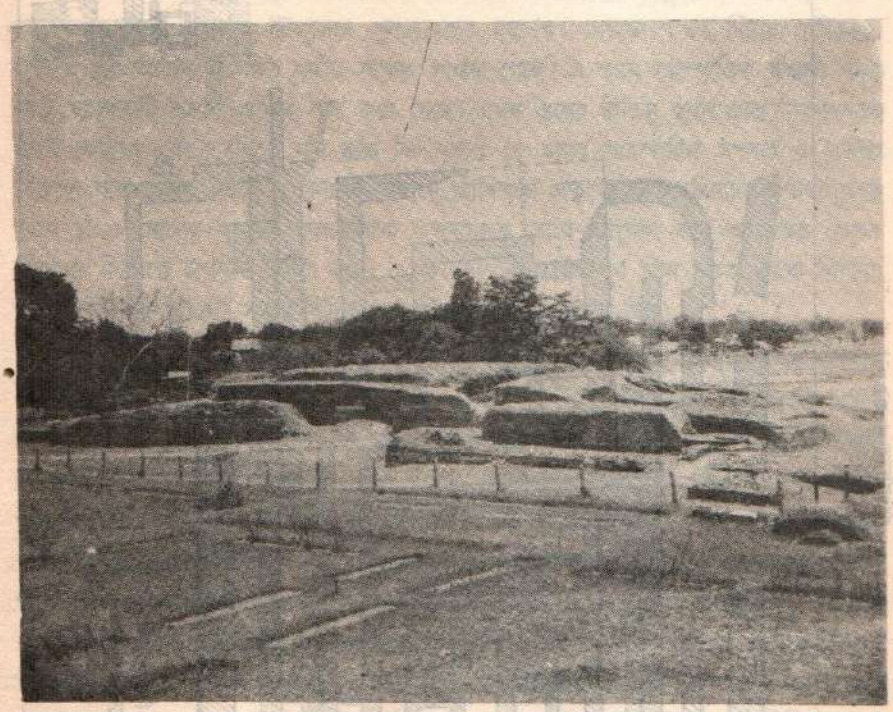
গোবিন্দ ভিটা ঃ মহাস্থানগড়ের উত্তরবাহুর পূর্বপ্রান্ত থেকে মাত্র ১৮৫ মি: উত্তর-পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর বাঁকের পাশে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্রামাগারের উত্তর অংশে গোবিন্দ ভিটার অবস্থান। এ ঢিবির পূর্বপাশের অধিকতর উঁচুস্থানে ১৯২৮ সালে প্রথম খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। ফলে এ স্থানে একাধিক নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি স্থাপত্যিক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল। স্থাপত্যিক শৈলী অনুযায়ী সবচেয়ে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষকে পরবর্তী গুপ্ত (প্রথম নির্মাণ সময়কাল - খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতক) এবং দ্বিতীয়টি পাল শাসনামলের (খ্রি: আট-নয়-শতক) বলে ধরে নেওয়া যায়। এছাড়া এ স্থানে খ্রিস্টীয় বার-তের শতকের দিকে (তৃতীয় নির্মাণ সময়কাল) আর এক পর্যায়ে নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। খননে প্রতিবেদকের অভিমত অনুযায়ী এসব ভগ্নাবশেষ মন্দির স্থাপত্যের নমুনার ধারক। অতপর খ্রিস্টীয় পনের শতকের দিকেও এ ঢিবিতে কিছু বিক্ষিপ্ত নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল (চতুর্থ নির্মাণ সময়কাল) বলে খনন প্রতিবেদকের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

(ক) প্রথম নির্মাণ সময়কালের মন্দির ঃ এর কেবল পশ্চিম বাহুর (উত্তর-দক্ষিণে লম্বা) একাংশের ভিত্তিসহ দেয়ালের কিছু অংশ অক্ষত আছে। ভিত্তিসহ দেয়ালের অক্ষত অংশের উচ্চতা ৩.৩৫ মি: এবং ভিত্তির অংশে ১৬টি থাক রয়েছে। এর বহির্ভাগের মাঝামাঝি অংশে ১.৫২ মি: চওড়া এবং ৯.১২ মি: লম্বা একটি প্রবেশমঞ্চ জাতীয় উদ্‌গত অংশ আছে। অপরাপর অংশ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একই চত্বরের পূর্বদিকের অনতিদূরে একই নমুনার স্থাপত্যিক শৈলী সূচক আর একটি বর্গাকার (১৭ মি: × ১৭মি:) ইমারতের ভিত্তির অংশ দেখা যায়। পশ্চিম ও পূর্বদিকের উভয় ইমারতের কেন্দ্রস্থলে একটি প্রদক্ষিণ পথ ঘেরা বেদীর অস্তিত্ব আছে। বেদীটির পরিমাপ ১.৯৭ মি: × ৯.৬৭ মি: এবং প্রদক্ষিণ পথ গড়ে ১ মি: চওড়া। এছাড়াও এ সময়কালে ইমারতটিকে করতোয়ার আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর সর্ব পূর্বপ্রান্তে বেশ কয়টি লম্বা ও আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত দেয়াল এবং ৪৫মি: দীর্ঘ পাথরের বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল।

(খ) দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের মন্দির ঃ প্রথম নির্মাণ সময়কালের বারান্দাটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর একে ১.২১ মি: সংকুচিত করে এর উপর আর একটি বারান্দা তৈরি করা হয়। এছাড়া মূল ইমারতের ভিত্তিকে আরও কিছুটা উঁচু করে তার উপর একাধিক বদ্ধ-প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট সুউচ্চ ইমারত তৈরি করা হয়েছিল। সর্বোচ্চ কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি বেদী এবং এর পূর্বদিক ব্যতীত অপর তিন দিকে মোট পাঁচটি কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনটি কক্ষের প্রতিটিতে একটি করে পাতকুয়া রয়েছে। এছাড়া পূর্বোক্ত সময়কালের ইমারতটির পশ্চিম দিকে

১.৮২ মি: দূরত্বে ১.৮২ মি: চওড়া এবং ৩৪.৭৪মি: লম্বা একটি বহি:প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। এর পশ্চিম ও পূর্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে একটি করে অনুরূপ দেয়াল পূর্বদিকে ধাবিত হয়েছে। ফলে এ দেয়ালগুলোর অভ্যন্তরে একটি বেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা চতুষ্কোণাকার চত্বরের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বহি:প্রাচীরের উত্তর ও দক্ষিণ বাহু কত দূর বিস্তৃত ছিল তা করতোয়ার অব্যাহত ভাঙ্গনের ফলে আজ আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

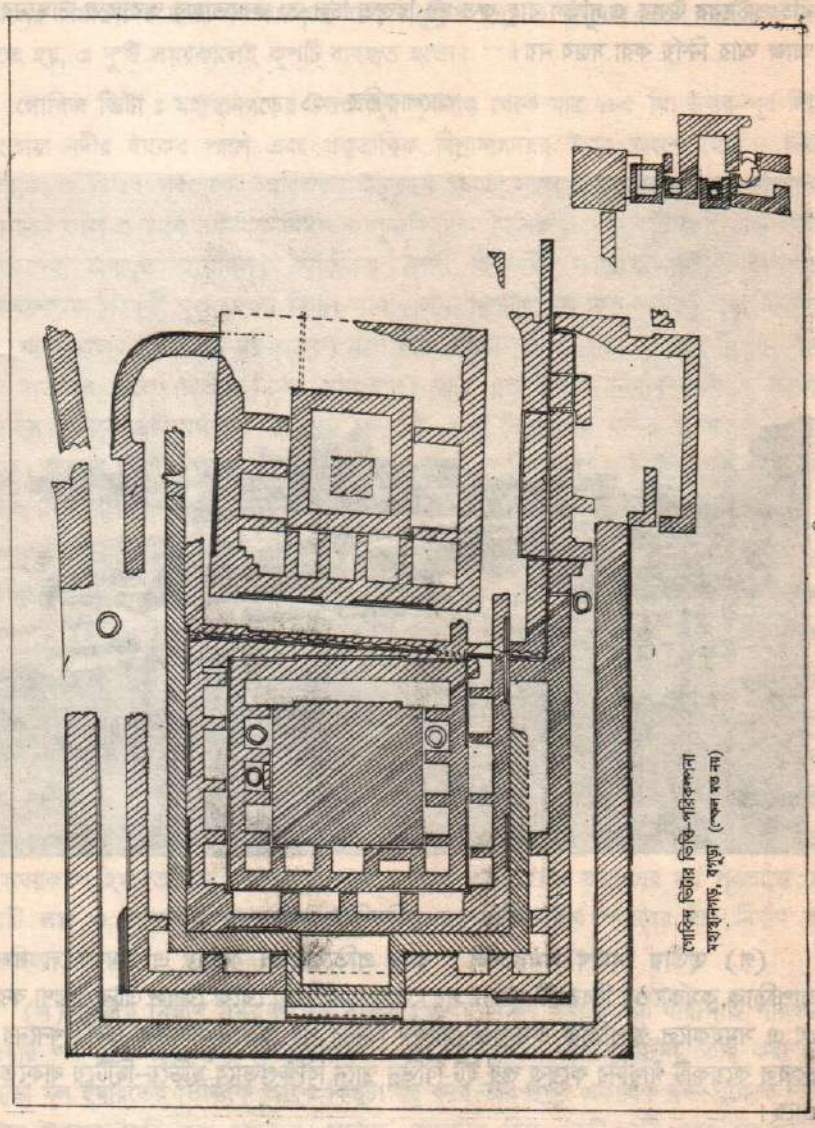
আলোকচিত্র- ৩১



সাধারণ দৃশ্য গোবিন্দভিটা, মহাস্থানগড়

(গ) তৃতীয় নির্মাণ সময়কাল : খনন প্রতিবেদকের বর্ণনায় এ সময়কালে সঙ্ঘটিত স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডের বিবরণটি সুস্পষ্ট নয়। তবে তার বর্ণনা থেকে কেবল এটুকু ধারণা করা যায় যে এ সময়কালে স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড গোবিন্দ ভিটার পূর্ব অঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল। খননের ফলে কেবল কয়েকটি গাঁথুনির কয়েক স্তর ইঁট বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে।

(ঘ) চতুর্থ নির্মাণ সময়কাল : এ সময়কালের স্থাপত্যিক নিদর্শনাদি পূর্বোক্ত সময়কালের মন্দিরগুলোর সংলগ্ন ভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলোর মধ্যে কেবল একটি



রেখাচিত্র – ৩৫

মৌর্যদের দ্বিতীয় ভিত্তি–পরিকল্পনা
মহাস্থানগড়, বগুড়া (স্কেল দেওয়া নাই)

পাকা মেঝের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ মেঝের উপর ছড়িয়ে থাকা মুসলিম শাসনামলের শৈলীর ছাপযুক্ত প্রত্নবস্তুগুলো থেকে এটা সহজেই অনুমেয় হয়ে ওঠে যে আলোচ্য মেঝে খ্রিস্টীয় পনের শতকের দিকে ব্যবহৃত হতো। এদের সাথী সামগ্রী হিসাবে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটি মৃৎপাত্র। মেঝের উপর মূল অবস্থায় প্রাপ্ত এ পাত্রটি খ্রিস্টীয় চৌদ্দ পনের শতকে বাংলাদেশে রাজত্বকারী কয়েকজন সুলতানের ১৮টি মুদ্রা দিয়ে পূর্ণ ছিল।

১৯৬০ সালে খননের ফলে এ ঢিবির দক্ষিণাংশে বর্ণনার অযোগ্য কিছু বিক্ষিপ্ত দেয়ালের অংশ বিশেষ অনাবৃত হয়েছে। এসব দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিম্নমানের কারিগরী পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এমনকি ইটগুলোও পুন:ব্যবহৃত ধরনের। তাছাড়া ৭.৬২ মিটার গভীরতায় পৌঁছার পর আদিম অকর্ষিত মাটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। এ স্থানে সাংস্কৃতিক জঞ্জাল সমৃদ্ধ মোট সতেরোটি স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এসব স্তরের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো এতই ক্ষয়িষ্ণু এবং পূর্বদিকে নদী দ্বারা বিলীনপ্রাপ্ত যে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা কঠিন। তবে এ খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ও স্তরবিন্যাসের তথ্যগুলোর সাথে ১৯২৮ সালের খননের ফলাফলকে তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করে আপাতত কেবল নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ খননস্থলটিতে খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে খ্রিস্টীয় পনের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে জনবসতি অব্যাহত ছিল।

ভাসুবিহার (নরপতির ধাপ) ঃ মহাস্থানগড় থেকে আনুমানিক ৫ কি:মি: উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই ঢিবির পরিমাপ ২৪৩ মি: × ২১৩ মি:। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তিনটি অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমিক খননের ফলে এ ঢিবিতে দু'টি বৌদ্ধ বিহার ও একটি মন্দিরের কাঠামো উন্মোচিত হয়েছে। ঢিবির উত্তরাংশে অবস্থিত বিহারটি দক্ষিণমুখী। আয়তাকারে নির্মিত এই বিহারের পরিমাপ ৫৬.৮ মি: (পূর্ব-পশ্চিম) × ৪৯.২২ মি: (উত্তর-দক্ষিণ)। এর সাধারণ পরিকল্পনার সাথে পাহাড়পুর বিহার কাঠামোর গভীর সৌসাদৃশ্য রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্দিরের উপস্থিতি নেই। এর বহি:প্রাচীর ২.৫৯ মি: চওড়া। এই প্রাচীরের ভেতর দিকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গড়ে ৩.৪০ মি: × ৩.৪৮ মি: পরিমাপের মোট একত্রিশটি ভিক্ষুকক্ষ। এদের সম্মুখবর্তী টানা বারান্দাটি ২.৫৯ মি: প্রশস্ত। মধ্যবর্তী উন্মুক্ত চত্বর থেকে টানা বারান্দায় আরোহণ ও অবতরণের জন্য দক্ষিণ বাহুর তোরণের সম্মুখ ভাগ থেকে সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। এই বিহারের প্রবেশ-দরজা থেকে ২২.৮৬ মি: দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে দ্বিতীয় বিহার। পূর্বমুখী এই বিহারটির পরিমাপ ৪৯.৩৭ মি: (উত্তর-দক্ষিণ) × ৪৬.৩২ (পূর্ব-পশ্চিম)। এর প্রবেশ-তোরণটি বাহিরের দিকে প্রলম্বিত এবং থাম শোভিত হলঘর ও দু'টি ছোট কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রবেশ তোরণ ছাড়া পূর্ববাহুতে পাঁচটি এবং অন্যান্য বাহুর প্রতিটিতে সাতটি করে ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে। এসব কক্ষের পেছনের দেয়াল এবং সামনের টানা বারান্দা উভয়ই ২.৫৯ মি: করে চওড়া। প্রতিটি কক্ষে একটি করে দরজা (১.৩৯ মি: প্রশস্ত) দিয়ে বারান্দার দিকে উন্মুক্ত। মধ্যবর্তী উন্মুক্ত চত্বরটি ফাঁকা। বিহারের তোরণ থেকে ৪৫.৭২মি: দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি উত্তরমুখী মন্দিরের অবস্থান। প্রায় ক্রশাকার ভিত্তি-পরিকল্পনার উপর নির্মিত মন্দিরটির

পরিমাপ ৩৮.১ মি: × ২৬.৩৬ মি:। এর কেন্দ্রে প্রদক্ষিণ পথ পরিবেষ্ঠিত একটি আয়তাকার গর্ভগৃহ রয়েছে। এর ভিত্তিমূলের বহির্মুখে রয়েছে পোড়ামাটির ফলক। এসব ফলকে বিধৃত চিত্রাবলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

নির্মাণ সামগ্রী ও স্থাপত্যিক শৈলী অনুযায়ী ভাসুবিহারে অনাবৃত ইমারতাদি খ্রিস্টীয় দশ–এগার শতকের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে। তবে উল্লিখিত নিদর্শনাদির সাথে প্রচুর পরিমাণ খোলামকুচি, ব্রঞ্জ নির্মিত নিবেদন মূর্তি, সীলমোহর ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব নিবেদন মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে ধ্যানীবুদ্ধ, মঞ্জুশ্রী, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তারা ও পূজারী। এদের কোন কোনটির শিল্পশৈলী বিহারগুলোর নির্মাণ সময়কালের চেয়ে প্রাচীন বলে প্রতীয়মান হয়। তাই আপাতত দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, ভাসুবিহারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত,এই বিহারগুলোর নিচের স্তরে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আমলের নিদর্শন গচ্ছিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলেকজান্ডার কানিংহামের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই ঢিবিতে বিখ্যাত 'পো–সি–পো' বিহারের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে। এই মন্তব্য যাচাই করার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে গভীর খনন কাজ পরিচালনা করা বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ (বিহার) ঃ ভাসুবিহার থেকে প্রায় ২ কি: মি: দক্ষিণ পূর্বদিকে বিহার হাট। এর নিকটস্থ পূর্বাংশে আর একটি ঢিবি আছে। স্থানীয় জনগণের নিকট এই ঢিবি তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ নামে পরিচিত। আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম এই ঢিবিকে গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজি (১২১২–২৭ খ্রিঃ) কর্তৃক ব্যবহৃত বসনকোট হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সাল (মধ্যবর্তী ১৯৮৩–৮৪ সাল বাদ দিয়ে) পর্যন্ত ক্রমাগত খননের ফলে ঢিবিটিতে একটি বিহার, একটি চতুষ্কোণাকার ইমারত ও একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়। তবে ঢিবিটির পূর্বাংশের অর্ধেক অংশ অদ্যাবধি খনন বহির্ভূত অবস্থায় রয়েছে। এ অংশের ভূপৃষ্ঠের সমোন্নতি রেখাগুলো পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করা যায় যে এ অংশে আরও দু'টি ইঁট নির্মিত ইমারতের কাঠামো গচ্ছিত আছে। খননের ফলে সর্বাধিক তেরটি স্তর, সাতটি মেঝে ও তিনটি অধিবসতি আমল শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে নিচের দু'টি মেঝের সাথে সম্পর্ক যুক্ত স্থাপত্য কীর্তির বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় অধিবসতি সময়কালে প্রথম অধিবসতি সময়কালের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যিক কাঠামোর উপর বর্তমানে দৃশ্যমান কাঠামোগুলোর নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। আর তৃতীয় নির্মাণ সময়কালে দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের ইমারতগুলোতে পুনঃনির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রত্নস্থলে প্রায় পাঁচ শত প্রত্নবস্তু অনাবৃত হয়েছে।

তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ নামক ঢিবিটি পূর্ব–পশ্চিমে ২১২ মিঃ এবং উত্তর–দক্ষিণে ১৮২ মিঃ বিস্তৃত। খননের পূর্বে এটা পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে ৩.৪ মিঃ উচু ছিল। ঢিবিটির পশ্চিম দিকে একটি বিহার এবং দক্ষিণ–পূর্বকোণে একটি স্তূপের (মতান্তরে মন্দির) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বিহারটি পশ্চিমাংশের বিহারের লাগোয়া দক্ষিণ দিকের অংশে বিস্তৃত ছিল। প্রথম বিহারটি পূর্বমুখী এবং এর পরিমাপ ৬১মিঃ (পূর্ব–পশ্চিম) × ৫৭মিঃ (উত্তর–দক্ষিণ)।

পূর্ববাহুর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত এই তোরণের বরাবর পূর্বদিক দিয়ে এক সময় ঘাঘর নদী প্রবাহিত হতো। এর উত্তর ও দক্ষিণের প্রত্যেকটিতে দশটি করে ভিক্ষুকক্ষ ছিল। অন্যদিকে পূর্ব বাহুতে প্রবেশ তোরণের দু'দিকের প্রত্যেক দিকে চারটি করে প্রকোষ্ঠ ছিল। পশ্চিম বাহুতে যদিও খনন পরিচালিত হয়নি তথাপি নয়টি প্রকোষ্ঠ ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। এদের আকৃতি ২.৪৪ মিঃ থেকে ৩.৬৬মিঃ এর মধ্যে উঠানামা করে। একইভাবে পেছনের দেয়ালের পুরুত্ব ২.৫৯মিঃ থেকে ২.৮২ মিঃ, সম্মুখের দেয়াল ১.৯৮মিঃ থেকে ২.৬মিঃ এবং বিভাজক দেয়ালের পুরুত্ব ১.২২মিঃ থেকে ২.২১মিঃ এর মধ্যে বিদ্যমান। সারিবদ্ধ কক্ষগুলোর সামনে দিয়ে রয়েছে ২.৭৪মিঃ প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার সামনে রয়েছে ১.২মিঃ চওড়া ঠেস দেয়াল। মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে খোলা চত্বর।

তোতারাম পণ্ডিতের ধাপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত প্রথম বিহারটির দু'টি কক্ষে বিছান ইটের উপর জমাটবদ্ধ মেঝে এবং তার উপর ইটের তৈরি বেদী রয়েছে। এগুলো প্রত্নস্থলটির দ্বিতীয় স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দক্ষিণের বারান্দার পশ্চিমাংশ জুড়ে আছে ১২.১৯মিঃ লম্বা এবং ২.৮মিঃ চওড়া একটি ইটের তৈরি মঞ্চ। বিহারটিতে একটি অধিবসতি সময়কালে একটি মূল নির্মাণ ও একটি পুনঃনির্মাণ সময়কালের চিহ্ন লক্ষ করা গেছে। উত্তর বাহুর পূর্বপ্রান্ত থেকে চতুর্থ কক্ষের পেছন দিকে ২০সেমিঃ × ২৫সেমিঃ পরিমাপের নর্দমার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। পূর্ববাহুর দুই প্রান্তের কক্ষগুলোর পরিসর অত্যন্ত কম এবং দেয়ালগুলোও অপেক্ষাকৃত বেশি মোটা। পূর্ববাহুর মধ্যবর্তী তোরণটির পরিমাপ ২০.৭৮মিঃ (উত্তর-দক্ষিণ) × ৬.২৫মিঃ (পূর্ব-পশ্চিম)। এর বাইরের অংশে মূল বাহু থেকে বর্ধিত একটি প্রবেশ কক্ষ (৮.৩৩মিঃ × ৩.৯৬মিঃ) এবং ভেতরের উন্মুক্ত চত্বরের দিকে বর্ধিত অপর একটি কক্ষ (৫.৫মিঃ × ৩.৯৬মিঃ) আছে। মূল বাহুর বাইরের দিকে বর্ধিত প্রবেশ কক্ষটির দু'পাশে আবার একটি করে কক্ষ ছিল। প্রতিটি কক্ষের পরিমাপ ৬.৩৩মিঃ × ৫.৮৬মিঃ। বিহারের বাইরে থেকে তোরণে এবং তোরণ থেকে বিহারের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত চত্বরে উঠা-নামার জন্য সোপানশ্রেণী ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এগুলো কিছু সাংস্কৃতিক জঞ্জালের উপর নির্মিত হয়েছিল বলে এদের পুনঃ নির্মাণকালীন সংযোজন হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বাধা নেই।

তোতারাম পণ্ডিতের ধাপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রাপ্ত দ্বিতীয় বিহারটির কেবল পূর্ব এবং দক্ষিণ বাহুর অংশবিশেষে খনন পরিচালিত হয়েছে। ফলে এর ভিক্ষুকক্ষগুলোর পরিমাপ ৬.২৪মিঃ × ৩.৩৫মিঃ পাওয়া গেছে। পেছনের দেয়াল ২.৫৩মিঃ এবং সামনের দেয়াল ১.৮২মিঃ চওড়া। কক্ষগুলোর বিভাজক দেয়ালগুলো ১.২১মিঃ থেকে ১.২৬মিঃ চওড়া। সম্পূর্ণ খনন পরিচালিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়। তোতারাম পণ্ডিতের ধাপের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত কাঠামোটি একটি স্তূপ বা মন্দির হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। এর সাথে যশোরের ভারতভয়না ও বগুড়ার গোকুল মেধে প্রাপ্ত স্থাপত্য কাঠামোর চমৎকার সৌসাদৃশ্য রয়েছে।

তোতারাম পণ্ডিতের ধাপে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে সুলতান সিকন্দার শাহের আমলের (১৩৫৯-১৩৮৭ খ্রিঃ) একটি রৌপ্য মুদ্রা, একটি ব্রঞ্জের ধ্যানীবুদ্ধ। কিছু পোড়ামাটির ফলক, তিনটি পোড়ামাটির মূর্তির মস্তকের অংশ, কিছু পাথরের পুঁতি অলঙ্কৃত ইঁট ও বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গলকোট ঃ মহাস্থান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে চেঙ্গিসপুর গ্রামে মঙ্গলকোট নামক ঢিবিটির অবস্থান। ঢিবিটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৮০.৪১ মিঃ, পূর্ব-পশ্চিমে ২৭.৪৩ মিঃ এবং উচ্চতা ৪.২৬মিঃ। ১৯৮০-৮৩ সালে খনন পরিচালনা করে এ ঢিবিটিকে একটি জমাটবদ্ধ ভিত (পূর্ব-পশ্চিমে ৫.০২ মিঃ × উত্তর-দক্ষিণে ৪.৯২মিঃ) উন্মোচিত করা হয়। ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমিত হয় যে এর উপর একটি কক্ষের অবস্থান ছিল। কক্ষটির অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ১.৫৭ মিঃ × ১.৫৭ মিঃ এবং বহির্ভাগের পরিমাপ ৩.৭৫ মিঃ × ৩.৮৫মিঃ। ভিতটির দক্ষিণে ১.৩৭মিঃ প্রশস্ত এবং ২৪.৩৮মিঃ লম্বা একটি পাকা পথও রয়েছে। শেষোক্তটির ৬০সেমিঃ পূর্ব দিকে অপর আর একটি কক্ষ রয়েছে। এর ভেতরের অংশের পরিমাপ ১.৮২ মিঃ × ১.৮২ মিঃ এবং বাহিরের অংশের পরিমাপ ২.৪৪ মিঃ × ২.৪৪মিঃ। এটা সংলগ্ন পথটির সাথে একটি সংকীর্ণ দেয়াল দিয়ে সংযুক্ত এ অংশে সাংস্কৃতিক জঞ্জালের স্তূপের উপর পোড়ামাটির মূর্তির ভাঙ্গা খণ্ডাংশ এবং আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দেয়ালের অংশ বিশেষ অনাবৃত হয়েছে। পূর্বদিক ব্যতীত অপর তিন দিকে ৬০সেমিঃ দূরত্বে রয়েছে ৮০সেমিঃ চওড়া বেষ্টনী প্রাচীর। পূর্বদিকের উন্মুক্ত অংশে আছে কিছু বর্ণনার অযোগ্য বিচ্ছিন্ন দেয়ালের ভাঙ্গা অংশ। প্রাচীর ঘেরা অংশটির মোট পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ১৫.২৪মিঃ × ১৫.২৪মিঃ। এর দক্ষিণাংশে ছয় ধাপ বিশিষ্ট এবং এ অংশে ১.১৪মিঃ চওড়া একটি সিঁড়িরও অস্তিত্ব রয়েছে।

মঙ্গলকোটে অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষগুলো জড়িয়ে আছে ষোলটি স্তর ও চারটি ভিতের সাথে। এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে পোড়ামাটির অসংখ্য মূর্তির ভগ্নাংশ, অলঙ্কৃত ইঁট ও একটি পাথরের টুকরা। ইমারতগুলো বিভিন্ন আকৃতির ইঁট ও কাদা দিয়ে তৈরি। অধিকাংশ প্রত্নবস্তু এসেছে (৯) ও (১০) স্তরগুলো থেকে। এইস্তর দু'টির নিচে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মেঝের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ফলে অনুমিত হয় যে আলোচ্য ঢিবিতে সম্ভবত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে। এই মন্দিরে একটি নির্মাণ ও একাধিক পুনঃনির্মাণের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে।

মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত মূর্তিগুলো গুপ্ত আমলের অন্তিমপর্বের শৈলীর ধারক। বিষয়বস্তুতে নারীপুরুষ ও পশুপাখি প্রাধান্য বজায় রেখেছে। প্রতিটি নারী বা পুরুষের পেছনে সর্পফণার উপস্থিতি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। এছাড়া এদের প্রায় ডিম্বাকার মুখমণ্ডল, গলায় এক প্রস্ত পুঁতির মালা, আনত চোখ, দেহের সুঠাম গড়ন, সুডৌল নাক প্রভৃতি অনেকাংশে ক্লাসিকাল গুপ্ত আমলের শৈলীর অবক্ষয়জনিত ধারা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই মূর্তিগুলোকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় পাঁচ-ছয় শতকের নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া যায়।

গোকুল মেধ ঃ এই প্রত্নস্থলটি লক্ষিন্দরের মেধ ও বেহুলার বাসরঘর নামেও স্থানীয় জনগণের নিকট পরিচিত। এটা মহাস্থানগড়ের প্রায় তিন কিঃমিঃ দক্ষিণে গোকুল (প্রাচীন গোপগৃহ?) গ্রামে অবস্থিত। ১৯৩৪–৩৬ সালে খনন পরিচালিত হওয়ার ফলে এ প্রত্নস্থলে এমন একটি স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় যার যথার্থ পরিচয় (স্তূপ? মন্দির?) নির্ণয় করা একটি দুরূহ কাজ। স্থাপত্য নিদর্শনটির পাদদেশে একটি ১৩.১০মিঃ উঁচু মঞ্চ রয়েছে। ১৭২টি বিভিন্ন আকৃতির বদ্ধ প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে নির্মিত এ মঞ্চ ক্রমশ উর্দ্ধগামী হয়ে উর্দ্ধদেশে একটি সমতল চাতাল সৃষ্টি করেছে। বদ্ধ প্রকোষ্ঠগুলো পাটকেল ও ঠেসে জমাটকৃত মাটি দিয়ে ভরাটকৃত অবস্থায় অনাবৃত হয়। চাতালের উপর দু'টি মূল নির্মাণ সময়কাল ও দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনায় নির্মিত স্থাপত্যিক কার্যাবলির চিহ্ন শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রাচীনতমটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত নবীনটির নিচে চাপা পড়ে আছে বিধায় প্রথম নির্মাণ সম্পূর্ণ নির্মাণ সময়কালের পরিকল্পনা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কেবল এটুকু অনুমেয় যে বিলুপ্ত ইমারতটি পশ্চিম দিক থেকে যাতায়াত যোগ্য ছিল। দ্বিতীয় (উপরাংশের) নির্মাণ সময়কালের কীর্তিটি একটি পশ্চিমমুখী

আলোকচিত্র–৩২



সাধারণ দৃশ্য গোকুল মেধ, গোকুল, বগুড়া

বারান্দা সমেত একটি আয়তাকার কক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরমধ্যে একটি পুনঃনির্মাণ সময়কালের অস্তিত্বও রয়েছে। পুনঃনির্মাণ সময়কালের মূল দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে মেঝের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবে অত্যধিক ভগ্ন অবস্থার কারণে উচ্চতার পরিমাপ নির্ণিত হয় নি। মেঝের মাটি অপসৃত হওয়ার পর এর মধ্যবর্তী স্থান থেকে একটি সংকীর্ণ নিভৃত কক্ষের কাঠামো বেরিয়ে পড়ে এবং দেখা যায়, এরমধ্যে একটি নরকঙ্কাল, একটি ইটে বাঁধান ছোট্ট ফোঁকর ও একটি পাথর পট্ট সঞ্চিত ছিল। পাথর পট্টটির উপরের পৃষ্ঠদেশে চারটি ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র বেষ্টিত একটি সামান্য বড় আকৃতির ছিদ্র উৎকীর্ণ রয়েছে। মধ্যবর্তী বড় ছিদ্রটিতে একটি সোনার পাতা সঞ্চিত ছিল। সোনার পাতাটিতে একটি অর্ধশয়ান ভঙ্গির ষাঁড় উৎকীর্ণ ছিল। এছাড়া কিছু পোড়ামাটির ফলকও আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত নিদর্শনাদির শৈলীর আলোকে প্রথম নির্মাণ আমল খ্রিস্টীয় পাঁচ-ছয় শতকে এবং দ্বিতীয় নির্মাণ আমল খ্রিস্টীয় এগার বার শতকের বলে অনুমিত হয়েছে।

পাহাড়পুর ঃ বৃটিশ শাসনামলে সবচেয়ে ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী খনন পরিচালিত হয়েছিল নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার অন্তর্গত পাহাড়পুর বিহারে। মাঝখানে সামান্য বিরতি ব্যতীত ১৯২৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত খননের ফলে এ প্রত্নস্থলে এমন একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছিল যেটা একক ইমারত হিসাবে হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বড় বড় প্রাচীন বিহার গুলোর মধ্যে অন্যতম স্থানের দাবিদার। এর প্রকৃত নাম সোমপুর (চাঁদের লোকালয়) মহাবিহার। উত্তরমুখী এই চতুষ্কোণাকার ইমারতের পরিমাপ ২৮০.৫ মিঃ × ২৮০মিঃ। এর চারটি বাহুর প্রতিটি পেছন থেকে সামনের দিকে যথাক্রমে সীমানা প্রাচীর, সারিবদ্ধ ভিক্ষুকক্ষ ও টানাবারান্দা (২.৫মিঃ প্রশস্ত) দিয়ে গঠিত। ভিক্ষুকক্ষের মোট সংখ্যা একশ সাতাত্তর। পূর্ববাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মূলবাহু থেকে বাইরের দিকে উদ্গত একটি থাম সংবলিত কক্ষ (১৪.৮১মিঃ × ১২.২৪মিঃ) এবং দুই দিকে কয়েকটি সংলগ্ন কক্ষ সমেত একটি প্রবেশ তোরণ রয়েছে। এছাড়া উত্তর-পূর্ব কোণের পশ্চিমে কক্ষ নং- ১৫ এবং ১৬ এর মাঝখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের আরও একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। আরও স্বল্প পরিসরের অপর একটি যাতায়াতযোগ্য গলিপথ রয়েছে উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে দক্ষিণে অবস্থিত কক্ষ নং-৪২ এবং ৪৩ এর মধ্যবর্তী স্থানে।

পাহাড়পুর বিহারের উত্তর বাহু ব্যতীত অপর তিনটি বাহুর প্রতিটির মধ্যস্থলে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময় এবং সামান্য প্রলম্বিত স্থাপত্যিক কাঠামো আছে। এগুলো সম্ভবত প্রাত্যহিক পূজাদি সমাপনের মণ্ডপ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অপরদিকে দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী পূজামণ্ডপটির অদূরবর্তী পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি প্রলম্বিত বাহু (৪.৮৭ মিঃ প্রশস্ত) দক্ষিণ দিকে বিহারের বাইরে ২৮ মিঃ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা অপর একটি বাহুর সাথে মিলিত হয়েছে। ৭.৬০মিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট এবং ৩০.৫০মিঃ লম্বা এই অংশে একসারি শৌচাগারের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। অপরদিকে বিহারটির মধ্যবর্তী উন্মুক্ত চত্বরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি সুউচ্চ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

পাহাড়পুর বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরটি একটি বহুকোণ বিশিষ্ট ক্রশাকার পরিকল্পনার

ভিত্তিমূলের উপর তিনটি ক্রমহ্রস্বমান ধাপে উর্দ্ধে ধাবমান এবং চতুর্মুখী (সর্বোতভদ্র) পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল। এর ছাদ এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এ অংশের বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চতা আজ আর বোধগম্য নয়। তবে তৃতীয় ধাপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একাংশে আজও অত্যন্ত অলঙ্কৃত কার্নিশের সামান্য অংশ টিকে আছে। এ অংশ থেকে বর্তমানে অক্ষত মন্দিরের চূড়া প্রায় ৪মিঃ উঁচু। তাই অনুমান করা যায়, মন্দিরটির চূড়ায় সম্ভবত একটি সুউচ্চ শিখর ছিল। অপর দিকে এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি বদ্ধ কুঠুরি। শিরোদেশ থেকে মেঝে পর্যন্ত ফাঁকা এই চতুষ্কোণাকার বদ্ধ কুঠুরির চারদিকের প্রতিটি বাহু ঠেস দিয়ে একটি করে বহির্কক্ষ (মণ্ডপ) সংবলিত আভ্যন্তরীণ কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। কক্ষগুলোর মধ্যে স্তম্ভকাণ্ড ও ভিত এমনভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে যা থেকে সহজেই অনুমিত হয় মূলনির্মাণ সময়কালে কক্ষগুলোর ছাদ পাথরের থামের উপর ন্যস্ত ছিল।

চার ধাপে উর্দ্ধমুখী উল্লিখিত মন্দিরের প্রতিটি ধাপের চার পাশে ছিল ঘূর্ণায়মান পথ। সবচেয়ে নিচের ধাপটির ঘূর্ণায়মান পথের পাশ দিয়ে মন্দিরের ভিত্তি-পরিকল্পনার সমান্তরালে ধাবিত সীমানা প্রাচীরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে এ প্রাচীর এবং মন্দিরের জগতি অংশ বর্তমানে মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। জগতির এ অংশে সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে তেষট্টিটি কুলঙ্গি ছিল। প্রতিটি কুলঙ্গিতে একটি করে পাথরের মূর্তি ছিল। বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবী এবং মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য এসব মূর্তিতে স্থান পেয়েছে। শিল্পশৈলী অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে কয়েকটি গুপ্ত-পাল-অন্তবর্তী আমলের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। এছাড়া প্রতিটি ধাপের কার্নিশ অত্যন্ত অলঙ্কৃত এবং এদের নিচে আনুভূমিক ভাবে এক বা দুই সারি পোড়ামাটির ফলক সজ্জিত রয়েছে। এসব ফলকে লোকায়ত দৃশ্য ধর্মীয় মাঙ্গলিক চিহ্নাদি, দেবদেবী, উপদেবদেবী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু স্থান পেয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে আরও অনুমিত হয় যে পূর্বদিক থেকে এ মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য প্রথম নির্মাণ সময়কালে সুপ্রশস্ত সিঁড়িপথ ছিল।

পাহাড়পুর বিহারের উন্মুক্ত চত্বরে কেন্দ্রীয় মন্দির ব্যতীত আরও রয়েছে ভোজনশালা, রান্নাঘর, নিবেদন স্তূপ, কূপ, কেন্দ্রীয় মন্দিরের অনুকৃতি, প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদি। তবে এগুলো অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বিহার অঙ্গনের পূর্বঅর্ধাংশে ছড়িয়ে আছে। তাই এগুলোকে একই সময়ে নির্মিত বলে ধরে নেওয়া যায় না। তাছাড়া এগুলোর অধিকাংশই এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এদের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। খনন কাজের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে মুদ্রা, রাজকীয় গুপ্ত আমলের একটি তাম্রশাসন (৪৭৮ খ্রিঃ), অসংখ্য মৃৎপাত্র, উপরত্ন পাথরের পুঁতি, সীলমোহর, সীলছাপ এবং আরও বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসবের সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একাধিক মেঝের অস্তিত্ব থেকে নিচের সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

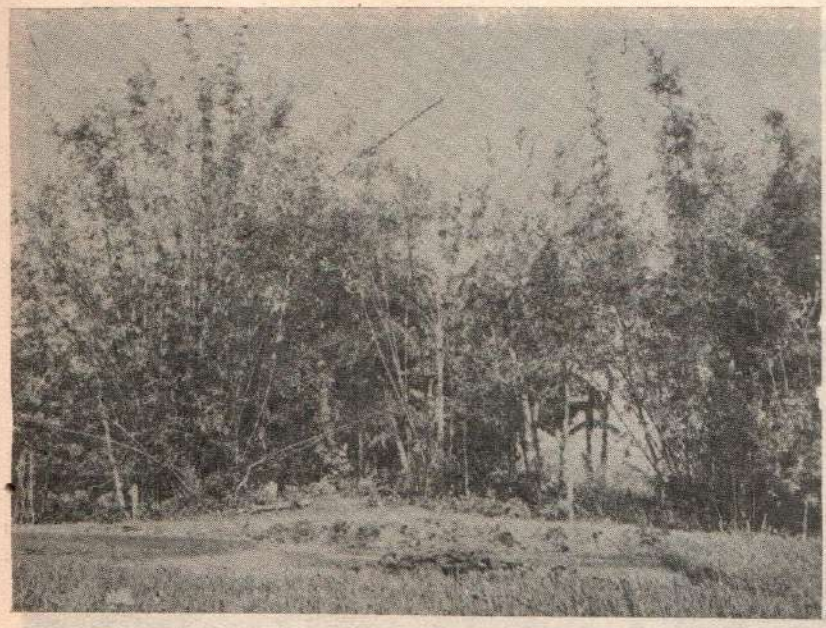
বিহারটি পাল বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রিঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু দশম শতকের দ্বিতীয় অর্ধাংশ থেকে পাল রাজাগণ বার বার বৈদেশিক আক্রমণের শিকার

হয়। এসব আক্রমণকারীদের মধ্যে মধ্যভারতীয় প্রতিহার রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৮২–৯২৩ খ্রিঃ) এবং বিক্রমপুরের (মুন্সিগঞ্জের) বর্মন রাজাদের (আঃ ১০৮০–১১৫০ খ্রিঃ) উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব আক্রমণের ফলে উত্তরোত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারে তাই বার বার পুনঃনির্মাণ কাজ পরিচালনা করতে হয়েছিল। বিহারের বিভিন্ন অংশে আজও এসব পুনঃনির্মাণের চিহ্ন অক্ষত রয়েছে। অপরদিকে বিহারের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলে জারিকৃত ফলকটিতে একটি জৈন বিহারের অবস্থানের উল্লেখ ছিল। তাছাড়া এ মন্দিরে গুপ্ত পরবর্তী আমলের কিছু মূর্তিও পাওয়া গেছে। এর ফলে ধারণা করা যায় যে ধর্মপাল নির্মিত এ বিহারের তলদেশে অথবা সংলগ্ন অঞ্চলের কোথাও একটি জৈন বিহারের অস্তিত্ব ছিল।

উপরোক্ত নির্দেশনাকে সম্মুখে রেখে এবং এর স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৮০–৮১ এবং ১৯৮১–৮২ সালে পাহাড়পুরে পুনরায় খনন পরিচালনা করা হয়। ১৯৮০–৮১ সালের খননের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৯৯৩ সালে চাকুরি হতে অব্যাহতি লাভ করা সত্ত্বেও কোন চূড়ান্ত খনন প্রতিবেদন পেশ করেন নি। তবে তাঁর লিখিত বিভিন্ন পত্র থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় আট–নয় শতকের স্থাপত্য নিদর্শনের নিচে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আমলের স্থাপত্য নিদর্শনের অস্তিত্ব তিনি লক্ষ করেছিলেন। এইসময় একটি ভিক্ষুকক্ষ থেকে একটি ব্রঞ্জ নির্মিত বড় আকারের বৌদ্ধ মূর্তির উপরের অর্ধাংশ (বর্তমান উচ্চতা ১.৩০ মিঃ) অনাবৃত হয়েছিল। শিল্পশৈলী অনুযায়ী এই মূর্তিটি খ্রিস্টীয় নয়–দশ শতকের নিদর্শন। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্রঞ্জ নির্মিত মূর্তি। ১৯৮৫ সালের পূর্বপর্যন্ত বিশ্বাস করা হতো যে মন্দিরের প্রথম নির্মাণ সময়কালে বিহার চত্বরটি দক্ষিণ–পশ্চিম দিক থেকে উত্তর–পূর্ব দিকে ঢালু ছিল। কিন্তু তখন বিহার থেকে বাইরে পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বিহারের উদ্বৃত্ত জল কেন্দ্রীয় মন্দির ও প্রধান ফটকের মধ্যবর্তী একটি জলাশয়ে সঞ্চিত হতো। কিন্তু ১৯৮৫ সালে এ অংশে খনন পরিচালনা করার ফলে জলাশয়টি পরবর্তীকালে খনিত গর্ত বলে প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আশির দশক উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই জলাশয়টি ভরাট করে ফেলা হয়।

১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিহারের উন্মুক্ত চত্বরে জঞ্জাল অপসারণের উদ্দেশ্যে পর পর তিন বছর খনন পরিচালিত হয়। এরমধ্যে ১৯৯০ সালের খনন চলাকালীন সময়ে কয়েকটি নতুন স্থাপত্যিক কাঠামো অনাবৃত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে প্রধান মন্দিরের একটি অনুকৃতি, একটি নিবেদন স্তূপ, দু'টি কূপ, কিছু দেয়ালের অংশ ইত্যাদি। ইটের আকৃতি ও স্তরবিন্যাস অনুযায়ী এগুলো খ্রিস্টীয় নয় শতকের (প্রথম পুণঃনির্মাণ সময়কালে) নিদর্শন বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য খননের সময় প্রচুর প্রত্নবস্তুরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে একটি কালো পাথরের থালা, একটি লোহার বর্শা ফলক, পোড়ামাটির মুখোশ, কর্ণেলিয়ান ও এগেট পাথরে তৈরি পুঁতি, ধাতুর তৈরি নিবেদন প্রকৃতির শিবলিঙ্গ, বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্নাংশ, শাক্ত–যন্ত্রের খণ্ডাংশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আলোকচিত্র-৩৩



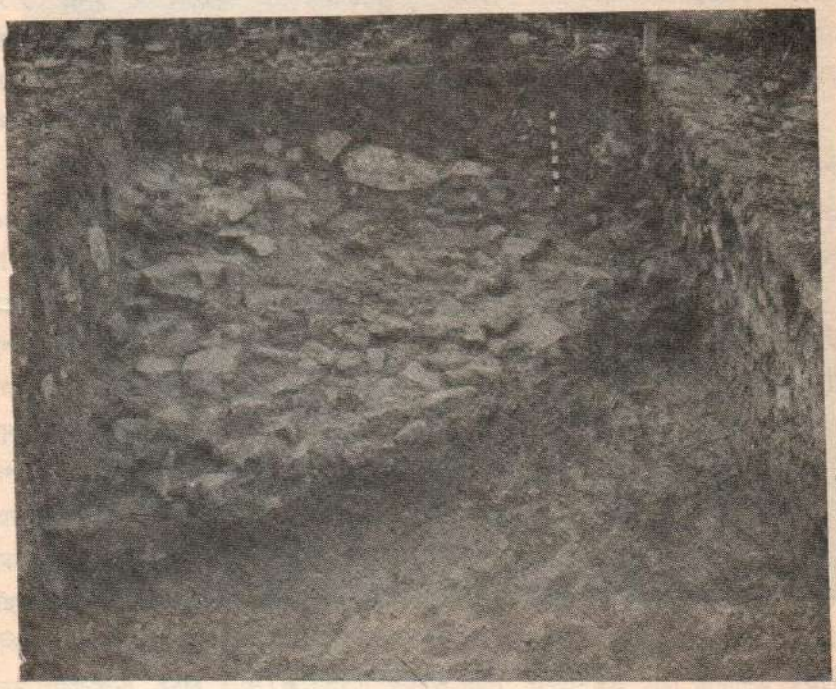
গোয়ালভিটা (পাহাড়পুর) ঢিবির সাধারণ দৃশ্য

এবার পাহাড়পুর বিহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বিহারের প্রধান প্রবেশ তোরণ থেকে মাত্র ১০০মি: উত্তরে গোয়ালভিটা গ্রামের জব্বার মিয়ার বাড়িতে অবস্থিত একটি অনুচ্চ ঢিবিতে ১৯৮৪ সালে লেখক ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি পরীক্ষামূলক খাদ স্থাপন করে প্রায় ১ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন পরিচালনা করেছিলেন। ফলে আঠার শতকে প্রচলিত শৈলীর কিছু অলঙ্কৃত ইঁট অনাবৃত হয়। এসব ফলকে লতাপাতার নকশা অঙ্কিত ছিল।[৩৯] এরপর আসে সন্ধাবতীর ঘাটের প্রসঙ্গ। এটি বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে প্রায় ৪৯মি: দক্ষিণে অবস্থিত। মাঝারি আকারের পাথরপট্ট বিছিয়ে এটি মেঝের আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে ভূপৃষ্ঠ থেকে এ মেঝে ভূমির নিচদিকে ১৫.৫০মি: গভীরতা পর্যন্ত ঢালুভাবে নেমে গেছে। ফলে এটি সহজেই জলাশয় সংলগ্ন একটি ঘাট বলে অনুমিত হয়। তবে বিহারের সাথে এর প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের মতো কোন তথ্য এযাবৎ গবেষকগণের সন্ধানে আসে

৩৯. ঢিবিটি স্থানীয় জনগণের নিকট গোয়ালভিটার বা পাগলার ঢিবি নামে পরিচিত। এখান থেকে সংগৃহীত ফলকগুলো পাহাড়পুর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

নি। 'সন্ধ্যাবতীর ঘাট' থেকে ১২.২০ মি: পশ্চিমে একটি পূর্বমুখী ক্ষুদ্রাকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আলোকচিত্র–৩৪



গোয়ালভিটায় অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ, ১৯৮৪ সালে ধারণকৃত

আয়তাকার (৬.৭০মি: × ৩.৩৫ মি:) ভূমি–পরিকল্পনায় নির্মিত এ ইমারতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি গোলাকার মঞ্চের নিম্নাংশ এবং পশ্চিমের দেয়াল বাইরের দিকে বর্গাকারে বর্ধিত একটি অংশ রয়েছে। কক্ষের ভেতরে দেয়ালের বহিরাবরণের কোন কোন স্থানে পূর্ণ–প্রস্ফুটিত পুষ্প মোটিফ রয়েছে। একাধিক পাপড়ির সারি সংবলিত এ পুষ্প ইন্দো–মুসলিম অলঙ্করণ শৈলীর ধারাবাহক। তবে এ ইমারতের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মতো কোন উপাদান এযাবৎ পাওয়া যায় নি। স্থানীয় জনগণের নিকট এই ধ্বংসাবশেষটি 'গন্ধেশ্বরীর মন্দির' নামে পরিচিত। এ দু'টি ইমারত নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

প্রচলিত কিংবদন্তিটির মূল চরিত্র সন্ধ্যাবতী নামের এক রাজকন্যা। তার পিতার নাম মহিদলন রাজা। ঘাটের সামনে ছিল নুরনদী। রাজকন্যা প্রতিদিন এ ঘাটে স্নান সমাপন শেষে সংলগ্ন ইমারতটিতে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করতেন। এ সময় ফুল দিয়ে তার ওজন নেওয়া হতো। একদিন ওজন গ্রহণ শেষে দেখা গেল, রাজকন্যার দেহের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি

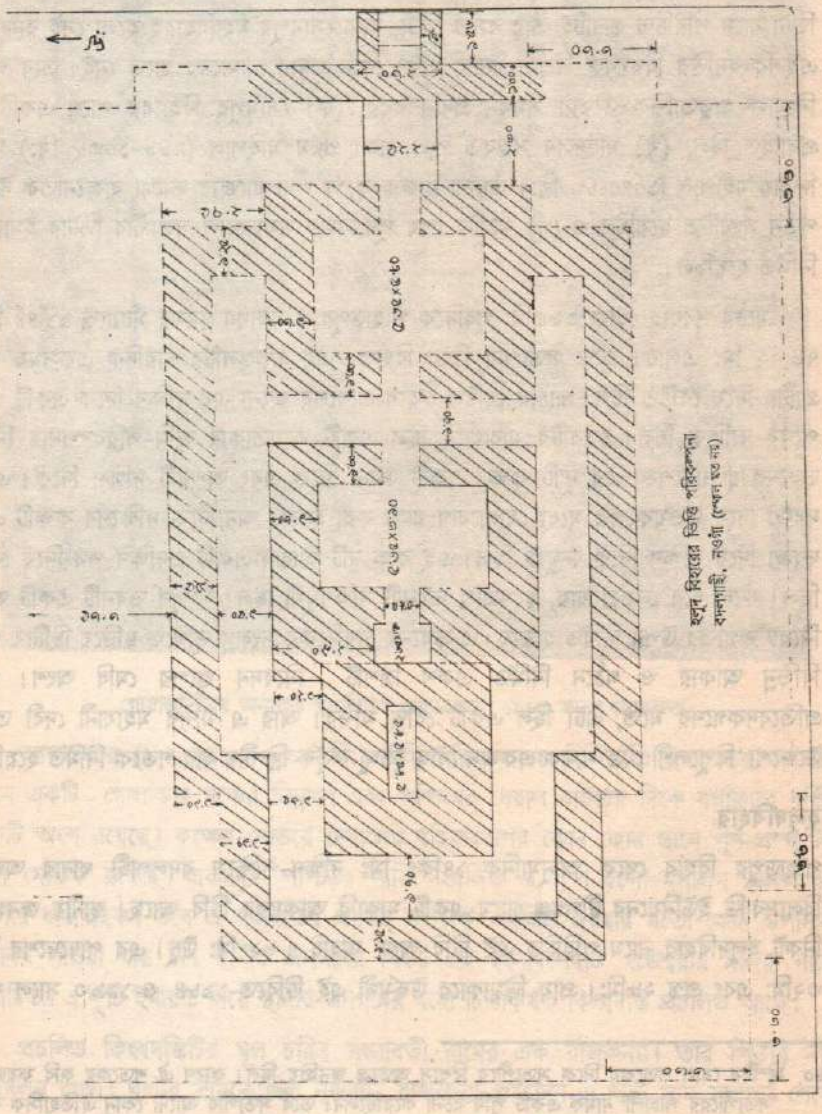
পেয়েছে। অনুসন্ধান শেষে জানা গেল, কুমারী রাজকন্যা গর্ভবতী হয়েছেন। ফলে রাজকন্যাকে রাজা বনবাসে প্রেরণ করলেন। বনবাসে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যাকে মুসলমানগণ 'সত্যপীর' এবং হিন্দুগণ 'সত্যনারায়ণ' নামে সম্মান প্রদর্শন করতেন।[৪০] সত্যপীরের জীবনের শেষদিকে রাজা মহিদলনের রাজ্য ও রাজবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। তখন সত্যপীর নদীর পূর্ব তীরে রাজবাড়ির অনতিদূরে এসে বসবাস শুরু করেন। স্থানীয় জনগণের মতে, বর্তমানে সত্যপীর ভিটা নামে পরিচিত স্থানটিই তাঁর বসত ভিটা, আর সোমপুর মহাবিহারই হলো সেই রাজবাড়ি। এই কিংবদন্তির বিষয়বস্তু বিশ্বাস করার মতো কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে গল্পটি নিম্নোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের সমর্থন প্রদান করে, (ক) সোমপুর বিহারের পাশে একটি নদী প্রবাহিত ছিল, (খ) মহিদলন সম্ভবত পাল রাজা প্রথম মহিপাল (৯৮৮–১০৩৮ খ্রি:) অথবা দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০–৮০ খ্রি:) তাঁদের রাজত্ব কালে পাল রাজ্যের ভাগ্যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন সংঘটিত হয়েছিল ও (গ) মঠটির শেষ পুণ:নির্মাণ সময়কালে সত্যপীর ভিটার ইমারতটি নির্মিত হয়েছিল।

মঠের পূর্ববাহু থেকে ৩৬৫মি: পূর্বদিকে পাহাড়পুর ও মালঞ্চা গ্রামের সীমান্তে ৯১.৪৪ মিঃ × ৭৬.০২ মিঃ এলাকা জুড়ে সত্যপীর ভিটা বিস্তৃত। এই প্রত্নস্থলটির চারদিক একসময় ইটের প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরে প্রবেশের জন্যে এর দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথের অস্তিত্ব ছিল। চত্বরটির মাঝখানে ছিল একটি আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনায় নির্মিত ভবনের ধ্বংসাবশেষ। এর দু'টি কক্ষ। একটি উত্তর দিকে এবং অপরটি দক্ষিণ দিকে। একটি দরজা দিয়ে উভয়কক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। অন্যদিকে দক্ষিণের কক্ষটি একটি দরজা দিয়ে দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত ছিল। এই কক্ষ দুটি আবার একটি প্রদক্ষিণ পথ দিয়ে বেষ্টিত ছিল। ফলে ধরে নেওয়া যায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনটি দক্ষিণমুখী ছিল। সম্পূর্ণ ভবনটি একটি অনুচ্চ নিরেট জগতির উপর নির্মিত হয়েছে। এ ভবনের চারদিকের সংলগ্ন ভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন আকার ও গঠনে নির্মিত একশ ত্রিশটি নিবেদন স্তূপের মেধি অংশ। খনন প্রতিবেদকগণের মতে, এটা ছিল একটি বৌদ্ধ মন্দির। আর এ মন্দির মহাযানী দেবী তারার উদ্দেশ্যে 'বিপুলেশ্রী মিত্র' নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক খ্রিস্টীয় বার শতকে নির্মিত হয়েছিল।

হলুদবিহার

পাহাড়পুর বিহার থেকে আনুমানিক ১৪কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে বদলগাছী থানার অন্তর্গত বিলাসবাড়ি ইউনিয়নের দ্বীপগঞ্জ গ্রামে একটি মাঝারি আকারের ঢিবি আছে। স্থানীয় জনগণের নিকট হলুদবিহার নামে পরিচিত এই ঢিবি আজ অবধি ৭.৬২ মি: উঁচু। এর পাদদেশের দৈর্ঘ্য ৩২মি: এবং প্রস্থ ২৮মি:। প্রায় ডিম্বাকারে উর্দ্ধমুখী এই ঢিবিতে ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে খনন

৪০. খ্রিস্টীয় ষোল শতকের দিকে সত্যপীরে বিশ্বাস অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কারণ ঐ শতকের কবি ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীরের পাঁচালী' নামক একটি পুঁথি রচনা করেছিলেন। তবে সত্যপীর আদৌ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি-না এ বিষয়ে আজও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি।



রেখাচিত্র – ৪০

পরিচালিত হয়েছিল। খননে অনাবৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয়, ঢিবিটির মধ্যবর্তী স্থানে ৫.৮০মি: × ৫.৮০ মি: পরিমাপের একটি বর্গাকার নিরেট অংশকে ঠেস দিয়ে প্রথম ২.৬২মি: × ১.৬২মি: পরিমাপের একটি অভ্যন্তরীণ কক্ষ এবং এর সম্মুখবর্তী স্থানে ৫.৫৫ মি: × ৩.২৫মি: পরিমাপের একটি মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল। এদের সম্মুখভাগে একটি উনিশ ধাপ যুক্ত সিঁড়িপথ রয়েছে। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ ১.১৫মি: লম্বা, ২৫সেমি: চওড়া এবং ২২ সেমি: খাড়া। এই সিঁড়িপথ দিয়ে ইমারতটির মেঝেতে আরোহণ করা যেত। নিরেট কাঠামো থেকে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশে ১১.৭০ মি: দূরত্বে ২.৪০মি: থেকে ৩.৪০ মিঃ চওড়া বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। অপর দিকে নিরেট কাঠামো এং পূর্বদিকস্থ অভ্যন্তরীণ কক্ষ, সম্মুখবর্তী মণ্ডপ ও সিঁড়িপথের চারপাশ ১.৭০ মি: চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কক্ষগুলো এবং প্রদক্ষিণপথের কোন কোন স্থানে অদ্যাবধি জমাটবদ্ধ মেঝে অক্ষত রয়েছে।

পূর্বমুখী এ ইমারতের পূর্বপাশে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত দেয়ালের অংশবিশেষ, মেঝে ও খোলা চত্বর উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু এসব দেয়ালের সাথে মূল ইমারতটির কি সম্পর্ক তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। অপরদিকে, নিরেট কাঠামোটির উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশে পূর্বদিকের মত একই বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল কি–না তা দেখার উদ্দেশ্যে খনন কাজ আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

রাজবাড়ি ঃ ১৯৯৬ সালে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানার জগদল মৌজায় অবস্থিত 'রাজবাড়ি' নামক ঢিবিতেও খনন পরিচালিত হয়েছে। খননে আবিষ্কৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমিত হয়, এ প্রত্নস্থলে একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। ইটের আকৃতি, গাঁথুনির ধরণ ও সাথি প্রত্নবস্তুগুলোর ধরন ও শৈলী অনুযায়ী এ প্রত্নস্থলের স্থাপত্যিক কীর্তিটির সময়কাল খ্রিস্টীয় এগার–বার শতকে ন্যস্ত করা যায়। এ প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে সোনার টুকরা, মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত ইঁট ও একটি কালো পাথরের মস্তকবিহীন মূর্তি অন্যতম। স্ফীতোদর এ মূর্তি সম্ভবত জম্ভল মূর্তির নিদর্শন।

আরও বহুসংখ্যক খননযোগ্য প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে। এসব প্রত্নস্থলে খনন পরিচালনা করে নিয়মিত খননের ফলাফল প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হলে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গবেষকগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণে সক্ষম হবেন। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে ইতিপূর্বে সম্পাদিত অধিকাংশ খনন প্রতিবেদন এ যাবৎ সরকারি নথিপত্রের লাল ফিতার অনমনীয় বাঁধন মুক্ত হতে সক্ষম হয় নি। ফলে খননের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে ইতিহাস–ঐতিহ্য। অথচ প্রত্নতত্ত্বের ভাষায় প্রকাশনা বিহীন খনন ধ্বংসের নামান্তর।

৮

বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ভবিষ্যত

অতীত মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল নিদর্শনই প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার মূল উপাত্ত। আর এসব নিদর্শনের সন্ধান মূলত এমন স্থানে পাওয়া যায় যে স্থানে মানুষ কখনও না কখনও বসবাস করেছে। কিন্তু বসতি স্থাপনের জন্য মানুষ সে স্থানটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে যেখানে জীবন ধারণের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করে। কারণ পরিবেশ থেকেই মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ করে। সুতরাং প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে পরিবেশ-প্রকৃতির পর্যালোচনা প্রাথমিক উৎসের ভূমিকা পালন করে থাকে। এমতাবস্থায় 'বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার ভবিষ্যত' সম্পর্কিত আলোচনাকে সুস্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজনে প্রথমে এদেশের পরিবেশ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

পরিবেশ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম (রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুরের কিয়দংশ), উত্তরাংশ (ঢাকার উত্তরাংশের সাভার, মধুপুর, ভাওয়াল ও গাজিপুর) এবং কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই টিলা অধ্যুষিত এলাকাগুলো শক্ত আঁঠাল গড়নের গৈরিক রঙের প্রাচীন পলল দিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলগুলো সম্ভবত চতুর্থ (সর্বশেষ) হিমালয়ান ওরগেনসি (Himalayan Orgency) সময়কালে সৃষ্ট।[৪১] এর মাটি প্লেইস্টোসিন ইপোকের পুরাতন পললের বৈশিষ্ট্যময়। ফলে আংশিক অনুর্বর। দেশের অপরাপর অংশ থেকে এ এলাকাটির ভূপৃষ্ঠও বেশ উঁচু এবং বন্যামুক্ত। এছাড়া এ অংশে নদ-নদীর সংখ্যাও কম। দেশের অবশিষ্ট অংশ হলসিন সাব-ইপোকের কোমল প্রকৃতির ধূসর অথবা সাদাটে ধূসর রঙের নব্যসৃষ্ট পলি অথবা দোঁআশ মাটি দিয়ে ঢাকা এবং প্লাবন ভূমির আওতাভুক্ত। আবার এ অংশে নদ-নদীর সংখ্যাও বেশি। বিশেষ করে বরিশালের পূর্বাংশে কার্বন ফরটিন ডেটিং পরিচালনা করে দেখা গেছে, ঐ অঞ্চলের ভূমি বড়জোর ৩০০ বছরের প্রাচীন। এছাড়া ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রেনেল (Rennell), ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এবং ১৯৭৯ সালে স্পার্সো (SPARRSO) কর্তৃক প্রণীত মানচিত্রগুলো থেকে দেখা যায়, কেবল

৪১. M. Abu Bakar Records of the Geological Survey of Bangladesh, Vol. 1., Part II, Dhaka, 1977 P. 54

বিগত দুই শতক ধরে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বদ্বীপটির সীমা-পরিসীমাই নানাভাবে সংকুচিত ও পরিবর্ধিত হয় নি[৪২] বরং নদীর গতি-প্রকৃতিও অনবরত পরিবর্তিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপট এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সুদূর অতীত থেকে জন-বসতি গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল।

আলোচনাধীন ভূখণ্ডটি কর্কটীয় ক্রান্তিবৃত্তে (Tropic of cancer) অবস্থিত হওয়ায় এর আবহাওয়া অনেকাংশে গ্রীস্মমণ্ডলীয় ভাবাপন্ন। বর্ষা মৌসুমে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার ১.৫২ মিঃ থেকে ৫মিঃ। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে বছরের অন্যান্য সময়েও কদাচিৎ কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হয়। ফলে এদেশে ফুল, ফল, পাখি ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সুলভ। তাছাড়া অসংখ্য নদী ও খাল যাতায়াত ব্যবস্থাকে একদিকে যেমন সুগম করে রেখেছে অন্যদিকে আঞ্চলিক অভিব্যক্তি স্ফুরণের প্রেরণাকেও সঙ্গোপনে লালন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে গুহা সংবলিত পাহাড়, শিকারের অনুকূল পরিবেশ, পাথর ও ধাতু দুর্লভ। তবে লালমাই-ময়নামতি টিলা শ্রেণীর ঢালে পাথরের বিকল্প হিসাবে প্রচুর পরিমাণ প্রস্তরীভূত কাঠ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি বিকাশের যেটুকু অবকাশ দেখা যায় তা যথেষ্ট বিবেচিত না হলেও একেবারে অপর্যাপ্ত বলা যায় না। অপরদিকে এদেশের মাটি যেহেতু নমনীয়, নদীও সংখ্যায় অনেক এবং প্রান্তরগুলো শস্য-শ্যামল ; সেহেতু কৃষিপদ্ধতি উদ্ভাবনের পর থেকেই এদেশে সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল এ সম্ভাবনা অধিকতর বিবেচ্য বলে গণ্য হতে পারে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ইতিহাসের বহুপর্যায় ও পর্ব আজও আমাদের অজানা। বিশেষ করে গোটা পুরা ঐতিহাসিক যুগটাই অজ্ঞাত-অপরিজ্ঞাত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও আদি ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে যতটুকু অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে তারমধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে পাটালিপুত্রের মৌর্যদের (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ৩২০-১৮৫ অব্দ) রাজ্যবিস্তার ও পতন, শুঙ্গ শাসনামল (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ - ৭২ অব্দ), কাহ্নব আধিপত্য (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ৭২-৩৫ অব্দ), কুশান (আঃ খ্রিস্টীয় ১ম-৩য় শতক) এবং গুপ্তদের (আঃ ৩১৯-৫৭৮ খ্রিঃ) উত্থানসহ পতনের পর্বগুলো অন্যতম। পরবর্তী আলোচনায় অবশ্য দেখা যাবে, বাংলাদেশে এসব শাসনামলের বেশ কিছু প্রত্ননিদর্শন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিস্কৃত হয়েছে। কিন্তু এসব রাজবংশগুলোর রাজত্বকালের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি আজও অসমাপ্ত রয়েছে। পরবর্তী অংশে এ যাবৎ প্রাপ্ত সূত্রগুলোর উপর নির্ভর করে যেটুকু তথ্য সন্নিবেশিত করা যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হলো।

---

৪২. Mohammad Abdur Rob, 'Gift of the Bay : Changing Morphology of the costal region of the Ganges Delta', The Independent, 20-12-96, P. 10-15.

প্রাগৈতিহাসিক যুগ ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাতিয়ার ১৮৮৬ সাল থেকে চট্টগ্রামের সিতাকুণ্ড ও রাঙ্গামাটি, কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি টিলা শ্রেণী এবং ফেনির ছাগলনাইয়া থানার আমজাধাতা ইউনিয়নে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে দু'চারটি পাথরের তৈরি হলেও অধিকাংশই প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি। কোন কোনটি প্রাচীন পাথর পর্যায়, আবার অন্যগুলো নব্যপাথর পর্যায়ের নমুনা-প্রযুক্তিবিদ্যার ছাপ বহন করছে। এদের মধ্যে একটি নিদর্শন বর্তমানে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও কয়েকটি বৃটিশ মিউজিয়াম এবং একটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। অবশিষ্ট নিদর্শনগুলো কোথায় কিভাবে আছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। ছাগলনাইয়ায় প্রাপ্ত নিদর্শনটি স্ক্রেপার (হাতকুঠার?) এবং সিতাকুণ্ডে পাওয়া একটি নিদর্শন সেল্ট (celt) হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলো ছাড়াও কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি টিলা শ্রেণীর ঢালে সত্তরের দশকে খ্রিস্টীয় আট-দশ শতকের স্তরের সান্নিধ্যে প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি কয়েকটি নব্যপাথর পর্যায়ের হাতিয়ার আনন্দ বাজার বাড়ি নামক ঢিবি খননকালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। অপরদিকে ছাগলনাইয়ার নিদর্শনটির প্রাপ্তিস্থলে অনুসন্ধান চালিয়ে কেবল খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকের কিছু সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফলে এসব প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে সর্বজন স্বীকৃত কোন সিদ্ধান্ত প্রদান আপাতত সম্ভব নয়। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আশির দশকে লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে সীমিতাকারের অনুসন্ধান পরিচালিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু প্রলুব্ধকর তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

লালমাই টিলা শ্রেণীতে অবস্থিত মোট এগারটি টিলায় এযাবৎ ভূপৃষ্ঠদেশীয় আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এসব হাতিয়ারের মধ্যে ক্লীভার হাতকুঠার, স্ক্রেপার, পরিমার্জনার পুন:ছোঁয়ার চিহ্নময় অন্তস্তল ও ফ্লেইক, বারিন, পয়েন্ট, ব্লেড, ওয়েইস্ট ফ্লেইক, টুকরো করা নুড়ি, দ্বিমুখো স্ক্রেপার, অ্যল, ছুরি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এদের নমুনা প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চ আশলিয় বা উচ্চ-প্রাচীন পাথর পর্বের শৈলী সুস্পষ্ট। আরও উল্লেখ্য যে এগুলোর অধিকাংশই লালমাই টিলা শ্রেণীর উপরাংশে গচ্ছিত ছিল। তাই এদের প্রকৃত পরিচিতি নির্ণয়ের জন্য আরও গভীর অনুশীলন প্রয়োজন। আপাতত কেবল এটুকু ধরে নেওয়া যায় যে বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগ নিয়ে চর্চা করার মতো যথেষ্ট অবকাশ গবেষকগণের জন্য অবারিত রয়েছে।

পুরা-ঐতিহাসিক যুগ : এ যুগটি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কারণ এ যুগের বৈশিষ্ট্যময় কোন মৃৎপাত্র এ যাবৎ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নি। তবে ঢাকা অঞ্চলের নরসিংদি জেলার রায়পুরা থানার ওয়ারিবটেশ্বর নামক গ্রামগুলো এবং সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে ইতিপূর্বে বেশ কয়টি লোহার পিণ্ড ও হাতকুঠার আবিষ্কৃত হয়েছিল। হাতকুঠারগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তদুপরি এ এলাকায় উপরত্ন পাথরের অসংখ্য গুটিকা অহরহ পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এ এলাকা থেকে কিছু সম্ভাবনাময়-খোলামকুচিও আবিষ্কার

করেছে। এসব প্রাপ্তি থেকে বাংলাদেশে পুরা-ঐতিহাসিক যুগের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি ক্ষীণ ইঙ্গিতমাত্র ভেসে উঠে। তাই অচিরেই ওয়ারিবটেশ্বর এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলে গভীর অনুসন্ধান পরিচালনা করে ইঙ্গিতটিকে অর্থবহ করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এই একই ধরনের অপর একটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল মহাস্থানগড়। কারণ মহাস্থানগড়ের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৯৩১ সালে ব্রাহ্মীলিপি সংবলিত একটি রাজাদেশ আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। লিপিতাত্ত্বিক বিবেচনায় উক্ত রাজাদেশটি খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকের নিদর্শন। এছাড়াও মহাস্থানগড়ে ১৯৭৯ সালের দিকে লেখক একটি কালো ও লাল ওয়্যারের খোলামকুচি পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু গভীর খনন পরিচালনা এবং মৃৎপাত্রের গভীর অনুশীলন না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা আপাতত সম্ভব নয়। মহাস্থানগড় সম্পর্কে পূর্বেই কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। তাই পরবর্তী অংশে ওয়ারিবটেশ্বর ও মহাস্থানগড়ের সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলগুলো সম্পর্কে পুনরায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হবে।

ঐতিহাসিক যুগ ঃ বাংলাদেশে কবে এবং কিভাবে প্রথম আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে এ যাবৎ কোন তথ্য আবিষ্কৃত না হলেও ঐতরেয় আরণ্যক ও শতপথ ব্রাহ্মণ্য থেকে জানা গেছে, আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ে এতদঅঞ্চলে অনার্য শ্রেণীর বসবাস ছিল। এরপর মহাকাব্য পর্বের ভাষ্যগুলোতে পুণ্ড্র নামক একটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সবশেষ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে 'পুণ্ড্রনগরী' (পুণ্ড্রদের শহর) নামটির উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য সংস্কৃত বিবরণগুলো থেকে পুণ্ড্র ছাড়াও অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদি নাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে কেবল পুণ্ড্র ও বঙ্গ এ দু'টি নামই বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই ধরে নেওয়া যায়, আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত। অর্থাৎ গোটা বাংলাদেশ একাধিক জনপদে বিভক্ত ছিল। এসব জনপদের মধ্যে একমাত্র পুণ্ড্র জনপদটির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য অবগত হওয়া গেছে।

বর্তমান রাজশাহী বিভাগ ও ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা জুড়ে পুণ্ড্র জনপদ বিস্তৃত ছিল। এর রাজধানীর নাম পুণ্ড্রনগর। রাজধানীটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকে এ জনপদটি পাটালীপুত্রের মৌর্য সম্রাটগণের দ্বারা শাসিত হতো এবং এর রাজধানী পুণ্ড্রনগরে মৌর্যদের একজন মহামাত্যের (প্রাদেশিক গভর্নর) কর্মস্থল স্থাপিত হয়েছিল। এই মহাস্থানগড়ে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত রাজত্বকারী বহু রাজা ও শাসনকর্তাগণের যথেষ্টসংখ্যক প্রত্নবস্তু ও স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলের নওগাঁ জেলার মান্দা থানার ফেটগ্রামে ছাপাঙ্কিত ধাতব মুদ্রা, ধামুরহাট থানার মাহিসন্তোষ থেকে কুশান শাসনামলের মূর্তি এবং বদলগাছি থানার হলুদ বিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট এবং জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার পাথর-ঘাটা থেকে উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ ওয়্যারের খোলামকুচি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই নি:সন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের ইতিহাস চর্চার জন্য বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল একটি আদর্শ ভূখণ্ড।

এছাড়া ঢাকার ওয়ারিবটেশ্বর ও ভৈরববাজারের প্রসঙ্গ তো আছেই। উল্লেখ্য, ভৈরববাজার থেকে ইতিপূর্বে প্রচুর ছাপাঙ্কিত ধাতব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের মাঝামাঝি সময়ে রাজত্বকারী গুপ্ত শাসকদের তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে নাটোরের জগদিশপুর, নওগাঁয়ের পাহাড়পুর বিহার, সান্তাহারের নিকটবর্তী সুলতানগঞ্জ, দিনাজপুরের বৈগ্রাম ও দামোদরপুর এবং কুমিল্লার দেবিদ্বার থানার গুনাইঘরে। এছাড়া এ বংশের সম্রাটের জারিকৃত মুদ্রা গোপালগঞ্জ, যশোর, গোয়ালন্দ এবং ময়নামতিতে পাওয়া গেছে। স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ ও মূর্তি পাওয়া গেছে গোটা রাজশাহী বিভাগ জুড়ে। সুতরাং এটা এক প্রকার নিশ্চিত যে প্রায় গোটা বাংলাদেশ জুড়েই গুপ্ত রাজনৈতিক–সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত পরবর্তী আমলের অনুকৃত গুপ্ত মুদ্রা এবং গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের (আঃ ৬০৬–৬২৫ খ্রিঃ) মুদ্রা ঢাকার সাভার, যশোর এবং ফরিদপুর ও ময়নামতি অঞ্চলে পাওয়া গেছে। তাছাড়া ফরিদপুরের কোটালী পাড়ায় পাওয়া গেছে খ্রিস্টীয় ছয় শতকে রাজত্বকারী গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদের নামে তিনজন সার্বভৌম রাজার পাঁচটি তাম্রশাসন ও স্বর্ণমুদ্রা। এর থেকে সহজেই অনুমিত হয়, গুপ্ত রাজবংশের পতনের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজবংশের উদ্ভব সূচিত হয়েছিল।

সিলেটের বিয়ানিবাজারের অধীন নিধনপুর থেকে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মনের একটি তাম্রফলক আবিষ্কার হতে আরও অনুমিত হয় খ্রিস্টীয় সাত শতকে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল কামরূপ রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তাছাড়া সিলেট সংলগ্ন চট্টগ্রাম বিভাগে একাধিক রাজবংশের উদ্ভব হয়। এসব রাজবংশের মধ্যে খড়্গ (আঃ ৬০০–৭০০ খ্রিঃ), দেব (আঃ ৬৩৫–৬৭৫ খ্রিঃ), রাত (আঃ ৫৯০–৭১০ খ্রিঃ) চন্দ্র (আঃ ৮১০–১০৫০ খ্রিঃ), মরুন্তনাথ ভট্টারক এবং চট্টগ্রামের দামোদর দেবের বংশ, পট্টিকের ও সমতটের পরবর্তী দেববংশ (আঃ খ্রিস্টীয় তের–চৌদ্দ শতক) অন্যতম। এদের তাম্রশাসন ময়নামতি ; নরসিংদির আশ্রাফপুর ; সিলেটের ভাটেরা, কালাপুর ও পশ্চিমবাগ এবং চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। ময়নামতিতে এসব রাজবংশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে। তাই এটা আজ প্রায় স্বীকৃত যে খ্রিস্টীয় সাত শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত হতো। এদের কেহ ছিলেন হিন্দু, আবার কেহ বৌদ্ধ। এদের রাজধানীগুলো ময়নামতি ও মুন্সিগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের ইতিহাস একটু ভিন্নতর।

গুপ্ত পরবর্তী আমলে বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে এক গভীর নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ ঐ সময় গৌড়, কনৌজ ও প্রাগজ্যোতিষে (আসাম) তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন হয়। এরা দীর্ঘ প্রায় এক শতক পারস্পরিক শক্তির প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত ছিল। আর বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল এই তিন রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। স্বভাবতই এ অঞ্চলটি তাদের শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেশময় নেমে আসে ধ্বংসের পালা। এরপর প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে (আঃ ৬৪৭–৭৬৫ খ্রিঃ) পশ্চিমাঞ্চলে মাৎস্যন্যায় (চরম অরাজকতা) আমল অব্যাহত থাকে। সবশেষে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে গোপাল

নামক এক ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্বকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করে। এই গোপালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত বৌদ্ধ পাল বংশ। খ্রিস্টীয় বার শতক পর্যন্ত রাজত্বকারী পালদের প্রভুত্ব পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতে কেন্দ্রিভূত ছিল। ফলে আনুমানিক বার শতকের দিকে বাংলাদেশের পূর্বাংশে বর্মন ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সেন নামে দু'টি হিন্দু রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বর্মনদের রাজত্ব ষাট-সত্তর বছরের (আঃ ১০৮০-১১৫০ খ্রিঃ) বেশি স্থায়ী হয় নি এবং সেনগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। সেনগণ (আঃ ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বিক্রমপুর (মুন্সিগঞ্জ) থেকে নিজেদের শাসন অব্যাহত রেখেছিল। অবশ্য এ দু'টি রাজবংশ বাংলাদেশের গোটা অঞ্চলের উপরই আধিপত্য বজায় রেখেছিল বলে অনুমিত হয়।

সেন রাজাগণ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে পশ্চিমাংশ থেকে মুসলমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শিঘ্রই দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে কুমিল্লা অঞ্চলে পরবর্তী দেব নামে আর একটি বংশের আবির্ভাব ঘটে এবং সম্ভবত এ বংশের রাজা মধুমথন দেব কর্তৃক সেন রাজত্বের অবসান হয়। অতঃপর খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে গোটা বাংলাদেশে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপিত হলে মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়ের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশের মধ্য-ঐতিহাসিক পর্যায়টির মোটামুটি একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেছে, যদিও এ সময়ে রাজত্বকারী সকলের নাম ও বিশদ বিবরণ জানা নেই। এপর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইমারত, শিলালিপি, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু দেশময় আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ পুঁথি-পুস্তকের বিবরণেও এ পর্যায়ের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ পর্যায়ের ধারাবাহিকতাকে যথাক্রমে ১২০৬-১২৮১ খ্রিস্টাব্দ দিল্লীর সেনাধ্যক্ষ বা জায়গিরদারদের শাসনামল, ১২৮১-১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ মুসলিম গভর্নরদের শাসনামল, ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ স্বাধীন সুলতানি আমল, ১৫৩৮-১৫৬০, খ্রিস্টাব্দ সুর শাসনামল, ১৫৬৩-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ আফগান শাসনামল, ১৫৭৬-১৬১২ খ্রিস্টাব্দ বারভূঁইয়া শাসনামল, ১৬১২-১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ, মুগল সুবেদারদের আমল, ১৬৯৫-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ নবাবী আমল ও ১৭৬৫-১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ ব্রিটিশ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল হিসাবে ন্যস্ত করা যায়। এরপর ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সূচিত হয় আধুনিক বা সাম্প্রতিক পর্যায়।

উপরিল্লিখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য বেশ কয়টি সময়কাল বা রাজবংশের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নির্দেশক তথ্য আজও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাতে হলে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমকে আরও জোরালো করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের গোটা ভূখণ্ড জুড়ে এ তৎপরতা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং সীমিত ব্যয় বরাদ্দের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমকে জোরালো করতে হলে প্রথমে নির্বাচন করতে হবে প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল। তাই পরবর্তী অংশে কেবল প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলগুলো সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের প্রয়াস সাধিত হলো।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি সম্প্রতি আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে

বর্তমানে মুন্সিগঞ্জে ২৩টি, বৃহত্তর খুলনায় ১২৭টি, যশোরে ২৫৫টি, বরিশালে ৬০টি, কুষ্টিয়ায় ৭৫টি, রাজশাহীতে ৩৯৮টি, ফরিদপুরে ১৪৩টি, পাবনায় ১০৩টি ও রংপুরে ২০৩টি প্রত্নস্থলের ধ্বংসপ্রায় চিহ্নাদি অবশিষ্ট আছে। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদন গুলো আরও প্রমাণ করে, কেবল বৃহত্তর বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলায় প্রত্নস্থলের সংখ্যা যথাক্রমে ৩০৫ এবং ২০১টি। কিন্তু উল্লিখিত প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আজ আর খনন অথবা সংরক্ষণযোগ্য অবস্থায় নেই। পক্ষান্তরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, উন্নয়ন কার্যক্রম, উদ্ধারকরণ, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক শাখার অনুপস্থিতি, নদীর ভাঙন, সাংস্কৃতিক সম্পদ লুটেরাদের তৎপরতা, ইট অপহরণকারীদের দৌরাত্ম্য, বন্যা, ভূমিধ্বস, অতিবৃষ্টি, উদ্ভিদ গজানো জাতীয় বিপত্তি এবং তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত প্রভাবের কারণে অধিকাংশ প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক সম্পদই বিপন্ন প্রায়। তথাপি প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল বলতে আলোচ্য পুস্তকে কেবল সেসব প্রত্নস্থল বোঝান হলো, যেগুলো অথবা যেগুলোর নিকটবর্তী এলাকা থেকে ইতিপূর্বে ইতিহাস প্রণয়নের উপযোগী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সূত্রাদি আবিষ্কৃত এবং চিহ্নিত হয়েছিল। এ জাতীয় প্রত্নস্থলগুলোকে আবার প্রকৃতিভেদে আরও দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক নিদর্শনসহ প্রত্নস্থল ও অন্তরীণ স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের প্রত্নস্থল।

দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক নিদর্শনসহ প্রত্নস্থল

এ শ্রেণীভুক্ত প্রত্নস্থলগুলোর পরিচিতি প্রায় সুবিদিত। কারণ এসব প্রত্নস্থলগুলোর ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে ইতিমধ্যে বহু পণ্ডিতই তাঁদের গবেষণায় বহুতথ্য উত্থাপন করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন প্রত্নস্থলের বিশেষ বিশেষ বিষয় আজও অজ্ঞাত অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছে। এসব অজ্ঞাত-অপরিজ্ঞাত বিষয়াবলি সম্পর্কে সন্দেহের অবসান হলে আমাদের ইতিহাসের বহু অধ্যায়ে বিরাজমান বহু সমস্যারই সমাধান হওয়া সম্ভব। তাই পরবর্তীঅংশে দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক নিদর্শনসহ প্রত্নস্থলগুলোর স্থানবিবরণ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

ওয়ারী-বটেশ্বর

নরসিংদি জেলা সদর থেকে বাসে চড়ে একাংশ পেরিয়ে এবং পরবর্তীঅংশ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে রায়পুরা থানাধীন ওয়ারী-বটেশ্বরে ও কেন্দুয়ায় পৌছা যায়। প্রায় তিনটি গ্রামের উপর বিস্তৃত এ প্রত্নস্থলের অদূরবর্তী এলাকার উপর দিয়ে মজে যাওয়া প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের আড়িয়ালখা নদীর পরিত্যক্ত খাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এছাড়া এ প্রত্নস্থলের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিপূর্বে কয়েকটি ছোট ও মাঝারি আকারের বিলীয়মান ঢিবিরও অস্তিত্ব ছিল। প্রত্নস্থলটি থেকে নিকট অতীতে প্রচুর পরিমাণ মুদ্রা, উপরত্ন পাথরে তৈরি পুঁতি, লোহার কুঠার, আকরিক লোহার পিণ্ড ইত্যাদি আবিষ্কারের কথা জানা গেছে। বর্তমানেও প্রচুর পরিমাণ প্রায়-মূল্যবান পাথরের গুটিকা হরহামেশা আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রত্নস্থলটির কোথাও কোথাও উপরত্ন পাথরের গুটিকা এবং পাটকেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী এগুলো খ্রিস্টপূর্ব আট-খ্রিস্টীয় দুই শতকের শৈলী বহন করছে।

ওয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে অবস্থিত ছিল। এই নদী সুপ্রাচীন কালে সিল্ক রোডের সংলগ্ন অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। এখানে প্রাপ্ত রূপার তৈরি চৌকো মুদ্রাগুলো লিপিবিহীন এবং এগুলো ছাপাঙ্কিত মুদ্রার পর্যায়ভুক্ত। এ নমুনার মুদ্রার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ছয়-খ্রিস্টীয় দুই শতক। মুদ্রাগুলোতে যেসব চিহ্নের ছাপ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে মাছ, নৌকা ইত্যাদি অন্যতম। প্রাপ্ত মুদ্রার পরিমাণও যথেষ্ট। তাই এ কথা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সুপ্রাচীন কালে ওয়ারী-বটেশ্বরে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দরের অস্তিত্ব ছিল এবং এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম নৌবন্দর।

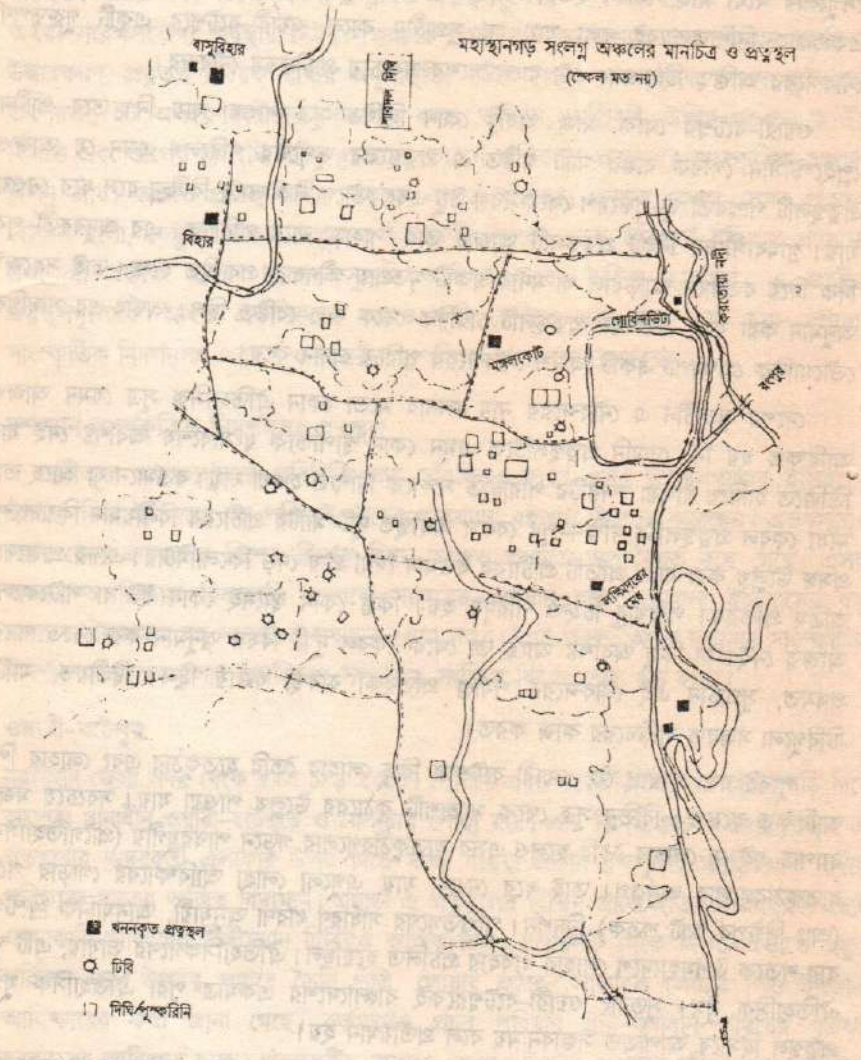
ওয়ারী-বটেশ্বর থেকে আজ অবধি কোন লিখিত সূত্র পাওয়া যায় নি। তবে প্রাচীন প্লেইস্টোসীন গৈরিক রঙের মাটি গঠিত এ প্রত্নস্থলের ভূপৃষ্ঠের পরিলেখ এমন যে আজও প্রত্নস্থলটি পার্শ্ববর্তী ভূ-পৃষ্ঠদেশ থেকে বেশ উঁচু এবং ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন বলে ধরে নেওয়া যায়। গ্রামবাসীদের নিকট প্রত্নস্থলটি আজও তাই 'পাহাড়' নামে পরিচিত। এর অদূরবর্তী পূর্ব দিক দিয়ে বর্তমানে আড়িয়াল খা নদীর একটি মৃতপ্রায় ক্ষীণধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তাই সহজেই অনুমান করা যায়, একসময় প্রত্নস্থলটি চারদিক থেকে জল-বেষ্টিত ছিল। অর্থাৎ এর সামগ্রিক ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট একটি আদর্শ নৌবন্দরের পরিচয় প্রদান করে।

দেশের সুপ্রাচীন এ নৌবন্দরের নাম জানার মতো কোন ঐতিহাসিক সূত্র যেমন আজও আবিষ্কৃত হয় নি, তেমনি প্রত্নস্থলটিতে এমন কোন স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট নেই যার ভিত্তিতে হারিয়ে যাওয়া বন্দরটির পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমানে যা আছে তার মধ্যে কেবল প্রত্নস্থলটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত দুটি মাটির প্রাচীরের বিলীয়মান কিয়দংশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। প্রতিটি প্রাচীরের বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় কিলোমিটার। এদের প্রান্তদেশে কৃত্রিম প্রতিরক্ষা পরিখার চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন স্থানেই কোন ইঁট বা পাটকেলের অস্তিত্ব নেই। যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা থেকে কেবল দু'টি বিষয় অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত, সুপ্রাচীন এই নৌবন্দরের পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় ছিল। দ্বিতীয়ত, মাটির ঢিবিগুলো সম্ভবত বাড়িঘরের কাজ করত।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ওয়ারী-বটেশ্বরে কিছু লোহার তৈরি হাতকুঠার এবং লোহার পিণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সাতাশটি কুঠারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে লোহার তৈরি হলেও এসব হাতকুঠারগুলোর গড়নে পাথরযুগীয় (প্রাগৈতিহাসিক) হাতকুঠারগুলোর অনুরূপ। তাই ধরে নেওয়া যায়, এগুলো লোহা আবিষ্কারের গোড়ার পর্বের (আঃ খ্রিস্টপূর্ব আট শতক) নিদর্শন। পণ্ডিতগণের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব বার শতকে উপমহাদেশে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণের ভাষায়, এটি পুরা ঐতিহাসিক যুগ। সুতরাং ওয়ারী-বটেশ্বরকেই বাংলাদেশের একমাত্র পুরা ঐতিহাসিক যুগীয় প্রত্নস্থল হিসাবে আপাতত সম্ভাবনাময় বলে প্রতীয়মান হয়।

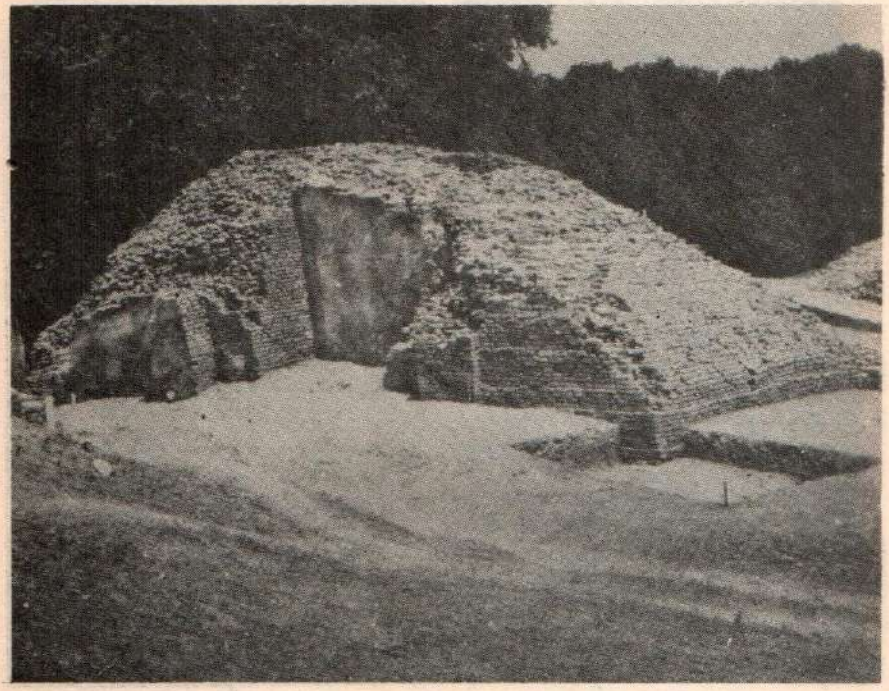
মহাস্থানগড়ের সংলগ্ন এলাকা ঃ মহাস্থানগড়ের পার্শ্ববর্তী সরলপুর, ট্যাংরা, নামুজা, পলাশবাড়ি, গোকুল, সেকেন্দ্রাবাদ, মথুরা, ডালিভরা ও হাজরাদিঘি ইত্যাদি গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জলাশয়, ঢিবি ও সাংস্কৃতিক জঞ্জাল অধ্যুষিত ভূমি। এদের মধ্যে যোগীর ভবন,

রেখাচিত্র – ৪১


মহাস্থানগড় সংলগ্ন অঞ্চলের মানচিত্র ও প্রত্নস্থল
(স্কেল মত নয়)
বাসুবিহার
বিহার
গোবিন্দভিটা
খননকৃত প্রত্নস্থল
ঢিবি
দিঘি/পুষ্করিনি

খুলনার ধাপ, লহনার ধাপ, ভীমের জাঁঙ্গাল, গোদাইবাড়ি ধাপ, নেতাই ধোপানির পাট, ওজাধনন্তরির ধাপ, ছাইঘাটি, কানাই কুণ্ড, স্কন্ধের ধাপ, কাঞ্চিরহাড়ি, ধনিকের ধাপ, বিশমর্দন ধাপ, সুবাদিঘির ধাপ, পাঞ্চপীরের ধাপ, যোগিনীর ধাপ, পীর শহর আলীর মাজার ঢিবি, কনসুধাপ, পীর বোরহান আলীর মাজার ভিটা, দাতা তারার ধাপ, ময়নামতি মন্ত্রির ধাপ, মাদারের দরগাহ ও বাড়ি ধাপ, মলপুকুরিয়া, কানাই ধাপ,বলাই ধাপ, দুলু মাঝির ভিটা, সন্যাসীর ধাপ, কাঁচের আঙ্গিনা, মঙ্গলনাথের ধাপ, রাসতলার ধাপ, ধনভাণ্ডার, চান্দের ভিটা, সওদাগর ভিটা, গোপিনাথ মঠ, ষষ্ঠিতলা ঢিবি, সিংগিনাথের ঢিবি, নাড়িয়া ধাপ, চলনের ধাপ, টাঙ্গিরআরা, রাজা গোপিনাথের ধাপ, দোলমঞ্চ ধাপ, বুড়ির থান, খামার বাড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে ইতিমধ্যে অধিকাংশ ঢিবি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। স্থানীয় জনগণ যথেচ্ছা কেটে নিচ্ছে মাটি, আর অপসারণ করছে সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি।

আলোকচিত্র–৩৫



মহাস্থানগড়ের উত্তর প্রাচীরে অনাবৃত তোরণ

অতি–সম্প্রতি ট্যাংরার ধাপে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি অপসারণ করণের প্রাক্কালে বেরিয়ে পড়ে গুপ্ত আমলের মথুরা শিল্পশৈলীর ধারাবাহক একটি বুদ্ধ মূর্তি। লালচে আভা যুক্ত বেলে পাথরে তৈরি এই মূর্তির উচ্চতা ১.০৩মি:। এই নিদর্শনে উত্তরীয় পরিহিত ধ্যানীবুদ্ধ তার

অতিপরিচিত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান আছেন। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই মূর্তির পেছনেও একই ভঙ্গিতে আর একটি বুদ্ধ রয়েছে। এর আকার মুখ্য পিঠের বুদ্ধের চেয়ে বড়। এছাড়া এর উপর ও নিম্নাংশ ভাঙ্গা। তাই ধরে নেওয়া যায় যে প্রাথমিক আমলের মূল মূর্তিটি কোন বৌদ্ধ বিরোধী শক্তির হাতে বিধ্বস্ত হলে পরবর্তী পর্যায়ে এর অপর পিঠের অপেক্ষাকৃত ছোট মূর্তিটি খোদিত হয়। এছাড়া এই ধাপটি থেকে প্রতিনিয়ত অজস্র ইট অপসারিত হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে অনুমিত হয়,এ ঢিবিতে একটি বিশালাকার বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত রয়েছে। এই মন্দিরে একাধিক নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। বড় ট্যাংরা নামক ঢিবিটির প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। অপরদিকে স্কন্ধের ধাপে করতোয়া মাহাত্ম্য বর্ণিত একটি কার্তিক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে বলে অনেকের ধারণা।[৪৩] ১৯৯২ সালে লেখক স্বয়ং এ ঢিবিটি পরিদর্শন করেন।

আলোকচিত্র– ৩৬

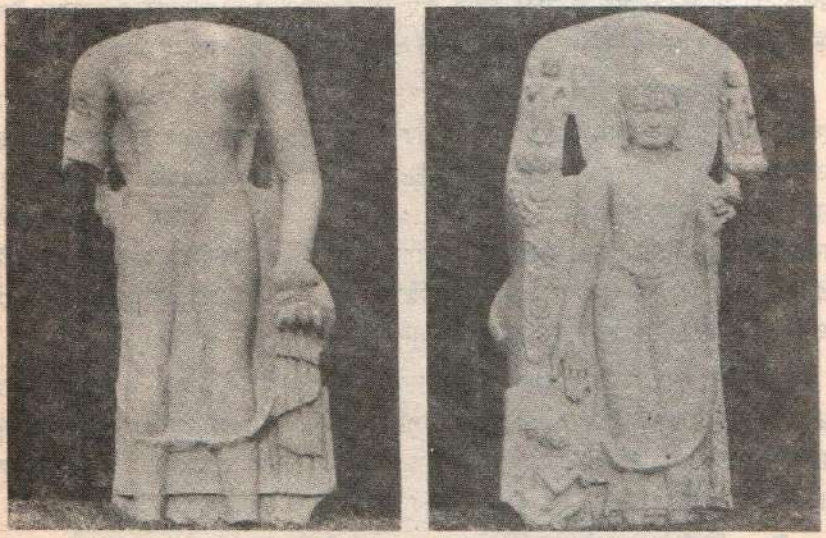


মহাস্থানগড়ের সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছোট ট্যাংরার ধাপ

৪৩. N. Ahmed, Mahasthan : A Preliminary Report on Archaeological Excavation, Karachi, 1971 (Edition) , p.56

পরিদর্শন কালে টিবির উপর বেশ কয়েকটি অলঙ্কার যুক্ত ইটের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। এসব ইটের এক পিঠে লজেঞ্জি, পিরামিড, দন্তাকৃতি ইত্যাদি মোটিফের অস্তিত্ব বজায় ছিল। এছাড়া টিবিটির পূর্বাংশে দেয়ালের অস্তিত্বও লক্ষ করা গেছে। এই ধরনের নিদর্শন এতদ্‌অঞ্চলে অবস্থিত অন্যান্য টিবিগুলোতেও দেখা গেছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে অলঙ্কার যুক্ত ইটসহ মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও ধাতু নির্মিত ক্ষুদ্রাকার মূর্তি, পোড়ামাটির মূর্তি ও বল এবং গৃহস্থালি দ্রব্যাদি অন্যতম। মহাস্থানগড় জাদুঘরের প্রত্নবস্তুর যোজন বইটি আলোচনা করলেই বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এসব নিদর্শনাদি গুপ্ত, গুপ্ত পরবর্তী পাল শাসনামলের বৈশিষ্ট্যসূচক শৈলী বহন করছে।

আলোকচিত্র – ৩৭



গৌণ পিঠ মুখ্যপিঠ

ছোট ট্যাংরার ধাপে প্রাপ্ত বেলে পাথরের বুদ্ধ

তাই সহজেই অনুমান করা যায়, খ্রিস্টীয় পাঁচশতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হলে মহাস্থানগড় কিছুকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে এবং উক্ত সময়কালে গোটা প্রত্নস্থলটি ধ্বংস ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে এর সংলগ্ন অঞ্চলে পরবর্তীকালে অপর একটি বিস্তীর্ণ উপ-শহর গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে কুমারগুপ্ত প্রথম মহেন্দ্রাদিত্যের (খ্রিঃ ৪১৫–৪৫ অব্দ) তৃতীয়

দামোদরপুর (দিনাজপুর) তাম্রফলকে পলাশবৃন্দক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।[৪৪] মহাস্থানগড়ের পশ্চিম প্রাচীর সংলগ্ন গ্রামটি আজও তার পলাশবাড়ি নামের মধ্যদিয়ে এই স্মৃতি ধারণ করছে। তাই এ কথা একেবারে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে মহাস্থানগড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে বিশদ অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা হলে আমাদের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাথরঘাটা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নস্থল বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে আনুমানিক ৭০ কিমি: পশ্চিম, নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার থেকে আনুমানিক ২৩ কিমি: উত্তর-পশ্চিম এবং পাঁচবিবি থানা সদরের অদূরবর্তী উত্তর দিকে একটি বিস্তীর্ণ প্রত্নস্থলের অবস্থান দেখা যায়। নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন পাঁচবিবি থেকে ঘোড়াঘাটগামী সড়ক ধরে প্রায় ৬ কিমি: উত্তরে অগ্রসর হলে প্রত্নস্থলটিতে পৌঁছা যায়। এই প্রত্নস্থলের প্রাচীন নিদর্শনাদি নিমাই পীরের দরগাহ, নওপুকুরিয়া-মনিপুর, কসবা ও উচাই নামক গ্রামগুলোর প্রায় ৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও স্থানীয় জনগণের নিকট প্রত্নস্থলটি পাথরঘাটা নামেই অধিক পরিচিত।

পাথরঘাটার পূর্বদিক দিয়ে তুলশিগঙ্গা নামে একটি ক্ষীণকায় নদীর মৃতপ্রায় ধারা আজও বহমান। এই নদী কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অপর একটি খাল ধরনের জলধারার সাথে যুক্ত হয়েছে। হতে পারে এটিও একটি মজে যাওয়া প্রাচীন নদীর খাত। উত্তর-দক্ষিণে বহমান এই নদী দু'টোর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিভিন্ন আকারের পাথর খণ্ড, ইট-পাটকেল, খোলামকুচি, পোড়ামাটির ফলক, দেয়ালের ভিত্তি চিহ্ন, পাথরের সর্দল দরজা- জানালার বাজুবন্দ, গোবরাট, মূর্তি, থাম এবং কয়েকটি জলাশয়সহ ঢিবির অস্তিত্ব দেখা যায়। তাই এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে এ প্রত্নস্থলে কোন বিরান জনপদের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে।

পাথরঘাটার সবচেয়ে তাৎপর্যময় স্থানটির নাম ক্যাথলিক মিশন ঢিবি। তুলশিগঙ্গা নদীর পাড় ঘেঁষে এই বিশাল ঢিবির অবস্থান। এর উপর বর্তমানে একটি ক্যাথলিক মিশনের বিভিন্ন ইমারতাদি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মিশন তৈরির প্রাক্কালে বুলডোজার চালিয়ে ঢিবিটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। তবে এর মাটির রঙ আজও পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমির চেয়ে ভিন্নতর।

মাটির সঙ্গে অসংখ্য সাংস্কৃতিক জঞ্জাল মিশে আছে। শুধু তাই নয়, মিশনটি তৈরির সময় যেসব প্রত্নবস্তু অনাবৃত হয়েছিল সেগুলোর একটি বড় সংগ্রহ এখনও মিশন ভবনের একটি সংগ্রহশালায় সংগৃহীত আছে। মিশন চত্বরের এক প্রান্তে নদী সংলগ্ন একটি স্থানে নিকট সাম্প্রতিক কালে নির্মিত একটি মন্দিরের কিছু কিছু মূল্যবান পাথরের নিদর্শন স্তূপাকার হয়ে আছে।

মিশন পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে নিকট-সম্প্রতি কালে নির্মিত যে মন্দিরটির কথা বলা হলো তার সম্মুখ থেকে নদীর শুষ্ক তলদেশসহ উভয় পাড় জুড়ে ২০০ মিটারের মতো দীর্ঘ অংশে অসংখ্য বেলে পাথরের পট্ট এবং বিক্ষিপ্ত গাঁথুনি ছড়িয়ে আছে। পাথর-পট্টগুলো এবং গাঁথুনির

---

৪৪ .Epigraphica India, vol. XV, 1919-20, p. 114

বিন্যাস দেখে অনুমিত হয় যে এস্থানে এককালে একটি অথবা একাধিক বিশাল ঘাটের অস্তিত্ব ছিল। এগুলো যদি প্রকৃতপক্ষেই কোন সেতুর ধ্বংসাবশেষ হয় তবে বলতে হবে, বাংলাদেশে এ ধরনের দ্বিতীয় নিদর্শন এযাবৎ অন্যকোথায়ও আবিষ্কৃত হয় নি।

আলোকচিত্র –৩৮



বেলে পাথরের স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ, পাথরঘাটা, জয়পুরহাট, ১৯৮৪ সালে ধারণকৃত

ক্যাথলিক মিশনের ২০০ মিটার দক্ষিণে আরও একটি ঢিবি আছে। এই ঢিবির উপর কয়েক বছর পূর্বে নির্মিত একটি ঘরের মধ্যে একটি পাকা কবর আছে। স্থানীয় জনগণের নিকট কবরটি নিমাই পীরের দরগাহ নামে পরিচিত। এ দরগাহের নামানুসারেই ঢিবিটি নিমাই পীরের ঢিবি নামে পরিচিত। এ স্থানেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাচীন ইট-পাটকেল ও পাথরের তৈরি বিভিন্ন উপকরণ ছড়িয়ে আছে। পাথরের নিদর্শনাদির মধ্যে একটি থাম আকৃতি গ্রানাইট পাথর খণ্ড এবং কয়েকটি নকশা করা স্তম্ভমূল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধরে নেওয়া যায়, নিমাই পীরের মাজারের

নিচে প্রাক-মুসলিম আমলে নির্মিত একটি বিশালাকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লুকানো আছে। অপরদিকে, মাজারটিতে সুলতান নুসরত শাহের আমলের (১৫২৯-৩১ খ্রিস্টাব্দ) একটি শিলালিপি কয়েক বছর পূর্বে সংরক্ষিত ছিল বলেও নানা সূত্রে অবহিত হওয়া যায়। এর থেকে ধারণা করা যায়, নিমাই পীরের দরগাহের নিচে প্রোথিত প্রাক্-মুসলিম আমলের ইমারতটির ধ্বংসাবশেষের উপর খ্রিস্টীয় ষোল শতকে আরও একটি ইমারত তৈরি হয়েছিল।

পাথরঘাটার পার্শ্ববর্তী এলাকার অন্যান্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে নওপুকুরিয়া ঢিবি, ধন-ভাণ্ডার, কাসিয়াবাড়ি ধাপ ও উচাই ধাপ অন্যতম। নওপুকুরিয়া নাম থেকে অনুমিত হয়, এস্থানে এক সময় নয়টি পুকুর ছিল। বর্তমানে নয়টি পুকুর অক্ষত না থাকলেও তিনটি দিঘির অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এই তিনটি দিঘি এবং পাথরঘাটার অন্যান্য সবকয়টি দিঘিই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। বিশেষজ্ঞগণের মতে এ ধরনের দিঘি পাক-মুসলিম শাসনামলের নিদর্শন। এছাড়া উচাই গ্রামে রয়েছে 'বেলের ঢিবি' নামে আর একটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ঢিবি (৭০ মি: × ৫৩মি:) এর উচ্চতা

আলোকচিত্র - ৩৯



তুলশীগঙ্গা নদীতে পড়ে থাকা পাথরঘাটার পাথরপট্ট, পাথরঘাটা, জয়পুরহাট

প্রায় ৪.৫ মি:। এরপাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে ঝিনাইগাতি-উচাই খাল। তবে এ খাল যে মূলত মৃত আত্রাই নদীরই একটি শাখা তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এছাড়া ঢিবির সর্বত্রই ইট-পাটকেল, খোলামকুচি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কোন কোন ইটের মাপ ৩০

সেমি: × ২৫ সেমি: × ৫ সেমি:।

ক্যাথলিক মিশনের সংগ্রহশালায় যেসব প্রত্নবস্তু সংগৃহীত আছে সেগুলোর মধ্যে একটি কালো ঔজ্জ্বল্যময় ওয়্যারের গাডরুণ্ড আকৃতির মৃৎপাত্রের (গাডরুণ্ড) খোলামকুচি অন্যতম। এ ধরনের খোলামকুচি তক্ষশিলার খ্রিস্টপূর্ব তিন-দুই শতকের স্তরগুলোতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পাথরঘাটা থেকে সংগৃহীত এমন একটি মূর্তির ভগ্নাংশ সংগৃহীত আছে যার মধ্যে কুশান (আনুমানিক খ্রিস্টীয় এক-দুই শতক) আমলের শিল্পশৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট। অন্যদিকে পাথরঘাটায় যেসব পাথর খণ্ডের স্থাপত্যিক ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেগুলোর কিছু সংখ্যকের মধ্যে গুপ্ত (খ্রিস্টীয় চার-পাঁচ শতক) শিল্পশৈলীর ছাপ অনস্বীকার্য। অবশিষ্ট নিদর্শন পাল আমলের (খ্রিস্টীয় আট-বার শতক) শৈলীর ছোঁয়া স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। এভাবে একপ্রকার নিশ্চিন্তেই অনুমান করা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষোল শতক পর্যন্ত পাথরঘাটায় একটি বিস্তীর্ণ ও সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

পাথরঘাটার অদূরেই পাঁচবিবি নামক শহরের অবস্থান। এই নামটির সাথে গুপ্ত শাসনামলের তাম্রফলকে উল্লিখিত 'পঞ্চনগরী' নামক বিষয়ের (বর্তমান জেলার সমতুল্য) নামের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া গুপ্ত শাসনামলের প্রায় আটটি তাম্রফলক পাথরঘাটার অনূর্ধ ষাট কিলোমিটার ব্যাসের অধীন এলাকা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই ধারণা করা একেবারে অমূলক হয় না যে পাথরঘাটায় একটি প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে। সম্ভবত আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষপর্ব থেকে মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত উক্ত প্রশাসনিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

চন্দ্রবর্মণকোট ঃ এটি একটি সুরক্ষিত নগর। বর্তমানে বিস্মৃত ও বিধ্বস্ত প্রায়। গোপালগঞ্জ জেলা সদর থেকে ২৪ কিলোমিটার উত্তরে কোটালীপাড়া থানা সদরে এর অবস্থান। ধ্বংসাবশেষগুলোর বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে বোঝা যায়, কোটালীপাড়ার ঘাঘর ইউনিয়নের মোক্ষ কোটালীপাড়া, পশ্চিমগাঁও, ডুপারপাড়, ফেদরা (ফেরধরা), কয়েথা এবং আরও কয়েকটি এলাকা জুড়ে প্রাচীন চন্দ্রবর্মণকোটের বিস্তৃতি ছিল। এর উত্তরে রাচিরবিল ও গোবিন্দপুর, পূর্বে বিদ্যাবিজ্যোতি (কাটিয়ার বাড়ি), ভুয়ারপাড়া, শান্তিকুটির ও বুজরোগেরকোণা, দক্ষিণে নিতাইগঞ্জ পিঞ্জকোঠী (পিঞ্জেরী) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুয়াখোলা, কুরপাল ও গুগ্রাহটি গ্রাম। এর উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘাঘর ও শালদা নদী পরস্পর মিলিত হয়ে ঘাঘর নামে পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গোপালগঞ্জ সদর অথবা রাজৈর কিংবা গৌরনদী থেকে জলযান যোগে এ প্রাচীন স্থানটিতে পৌঁছা কিছুটা সহজ। বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় চন্দ্রবর্মণকোট শহরটির অতীতে দুটি অংশ ছিল। প্রথমটি মূল দুর্গ-নগরী এবং দ্বিতীয়টি উপশহর। দুর্গ-নগরীটি আয়তাকারে নির্মিত এবং প্রায় ১৭.৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪.৭৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৪ কিলোমিটার। প্রতিটি বাহুতে গড়ে ৩০ মিটার চওড়া মাটির প্রাচীর রয়েছে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রাচীর গুলোর গড় উচ্চতা ২.৮৪ মিটার। স্থানীয় জনগণের কাছে এই প্রাচীরগুলো পূর্বপাড়, পশ্চিমপাড়, উত্তরপাড় ও দক্ষিণপাড় নামে পরিচিত। দুর্গের বাইরে প্রাচীরগুলোর পাদদেশ ঘেঁষে

কৃত্রিম প্রতিরক্ষা পরিখাও অদ্যাবধি দৃশ্যমান। পূর্বপাড়ের মধ্যবর্তী অংশের লাগোয়া দক্ষিণাংশে একটি বড়ো ভাঙা অংশ দেখা যায়। এছাড়া উত্তরপাড় এবং দক্ষিণপাড়ে একাধিক ছোটবড় ভাঙা অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কোনটি প্রাচীন এবং কোন্‌টি সাম্প্রতিক তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। অপরদিকে প্রধান তোরণের মূল প্রস্থ আজ আর বুঝার উপায় নেই। কারণ এর অংশবিশেষ সম্প্রতি ভরাট করে ফেলা হয়েছে। তবে স্থানীয় জনগণের নিকট এ ভাঙা অংশটি অদ্যাবধি 'বড়ভাঙা' নামে পরিচিত। তাই ধরে নেওয়া যায় যে সম্ভবত পুবপাড়ের 'বড়ভাঙা' অংশটিই দুর্গে প্রবেশের প্রধান তোরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

আলোকচিত্র – ৪০



চন্দ্রবর্মণ কোটের দক্ষিণ–পূর্ব কোণের বহির্দৃশ্য, কোটলিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ১৯৯০ সালে ধারণকৃত

চন্দ্রবর্মণকোটের উপশহরটি খুব সম্ভব দুর্গ-নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘাঘর নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল এবং নদীবন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ এলাকার গুগ্রাহাটি, কুরপাল ও গুয়াখোলা নামের গ্রামগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। গুগ্রাহাটি ও কুরপালে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে দু'টি তাম্রফলক অন্যতম। লিপিতাত্ত্বিকগণের ধারণা, এগুলো খ্রিস্টীয় ছয় শতকের নিদর্শন। মজার ব্যাপার এই যে, একই

ধরনের আরও তিনটি তাম্রফলক দুর্গের অভ্যন্তরভাগ থেকেও আবিষ্কৃত হয়েছিল। কুরপাল গ্রামটি থেকে ১৯০৮ সালে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৬–৪১৩ খ্রিঃ), স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫–৬৭ খ্রিঃ), সমাচারদেব (আঃ খ্রিঃ ছয় শতকের শেষার্ধে) এবং গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের (আঃ ৬০৬–৩৬ খ্রিঃ) কিছু স্বর্ণমুদ্রা উক্ত তাম্রফলকগুলো সম্পর্কে লিপিতাত্ত্বিকগণের প্রদত্ত সময়কাল মেনে নিতে অনেকটা সমর্থন যোগায়। তদুপরি চন্দ্রবর্মণকোট নামক প্রাচীন শহরটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা উদ্রেকের ক্ষেত্রেও এসব আবিষ্কার যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে। চন্দ্রবর্মণকোটে আবিষ্কৃত খ্রিস্টীয় ছয় শতকের শেষার্ধে পাঁচটি তাম্রফলক এবং কুরপালে আবিষ্কৃত কয়েকটি মুদ্রা থেকে সর্বমোট তিনজন সার্বভৌম রাজার নাম জানা যায়। এদের নাম গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। এই রাজাদের নাম উৎকীর্ণ আরও দু'টি তাম্রফলক উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বঙ্গে পাওয়া গেছে। এসব তাম্রফলকে নব্যকশিক ও বরকমণ্ডল নামে দু'টি বিভাগেরও উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টীয় ছয় শতকে মগধকেন্দ্রিক গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙনের খেলা শুরু হয়েছিল। এমনকি,৫০৬–৭ খ্রিস্টাব্দে সমতটের (মেঘনা উপত্যকা) ত্রিপুরে (কমলাঙ্ক, কুমিল্লা) বন্যগুপ্ত নামক একজন শাসক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ ও নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা জারি করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তার রাজত্বের শেষদিকে রাজকীয় গুপ্তদের বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে চরম কৃচ্ছতা সাধনে নিয়োজিত হয়ে নালন্দা মহাবিহারে আত্মোৎসর্গ করেন। সম্ভবত এই সুযোগে আনুমানিক ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে গোপচন্দ্র–ধর্মাদিত্য–সমাচারদেবের বংশ নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তারা চন্দ্রবর্মণকোটকে কেন্দ্র করে উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রায় ষাট সত্তর বছর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিল। এই রাজ্যেরই অন্যতম দু'টি প্রশাসনিক ভাগের নাম নব্যকশিক ও বরকমণ্ডল।

চন্দ্রবর্মণকোটের প্রাধান্য কতদিন বজায় ছিল সে সম্পর্কে আজও কোনো সূত্র পাওয়া যায় নি। তবে খ্রিস্টীয় সাত শতকের শুরুতে মুর্শিদাবাদের অধীন চিরুটী রেলস্টেশনের নিকটে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে পরম প্রতাপশালী শাসক শশাঙ্কের উত্থানের ইতিহাস বহু সূত্র থেকেই জানা যায়। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, খ্রিস্টীয় সাত শতকে কর্ণসুবর্ণের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রবর্মণকোট এবং এর রাজবংশের পতন ঘটে। এরপর থেকেই চন্দ্রবর্মণকোট কোনো দিন আর তার গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে নি।

বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যাওয়া চন্দ্রবর্মণকোটে অতীতে যেসব ইমারতাদি ছিল সেসবের কোনো চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ বছরের বেশিরভাগ সময়ই এর অভ্যন্তরভাগ জলমগ্ন থাকে। ভিতরে এবং বাইরের কোন কোন স্থানে নতুনভাবে মাটি ভরাট করে বসত ভিটা তৈরি করা হয়েছে। এসব নতুন বসতি বর্তমানে সিকির বাজার, রতলি, উনসিরা, পচাঁপাড়া, পাড়কোণা, আমতলি, মনসাবাড়ি, ডউয়াতলি ইত্যাদি নামে পরিচিত। উনসিরা গ্রামে চলতি শতকের গোড়ার দিকে সাহাবাড়ি নামে বেশ কিছু দালানকোঠাও গড়ে

উঠেছিল। এসব দালানকোঠা বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এর সংলগ্ন বান্দোল গ্রামে ইতিপূর্বে একটি পুকুর খননকালে প্রচুর প্রাচীন ইটের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ইটগুলো স্থানীয় জনগণ বাড়িঘর তৈরির কাজে ব্যবহার করে আসছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের গোয়ালজক গ্রামের (মৌজা-৮২) ৩২৬-২৮ নং দাগগুলোতে আজও যথেষ্ট পরিমাণ ইটপাটকেলসহ খোলামকুচি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ দুর্গ এলাকায় বেশ কিছুসংখ্যক প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিনীর অস্তিত্বও দেখা যায়। এদের সংখ্যা চৌদ্দ। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনার উপযোগী কোন ঢিবির অস্তিত্ব দেখা যায় না। এমন কোন গাছেরও অস্তিত্ব নেই যার বয়স ১০০ বছরের অধিক হতে পারে। উত্তরপাড়ের বাগান-উত্তরপাড়ার জনৈক বাসিন্দা ইতিপূর্বে এ এলাকায় দু'টি প্রাচীন মুদ্রার সন্ধান পেয়েছিলেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। তাছাড়া এসব এলাকার মাটির নিচ থেকে প্রায়ই কিছু না কিছু প্রাচীন ইটপাটকেল উঠে আসে বলেও শোনা গেছে।

সম্ভার ঃ সাভারের অনুর্ধ তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্ননিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ প্রত্নস্থলে এ যাবৎ সন্ধানলব্ধ প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে প্রত্নঢিবি, মুদ্রা, মূর্তি, খোলামকুচি, সংস্কৃত শ্লোক লিখিত একটি মঠলিপি ইট-পাটকেল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব নিদর্শনের কোনটি বৌদ্ধ, আবার কোনটি হিন্দু ধর্মীয় ধর্মাচারের উপাচার। এছাড়া এতদ্অঞ্চলে 'কোটবাড়ি' নামে একটি মাটির দুর্গও রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী এসব নিদর্শন খ্রিস্টীয় সাত থেকে দশ-এগার শতকের শৈলী বহন করেছে। ফলে ধরে নেওয়া যায়, তদানীন্তনকালে সাভারে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। আর এর রাজধানী ছিল সম্ভার।

সাভার এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলটির নাম রাজাসন ঢিবি। সাভার বাজার থেকে একটি স্বল্পপ্রশস্ত পাকা রাস্তা ধরে অনধিক দেড় কিলোমিটার পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকলে রাস্তার দক্ষিণ পাশে মাত্র তিন-চার বছর আগেও এ ঢিবির অস্তিত্ব লক্ষ করা যেত। তখন এ স্থানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি নামসর্বস্ব সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিও লাগান ছিল। এর সম্মুখে ছিল আনুমানিক ১০৬ মিঃ দীর্ঘ ও ৬০ মিঃ প্রশস্ত একটি ফাঁকা জমি। এই জমির সর্বত্র ইট-পাটকেল এবং খোলামকুচির অস্তিত্ব ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আগাছা ও মানুষের বিষ্ঠাপূর্ণ কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ছোটখাট ঢিবিও ছিল। চলতি শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও ঢাকা জাদুঘর এ প্রত্নস্থলটি থেকে বেশ কয়টি ইটের তৈরি নিবেদন স্তূপের ধ্বংসাবশেষসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নবস্তুর সন্ধান লাভ করেছিল। এসব প্রত্নবস্তুর অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মীয় শৈলী বহন করত। প্রত্নবস্তুগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীতে রয়েছে। এসব প্রত্নসম্পদ আবিষ্কারের আলোকে ধরে নেওয়া যায় যে রাজাসন ঢিবিতে খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে রাজাসন ঢিবিটি সম্প্রতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

সাভারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলটির নাম হরিশ চন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবি। এই ঢিবিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি খনন পরিচালিত হয়েছে এবং খননের ফলাফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আপাতত লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাজাসন ও হরিশচন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে একটি মরা নদীর খাত প্রবাহিত রয়েছে। এমনকি একটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দিঘিও রয়েছে।

হরিশ চন্দ্র রাজার প্রাসাদ ঢিবির উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরবর্তীস্থানে বংশাই নদীর পূর্বতীরে একটি মাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ দুর্গ প্রায় ৩৫০ মিটার লম্বা এবং ২৫০ মিটার প্রশস্ত। আয়তাকারে নির্মিত দুর্গটির প্রতিটি বাহুতে প্রায় ১০ মিটার চওড়া মাটির পাঁচিল রয়েছে। পাঁচিলগুলোর বর্তমানে গড় উচ্চতা প্রায় চার মিটার। পাঁচিলের বাইরের পাদদেশ ঘেঁষে এক সময় গভীর ও সুপ্রশস্ত কৃত্রিম প্রতিরক্ষা পরিখা ছিল। বর্তমানে কেবল উত্তরাংশে এ পরিখার খাত সুস্পষ্ট। দুর্গটির পাঁচিল ও অভ্যন্তরের প্রায় সর্বত্র নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরির কাজ অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন অংশ চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অবস্থা আরও দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে দুর্গের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সাভারের অন্যান্য প্রত্নইমারতের মধ্যে রেডিও কলোনীর নিকটবর্তী হশিচন্দ্রের বুরুজ অন্যতম। প্রাচীন ইঁট ও কাদার মসলায় তৈরি এ ইমারতটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তবে এর পলেস্তরা বিহীন দেয়ালের বহিরাংশের নানা স্থানে একাধিক উদ্গত ও অবতল প্রক্ষেপণের অস্তিত্ব দেখে খুব সহজেই অনুমিত হয় যে ইমারতটি একসময় নানাপ্রকার অলঙ্করণে সুদৃশ্য ছিল। অতএব মূল-নির্মাণ সময়কালে এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত ছিল তাতে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইমারতাদি অধ্যুষিত সাভার এলাকায় প্রচুর পরিমাণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়ে আসছে। এসব আবিষ্কারের মধ্যে স্টেপলেটন নামে একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও সাভারের জনৈক স্কুল মাস্টার কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি মঠলিপি, কয়েকটি ইঁট এবং মুদ্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মঠলিপিটি মানিকগঞ্জের একজন কবিরাজের নিকট একটি তুলট কাগজে লিখিত ছিল। মূল লিপিটির সন্ধান আজও জানা যায় নি। এই লিপিতে একটি অখ্যাত রাজবংশের বংশপঞ্জি লিপিবদ্ধ ছিল। আরও জানা যায়, এ বংশেরই একজন রাজা প্রাচীন কিরাত নামক একটি জাতিকে পরাজিত করে সাভার অঞ্চলে একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তবে উক্ত রাজবংশের সময়কাল এবং পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মতো অন্যকোন প্রমাণ এ যাবৎ কোন সূত্র থেকেই পাওয়া যায় নি। তবে মঠলিপিটিতে রাজধানীর নাম সম্ভার ছিল বলে উল্লেখ ছিল।

সাভারে আবিষ্কৃত কয়েকটি ইটে আদি বাংলা হরফে একটি লিপি উৎকীর্ণ ছিল। এ লিপির পাঠোদ্ধারে দাঁড়িয়েছে হরিশ চন্দ্র। হরিশচন্দ্র নামে আদৌ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিল কি না, এ বিষয়ে আজও কোন সত্যসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে বাংলা লোকসাহিত্যে এ নামে একজন রাজার নাম উল্লেখ রয়েছে। নাথদের গীতিকাব্য থেকেও তার সম্পর্কে অবহিত হওয়া

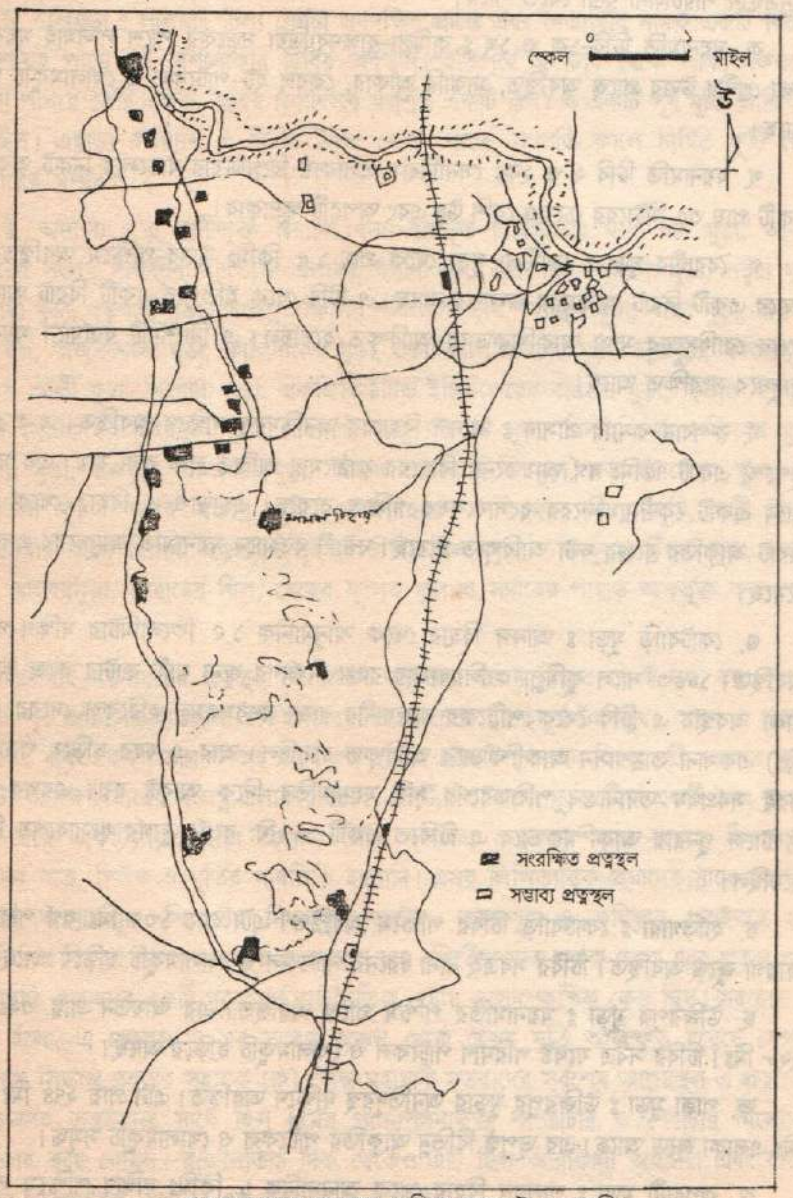
যায়। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিশচন্দ্রের ঢিবি হরিশচন্দ্রের দিঘি ইত্যাদি নামে বহু পরিত্যক্ত এলাকা এবং জলাশয়ের অস্তিত্ব রয়েছে। এসব তথ্যের উপর নির্ভর করে আপাতত কেবল এটুকু অনুমান করা যায় যে হরিশচন্দ্রের সময়কাল বড়জোর আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশ–এগার শতক হতে পারে। তবে তাঁর সাথে সাভারের প্রত্ননিদর্শনাদির সম্পর্ক নিরূপণ করা বড়ই দুরূহ।

সবশেষে আরও একটি কথা পুনরায় না বললেই নয় যে সাভারে কিছু গুপ্ত অলঙ্কৃত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ ধরনের মুদ্রা খ্রিস্টীয় সাত–আট শতকের দিকে প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতগণ ধারণা পোষণ করেন। সাভারে প্রাপ্ত কোন কোন মুদ্রায় সুধন্যাদিত্য, ক্রমাদিত্য এবং পৃথুবীর জাতীয় কয়েকটি নামের উল্লেখ ছিল। এই নামগুলোর সাথে খ্রিস্টীয় ছয় শতকে ফরিদপুরের চন্দ্রবর্মণকোটে (কোটালিপাড়া) রাজত্বকারী ধর্মাদিত্য নামের সৌসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাছড়া চন্দ্রবর্মণকোটেও সাভারের কোটবাড়ির অনুরূপ একটি বিরাট দুর্গের অস্তিত্ব রয়েছে। উক্ত দুর্গটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জলমগ্ন হয়ে ধ্বংস হয়েছিল বলে প্রখ্যাত পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী অভিমত পোষণ করেন। তাই সবকিছু মিলিয়ে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আনুমানিক খ্রিস্টীয় সাতশতকে চন্দ্রবর্মণকোট বিধ্বস্তহলে উক্ত রাজধানী থেকে রাজত্বকারী ধর্মাদিত্যের কোন উত্তরাধিকারী (সম্ভবত সুধন্যাদিত্য) সাভারের বন্যামুক্ত উচু এলাকায় রাজধানী স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবে সাভারের প্রত্ননিদর্শনাদির সময়কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টীয় সাত থেকে এগার শতক।

লালমাই ময়নামতির অবশিষ্ট এলাকা

লালমাই–ময়নামতি টিলা শ্রেণীর বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর ঢালে এ যাবৎ প্রায় চুয়ান্নটি প্রত্নঢিবি শনাক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে এ পর্যন্ত তেইশটি প্রত্নঢিবি সংরক্ষিত ঘোষিত হয়েছে। তন্মধ্যে যেসব ঢিবিতে ইতিমধ্যে খনন পরিচালনার ফলে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যিক নিদর্শনাদি উন্মোচিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঢিবিগুলোতে প্রাপ্ত মুদ্রা, তাম্রফলক ইত্যাদি থেকে এমন কতকগুলো রাজা, রাজ্য ও রাজবংশের নাম জানা যায় যাদের সম্পর্কে অপর কোন সূত্র থেকে এ যাবৎ অবগত হওয়া সম্ভব হয় নি। এরা খ্রিস্টীয় সাত শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। এসব রাজবংশগুলোর নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের রাজত্বকালে এতদ্অঞ্চল সমতট, হরিকেল, পট্টিকের ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। এসব রাজ্যের রাজধানী হিসাবে দেবপর্বত, জয়কর্মণ্ড–বসাক ইত্যাদি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব রাজধানীর সঠিক অবস্থান আজও জানা যায় নি। অনেকের মতে ময়নামতির অদূরস্থ বড়কামতা নামক একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষগুলোই জয়কর্মান্ত–বসাকের চিহ্ন বহন করছে। আরও ধারণা করা হয়েছে যে ময়নামতি টিলা শ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত রাণীরবাঙলো ঢিবিতে দেবপর্বতের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে পরিচালিত খনন থেকে এ অনুমিতির পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি। এছাড়া এ যাবৎ যেসব রাজা ও রাজবংশের নাম জানা গেছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজ্যের বিস্তৃতি, সঠিক

রেখাচিত্র – ৪২



প্রত্নস্থলসমূহের অবস্থান দেখিয়ে লালমাই-ময়নামতি

সঠিক সময়কাল, রাজত্বের বিশদ বিবরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়েছে। এস অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসার জন্য নিদেন পক্ষে নিম্নোক্ত সাংস্কৃতিক ঢিবিগুলোতে গভী অনুসন্ধান পরিচালনা করা যেতে পারে।

ক. ময়নামতি ঢিবি-১ক ও ১খ ঃ কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের পাশে লালমাই ময়নামতি টিলা শ্রেণীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, মাঝারি আকার, কেবল ইঁট-পাটকেল ও খোলামকুচি ছড়িয়ে আছে।

খ. ময়নামতি ঢিবি ২ ও ২কঃ সেনানিবাস এলাকায় বিগ্রেডিয়ার বাঙলোর নিকট অবস্থিত একটি প্রায় ৩০ মিটারের চেয়েও বেশি উঁচু এবং অপরটি ক্ষুদ্রাকার।

গ. বৈরাগীর মুড়া ঃ কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় ১.৫ কিমিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এর উত্তরে একটি বিরাট আকারের জলাশয় আছে। এ ঢিবি থেকে ইতিপূর্বে একটি বিরাট আকারের ব্রঞ্জের বোধিসত্ত্বের মাথা আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ নিদর্শনটি বর্তমানে ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ঘ. রূপবান কন্যার প্রাসাদ ঃ আনন্দ বিহারের অনতিদূরস্থ দক্ষিণে অবস্থিত। এ প্রত্নস্থলে ভূপৃস্থে একটি ৭৫মি: বর্গ আয়তনের বিহারের কাঠামোর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি কেন্দ্রীয়মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও গচ্ছিত রয়েছে। এছাড়াও এ বিহার থেকে একটি বিরাট আকৃতির ব্রঞ্জের ঘন্টা আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘন্টাটি বর্তমানে ময়নামতি জাদুঘরের প্রদর্শনীতে রয়েছে।

ঙ. কোটবাড়ি মুড়া ঃ আনন্দ বিহার থেকে আনুমানিক ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ১৮০৩ সালে কুমিল্লা-কালিরবাজার রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি কাটার কাজ অব্যাহত থাকা অবস্থায় এ ঢিবি থেকে পট্টিকের রাজধানীর রাজা রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের (১২২০ খ্রিঃ) একখানা তাম্রশাসন আকস্কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পরই সর্বপ্রথম তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি ময়নামতির দিকে আকৃষ্ট হয়। এরপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় আকস্মিকভাবে এ ঢিবিতে একটি ১৮২মি: বর্গের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হয়েছিল।

চ. হাতিগারা ঃ কোটবাড়ি ঢিবির পশ্চিমে অবস্থিত। এটা প্রায় ১৩৭ মিঃ বর্গ পরিমাপের জায়গা জুড়ে অবস্থিত। ঢিবির সর্বত্রই নানা ধরনের পাটকেল ও খোলামকুচি ছড়িয়ে আছে।

ছ. উজিরপুর মুড়া ঃ ময়নামতির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩২০ মিঃ× ২২৮ মিঃ। ঢিবির সর্বত্র যথেষ্ট পরিমাণ পাটকেল ও খোলামকুচি ছড়িয়ে আছে।

জ. পাক্কা মুড়া ঃ উজিরপুর মুড়ার অনতিদূরস্থ দক্ষিণে অবস্থিত। এটা প্রায় ২৭৪ মিঃ × ৩০ মিঃ এলাকা জুড়ে আছে। এর ভূপৃষ্ঠ বিভিন্ন আকৃতির পাটকেল ও খোলামকুচি সমৃদ্ধ।

ঝ. রূপবানী মুড়া ঃ শালবন বিহার থেকে আনুমানিক ৮ কিমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে লালমাই টিলা শ্রেণীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এর ভূপৃস্থের প্রায় সর্বত্রই অগুনতি সাংস্কৃতিক জঞ্জাল ছড়িয়ে

আছে।

ঞ. বালাগাজির মুড়া ঃ লালমাই রেল স্টেশনের প্রায় ৮০০ মি: উত্তরে অবস্থিত। অনুসন্ধান করলে প্রায়শ নানা নমুনার সাংস্কৃতিক জঞ্জালের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

ট. চণ্ডিমুড়া ঃ লালমাই টিলা শ্রেণীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে এবং দৈত্যদিঘি নামক একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পাড়ে এই বিশালাকার ঢিবির অবস্থান। ইতিপূর্বে এ ঢিবি থেকে আকস্মিকভাবে কালো পাথরে তৈরি একটি মঞ্জুবর (বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর একটি রূপ) ও একটি সূর্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়া বর্তমানে এ ঢিবির উপর শোভা পাচ্ছে সম্প্রতি কালে নির্মিত দু'টি ছোট আকারের মন্দির।

ঠ. অন্যান্য ঃ এ শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য খনন বহির্ভূত ঢিবিগুলোর মধ্যে ধান মুড়া, আনন্দ বিহারের সংলগ্ন দক্ষিণের পরিত্যক্ত এলাকা, হগনি মুড়া, উপত্যকা, আদিনা মুড়া, সবুরা মুড়া, বড়গাছী মুড়া, বড়গাছী মুড়ার সংলগ্ন দক্ষিণের পরিত্যক্ত ভূমি, নিরঞ্জন মুড়া, খাছর মুড়া, রূপবান মুড়া হল, অর্জুনখোলা মুড়া, কালিদাসের মুড়া, সেনানিবাস বাঙলো মুড়া, চল্লামুড়া, ফকিরমুড়া, আব্বাস আলী মুড়া, সিংগারা মুড়া, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বাঙলো মুড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবরস্থান মুড়া, গাবগাছি মুড়া, বটগাছি মুড়া, মিনারখিলের পশ্চিমের মুড়া, বৈরাগী মুড়া, টক্কমুড়া, বালাগাজিমুড়া, আনন্দ রাজার দিঘি মুড়া, বড় ইঁটাখোলা মুড়া, বড় ইঁটাখোলা মুড়ার পূর্বের সংলগ্ন ভূমি, ভোজবিহারের পশ্চিমের সংলগ্ন ভূমি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর অংশ বিশেষ, বড়পাড়া ভূইয়ার ঢিবি, লিলা মুড়া, টাক্কামুড়া, টিপরা মুড়া, মন্দারা মুড়া, মাইধরমুড়া, মেম্বারের খিল, মেহের কুলের মুড়া ও সর্দারের পাহাড় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

লালমাই-ময়নামতির প্রত্নস্থল যে কেবল আয়তনে যথেষ্ট বিস্তৃত তা-ই নয়, বরং সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসমুখ। কারণ এ প্রত্নস্থল থেকে এ যাবৎ কেবল তাম্রফলকই আবিষ্কৃত হয়েছে চৌদ্দটি (শালবন বিহার ৭টি, চারপত্র মুড়ায় চারটি, আনন্দ বিহারের সংলগ্ন এলাকায় থেকে একটি, কোটবাড়ি মুড়া থেকে একটি এবং রূপবান মুড়া থেকে একটি)। এ ছাড়া অন্যান্য লিপি সংবলিত প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে সীলমোহর, নিবেদন পাত্র, পিষ্টক ও মূর্তির পাদলিপি ইত্যাদি। এসব লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণের সাথে নরসিংদি জেলার আশ্রাফপুর, সিলেটের নিধনপুর, ভাটেরা, কালাপুর ও কুমিল্লার গুনাইঘরে প্রাপ্ত তাম্রলিপির বিবরণ পরস্পর সমন্বয় করে দেখা যায়। খ্রিস্টীয় সাত শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত ময়নামতি একাধারে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ প্রত্নস্থল ও এর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে যেসব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক (ক) বৌদ্ধ মহাযানী মতবাদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এ প্রত্নস্থলেই ব্রজযানসহ তন্ত্রযানের সাথে হিন্দু ধর্মের পঞ্চোপসনাভুক্ত শাস্ত্রাচার ও শৈবাচার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল। রাজনৈতিক দিক থেকেও এটি ছিল আরাকানী অহমীয়া এবং বাঙালি শক্তির পারস্পরিক মিলনের এক সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল।

মাহিসন্তোষ ঃ পাথরঘাটা থেকে আনুমানিক পঁচিশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন একটি গ্রামের নাম চৌঘাট। নওগাঁ জেলা সদর থেকে বাসে ধামুরহাট পর্যন্ত এসে একটি অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ ধরে চৌঘাটে পৌছা যায়। এই গ্রামের প্রায় চল্লিশ হেক্টর জায়গা জুড়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গৌড়, দেবকোট প্রভৃতি প্রাচীন রাজধানীগুলোর সাথে ভৌগোলিক নৈকট্য এবং ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে মিনহাজু-ছ-সিরাজ কর্তৃক রচিত তাবাকাত-ই-নাসিরীর বর্ণনার সাথে কতিপয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে চৌঘাটের প্রত্ননিদর্শনগুলোকে প্রাচীন মকসিদা এবং সন্তোষ নামক শহরের ধ্বংসাবশেষ বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞ ধারণা করেছেন। আর তাই দু-চারজন গ্রামবাসীকেও গ্রামটির নাম মাহিসন্তোষ বলে উল্লেখ করতে শোনা যায়।

মাহিসন্তোষের উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে একটি মাটির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত। আয়তাকারে (২৭৫ মিঃ × ২৫৫ মিঃ) নির্মিত দুর্গটির পশ্চিম দিক দিয়ে শীর্ণকায় আত্রাই নদীর মজা খাত প্রবাহিত হচ্ছে। মাটির প্রাচীরগুলোর বর্তমান গড় উচ্চতা ৩.০৫ মিঃ এবং প্রস্থ ১৬.৫৬ মিঃ। দক্ষিণ বাহুর মাঝামাঝি অংশে একটি ভাঙা অংশ দেখা যায়। সম্ভবত এ অংশটি দুর্গ-তোরণের সাক্ষী বহন করছে। প্রাচীরের বাইরের পাদদেশ ঘেঁষে প্রায় ২.৭৫ মিঃ প্রশস্ত কৃত্রিম প্রতিরক্ষা পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। তবে অতীত কালে মাটির প্রাচীরের উচ্চতা এবং পরিখার প্রস্থ যে আরও অনেক বেশি ছিল তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

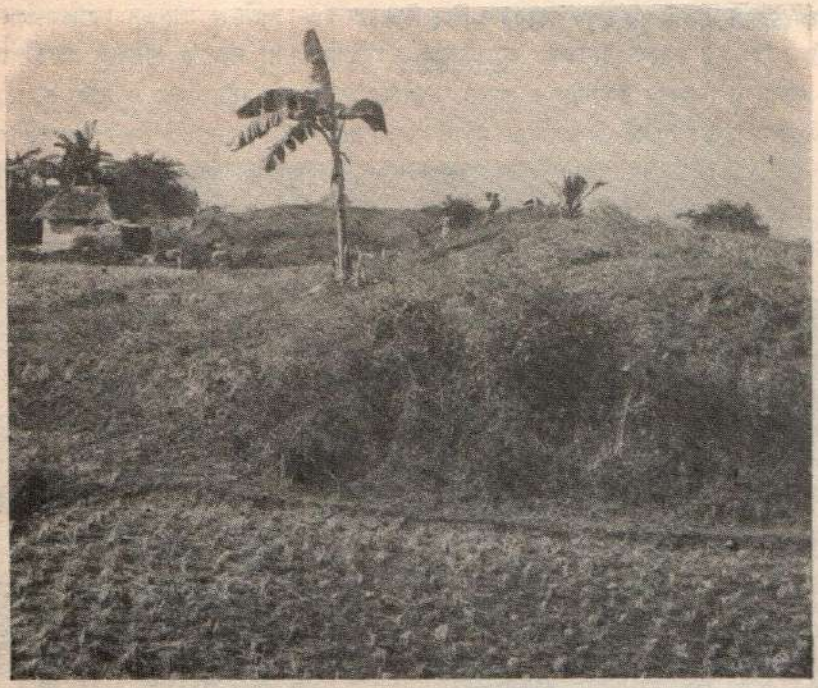
দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ বর্তমানে আবাদি জমি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেবল দক্ষিণ-পূর্বাংশের কিছুটা জায়গা দু'টি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ ঢিবির দ্বারা অধিকৃত হয়ে আছে। অবশিষ্ট অংশ থেকে হাল কর্ষণের সময় প্রায়ই ইট-পাটকেল ও খোলামকুচি জাতীয় সাংস্কৃতিক জঞ্জাল অনাবৃত হতে শোনা যায়। তাই এটা নিশ্চিত যে অতীতে দুর্গটির অভ্যন্তরে বেশ কিছু ইমারত ও বসতি ছিল।

দুর্গের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিঠাপুকুর নামে একটি মাঝারি আকারের দিঘি আছে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দিঘিটির পশ্চিম পাড়ের সংলগ্ন অনেকটা জমি পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে গড়ে প্রায় দেড় মিটার উঁচু। এ অংশের মাটির রঙ একটু বেশি লালচে এবং গঠন তুলনামূলকভাবে ভিন্নতর। এখানে সেখানে বিভিন্ন আকারের কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাঁচের পাথর খণ্ডসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক জঞ্জাল ছড়িয়ে আছে। এর একপ্রান্তে একটি প্রাচীন কবরও দেখা যায়। স্থানীয় জনগণের নিকট একটি কবর মায়াবিবির এবং অপরটি তার কন্যার বলে পরিচিত। কিন্তু এ যাবৎ ঐতিহাসিক কোন সূত্র থেকে মায়াবিবির পরিচয় সংক্রান্ত কোন তথ্য জানা যায় নি।

মায়াবিবির মাজারের সংলগ্ন পশ্চিমাংশে একটি গোরস্থান আছে। বর্তমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ অংশের সাংস্কৃতিক জঞ্জালগুলো থেকে অনুমিত হয় যে গোরস্থানটির চারপাশে এক সময় প্রাচীর ছিল। বর্তমানে কেবল কয়েকটি পাকা কবর অবশিষ্ট আছে। এরমধ্যে একটি কবর 'উজিরের কবর' নামে পরিচিত। তবে উজির পদবীধারী ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সকলেই নীরব। অপর দিকে কোন কোন সূত্র থেকে জানা গেছে, খ্রিস্টীয় তের শতকে জনৈক মাওলানা নবিউদ্দিন আল আরাবীর নেতৃত্বে এ প্রত্নস্থলে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা

অনুমান করা যায়, সম্ভবত উক্ত মাদ্রাসা নির্মাতার কবরটিই হয় তো এই গোরস্থানের কোন এক স্থান দখল করে আছে।

আলোকচিত্র -৪১



মাহিসন্তোষ দুর্গের উত্তর পূর্বকোণ ধামুরহাট, নওগাঁ

উজিরের কবরের অনতিদূরস্থ দক্ষিণ দিকের একটি পরিত্যক্ত ভূমি-খণ্ডে একটি দশ গম্বুজ বিশিষ্ট হোসেন শাহী আমলের মসজিদ ছিল। খনন অধ্যায়ে এর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। মসজিদটি বর্তমানে বারদুয়ারী নামে পরিচিত।

এ যাবৎ চৌঘাট (মাহিসন্তোষ) এলাকা থেকে আরবি লিপি উৎকীর্ণ মোট তিনটি পাথর-পট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে একটি আকারে বেশ বড় এবং এটি মায়াবিবির দরগার দেয়ালে লাগানো ছিল। এই শিলালিপিতে বাংলার সুলতান রুকুন-উদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-৭৬ খ্রিঃ) একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় শিলালিপিটি আকারে ছোট হলেও এর বর্ণিত বিষয় প্রথম শিলালিপির অনুরূপ। তৃতীয়-শিলালিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এর পরিমাপ ৪৮.২ সেমিঃ × ৪৮.২ সেমিঃ । এরমধ্যে ৯১২ হিজরিতে (১৫০৫ খ্রিঃ) সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালে একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। সম্ভবত

বারদুয়ারীর ধ্বংসাবশেষই এই শিলালিপিতে বর্ণিত মসজিদের স্মৃতি বহন করছে। অপর দু মসজিদের চিহ্নসম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সম্প্রতি বরেন্দ্র জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এ এলাকা থে ৩৫টি নকশি ইটও সংগ্রহ করেছে। সংগৃহীত ইটগুলো সংগ্রহকারকগণের মতে মসজিদে ব্যবহৃ হয়েছিল (ইত্তেফাক, ২৬/৪/৯৭ সংখ্যা, পৃ: ৮)। একইস্থানে তিনটি মসজিদ, একটি দুর্গ একাধিক ইমারতের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে খ্রিস্টীয় পনের-ষে শতকে চৌঘাটে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের অস্তিত্ব ছিল।

আলোকচিত্র - ৪২



মাহিসন্তোষ দুর্গের পরিখা, ধামুরহাট, নওগাঁ

চৌঘাটের বিলীয়মান শহরটি কখন এবং কার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানার মতে কোন ঐতিহাসিক সূত্র এ যাবৎ পাওয়া যায় নি। তবে এ প্রত্নস্থলটিতে প্রাপ্ত একটি মূর্তির ভগ্নাংশে কুষাণ আমলে (খ্রিস্টীয় এক-দুই শতক) প্রচলিত শিল্পশৈলীর ছাপ লক্ষ করা গেছে, তাছাড় পূর্বে উল্লিখিত ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিটি এবং বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত মিহরাবের উল্টে পিঠগুলোতে সূর্য ও বিষ্ণু মূর্তির অস্তিত্ব রয়েছে। এইসব মূর্তির শিল্পশৈলীতে গুপ্ত পরবর্তী আমলের (খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতক) প্রভাব অনস্বীকার্য। এ হিসাবে চৌঘাটের বিস্মৃত শহরটির

সময়কাল খ্রিস্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া যায়।

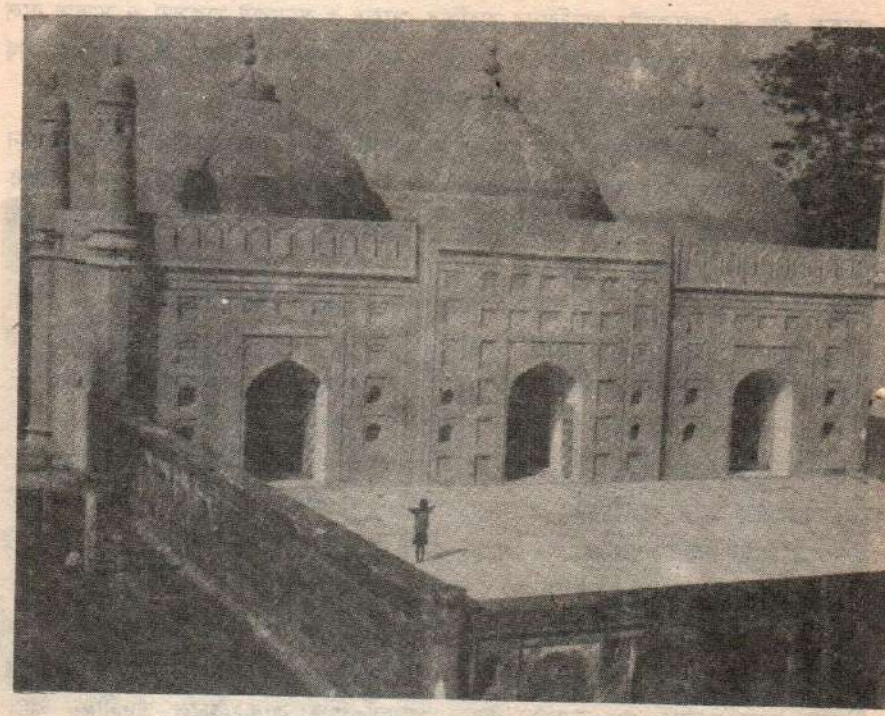
তাবাকাত-ই-নাসিরীর বর্ণনা থেকে দেখা যায়, প্রথম বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খলজী লক্ষনৌতি (মালদা নবাবগঞ্জের গৌড়) থেকে বেকোটে (পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর জেলায়) রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে আত্মকলহের সূত্রপাত হয়েছিল। এই আত্মকলহের পথ ধরে মকসিদা ও সন্তোষ নামক স্থানে বখতিয়ার খলজীর একজন সেনাধ্যক্ষ নিহত হলে তাকে সেখানেই কবরস্থ করা হয়। চৌঘাট যেহেতু গৌড় ও দেবকোটের অনতিদূরে অবস্থিত সেহেতু এ স্থানকেই মাকসুদা ও সন্তোষ বলে অধিকাংশ পণ্ডিত শনাক্তকরণে ঐক্যমত্য পোষণ করেন। এ কারণেই চৌঘাটের প্রত্ননিদর্শনাদি দীর্ঘ দিন ধরে মাহিসন্তোষ নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে এ যাবৎ সুলতান রকুন-উদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৫ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান শামস-উদ্দীন-মোজাফফর শাহ (১৪৯০-৯২ খ্রিঃ) ও সুলতান নাসির-উদ্‌দীন নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিঃ) যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে ওগুলোর কয়েকটিতে বারবাকাবাদ নামে একটি টাকশালের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এ নামে কোন শহর বা টাকশালের অস্তিত্ব বাংলাদেশের অপর কোনপ্রান্তে আবিষ্কৃত হয় নি। অন্যদিকে মুগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলা সুবায় (প্রদেশের সমতুল্য) উনিশটি সরকারের (জেলার সমতুল্য) অস্তিত্ব ছিল। উনিশটি সরকারের মধ্যে একটির নাম ছিল বারবাকাবাদ। আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরীতে বারবাকাবাদের অধীন আটত্রিশটি মহালের (পরগনা, থানার সমতুল্য) যে বর্ণনা রয়েছে তার সাথে ধামুরহাট ও এর সংলগ্ন অঞ্চলের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাই মাহিসন্তোষ ও বারবাকাবাদকে অভিন্নবলেই অনুমিত হয়। বারবাকাবাদ কোষাগারের নামে উৎকীর্ণ কয়েকটি মুদ্রাও আমাদের সন্ধানে রয়েছে। এমতাবস্থায় এটাও ধরে নিতে আপত্তি থাকে না যে চৌঘাটের ধ্বংসস্তূপে একটি কোষাগারের সাংস্কৃতিক কঙ্কাল লুকায়িত আছে।

গৌড়ের (লক্ষণাবতী) উপশহর ঃ আদি -ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যপর্ব থেকেই গৌড় নামে একটি জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। রাজকীয় গুপ্ত শাসনামলের শেষদিকে (আঃ খ্রিস্টীয় সাত শতক) গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। ফলে তদানীন্তন কালে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পূর্বাঞ্চলেও গৌড় নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। মহারাজ শশাঙ্কের (আঃ ৬০৬-৬২৫ খ্রিঃ) রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি রেলস্টেশনের সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে এই রাজ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। অতপর মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে (১২০৪-৫ খ্রিঃ) এই রাজ্য দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল বলে জানা যায়। গঙ্গা (পদ্মা) নদীর পশ্চিমের অংশটির নাম ছিল রাল (রাঢ়), আর পূর্বের ভূখণ্ডটির পরিচিতি ছিল বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র (বারিন্দ্র) নামে। এই শেষোক্ত অংশে মোট দু'টি রাজধানী ছিল। প্রথমটি দেবকোট বা দিউ-কোট (বানগড়=পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত) এবং দ্বিতীয়টি লক্ষনৌতি বা লক্ষণাবতী। শেষোক্তটির অপর নাম গৌড়। আবার মুগল আমলে (১৫২৬-১৬৯৫ খ্রিঃ) এর নাম হয়েছিল জান্নাতাবাদ। (স্বর্গ নগরী)। বর্তমান

মালদহ জেলা এবং বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্তে এই শহরের অবস্থান চিহ্নি করা হয়েছে। তাই অনুমিত হয়েছে যে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষপর্ব থেকে এখানে নগ সভ্যতা বিকশিত হতে শুরু করে এবং মাঝখানে সামান্য বিরতি ব্যতিরেকে মোটামুটি খ্রিস্টী ষোল শতক পর্যন্ত এ শহর জনবহুল ছিল। অতপর পদ্মার (গঙ্গার) গতিপরিবর্তন ও মহামারী প্রাদুর্ভাব ঘটিত কারণে এ নগরী পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কিন্তু পরিত্যক্ত নগরীটির যত্রতত্র আজও

আলোকচিত্র -৪৩

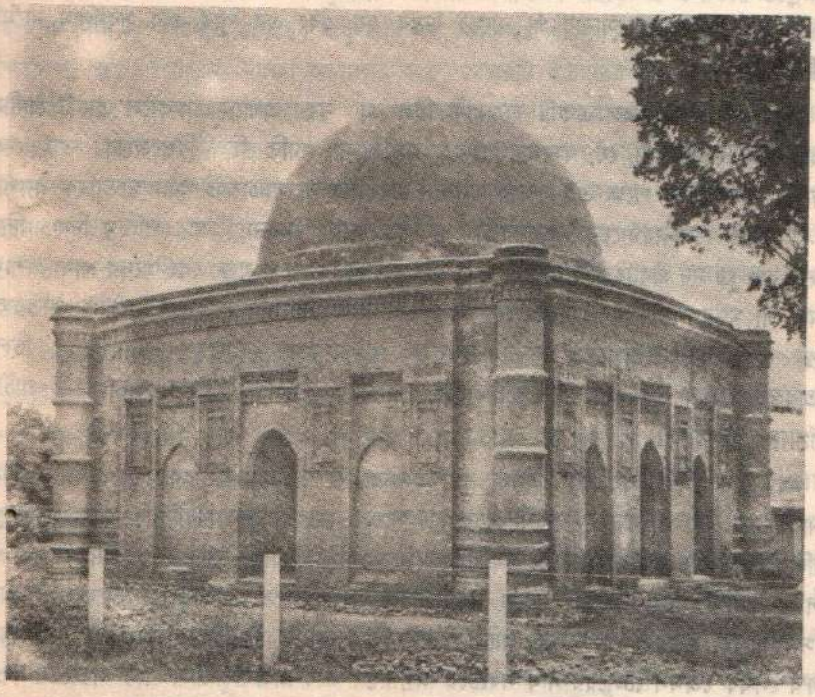


শাহনিয়ামত উল্লাহ ওয়ালির মসজিদের সম্মুখভাগের দৃশ্য, গৌড়

ছড়িয়ে আছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থাপত্য কীর্তি। এছাড়াও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঢিবি। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত ঢিবিগুলোর মধ্যে দুধপুকুর ও শিয়ালমারা অন্যতম। এছাড়া রয়েছে সুলতানি ও মুগল শাসনামলে নির্মিত বেশ কয়টি ঐতিহাসিক ইমারত। এসব ইমারতের মধ্যে ছোট সোনা মসজিদ, দারাসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসা, খানিয়া দিঘি মসজিদ, শাহ সুজার হাম্মাম, শাহ নিয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর মাজার ও মসজিদ অন্যতম। এছাড়া বিস্তীর্ণ প্রত্নস্থলটির বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি তুঘরা লিপি সংবলিত লিপিফলকও আবিষ্কৃত হয়েছে। এসবের পাঠোদ্ধার থেকে জানা গেছে যে বর্তমান গৌড়ের বিরান এলাকায় আরও বহু মাজার এবং

মসজিদের নিদর্শন লুকিয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ এলাকায় প্রাচীন বসতির সাক্ষী স্বরূপ অসংখ্য দিঘি পুষ্করিনী তো রয়েছেই।

আলোকচিত্র -৪৪



সাধারণ দৃশ্য, গোয়ালদি মসজিদ, সোনার গাঁ

সোনার গাঁ ঃ বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম সুবর্ণগ্রাম (স্বর্ণের গ্রাম) এর রাজধানীটিও অতীতে এই নামেই পরিচিত ছিল। রামায়ণে এই নামের উল্লেখ রয়েছে। তবে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে খ্রিস্টীয় তের শতকের ফার্সি ইতিহাসবিদ জিয়াউদ্দিন বারানীই প্রথম তাঁর রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে' সুবর্ণগ্রামের উল্লেখ করেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে সুবর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন দলুজ রাঁও। এরপর উক্ত অঞ্চলে মুসলমান শাসনের প্রবর্তন হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক ধরে ঢাকা থেকে আনুমানিক ২৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে অগ্রসর হলে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরের অদূরবর্তী স্থানে বর্তমানে সোনার গাঁ (স্বর্ণের গ্রাম) নামে একটি গ্রামের অস্তিত্ব আছে। এই গ্রামের সংলগ্ন পানাম, গোয়ালদি, মুগরাপাড়া ইত্যাদি মৌজায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বেশকিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাই বর্তমানে

সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বর্তমান সোনার গাঁ নামটি প্রাচীন সুবর্ণ গ্রামের কালানুক্রমিক বিবর্তিত রূপ মাত্র। প্রায় সকলেই আরও বিশ্বাস করেন যে, আলোচ্য মুগরাপাড়া-সোনার গাঁ এলাকাই ছিল প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের রাজধানী। অবশ্য সুবর্ণগ্রাম থেকে সোনার গাঁ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে এমন মতও প্রচলিত আছে যে, খ্রিস্টীয় ষোল শতকের বারভূঁইয়া নেতা ঈসা খানের স্ত্রী সোনাবিবির নাম থেকে সোনার গাঁ নামের উদ্ভব হয় এবং এর পূর্বে এটা সুবর্ণগ্রাম নামেই পরিচিত ছিল।

সোনার গাঁ যে কেবল একটি রাজধানী ছিল তা নয়। এখানে এককালে একটি প্রাচীন বন্দরও ছিল। উল্লেখ্য যে, সোনারগাঁয়ের মসলিনের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তাই দেশ বিদেশের বণিকগণের পক্ষে এই বন্দরে মসলিন ক্রয়ের জন্য যাতায়াত করা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বস্তুত সোনারগাঁয়ের অদূরবর্তী পূর্বদিক দিয়ে মেঘনা, আর পশ্চিম দিক দিয়ে আজও ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হচ্ছে। এ দু'টি নদীই সাগরের সাথে যুক্ত এবং এদের শাখা-প্রশাখা সোনার গাঁ মুগরাপাড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। তাই রাজধানী স্থাপনের মতো পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বন্দর স্থাপনের মতো উপযুক্ত যোগাযোগের সুযোগ সোনারগাঁয়ের ছিল। এমতাবস্থায় আমরা এক প্রকার নিশ্চিতভাবেই ধরে নিতে পারি যে বর্তমান সোনারগাঁ-ই প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের রাজধানী।

মধ্য-ঐতিহাসিক পর্যায়ের লেখক, ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণের মধ্যে প্রাচীন সোনারগাঁয়ের বিত্ত ও বৈভব সম্পর্কে প্রচুর সূত্র পাওয়া যায়। যাদের বিবরণাদি থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাদি পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে রালফ্ ফিচ (১৫৮৫ খ্রিঃ), বাহারিস্তান-ই-গায়বীর লেখক ও মুগল সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নাথান, নবাবি আমলে রচিত রিয়াজুস সালাতিনের লেখক গোলাম হোসেন সলিম, ইংরেজ শাসনামলে রচিত 'স্কেচ অব দ্য স্ট্যাটিসটিক্যাল এণ্ড টপগ্রাফি অব ঢাকা'র লেখক জেমস টেলরের নাম সবচেয়ে অগ্রগণ্য। তবে রাজধানীটি সম্পর্কে সবচেয়ে স্পষ্ট বর্ণনা সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্ব কালে (১৩৯০-১৪১০ খ্রিঃ) সোনার গাঁ ভ্রমণকারী চৈনিক মাহুয়েনের বিবরণে পাওয়া যায়। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, তদানীন্তন কালে রাজধানীর সীমানা প্রান্তে প্রাচীর এবং অভ্যন্তরে সুরমা রাজপ্রাসাদ এবং আমীর-ওমরাহদের শানশওকতময় বাসভবন ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে বর্তমান সোনারগাঁয়ে এসবের কোন চিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই।

সোনারগাঁয়ে প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকলেও এর চারপাশের সংলগ্ন মোগরাপাড়া, দমদমা, পানাম ও গোয়ালদিহি নামক গ্রামগুলোতে বেশকিছু ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে. দমদমা নামক গ্রামটির তিন দিক একসময় পরিখা এবং দক্ষিণ দিক মোনাখালি নামক ছোট্ট নদী দিয়ে বেষ্টিত ছিল। ফারসি শব্দ দমদমা অর্থ ঢিবি, উঁচুস্থান বা দুর্গ। এছাড়া এর সংলগ্ন মোগরাপাড়ায় বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশকিছু সংখ্যক প্রাচীন ইমারতের চিহ্ন। আর এসব কারণেই দমদমা-মোগরাপাড়াকে প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম বন্দর ও রাজধানী নগরী হিসাবে ধরে নিতে তেমন একটা বাঁধা থাকে না।

দমদমা-মোগরাপাড়ার ইমারতগুলোর মধ্যে জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের মসজিদ, শাহ ইব্রাহিম দানিশমন্দ সাহেবের মাজার, মান্না শাহের মাজার ও শাহী কবরস্থান, নওবতখানা, খানকাহ,টাকশাল ও নাসির উদ্দিন মুনসির মাজার অন্যতম। এছাড়া এ এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দিঘি-পুস্করিনীও রয়েছে। শুধু তাই নয়, কতিপয় স্থানে পাথরের ছোট বস্তু গোরীপট্ট, শিবলিঙ্গ, স্তম্ভ, পাটাতন, দরজা-জানালার বাজু, গোবরাট ইত্যাদির ভগ্নাংশও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে এবং পুন:ব্যবহৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ সবের মধ্যে কোনটির সময়কাল কত তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। কেবল এটুকু অনুমেয় যে পাথরের নিদর্শনগুলো প্রাক-মুসলিম আমলে প্রচলিত শিল্পশৈলী বহন করছে। অপরদিকে স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের ইটের আকৃতি এবং গাঁথুনির মসলা (সুরকি) মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত শৈলীর বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া একটি কবরে ৮৮৯ হিঃ এবং একটি মসজিদে ১১১২ হিঃ উৎকীর্ণ দু'টি লিপিফলক সংযোজিত আছে।

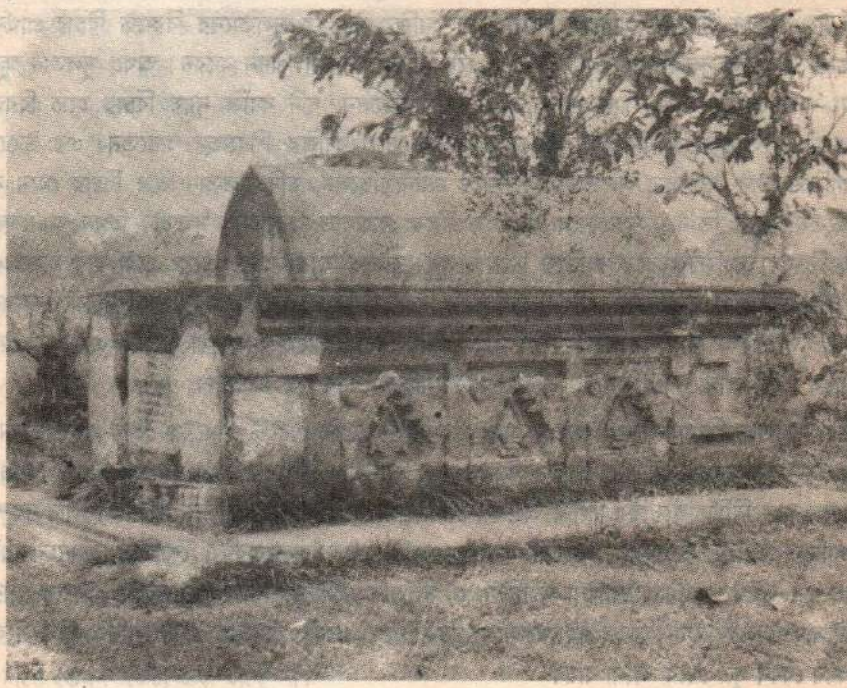
দমদমার প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সচিলপুর গ্রামে দু'টি পাকা কবর সংবলিত একটি কবর স্থান আছে। দু'টি কবরের মধ্যে পশ্চিম দিকেরটিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সমাহিত আছেন বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইনি সেই সুলতান যার শিকারের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীর অকস্মাৎ এক বিধবা বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে বিধবা মৃত বালক পুত্রের তীরবিদ্ধ মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে কাজির দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেন। কাজি সুলতানের ভয়ে ভীত না হয়ে ন্যায় বিচার সম্পাদন করেন। অথচ সুলতান ক্ষুব্ধ না হয়ে কাজিকে পুরস্কার প্রদান করে জানিয়েছিলেন, যদি কাজি ন্যায় বিচার হতে বিরত থাকতেন তবে তিনি নিজের শাণিত তলোয়ার দিয়ে কাজির শিরচ্ছেদ করতেন। এর উত্তরে কাজিও তার বেতখানা সুলতানকে দেখিয়ে জানিয়েছিলেন, যদি সুলতান তাঁর বিচার মেনে না নিতেন, তবে তিনিও সুলতানকে ঐ বেত দিয়ে বেত্রাঘাত করতেন। সুলতান তখন আনন্দের আতিশয্যে কাজিকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। রাজত্ব আর সম্পদ একে একে হার মানলেও বৃদ্ধা বিচারক ও সুলতানের কাহিনী হার মানে নি। বাঙালিদের মুখে মুখে কিংবদন্তির রূপে যুগের পর যুগ প্রাণের নির্যাসের মতো বেঁচে আছে ন্যায় বিচারের এই কালজয়ী দৃষ্টান্ত। এই আমাদের ঐশ্বর্য! এই আমাদের ইতিহাস! এ কি সোনারগাঁয়ের কোন ক্ষুদ্র উপহার?

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কবরটির উপর একটি পাথরের তৈরি কবরাচ্ছাদন স্থাপন করা আছে। এর নিচের অংশ আয়তাকার মঞ্চ এবং উপরের অংশ নৌকার নিরেট ছৈ এর মতো করে নির্মিত হয়েছে। নিচের অংশের চারপাশেই সারিবদ্ধভাবে ত্রিভাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা শোভিত আছে। খিলানের অবতল অংশে একটি ঝুলন্ত অলংকরণও শোভিত হয়েছে। এই নকশার সাথে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও সুলতান সেকান্দর শাহের মাজারের অলংকরণের সৌসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই মাজারের উত্তরাংশে একটি পাথরের চেরাগদানিও ছিল বলে কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায়।

প্রাচীন সোনারগাঁয়ের স্মৃতি বিজড়িত এ এলাকার অপর একটি ইমারতের নাম গোয়ালদিহি

মসজিদ। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার থেকে আনুমানিক চার কিলোমিটার উত্তরে গোয়ালদিহি গ্রামে এর অবস্থান। এই শতকের গোড়ার দিকে মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ টিবি রূপে বিরাজ করছিল। কয়েক বছর পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মসজিদের মূল কাঠামো পুনরুদ্ধার ও মেরামত সম্পন্ন করেছে। বাইরের দিকথেকে এই মসজিদ দেখতে বর্গাকার হলেও এর ভেতরের কক্ষটি অষ্টকোণাকার। এককক্ষবিশিষ্ট স্বল্প পরিসরের এই মসজিদটির ছাদ একটি মাত্র গম্বুজ দিয়ে ঢাকা। এর কার্নিশ সামান্য বাঁকা। ভেতরের অংশের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অবতল মিহরাব আছে। মধ্যবর্তী স্থানে মিহরাবটি আকারে বড় এবং কারুকার্যময় পাথর দিয়ে মনোরমভাবে সজ্জিত। এই উভয়পাশের ইটের তৈরি খিলান দু'টি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। দেয়ালের গায়ের কোন কোন অংশে পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায়। উনিশ শতকের সত্তর দশকে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি কালো পাথরের লিপিফলক উদ্ধার করেছিলেন। লিপিফলকটির পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ৯২৫ হিজরিতে নির্মিত হয়েছিল।

আলোকচিত্র – ৪৫



গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মাজার, সোনার গাঁ

খলিফাতাবাদ ঃ বাগেরহাট জেলা সদরের হাউলি মোকাম নামে পরিচিত এলাকায় খ্রিস্টীয় ষোল শতকে খলিফাতাবাদ নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল স্থানীয় একজন মুসলিম সেনাধ্যক্ষের প্রশাসনিক কেন্দ্র। এ শহরে তদানীন্তন কালে একটি টাকশালও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শহরটি আজ বিস্মৃত প্রায়। আর এর অধিকাংশ প্রাচীন নিদর্শনাদি পরবর্তীকালে নির্মিত বাড়ি-ঘরের নিচে চাপা পড়ে গেছে। তবু ছিটেফোঁটা যা কিছু যত্রতত্র অবশিষ্ট আছে সেগুলো সুন্দরঘোনা, সোনাতলা, বারাকপুর, রণবিজয়পুর, কাঁঠালগ্রাম এবং আরও কয়েকটি পার্শ্ববর্তী মৌজার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ধ্বংসাবশেষগুলোর উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে ভৈরব নদীর মজে যাওয়া খাত।

খলিফাতাবাদ নামকরণ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে শহরটি মুসলিম শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানার জন্য একটি ইমারতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এটি একটি সমাধিসৌধ। এর কবরের উপর লিপি সংবলিত একটি কবরাচ্ছাদন রয়েছে। লিপিটির পাঠ অনুযায়ী কবরে সমাহিত ব্যক্তি ৮৬৩ হিজরিতে (১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লিপিটিতে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতি হিসাবে উলুঘ খান জাহান উল্লেখ আছে।[৪৫] আর তাই সমাধিসৌধটি 'খানজাহান আলীর'(!) মাজার রূপেই সাধারণ জনগণের নিকট সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি একজন কামেল পীর ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সূচক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে উলুঘ খানজাহান একটি রাজকীয় পদবি মাত্র। এই পদবি সুলতানগণ কেবল ঐসব অতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণকে প্রদান করতেন যাঁরা কোন বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হতেন। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই সঙ্গত কারণেই ধরে নেওয়া যায়, খলিফাতাবাদ শহরটি সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর কোন একজন অতি উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উলুঘ খান জাহানের সমাধিসৌধটি একটি অনুচ্চ দেওয়াল ঘেরা চত্বরের মাঝখানে দণ্ডায়মান। এটি একটি ৪.৫৭ মি: উঁচু বর্গাকার ইমারত। এর সম্পূর্ণ ছাদ একটি মাত্র গম্বুজ দিয়ে আবৃত। এর কার্নিশ সামান্য বাঁকা। অভ্যন্তরভাগের ১২.৮ মিঃ × ১২.৮ মিঃ পরিমাপের মেঝের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে আছে মূল কবর। কবরটির উপর প্রতিষ্ঠিত পাথরের কবরাচ্ছাদনটি দুই অংশে বিভক্ত। নিচের অংশ আয়তাকার মঞ্চ এবং উপরের অংশ নৌকার নিরেট ছৈ এর সাথে তুলনীয়। কবরাচ্ছাদনটির সর্বাঙ্গে হস্তলিপিবিদ্যার মনোরম শৈলীতে কলেমা তৈয়ব, কলেমা শাহাদত, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও চার খলিফার নাম, সুরা তাকাসুর, আয়াতুলকুরসি, সুরা কাফেরুন, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাছ এবং চার ফেরেশতার নাম উৎকীর্ণ আছে। স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে সমাহিত উলুঘ খান জাহান কেবল একজন অতি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন রাজকীয় ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, বরং একজন উঁচুদরের খোদাভীরু কামেলও ছিলেন।

---

৪৫ . হাবিবা খাতুন, 'সমাধি লিপিতে বাগেরহাটের খান জাহান পরিচিতি, আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ', ১৯৯১, পৃ. ২৭২

সম্ভবত এ কারণেই তিনি আজও পীর হিসাবে বহুল পরিচিত।

উলুঘ খান জাহানের মাজারের সংলগ্ন দক্ষিণে খাঞ্জালী দিঘি নামে একটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা বিরাটাকার জলাশয় আছে। এর গভীরতা প্রায় ১২.১ মি:। এমনকি এ দিঘিতে কুমির পর্যন্ত বসবাস করছে। মাজারের লাগোয়া পশ্চিমে একটি মসজিদও আছে। আরও একটি নয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে খাঞ্জালী দিঘির পশ্চিমপাড়ে। খলিফাতাবাদের অন্যান্য নিদর্শনাদির মধ্যে চুনাখোলা মসজিদ, রেজাখোদা মসজিদ, সিংগাইর মসজিদ, পঁচা দিঘি, আন্দেলখার দিঘি, বক্তার খার দিঘি, কোদালাখোয়া দিঘি, বাদুরা দিঘি, বিবি বেগনি মসজিদ, কাঁঠাল গ্রামের

আলোকচিত্র -৪৬



ষাটগম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের থাম, বাগেরহাট

মসজিদ, রনবিজয়পুর মসজিদ ও দিঘি অন্যতম। আকার আকৃতি ও গম্বুজের সংখ্যার ভিত্তিতে একটির সাথে অপর মসজিদের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

রণবিজয়পুর মসজিদ এক গম্বুজ বিশিষ্ট ও কাঁঠাল গ্রামের মসজিদ নয় গম্বুজ বিশিষ্ট। তবে খলিফাতাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইমারতটির নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ। কারণ এটা বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়।

সুন্দরঘোনা নামক গ্রামের সুবিশাল (৯১৫ মি: × ৫৪৮ মিঃ) ঘোড়াদিঘি নামক জলাশয়ের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত ষাটগম্বুজ মসজিদের মেঝায়াতন ৫১ মিঃ (উত্তর দক্ষিণে) × ৩২ মিঃ (পূর্ব-পশ্চিম)। এর কার্নিশ ঈষৎ বাঁকা এবং মেঝে থেকে এর উচ্চতা ৬০ মিঃ। সম্পূর্ণ ছাদটিকে পূর্ব পশ্চিমে এগারোটি ও উত্তর-দক্ষিণে সাতটি লম্বভাগে এবং মোট সাতাত্তরটি চতুর্ভুজে বিভক্ত করে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা মধ্যের একটি সারিতে মোট সাতটি চৌচালাকার এবং অবশিষ্ট চতুর্ভুজগুলোর প্রতিটিতে একটি করে মোট সত্তরটি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মসজিদের বাইরের চারকোণের প্রতিটিতে একটি করে গোলাকার সংলগ্ন বুরুজ আছে। প্রতিটি বুরুজের শীর্ষেও একটি করে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ শোভিত রয়েছে। এভাবে এই মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা সর্বমোট একাশিটিতে দাঁড়িয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে ছাদের গম্বুজগুলোর ভার বহনের জন্য ছয় সারিতে বিভক্ত হয়ে প্রতি সারিতে উত্তরে-দক্ষিণে দশটি করে মোট ষাটটি পাথরের থাম রয়েছে। সম্ভবত এজন্যই মসজিদটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

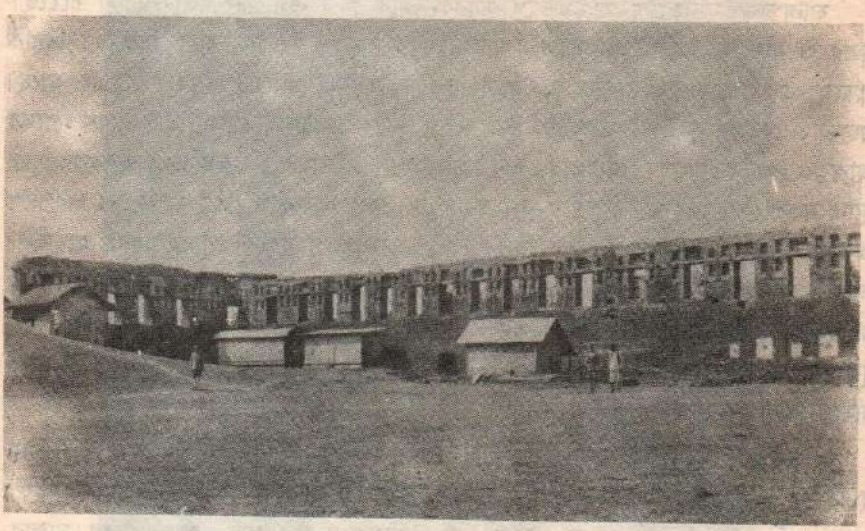
ষাটগম্বুজ মসজিদের সম্মুখভাগে সারিবদ্ধভাবে মোট এগারটি খিলান-দরজা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের প্রতিটি দেওয়ালেও সাতটি করে অনুরূপ খিলান-দরজা আকারের খিরকি রয়েছে। একইভাবে অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেওয়ালেও মোট এগারটি অবতল মিহরাব আছে। এছাড়া এ দেয়ালে কেন্দ্রীয় বড় মিহরাবটির সংলগ্ন উত্তরে একটি অতিরিক্ত ছোট প্রবেশ পথের অস্তিত্বও লক্ষ করা যায়। দেয়ালের কোন কোন অংশে পোড়ামাটির ফলক এবং অলঙ্করণযুক্ত ইটের নকশাও দেখা যায়। বিশেষ করে মিহরাবগুলো বেশ আকর্ষণীয়। এই মসজিদের চারপাশে অতীতে দেয়াল ঘেরা একটি চত্বর ছিল। কিন্তু দেয়ালগুলো বহুদিন পূর্বেই বিনষ্ট হয়েছিল। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মাটি খুঁড়ে বিলুপ্ত দেয়ালের ভিত আবিষ্কার করেছে। প্রতিটি বাহুর মধ্যবর্তী অংশে একটি করে তোরণ এবং সামনের দু'টি কোণের প্রতিটি কোণে একটি করে বুরুজের চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মসজিদের অভ্যন্তরে একত্রে দুই হাজার লোকের নামাজ আদায়ের সংস্থান রয়েছে।

খলিফাতাবাদের অন্যান্য প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে অসংখ্য পাকা কবর এবং বৈচিত্র্যময় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে জিন্দাপীরের মাজার, এবাদতখানা, মুসাফির খানা, বাড়ি, কাচারি, চিল্লাখানা, সৈয়দ শাহ মোহাম্মদের মাজার, আগুনপীরের মাজার, ঠাণ্ডাপীরের মাজার, পাগলাপীরের মাজার এবং খাঞ্জালীর রাস্তা ও বসত বাড়ি অন্যতম। এছাড়া মিঠাপুকুর নামে একটি জলাশয়ের পাশে টাকশাল নামে পরিচিত একটি স্থানও রয়েছে। অন্যান্য বহুস্থানে অগুনিত খোলামকুচি এবং পাটকেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আর তাই স্থানীয় জনগণ আজও বিশ্বাস করে যে বিস্মৃত এ শহরে অতীতে ৩৬০টি দিঘি সমেত ৩৬০টি মসজিদ ছিল।

প্রাচীন খলিফাতাবাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নবস্তু স্থানীয় খান জাহানীয়া গণবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসাবে সংরক্ষণ করছেন।

জাহাঙ্গীরনগর ঃ খ্রিস্টীয় সতের শতকে মুগল সুবেদারদের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বর্তমান ঢাকা শহরটি জাহাঙ্গীরনগর নামে বিকশিত হতে শুরু করেছিল। তবে ইতিপূর্বেও এ শহরে বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এসব ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনটি নারিন্দা এলাকায় অবস্থিত। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদ ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে (৮৬১ হিঃ) নির্মিত হয়েছিল। এরপর থেকে ঐ শহরে আরও বহু ইমারত নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে মসজিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। আর তাই ঢাকাকে যথার্থ যুক্তিসঙ্গতভাবেই মসজিদের শহর বলা হয়। বর্তমানে দর্শনযোগ্য ইমারতাদির মধ্যে চকবাজার এলাকায় অবস্থিত বড়কাটরা, ছোটকাটরা, জাতীয় উদ্যানের পাশে অবস্থিত হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ, ধানমণ্ডিস্থ ঈদগাহ, মোহাম্মদপুরের সাত মসজিদ, জিঞ্জিরার প্রাসাদ, লালবাগের ঔরঙ্গবাদের প্রাসাদ-দুর্গ ও খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ উল্লেখযোগ্য। এগুলো সবই মুগল শাসনামলের নিদর্শন। এই যুগে নির্মিত কীর্তিরাজির মধ্যে লালবাগ প্রাসাদ-দুর্গ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি বর্তমানে লালবাগ কেল্লা নামে অধিক পরিচিত। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

আলোকচিত্র – ৪৭



লালবাগ দুর্গের পশ্চিম প্রাচীর, ঢাকা

লালবাগ কেল্লা ঃ ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম কর্তৃক ঔরঙ্গবাদ প্রাসাদ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এরপর সুবেদার শায়েস্তা খানও এ দুর্গের কিছু

নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তারা কেহই মূলনির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এ প্রসাদ দুর্গের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। আয়তাকার ভূমি-পরিকল্পনার অসমাপ্ত দুর্গটি বর্তমানে পূর্ব-পশ্চিমে ৬০৯ মিটার বিস্তৃত। উত্তর-দক্ষিণে এর প্রস্থ ২৪৩ মিঃ। দক্ষিণ পূর্বকোণে রয়েছে স্বতন্ত্র ইমারত আকৃতির প্রধান তোরণ। এছাড়া উত্তর বাহুর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের কাছাকাছি রয়েছে আরও দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির তোরণ। ইট নির্মিত এর প্রতিটি প্রাচীর কতটুকু উঁচু ছিল তা আজ আর বোঝার উপায় নেই, তবে এগুলো গড়ে ১.১৩ মিটার পুরু ছিল। দক্ষিণ দেয়ালে পারস্পরিক নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে কয়েকটি তোপমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া এই দেয়াল ঘেঁষে দুর্গের অভ্যন্তরে কিছু কক্ষ ছিল। খনন অধ্যায়ে কক্ষগুলোর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আছে একটি প্রহরী বুরুজ। এ স্থানে দুর্গের বাইরে ঢাকা শহরে প্রবেশের জন্য একটি ফটক ছিল বলে আঠার শতকের একজন ইওরোপিয় শিল্পীর অঙ্কিত একটি চিত্র থেকে জানা যায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, তোরণটির পশ্চিম অংশ বর্তমানে একটি বসতবাড়ির অংশে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমের সুউচ্চ দেয়ালের আংশিক এখনও টিকে আছে।

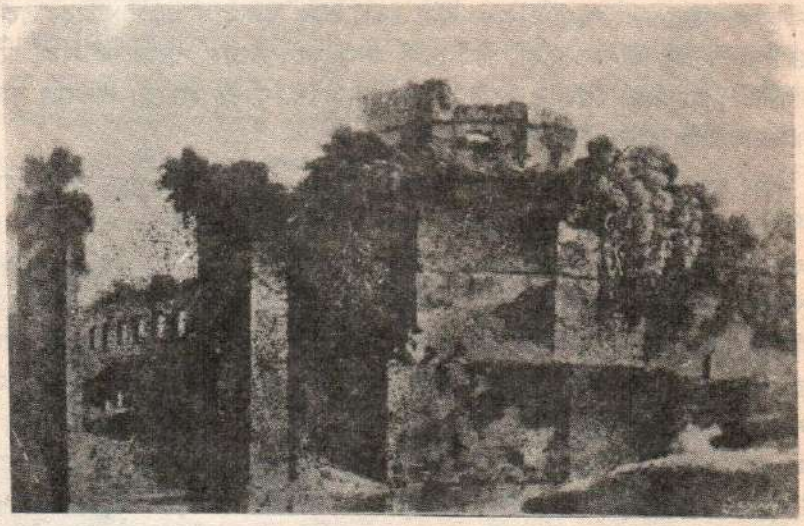
দুর্গের অভ্যন্তর ভাগের পূর্বপ্রান্তে একটি পুকুর আছে। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আছে পূর্বমুখী একটি দ্বিতল ভবন (বর্তমানে যাদুঘর)। দেওয়ান-ই-আম আকৃতিতে নির্মিত এ ভবনের নিচতলা হাম্মাম ও দ্বিতল হলঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা যায়। এর ছাপ বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত দোচালার আকৃতিতে নির্মিত। দেওয়ান-ই-আমের ৮৩মি: পশ্চিমে আছে পরীবিবির মাজার নামে পরিচিত আর একটি ইমারত। বেলে পাথর বাঁধান একটি অনুচ্চ মঞ্চের উপর বর্গাকারে (১৮.২৮ মি: × ১৮.২৮ মিটার) নির্মিত এ ইমারতের স্থাপত্যকলায় দিল্লীর দ্বিতীয় মুগল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির প্রভাব সুস্পষ্ট। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি বর্গাকার কক্ষ। এ কক্ষের প্রতিকোণে রয়েছে একটি করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের বর্গাকার কক্ষ। দু'কোণের দু'টি কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে আছে একটি করে আয়তাকার কক্ষ। এদের ছাদ হিন্দু স্থাপত্যবিদ্যার ক্রমঃপুরণ (করবেল) পদ্ধতিতে নির্মিত। ছাদের উপরাংশে সমান, কিন্তু কেন্দ্রস্থলে আছে একটি ছোট গম্বুজ, যার বহিরাবরণ তামার চকচকে পাত দিয়ে আবৃত। এর কেন্দ্রীয় কক্ষের মেঝে এবং কবরাচ্ছাদনের বহির্ভাগ মার্বেল দিয়ে মোড়া। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষটিও একই ধরনের। তবে এরমধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একটি কবরাচ্ছাদন দেখা যায়। অন্যান্য কক্ষগুলো ফাঁকা। হাম্মাম ও মাজার নামে পরিচিত এ ইমারত দু'টির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এদের জানালায় সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি জালি ব্যবহৃত হয়েছে।

পরীবিবির মাজারের দক্ষিণ দরজার সম্মুখভাগে মঞ্চের উপর পাশাপাশি দু'টি ইটসুরকি নির্মিত কবরাচ্ছাদনসহ কবর দেখা যায়। দুর্গের উত্তর বাহুর মাঝামাঝি অংশ ঘেঁষে শেষোক্ত ধরনের আরও দু'টি কবরাচ্ছাদন সহ কবর রয়েছে। এসব কবরে সমাহিত ব্যক্তিদের পরিচয় জানার মতো কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র আজ আর আমাদের হাতে নেই।

পরীবিবির মাজার সংলগ্ন কবরগুলোর বরাবর দক্ষিণের অনতিদূরে একটি অর্ধআবৃত

ইমারত আছে। এর উত্তরদিকের দেয়ালের বহিরাবরণ পলেস্তরার মুর্কানাস (মৌচাক) অলঙ্করণ সমৃদ্ধ এবং এর নিচে রয়েছে সংকীর্ণ একটি খিলান পথ, যার অপরপ্রান্তে একটি চতুর্ভূজ কক্ষ আছে। এ কক্ষ থেকে কয়েকটি সংকীর্ণ পথ বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। ফলে এ ইমারত নিয়ে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে এই ইমারতটি দুর্গাভ্যন্তরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সঙ্গে জড়িত ছিল।

আলোকচিত্র- ৪৮



অন্তিম-মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক পর্বের ইউরোপীয় শিল্পীর চোখে লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বহির্দেশ

দুর্গের পশ্চিম প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থান ঘেঁষে হাম্মাম ও পরীবিবির মাজারের অবস্থানের সারির সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে একটি মসজিদ। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদ মুগল শাসনামলে এ দেশে প্রচলিত মুগল মসজিদের একটি আদর্শ উদাহরণ। এছাড়া দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের প্রধান ফটকের সংলগ্ন বাইরের অংশে দুর্গ নির্মাণের পরবর্তীকালে নির্মিত একটি মসজিদ দেখা যায়। লালবাগ শাহী মসজিদ নামে পরিচিত এ মসজিদে আজ আর এর আদি রূপ অক্ষত নেই।

ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঃ ঢাকার আশেপাশে নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে মুগল আমলে বেশ কয়েকটি দুর্গ ও ইমারত নির্মিত হয়েছিল। দুর্গগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তরে অবস্থিত হাজীগঞ্জ দুর্গ, বন্দরে অবস্থিত সোনাকান্দা দুর্গ এবং মুন্সিগঞ্জ শহরস্থ ইদ্রাকপুর

দুর্গ আজও দর্শনযোগ্য অবস্থায় আছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে এ অঞ্চলে আরও কিছু দুর্গ নির্মাণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে সেগুলো বর্তমানে দর্শনযোগ্য অবস্থায় নেই। এছাড়া ঢাকা শহরের বিপরীতে বুড়িগঙ্গার তীরে রয়েছে জিঞ্জিরা প্রাসাদ।

অন্তরীণ স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষসহ প্রত্নস্থল

এ শ্রেণীভুক্ত প্রত্নস্থলগুলোর সংখ্যা অনেক, তবে এদের সম্পর্কে জানা তথ্যের পরিমাণ অপ্রতুল। এগুলো ছড়িয়ে আছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আনাচে-কানাচে। অঞ্চলগুলোর যাতায়াত ব্যবস্থাও অবহেলিত। কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা যোগানোর ক্ষেত্রে এদের ভূমিকাকে একেবারেই খাটো করে দেখা যায় না। তাই পরবর্তী অংশ এ শ্রেণীভুক্ত প্রত্নস্থলগুলোর বৃহত্তর জেলা ভিত্তিক একটি তালিকা মাত্র সংযোজিত হলো।

কুমিল্লা ঃ বৃহত্তর কুমিল্লার অন্তরীণ স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে দেবিদ্বার থানার গুনাইঘর, বরুড়া থানার মণ্ডুক, চান্দিনার বড় কামতা ও চন্ডিপুরের শিবলিঙ্গ ঢিবি, কুমিল্লা শহরের এগার কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত নওয়াপাড়া গ্রামের বর্ধণমুড়া ও দিঘি, বর্ধণমুড়ার অদূরবর্তী উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পাঁচথুবির পাঁচটি ঢিবি, শহরসংলগ্ন মহান্তের মুড়া ও কালিকাপুরের বৈষ্ণব মুড়া নামক ঢিবি, নবীনগর থানার বাঘাউরা-বেলকুণ্ডাই, আখাউড়া রেলস্টেশনের অদূরবর্তী চম্পকনগর, শাহরাস্তি থানার মেহের কালী মন্দির এলাকা, মতলব থানার সংলগ্ন নারায়ণপুর ও দক্ষিণ-পূর্বের গ্রাম এবং কচুয়া থানা অন্যতম। কারণ এসব স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শনাদি আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। গুনাইঘরে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত এবং ৫০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে রাজত্বকারী বন্যগুপ্ত নামক রাজার একটি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। একইভাবে মণ্ডুক থেকে পাদলিপিসহ একটি কালো পাথরের গণেশ (আঃ খ্রিঃ দশম শতক) ও অসংখ্য পাটকেল-খোলামকুচি, বড়কামতা চণ্ডিপুর থেকে একটি শিবলিঙ্গ সমেত অগুনিত পাটকেল-খোলামকুচি, বর্ধণমুড়ার সংলগ্ন এলাকা থেকে খড়গবংশীয় শাসনামলের বিবিধ সাংস্কৃতিক জঞ্জাল, বাঘাউড়া-বেলাইকুণ্ডি থেকে পাদলিপিসহ কালো পাথরের একটি বিষ্ণু (আঃ খ্রিঃ দশ-এগার শতক) ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক জঞ্জাল, চম্পকনগর থেকে সাংস্কৃতিক জঞ্জাল, মেহের কালী বাড়ি থেকে শিবলিঙ্গসহ মূর্তির ভগ্নাংশ (আঃ খ্রিঃ দশ-বার শতক), কচুয়া থেকে দশ এগার শতকের একটি হেরুক ও মতলব থেকে পাদলিপিসহ একটি গণেশ (আঃ খ্রিঃ দশ-এগার শতক) আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, দেবিদ্বার থানায় প্রাপ্ত গুনাইঘর তাম্র ফলকটিতে এর জারিকরণের স্থল হিসাবে 'ক্রিপুর' নামক শহরের উল্লেখ আছে। তাই ধরে নেওয়া যায় যে এতদ্অঞ্চলে ক্রিপুর নামক শহরের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত আছে। একইভাবে খড়গদের রাজধানী জয়কর্মান্তবসাক নামের সাথে বর্তমান বড়কামতা নামটির যথেষ্ট উচ্চারণগত নৈকট্য লক্ষ করা যায়। তাই অনেকের ধারণা, বড়কামতা গ্রামে খ্রিস্টীয় সাত-আট শতকের একটি রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।

BANDOG Library Dhaka

কুষ্টিয়া ঃ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের অধীন আমদহ মৌজার প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ এলাকায় লম্বালম্বিভাবে বিভিন্ন আকারের নয়টি ঢিবি দণ্ডায়মান আছে। অধিকাংশ ঢিবির পৃষ্ঠদেশ নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক জঞ্জাল ধারণ করছে। বিশেষ করে রায়গোয়ালা চৌধুরী বাড়ি নামক ঢিবিটির পরিমাপ ২৪৩ মিঃ × ৬১ মিঃ। এ ঢিবি থেকে ইতিপূর্বে প্রাক্-ইসলামি বৈশিষ্ট্যসূচক বেশ কয়টি পোড়ামাটির ফলক, সোনার গহনা ও বেলে পাথরের থাম আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে জানা যায়। আবিষ্কৃত থামগুলোর মধ্যে একটি আজও স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সম্মুখে সংরক্ষিত আছে। এ ঢিবির দু'পাশে দু'টি জলাশয়ও আছে। অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে কুমারখালির বালিয়াকান্দি মৌজার ইদ্রাকপুরে অবস্থিত চকরাম শাহের বাড়ি ঢিবি (১.৫২ মিঃ উচ্চতা), খোকসা সদরের কালিশিলা-কালীমন্দির ঢিবি, আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ি জমিদার বাড়ি ঢিবি ও দিঘি, দামুরহুদার দমদমায় অবস্থিত দু'টি ঢিবি (২.৪৩ মিঃ উচু), মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নের শ্যামপুর ঢিবি ও বাগোয়ান ইউনিয়নের শেখ ফরিদের ঢিবি, মঠবাড়িয়া ঢিবি এবং কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরোঘড়িয়া গ্রামের মারুক ঢিবি অন্যতম। আপাতঃদৃষ্টিতে এসব প্রত্নস্থলের অন্তরীণ কীর্তিরাজিগুলোকে খ্রিস্টীয় বার-আঠার শতকের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়।

খুলনা ঃ তেরখাদা থানার জয়সেনা-ইখরা এলাকা, পানতিতা গ্রামের পোড়াভিটা, কয়রা থানার প্রতাপাদিত্যের গড়, ডুমুরিয়া থানার মঠবাড়িয়া ঢিবি, বাঘেরহাট সদরের সোনাতলা ঢিবি, মিঠাপুকুর পাড়ের টাকশাল ঢিবি, সুন্দরঘোনার খানজাহানের রাস্তা, দাহোরকোল মাজার ঢিবি ও কাজি বাঁশতলা কবরস্থান, আশাশুনি থানার শাইনহাটি এবং খুলনা শহরের ৩০ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আগ্রা-কপিলমুনি প্রভৃতি স্থানে বৃহত্তর খুলনা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলোর অবস্থান। এরমধ্যে কেবল জয়সেনা -ইখরা এলাকায় উলুভিটা, নেড়া ভিটা, সুরৎ মাস্টারের ভিটা ও বটভিটা নামে পাঁচটি ঢিবি আছে। সম্প্রতি সুন্দরবনের আগামরা এবং বুড়িগোয়ালিনি রেঞ্জ দু'টিতে মোট সাতটি ঢিবির অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। গভীর অরণ্যে অবস্থিত এসব ঢিবিতে অসংখ্য ইট-পাটকেল ছড়িয়ে আছে। ঢিবিগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে বিপন্ন প্রায়। প্রতাপাদিত্যের গড় থেকে ১৯৯৫ সালে কালো পাথরে উৎকীর্ণ একটি নরসুন্দরী মূর্তি ও একটি দরজার অলংকরণের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়। শিল্প শৈলী অনুযায়ী এগুলো পাল শাসনামলের নিদর্শন। এছাড়া এ দুর্গটির অভ্যন্তরভাগে কয়েকটি ঢিবিও আছে।

চট্টগ্রাম ঃ এ বৃহত্তর জেলার অন্তরীণ স্থাপত্য নিদর্শন সংবলিত প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলগুলো কক্সবাজারের রামকোট, জেলা সদরের নাসিরাবাদ, হাটহাজারী থানার ফতেহপুর ঝোবড়া, উত্তর রাউজান এবং আনোয়ারা থানার ঝিউরিতে অবস্থিত। নাসিরাবাদে দামোদর দেব (আঃ খ্রিঃ বার শতক) নামক একজন অখ্যাত সামন্ত রাজার একটি তাম্র শাসন, ঝোবড়ায় ৩৬টি হরিকেল মুদ্রা এবং ঝিউরিতে ৬৪টি ক্ষুদ্রাকার ব্রঞ্জের মূর্তিসহ দু'টি নিবেদন স্তূপ আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। নাসিরাবাদ থেকে উত্তর রাউজান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বেশকিছু উত্তর-দক্ষিণে লম্বা

দিঘিও রয়েছে। তাই এই এলাকায় একটি প্রাক-মুসলিম শাসনামলের প্রশাসনিক কেন্দ্রের আস্তত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ঝিউরিতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তিগুলোর মধ্যে কয়েকটির পেছনে খ্রিস্টীয় নয়-এগার শতকের লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যময় কিছু মুদ্রণও রয়েছে। রামুর বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরে এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বেলে পাথরে তৈরি বেশ কয়েকটি মূর্তির খণ্ডাংশ ও স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

অতিসম্প্রতি লেখক স্বয়ং চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ২২ কিঃমিঃ পূর্বে রাউজান থানার পাহাড়তলী ইউনিয়নের উপসত্তরপাড়ায় অবস্থিত টিলার ঢালে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল আবিষ্কার করেছেন। এ প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে প্রস্তরীভূত কাঠ, প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি হাতকুঠার, স্ক্রেপার, ফ্লেইকড কোর, চার্ট ও স্ফটিকমনির নডিউল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ফলে এ হাতিয়ারগুলোকে নব্যপাথর পর্যায়ের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে। হাতিয়ারগুলো বর্তমানে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করেছে।

ঢাকা ঃ বৃহত্তর ঢাকা জেলার প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে নরসিংদি জেলার বেলাব ও আশ্রাফপুর ; গাজিপুরের বড়ই গ্রাম এবং মুন্সিগঞ্জের রামপাল, সোনারঙ ও শ্রীপুর অন্যতম। কারণ বেলাবে বর্মণ রাজা ভোজ বর্মণের (আঃ খ্রিঃ বার শতক) একটি তাম্রশাসন এবং এর অদূরবর্তী আশ্রাফপুরে খড়গবংশীয় দু'টি তাম্রশাসনসহ একটি ব্রঞ্জের নিবেদন স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। অপরদিকে বড়ইগ্রামে আজও মিঠাপুকুর ও সমুদ্র নামক দু'টি জলাশয় এবং ইটের তৈরি কয়েকটি বিধ্বস্ত স্তূপ পরিবেষ্টিত হয়ে মুটেরতলা নামক একটি ঢিবির অস্তিত্ব রয়েছে। একইভাবে রামপালে কয়েক দশক পূর্বেও ২৭৪ বর্গমিটার পরিমাপ এবং ৬০ মিঃ প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত একটি দুর্গসহ বহু দিঘি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত। এর সংলগ্ন কাজিকসবা থেকে প্রচুর প্রত্নবস্তুও আবিষ্কৃত হয়েছে। কাজিকসবায় আবিষ্কৃত মূর্তিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত একটি কাঠের সুর সুন্দরী (আঃ খ্রিঃ এগার শতক) মূর্তি অন্যতম। তবে গোটা মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকেই বিভিন্ন সময়ে প্রচুর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসেও মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক অনুরূপ দু'টি পাথরের মূর্তি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তর করেছেন। এছাড়া ১৯২৪-২৫ সালে আর. ডি. ব্যানার্জি রঘুরামপুর গ্রামে একটি পাকাঘাটসহ বেশ কিছু স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন। এমনকি সম্পূর্ণ এলাকার যত্রতত্র প্রচুর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দিঘিতো রয়েছেই। এরমধ্যে একটি দিঘি আজও বল্লালদিঘি নামে পরিচিত। তাই পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে মুন্সিগঞ্জের চন্দ্র ও সেন আমলের তাম্রশাসনগুলোতে বর্ণিত বিক্রমপুর ও বল্লালবাড়ি নামক দু'টি বিজয় শিবিরের (জয়স্কন্ধবর) ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, ধামরাই সদর ও মানিকগঞ্জের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় আরও কিছু প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলের অস্তিত্ব রয়েছে।

আলোকচিত্র - ৪৯

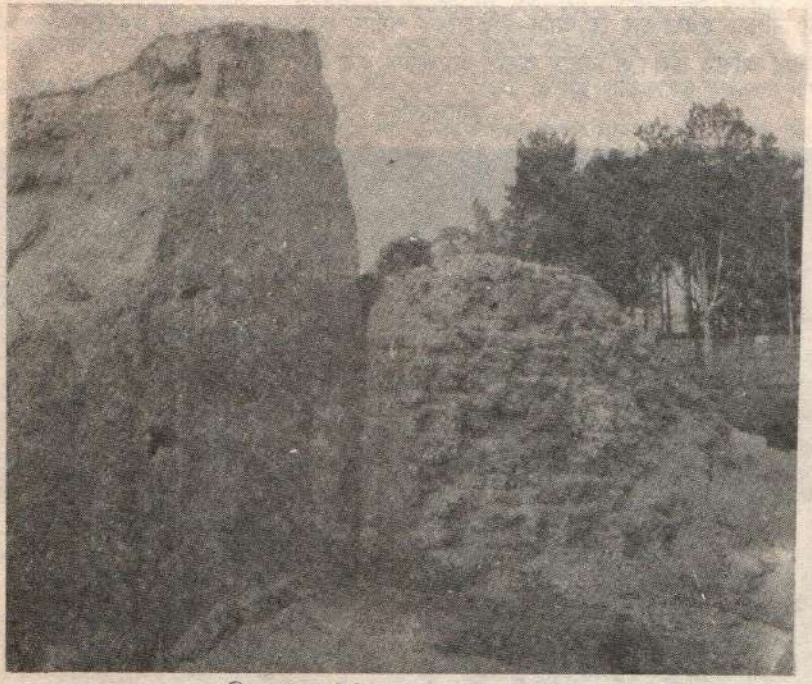


বড়কাটরার দক্ষিণ তোরণের দৃশ্য, ঢাকা

নোয়াখালি ঃ এ বৃহত্তর জেলার একমাত্র প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল ফেনির অন্তর্গত ছাগলনাইয়ার আমজাধাতা ইউনিয়নের সিলুয়ায় অবস্থিত। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

দিনাজপুর ঃ ফুলবাড়ি থানার দামোদরপুর, থানা সদর, রাজনগড়, চিন্তামন-পুকুরী, ভানগদিঘি, সাগরদিঘি, নলদিঘি, মোহনপুর-চাপড়া, হাকিমপুর থানার বৈগ্রাম ও টঙ্গীশহর ঘোড়াঘাটের বেলওয়া, পলা ও বারপাইকের গড়, পঞ্চগড়ের ভিতর গড় ও ভঞ্জনপুর ঢিবি (৯৩ মিঃ × ৬০মিঃ × ৬ মিঃ)। দেবীগঞ্জের বাহির গড়, রানীশঙ্কাইলের বাংলাগড়, গোরকুই ঢিবি জগদল, ধর্মগড় ও মালদুয়ার ; বোচাগঞ্জের বাতাসন-মতিময়ডাঙ্গী, বীরগঞ্জের ভেলুয়া, কাঠগড় ঝলমলিয়া, কাহরোলের কান্তনগর ও শ্রীচন্দ্রপুর ; খানসামার গোয়ালদি, পার্বতীপুরের হিরাবেশ্যার ভিটা, কিচক রাজার গড়, বেলাইচণ্ডী, দেউলি, দোসতিনা ও অচিনের ঢিবি ; বিরামপুরের বিরামপুর কলেজ ও চণ্ডিপুর-গড়পিঙ্গলাই ; চরকাই এর বিবির ধাপ ও জম্বুলেশ্বর এবং নবাবগঞ্জের তর্পন দিঘি, হরিণাকুণ্ড, ভাদুরিয়া ও কাঞ্চির ধাপ প্রভৃতি স্থানে সাংস্কৃতিক ঢিবি, বিভিন্ন ধর্মীয় (হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন) স্থাপত্য নিদর্শন, মাটির দুর্গ, মূর্তি, পাঁচিল,

আলোকচিত্র- ৫০



ভিতরগড়ের ইটের দেয়ালের অংশ, পঞ্চগড়

রাস্তা ইত্যাদি প্রত্ননিদর্শনাদি গচ্ছিত রয়েছে। বিশেষ করে দামোদরপুর থেকে গুপ্ত আমলের পাঁচটি, বৈগ্রাম থেকে গুপ্ত আমলের একটি ও বেলওয়া থেকে পাল শাসনামলের দু'টি (মোট আটটি) তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে বর্তমান দিনাজপুর জেলার সীমার মধ্যে গুপ্ত-পাল শাসনামলের একাধিক প্রশাসনিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব রয়েছে।

পাবনা ঃ এই বৃহত্তর জেলার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলটি রায়গঞ্জ থানার নিমগাছিতে অবস্থিত। এর পাশে আজও প্রাচীন করতোয়ার একটি পরিত্যক্ত খাতের চিহ্ন বিদ্যমান। সম্পূর্ণ প্রত্নস্থলটি বেশ কয়েকটি ঢিবি সমৃদ্ধ। গত দশকেও কোন কোন ঢিবির উচ্চতা প্রায় সাত মিটারের মতো ছিল। প্রতিটি ঢিবি থেকেই হরহামেশা প্রচুর পরিমাণ ইট-পাটকেল ও খোলামকুচি বেরিয়ে আসছে। এ প্রত্নস্থল থেকে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে গুপ্ত শাসনামলের মুদ্রা এবং পোড়ামাটির ফলক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে অবগত হওয়া গেছে।

ফরিদপুর ঃ এ বৃহত্তর জেলার অধিকাংশ ভূমি প্লাবন ভূমির আওতাভুক্ত। তাই বর্তমানে এ জেলায় আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের অস্তিত্ব নেই। তবে কোটালিপাড়া সদরে একটি বিশাল দুর্গের অস্তিত্ব, গুপ্ত শাসনামলের মুদ্রা, খ্রিস্টীয় ছয় শতকে রাজত্বকারী তিনজন রাজার পাঁচটি

তাম্রশাসন এবং ইদিলপুরে সেন রাজা কেশব সেনের একটি তাম্রফলক প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ে ফরিদপুরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

আলোকচিত্র -৫১



পাথরের স্তম্ভমূল, ভিতরগড়, পঞ্চগড়।

বগুড়া ঃ বৃহত্তর বগুড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল মহাস্থানগড় ও পাথরঘাটা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে জয়পুরহাট এলাকাধীন বড়তাজপুর গ্রামের ৫৯ মি: × ৩৫ মিঃ পরিমাপের তাজপুর ধাপ নামক ঢিবি ও হিলকুণ্ড গ্রামের ৪৮ মিঃ × ৩০ মিঃ × ২ মিঃ পরিমাপের ঢিবি, পাঁচবিবির অধীন মাধবপুর গ্রামের ৩৫ মিঃ ×৩২ মিঃ × ১.৫ মিঃ পরিমাপের ঢিবি, ধরনজি ইউনিয়নের সলুয়া গ্রামের ১১.৫ মিঃ × ১০ মিঃ ১.৮ মিঃ পরিমাপের ঢিবি, কুসম্বা ইউনিয়নের বাদের গ্রামের ৮৮ মিঃ × ৪.৫ মিঃ × ৩.৬ মিঃ পরিমাপের ঢিবি এবং এর সংলগ্ন কাসিয়াবাড় ধাপ, নিশিপুর ইউনিয়নের বাঘাবাড়ি গ্রামের পরিখা বেষ্টিত ১৩৭ মিঃ × ১২১ মিঃ পরিমাপের মহালপুকুর ঢিবি, ধুপচাচিয়া ইউনিয়নের ৯১ মি: × ৭৬ মিঃ × ২৪ মিঃ পরিমাপের ধাপেরহাট ঢিবি, গুনাহার ইউনিয়নের জায়ল গ্রামের ৪৮মিঃ × ৪৫ মিঃ × ২১ মিঃ পরিমাপের ধাপ ঢিবি, তালাওরা ইউনিয়নের খানপুর গ্রামের ৩৭মিঃ × ৩০ মিঃ পরিমাপের

ঢিবি ; নন্দিগ্রাম থানার চাকলামা ইউনিয়নের ঘুচিগ্রামের ৫৩ মিঃ × ৪৬ মিঃ × ৪.৫ মিঃ পরিমাপের ঢিবি, ৪ মিঃ উঁচু বাঁশবাড়িয়া ধাপ, কোসাস গ্রামের ৪৬ মিঃ × ৩০ মিঃ × ২.১ মিঃ পরিমাপের বড়ধাপ, চকদেওলা গ্রামের ৩৯ মিঃ × ৩২ মিঃ × ৬ মিঃ পরিমাপের দেওলার ধাপ, বুড়াইল ইউনিয়নের ৪৯ মিঃ × ৬০ মিঃ পরিমাপের কালিতলা ধাপ, সিদোইল গ্রামের ১৯ মিঃ × ১২ মিঃ পরিমাপের ঢিবি এবং শেরপুর থানার জামুর গ্রামের ৮৯ মিঃ × ৬০ মিঃ × ১০ মিঃ পরিমাপের ধাপের আরা ঢিবি, মুকুন্দা গ্রামের ১২১৯মিঃ × ৭৯২ মিঃ × ০.৬ মিঃ পরিমাপের রাজবাড়ি ও পাঁচদেওলা গ্রামের ৪৯ মিঃ × ৪১ মিঃ × ২ মিঃ পরিমাপের ঢিবি অন্যতম। এছাড়া ১৯৯৩ সালে শেরপুর এলাকা থেকে খ্রিস্টীয় আনুমানিক দশ-এগার শতকের লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত একটি তাম্রফলক ও আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রফলকটির পরিমাপ ৪৭.৫ সেঃমিঃ × ৩৯ সেঃমিঃ। এর এক পিঠে ৪০টি এবং গৌণপিঠে ৩৮ টি পঙ্‌তি রয়েছে। উপরাংশের বর্ধিত অংশে একটি গোলকে আবদ্ধ চক্রের দু'পাশে দু'টি উপবিষ্ট হরিণ এং অগ্নিশিখা উৎকীর্ণ রয়েছে। এর ভাষা সংস্কৃত এবং বর্ণমালা দেব-নাগরী। ফলে এই তাম্রফলক পাল ও চন্দ্র বংশীয় অন্যান্য তাম্রফলকের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠোদ্ধারের পর এই অনুমান সত্য বলে প্রমাণ হলে আমাদের ইতিহাসে কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বরিশাল ঃ প্রায় সমগ্র ভূ-খণ্ডটিই ফরিদপুরের মতো প্লাবন ভূমির অন্তর্গত হওয়ায় বর্তমানে প্রাচীন প্রত্ননিদর্শন সংবলিত প্রত্নস্থল নাই বললেই চলে। তবে বাবুগঞ্জ থানার অর্ন্তগত বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ রাজবাড়িতে বড় আকারের একটি ও পিরোজপুরের অধীন ইন্দুরকানীর দলারণ-কলারণ এলাকায় মধুবালা নামে তিনটি মাঝারি আকারের ঢিবি আছে। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ রাজবাড়ি ঢিবিতে প্রচুর ইঁট-পাটকেলের সমারহ এবং এর চারপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেশ কিছু দিঘির অস্তিত্ব থেকে এ এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। এছাড়া এ এলাকা থেকে ইতিপূর্বে একটি ব্রঞ্জের খর্সপন (চাখার জাদুঘর যোজন নং-১০, প্রাপ্তিস্থল বানড়িপাড়ায়, খলিসাকোটা), দু'টি কালো পাথরের মারিচি (চাখার জাদুঘর যোজন নং ১১-১২, প্রাপ্তিস্থান বাখেরগঞ্জ) ও একটি কালো পাথরের গরুড় (চাখার জাদুঘর যোজন নং ১৩) আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবার কলিকাতা আশুতোষ জাদুঘরে স্থান পেয়েছে এ বৃহত্তর জেলা থেকে সংগৃহীত কালো পাথরে তৈরি একটি জগদাত্রী, অষ্ট-ধাতুর তৈরি একটি শিব-অবলোতিতেশ্বর (প্রাপ্তিস্থল হবিবপুর গ্রাম) এবং কালো পাথরে তৈরি একটি গরুড় বাহিত বিষ্ণু (প্রাপ্তিস্থল লক্ষণকাঠী গ্রাম)। সম্প্রতি চাখার এলাকা থেকে শশাঙ্ক নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রাও আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতেও এ এলাকা থেকে সংগৃহীত কিছু মূর্তি স্থান লাভ করেছে। এগুলোর সময়কাল খ্রিস্টীয় দশ বার শতক। সুতরাং বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ রাজবাড়ি ঢিবি ও ইন্দুরকানীর মধুবালা ঢিবি যে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যশোর ঃ অন্তরীণ স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলটির নাম বারবাজার। তবে খনন পরিচালিত হয়নি এমন কয়েকটি ঢিবি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে হরিণাকুণ্ড থানার দিগনগর স্তূপ, জেলা শহরের উত্তরে অবস্থিত মুরালি কসবা ও শেখহাটি এবং ভারতভয়ানার অনতিদূরস্থ গৌরিঘোনা অন্যতম। দিগনগর স্তূপ নামক প্রত্নস্থলে প্রচুর ইঁট-পাটকেল সমৃদ্ধ ৫২ মিঃ × ৪২ মিঃ × ৯১ সেঃমিঃ পরিমাপের একটি সাংস্কৃতিক ঢিবি ও এর পাশে একটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দিঘি রয়েছে। মুরালি কসবা এলাকার একটি বিশাল অংশ জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সাংস্কৃতিক জঞ্জাল ইতিপূর্বে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। তদুপরি এ প্রত্নস্থল থেকে খ্রিস্টীয় দশ বার শতকের শিল্পশৈলীর ভাস্কর্য উৎকীর্ণ কয়েকটি পাথরের থাম ও একটি বড় আকারের বিষ্ণু মূর্তি কয়েক বছর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। মুরালি-কসবা থেকে আকস্মিক ভাবে কয়েকটি পাথরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলো পাল ও সেন আমলে প্রচলিত শৈল্পশৈলীর ধারা বহন করছে। গৌরিঘোনায় রয়েছে একটি প্রায় সমতল ঢিবি। এ ঢিবিতে একটি কালো পাথরের সর্দল ও কিছু স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া বাঘারপাড়া থানা ও মাগুরার শালিখা থানার শুরুসুনার কিছু কিছু অংশে একটি প্রাচীন সড়কের অস্তিত্ব রয়েছে। এ সড়ক যদিও শেরশাহের নির্মিত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত তথাপি এটি আরও প্রাচীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ যশোর-ফরিদপুরের সীমান্তবর্তী কয়েকটি স্থানে শশাঙ্কের মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে অবহিত হওয়া যায়। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে সুদূর অতীত থেকেই যশোর অঞ্চলের সাথে ভারতের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

ময়মনসিংহ ঃ এ বৃহত্তর জেলার অন্তরীণ স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষসহ প্রত্নস্থলগুলো জারখা রাজবাড়ি, বড়তীর্থ, সাগরদিঘি, হোররাজার বাড়ি, শিবেরটেক (কেন্দুয়া থানার অধীন) ও ঘাটাইলের অদূরবর্তী স্থানে অবস্থিত।

রাজশাহী ঃ বৃহত্তর রাজশাহীর প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলগুলো মান্দার নিমদিঘি, মহাদেবপুরের বান্দাইখেরা, ধামুরহাটের মঙ্গলবাড়ি ও জগদল, পত্নিতলার (নজিপুর) যোগিরগোফা ও আগ্রাদিগুন, পোরশার দিবর, বাগ মারার অচিনঘাট, তানোরের ধানোর ও পারিশো, গোদাগাড়ির দেওপাড়াসহ প্রেমতলি, কুমারপুর, বিজয়পুর, মান্দোল ও ঘাটনগর ; চারঘাট থানার লক্ষ্মিপুর ; গোমস্তাপুরের নওদা রোহনপুর এবং বড়ইগ্রাম থানার ধনাইদহ ও পুটিয়ার জগদিশপুরে অবস্থিত। ধনাইদহ থেকে ১১৩ গুপ্তাব্দের (৪৩২ খ্রিঃ) একটি ও জগদিশপুর থেকে ১২৮ গুপ্তাব্দের (৪৪৭ খ্রিঃ) একটি মোট দু'টি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত তাম্রফলক সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি তাম্রফলকেই গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক জমি বরাদ্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। অচিনঘাটে আঃ খ্রিস্টীয় এগার-বার শতকের প্রাচীন সড়কসহ কয়েকটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ, আগ্রাদ্বিগুনে একটি বড় আকারের ঢিবি ও খ্রিস্টীয় দশ-এগার শতকের শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি হিন্দু মূর্তি, জগদলে আঃ খ্রিস্টীয় এগার-বার শতকের

শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্যময় হিন্দু মূর্তির টুকরা, ব্রঞ্জের ঘন্টা ও নানাবিধ প্রত্নবস্তুসহ কিছু স্থাপত্যিক নিদর্শন, মঙ্গলবাড়ির বাদালে পাল রাজা নারায়ণ পালের (আঃ ৮৫৫–৯০৮ খ্রিঃ) লিপি সংবলিত একটি কালো পাথরের গরুড় স্তম্ভ ও ঢিবি, বান্দাইখেরায় একটি ঢিবি ও কিছু হিন্দু মূর্তির ভগ্নাবশেষ ; নেয়ামতপুরে খ্রিস্টীয় দশ–বার শতকের শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্যময় বেশ কয়টি হিন্দু

আলোকচিত্র – ৫২



যোগেশ্বরী বেলেপাথর, কুমারপুরে প্রাপ্ত।

মূর্তি, ধানোর ও পারিশোতে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির ঢিবি দেওপাড়ায় সেন রাজা বিজয় সেনের (আঃ ১০৯৫–১১৫৮ খ্রিঃ) একটি লিপি, বেশ কিছু হিন্দু মূর্তি, স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ ও প্রদ্যুম্নেশ্বর নামে উত্তর– দক্ষিণে লম্বা একটি দিঘি, কুমারপুরে মাজার ও উপর বাড়ি নামে দু'টি ঢিবি, প্রেমতলিতে যথেচ্ছা সাংস্কৃতিক জঞ্জাল ছড়ানো একটি বিস্তীর্ণ ঢিবি, বিজয়নগরে একাধিক ঢিবি, মান্দোলে পরিখাবেষ্টিত একটি বিরাটাকার ঢিবি, দিবরে একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মধ্যবর্তী

স্থানে আনুমানিক খ্রিস্টীয় এগার শতকের একটি পাথরের বিজয় স্তম্ভ। ঘাটনগরে পাঁচটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষসহ কয়েকটি মূর্তি ; লক্ষ্মীপুরে খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতকের শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্য সংবলিত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ ও একটি বিরাট আকারের মহিষাসুরমর্দিনী, নওদায় বুরুজ নামে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি সুউচ্চ ও বিশালাকার ঢিবি, নিমদিঘিতে মাঝারি আকারের একটি ঢিবি এবং যোগিরঘোফায় একটি বিস্তীর্ণ কিন্তু অনুচ্চ ঢিবির সন্ধান পাওয়া গেছে।

আলোকচিত্র – ৫৩

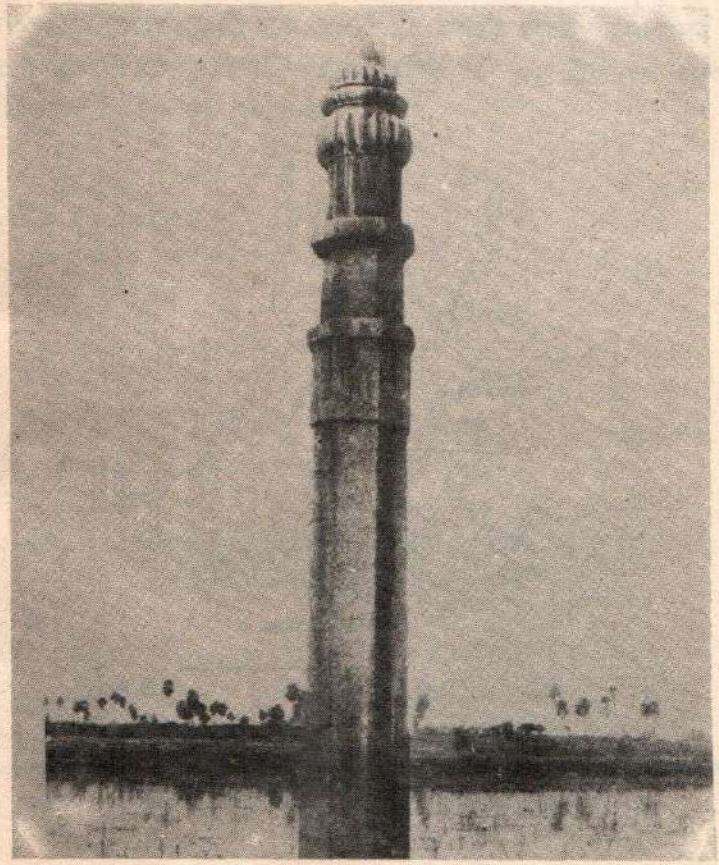


কুমারপুরের পাথর খণ্ড।

রংপুর ঃ বদরগঞ্জ থানার লোহানী পাড়ার চাপড়া কোটে খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকের লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যময় একটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। শিলালিপিটিতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীঅংসুবর্ধণ উল্লেখ করা আছে। শ্রীঅংসুবর্ধণের পিতা, পিতামহ এবং পিতামহের নামের সাথেও 'বর্ধণ' পদবি সংযুক্ত, কিন্তু কোন রাজকীয় পদবির উল্লেখ নেই। তাই অংসুবর্ধণের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে চাপড়াকোটে অনুসন্ধান পরিচালনা করা হলে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যিক কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বৃহত্তর রংপুরের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থল হলো ডিমলা থানার ধর্মপালগড়, ধর্মপুরের ময়নামতি কোট, পাইটাপাড়া, নিলাম্বর রাজার গড় ; নীলফামারির হরিশচন্দ্র রাজার

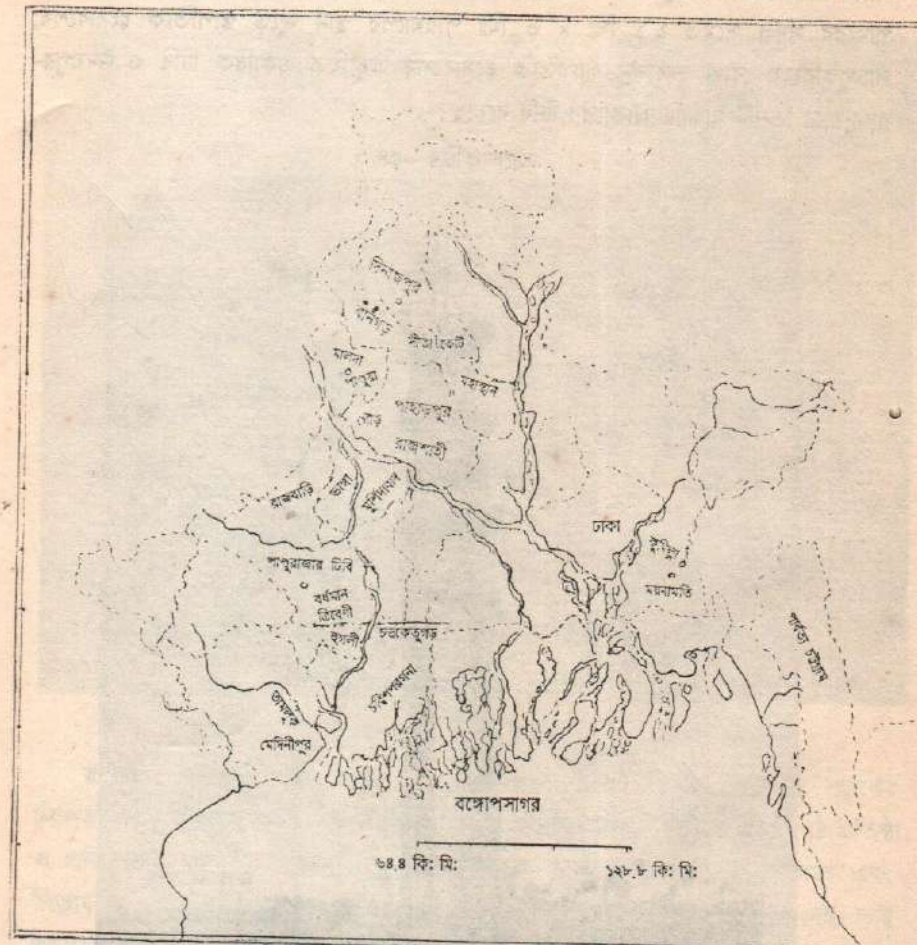
পাট, পীরগঞ্জের কান্দুয়ার ও সাতগড় ; দেবীগঞ্জের ভীমের লাঙ্গল–জোয়াল ও পাঁচপুকুরিয়া এবং মিঠাপুকুরের উদয়পুর–বাগদুয়ারে অবস্থিত। ধর্মপাল গড়ে প্রচুর সাংস্কৃতিক জঞ্জাল অধ্যুষিত ২৩৭৭ বর্গ মিটার পরিমাপের একটি মাটির দুর্গ, ময়নামতির কোটে ৯১৪ মিঃ × ৯১৪ মিঃ পরিমাপের একটি মাটির দুর্গ, নিলাম্বর রাজার গড়ে গোলাকারে (৯১০ মিঃ ব্যাস) নির্মিত একটি ঢিবি, পাইটকাপাড়ায় ১৫.২ মি: × ৯.১ মি: স্থান জুড়ে স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ, হরিশচন্দ্র রাজার পাটে একটি ঢিবি, কান্তদুয়ার ও সাতগড়ে একটি গোলাকার দুর্গ, ভীমের লাঙ্গল–জোয়ালে কালো পাথরের সর্দল সমেত ৯.১ মিঃ × ৬ মিঃ পরিমাপের স্থান জুড়ে স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ, পাঁচপুকুরিয়ায় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ অধ্যুষিত একাধিক ঢিবি ও উদয়পুর–বাগদুয়ারে তিনটি মাঝারি আকারের ঢিবি রয়েছে।

আলোকচিত্র – ৫৪



দিবর স্তম্ভ, পোরশা, রাজশাহী।

রেখাচিত্র – ৪৩



বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার : খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতক

সিলেট ঃ এ যাবৎ বৃহত্তর সিলেট থেকে কয়েকটি লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শন আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হলো কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার (আঃ ৬১০–৬৫০ খ্রিঃ) নিধানপুর তাম্রশাসন, মরুণ্ডনাথ ভট্টরক (আঃ খ্রিঃ সাত শতক) নামক সামন্ত নরপতি কর্তৃক জারিকৃত কালাপুর তাম্রশাসন, চন্দ্র বংশীয় শ্রীচন্দ্র দেবের (আঃ ৯৩০–৯৭৫ খ্রিঃ) পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন এবং গোবিন্দ কেশব দেব ও ঈশান দেব (খ্রিঃ তের শতক) কর্তৃক জারিকৃত ভাটেরা তাম্রশাসন। এছাড়া মৌলভী বাজার–বিয়ানিবাজার এলাকা থেকে আঃ খ্রিস্টীয় আট–নয় শতকের একটি ব্রঞ্জের লোকনাথ এবং প্রায় তিরিশ–চল্লিশটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত হরিকেল মুদ্রা আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং অনুমেয় যে মৌলভী বাজার বিয়ানিবাজার এলাকার কোন না কোন স্থানে একটি প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে সবার আগে ভাটেরায় অবস্থিত দু'টি মাঝারি আকারের ঢিবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিশীল প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যে জেলা শহরে অবস্থিত হযরত শাহজালালের মাজার ঢিবি, শহরের প্রান্তবর্তী ঘরদুয়ার নামক পাহাড়ে অবস্থিত ঢিবি এবং জয়ন্তিয়ার একক খণ্ড পাথুরে স্মৃতিস্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯

সমীকরণ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উপযোগী সূত্র আজও আবিষ্কৃত হয় নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় মানুষের ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক যে কয়টি হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর কোনটিই স্তরবিন্যাসজাত হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। নমুনা ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে এগুলো মায়ানমারের এ্যানায়থিয়, (Anyathian), মালয়ের তাম্পেনিয় (Tampanian), জাভার পাজিতানিয় (Pajitanian), চিনের চৌকোতিয় (choukotien) অথবা ভারতের মদ্রাজ কিংবা সোনিয় প্রভৃতি কোন পার্শ্ববর্তী প্রাচীন পাথর পর্যায়ের ঐতিহ্যের শৈলী বহন করছে কি–না এ প্রসঙ্গে আজও কোন তুলনামূলক পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয় নি। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সবকয়টি প্রাগৈতিহাসিক যুগীয় হাতিয়ার প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি যা এ্যানায়থিয় ঐতিহ্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারগুলো ছাগলনাইয়া, সিতাকুণ্ড, কুমিল্লা, রাঙামাটি ও ময়মনসিংহে[৪৬] আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, একমাত্র নোয়াখালি অঞ্চল ব্যতীত অপর সকল প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলগুলো আজও উপজাতি বহুল এলাকা। তাছাড়া ছাগলনাইয়া ও কুমিল্লার ময়নামতির আনন্দবিহারে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের শেষ সময়কাল ও মধ্য–ঐতিহাসিক পর্যায় শুরু হচ্ছে এমন সময়কালের কিছুনিদর্শনের সাথে আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা ও আসামের কাছাড়ে এবং পশ্চিম–বঙ্গের বহুস্থানে এ নমুনাভুক্ত হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪৭] বিশেষ করে বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরবর্তী পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বনকাঠি গ্রামে যেসব প্রাচীন পাথর পর্যায়ের হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে সোনিয় ঐতিহ্যের প্রাচীন পাথর

---

৪৬. Z. clarance Maloney, 'Bangladesh Prehistory,' The Journal of the Institute of Bangladesh studies, Vol, 11, Rajshahi, 1977, p.11. ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার উনসত্তর পাড়ায় লেখক প্রস্তরীভূত কাঠ ও প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার সমৃদ্ধ আরও একটি নতুন প্রত্নস্থল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪৭. A.K. Varman, Nealithic culture of India, Delhi, 1988, p. 7 ; Dilip K. chakrabarti, Ancient Bangladesh, 1992, p. 41

সোনিয় ঐতিহ্যের প্রাচীন পাথর পর্যায়ের বেলে স্ফটিকে তৈরি ও এ্যাকানথিয়[৪৮] ঐতিহ্যের প্রস্তরীভূক্ত উভয় নমুনার হাতিয়ার অবিমিশ্রিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪৯] সুতরাং বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে, সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মায়ানমারের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ধরে পশ্চিম-বঙ্গে যাতায়াত করত। আর বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন পাথর পর্যায়ের নিদর্শনগুলো সম্ভবত উক্ত প্রাগৈতিহাসিক পথিকদেরই স্মৃতি বহন করছে।

পশ্চিম বঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নস্থল থেকে মধ্যপাথর ও নব্যপাথর পর্যায়ের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে মধ্যপাথর পর্যায়ের হাতিয়ারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে নেহাৎ অপ্রতুল।[৫০] বাংলাদেশ এবং আসামে এর ছিটেফোঁটাও এ যাবৎ সন্ধানে আসে নি। অপর দিকে নব্যপাথর পর্যায়ের হাতিয়ার আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, নব্যপাথর পর্যায়ে আসাম, বিহারের চিরন্দ ও কাশ্মিরের বুরজহমকে কেন্দ্র করে তিনটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য-শৈলী বিকশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত হাতিয়ারগুলো উল্লিখিত তিন ঐতিহ্যের মধ্যে কোন ঐতিহ্যটির শৈলী বহন করছে সে সম্পর্কে এ যাবৎ কোন সর্বজনস্বীকৃত পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয় নি। তবে লক্ষ করা যায় যে, মহাস্থানগড়ের সবচেয়ে নিকটবর্তী পশ্চিম দিকে অবস্থিত বানগড় (সম্ভবত প্রাচীন কোটিবর্ষ নগর) প্রত্নস্থলে খননের ফলে প্রাক-শুঙ্গ অধিবসতি আমলের একটি স্তর থেকে একটি চকমকি পাথরে তৈরি সেল্ট (celt) আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৫১] কিন্তু এটিও একটি বিচ্ছিন্ন আবিষ্কার ভিন্ন অন কোন অর্থ বহন করে না।

এবার পুরা ঐতিহাসিক বা ধাতুপাথর যুগের প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশে এ যাবৎ এ যুগের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। অথচ পশ্চিম বঙ্গে এ যুগের অসংখ্য প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটিতে খননও পরিচালিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলটির নাম পাণ্ডুরাজার ঢিবি। লক্ষণীয় বিষয় হলো, অজয় নদীর তীরবর্তী বর্ধমান জেলায়

---

৪৮. দ্বিতীয় হিমালয় হিমবাহ যুগের (আঃ চার লক্ষ থেকে এক লক্ষ বছর) সমসাময়িক, J. M. codes and E.S.Higgs, 'The Archaeology of Early Men', South and East Asia, London, 1969

৪৯. P.c. Das Gupta, The excavation at pandu Rajar Dhibi, calcutta, 1964, pp. 46-47.

৫০. বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর মধ্যে কেবল মুর্শিদাবাদে একটি মাত্র মধ্যপাথর পর্যায়ের প্রত্নস্থলের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এই সন্ধান লাভটিকে একটি বিচ্ছিন্ন আবিষ্কার ব্যতীত অন্যকোন ভাবে গণ্য করার অবকাশ খুবই সীমিত, M. M. Hoque, 'Evidence of Mesolithic culture in the Ganga Plain Area of West Bengal, Pratnatattva, Vol. 2, 1995, p.15 মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম থানার কট্টর থেকে স্ফটিকমনির তৈরি উচ্চ প্রাচীন পাথর পর্বের হাতিয়ারও আবিষ্কৃত হয়েছে, Asok Datta and Dilip Roy, 'Kattra, An upper palaeolithic site in the M.d- Ksai Valley, District Midnapur, West Bengal,' Studies in Art and Archaeology of Bihar and Bengal, New Delhi, 1989, pp. 310-19

৫১ K.G. Goswami, Excavations at Bangarh (1938 - 41), calcutta, 1948, p. 32, PL. XXXIII(a) 9

ধাতুপাথর যুগের প্রথম পর্বের (তামা পর্ব) একটি কবর থেকে প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি একটি ক্ষুদ্রাকার স্ক্রেপার আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫২] শুধু তাই নয় বীরভূম জেলার চাহিরি নামক একটি ধাতুপাথর যুগীয় প্রত্নস্থলের কিছু কয়লার কার্বণ ফরটিন তারিখ দাঁড়িয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ।[৫৩] কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশের ময়নামতি অঞ্চলে প্রচুর প্রস্তরীভূত কাঠ প্রাপ্তি সত্ত্বেও এ অঞ্চলে এ ধরনের কোন ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ারের আবিষ্কার সঙ্ঘটিত হয় নি।

বাংলাদেশে পুরাতন পাথর পর্যায়ের প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি হাতিয়ার আবিষ্কার, মধ্যপাথর পর্যায়ের অনুপস্থিতি, নতুন পাথর পর্যায় সম্পর্কিত বিতর্ক এবং পুরা ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনের অপ্রতুলতা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে আপাতত কেবল নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটিতে উপনীত হওয়া সম্ভব। হলসেন বা সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক কাল শুরু হওয়ার পূর্বে এদেশের অধিকাংশ সমতলভূমি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ফলে এই যুগের মানুষ আজ থেকে অন্তত দশ হাজার বছর পূর্বে হলসেন ভূতাত্ত্বিক কালে কেবল ঐ সকল স্থান দিয়ে যাতায়াত করেছে যেসব স্থান (পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী নোয়াখালির উত্তরাংশ এবং ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চল) প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসবাসের বা চলাচলের উপযোগী ছিল। দেশের অবশিষ্ট অংশগুলো যখন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তখন আদিম মানুষ মধ্যপাথর ও নব্যপাথর পর্যায় অতিক্রম করে ফেলেছিল। অপরদিকে হলসেন ভূতাত্ত্বিক কাল শুরুর পূর্বেও বীরভূম ছিল মধ্যপাথর ও নব্যপাথর পর্যায়গুলোর মানুষের বসবাসের উপযোগী। তাছাড়া বীরভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রস্তরীভূত কাঠ ও পাথর সুলভ। তাই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ধরে পর্যায়ের পর পর্যায় ধরে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ পাড়ি জমিয়েছে পশ্চিমে।

পুরা ঐতিহাসিক যুগের শেষদিক থেকে বাংলাদেশের পুরাতন পলিমাটি (লালমাটি) অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো (ঢাকার উত্তরাংশ, ময়মনসিংহের দক্ষিণাংশ ও বরেন্দ্র) কৃষিযোগ্য হয়ে ওঠা এবং পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের বয়ে আনা পলি দিয়ে নতুন উর্বর জমির সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল। এ যুগের কৃষিজীবী মানুষদের আর পশ্চিমে পাড়ি দেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। তারা এদেশে স্থায়ী বসতি বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ মানুষগুলোরই একটি অংশ আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে পুণ্ড্র নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রাচীন স্মৃতি ও শ্রুতি শাস্ত্রগুলোতে এবং আদি-ঐতিহাসিক পর্যায়ের বহু সূত্রে এদের উল্লেখ দেখা যায়। ধীরে ধীরে এরা একটি উন্নত নগর জীবনেরও সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপিতে এ নগরের নাম পাওয়া যায় পুণ্ড্রনগলতে (পুণ্ড্রনগর = পুণ্ড্রদের নগর)। এরই সমসাময়িক কালে ওয়ারী-বটেশ্বরেও অনুরূপ আরও একটি নগর গড়ে উঠেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নামক নদীটির ধ্বংসাত্মক গতি-প্রকৃতির কারণে শেষোক্ত শহরটির মূল অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

---

৫২. P. c. Das Gupta, p. 12

৫৩. Indian Archaeology - A Review (1982-83), New Delhi, 1985, p. 145.

মহাস্থানগড় ব্রাহ্মী লিপিকে কোন প্রকারেই খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকের পূর্বে ন্যস্ত করা যায় না।[৫৪] তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিটি থেকে অনুমিত হয়, এটি ছিল একটি আদেশনামা যা পুণ্ড্রনগরের মহামাত্যকে (ভুক্তি প্রশাসক) উদ্দেশ্য করে জারি হয়েছিল। মহামাত্যকে আদেশ প্রেরণের অধিকার একমাত্র সম্রাটের পক্ষেই সম্ভব। আমরা আরও অবগত যে, তৎকালে নিকটবর্তী অঞ্চলে মৌর্যদের আধিপত্য খ্রিস্টপূর্ব দুই শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুতরাং এটা একপ্রকার নিশ্চিত যে, মৌর্য শাসনামলে মহাস্থানগড়ে অবস্থিত পুণ্ড্রদের পুরা ঐতিহাসিক নগরটি একটি প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রে পরিণত ছিল। কিন্তু মহাস্থানের পার্শ্ববর্তী আর কোন তৎকালীন প্রত্নস্থল থেকে এ যাবৎ এ জাতীয় দ্বিতীয় কোন লিপিতাত্ত্বিক আবিষ্কার সংঘটিত হয় নি। বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করে তোলার উদ্দেশ্যে মহাস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত কয়েকটি এলাকায় আবিষ্কারার্থে ভ্রমণ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলগুলোর খননের ফলাফলগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

তাম্রলিপি ঃ বর্তমান নাম তমলুক এবং এটি একটি শহর। মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণ নদীর তীরে এর অবস্থান। কলিকাতার অদূরবর্তী ডিহিমণ্ডল ঘাট পেরিয়ে তমলুকে[৫৫] পৌঁছা যায়। ১৯৪০, ১৯৫৫ এবং ১৯৭৪ সালে এই শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং সংলগ্ন এলাকায় খনন ও অনুসন্ধান চালনা করা হয়। এছাড়া তমলুক শহরের অয়তবেরিয়া ও ইছাপুর এলাকা থেকে পাথরের সেল্ট, উপরত্ন পাথরের ব্লেড, ব্যরার ও অ্যল, ব্রঞ্জের কুড়াল, হাড়ের সুচ, বঁড়শি, কাঁটাওয়ালা হারপুন, সাদা রঙের ঈশদচ্ছ নক্শা আঁকা কালো-ও লাল ওয়্যারের খোলামকুচি, বাইরের পিঠে লাল ও ভেতরের পিঠে কালো প্রলেপ সংবলিত নিরস লাল রঙা ওয়্যার এবং উত্তর দেশীয় কালোমসৃণ মৃৎপাত্র, বিভিন্ন প্রকার উপরত্ন পাথর ও আকৃতির পুঁতি। সীলছাপ, সীলমোহর, পোড়ামাটির মৃত্তিকা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। উত্তরদেশীয় মসৃণ কালো ওয়্যারের কোন কোন পাত্রে ব্রাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। মৃত্তিকাগুলোকে খুব সহজেই প্রাক্-মৌর্য, মৌর্য,

---

৫৪. Paola G. Tinti, 'On the Brahmi Inscription of Mahasthangarh', Journal of the Bengal Art, Vol. 1, 1996, p. 36

৫৫. খ্রিস্টপূর্ব আঃ ছয় শতকের (প্লিনীর) সূত্র ধরে খ্রিস্টীয় দুই শতকে টলেমি তার ভৌগোলিক বিবরণে পালিমব্রোদ্ধের (পাটালীপুত্র) দক্ষিণ-পূর্বে কমবাইসন (রূপনারায়ণ) নদী তীরে তামালিটিস (তমলুক) নামক নগরের অবস্থান উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে সিংহলী মহাবংশে এটি সুহ্মদেশের (দক্ষিণ রাঢ় ঃ মোটামুটি হুগলি, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া নিয়ে রাঢ় গঠিত) একটি বন্দর ও জনপদ হিসাবে উল্লেখ লাভ করেছে। জৈন ধর্মগুরু ভদ্রবাহু রচিত কল্পসূত্র, মহাভারত ও উয়ান চুয়াঙের বর্ণনাতেও এটি একটি বন্দর-নগরী হিসাবে উল্লিখিত আছে। উয়ান চুয়াঙের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতট ভ্রমণ শেষে তাম্রলিপিতে এসেছিলেন। এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানাও তিনি দেখে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি জৈনদের একটি শাখাও এই শহরের নামে পরিচিত ছিল। উয়ান চুয়াঙ বলেছেন, তিনি এ শহরে অশোক নির্মিত একটি স্তূপ এবং বিজয় স্তম্ভের (শিলা অনুশাসন - তের) অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। অপরদিকে, মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকায় এ অঞ্চলে তৎকালে গঙ্গারিডি নামে একটি জাতির বাস ছিল বলেও উল্লেখ আছে। ধরে নেয়া যায় যে, তৎকালে এ শহরের তীরবর্তী রূপনারায়ণ নদী গঙ্গার শাখা অজয় ও দামোদরের সাথে যুক্ত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। আর এ কারণেই এটি একটি বন্দর-নগর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

শুঙ্গ, কুশান ও পাল শিল্পশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অপরদিকে কয়েকটি সীলমোহর (বর্তমানে তাম্রলিপি জাদুঘর ও গবেষণা কেন্দ্রের সংরক্ষণে রয়েছে) নালন্দায় প্রাপ্ত অনুরূপ কিছু সীল মোহরের সাদৃশ্য বহন করছে। তাছাড়া একটি ব্রঞ্জের মূর্তিতে পাল শাসনামলের শিল্পশৈলী সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, রূপনারায়ণ নদীর অপর পাড়ে তমলুকের অদূরবর্তী রাধাপুর গ্রাম (থানা শ্যামপুর, জেলা হাওড়া) থেকে সম্প্রতি পোড়ামাটির তৈরি এক অদ্ভুত মূর্তি (আশুতোষ জাদুঘর সংগ্রহ) সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিমুখ বিশিষ্ট ও হাতল যুক্ত এ মূর্তির মাথায় রোমান শিল্পশৈলীর শিরস্ত্রাণ পরিহিত আছে। এখানেই শেষ নয়। খননের ফলে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল পাথরের মসৃণ সেল্ট, হাড়ের তৈরি বহুধরনের হাতিয়ার ও ত্রুটিপূর্ণ ভাবে দগ্ধ খোলামকুচি। খননের মাধ্যমে উদ্ধারপ্রাপ্ত একটি উত্তর দেশীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্রে খরোষ্ঠী লিপিও পাওয়া গেছে। এর পাঠোদ্ধার দাঁড়িয়েছে 'তমুলিপুসু'। আশুতোষ জাদুঘরে ডানাযুক্ত একটি নরমূর্তির পোড়ামাটির ছাঁচ সংরক্ষিত রয়েছে। তামলুকে প্রাপ্ত এ ছাঁচ, খ্রিস্টপূর্ব দুই-এক শতকের শিল্পশৈলী বহন করছে।[৫৬] এসব আবিষ্কার ও খননের ফলাফলের উপর নির্ভর করে মোটামুটি তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। (ক) তমলুকের ইতিহাস নব্যপাথর পর্যায় থেকে পাল আমলের অন্তিম সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। (খ) এটি ছিল একটি বিখ্যাত বন্দর-নগরী। এ বন্দর নগরীর জনজীবনে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি বহুধর্মের প্রভাব বজায় ছিল। সম্ভবত এর পার্শ্ববর্তী নদীটি নাব্যতা হারালে এবং সমুদ্র দূরে সরে পড়লে এ বন্দর-নগর ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে (গ) তমলুকে মহাস্থানের প্রাথমিক আমলের সমসাময়িক কালে কোন রাজধানী বা প্রশাসনিক কেন্দ্র অবস্থিত ছিল এমন ধারণা পোষণকরণের অবকাশ খুবই সীমিত।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি ঃ বর্ধমান জেলার অজয় নদীর উত্তর উপকূলে এ প্রত্নস্থলটির অবস্থান। কোলকাতা বোলপুর রেলসড়কের ভেতর দিয়ে স্টেশন থেকে সড়ক পথে ৯ কিমিঃ অতিক্রম করে প্রত্নস্থলটিতে পৌছানো সম্ভব। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত খনন পরিচালনা করে এ প্রত্নস্থলে মোট চারটি অধিবসতি আমলের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথম অধিবসতি আমলের নিদর্শনের মধ্যে মাটির তৈরি ঘরের ভিটাসহ (গোল, আয়তাকার ও বর্গাকার) দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ, তুষের চিহ্ন সংবলিত নিস্প্রভ লাল রঙের ওয়্যার, তুষের চিহ্ন সংবলিত নিস্প্রভ ধূসর রঙের ওয়্যার, ঔজ্জ্বল্যময় লাল ওয়্যার ও পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত কিছু কবরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাই এই অধিবসতি আমলটিকে তামা-পাথর যুগের প্রথম (তামা) পর্যায়ে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে নীত করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম অধিবসতি আমলের শেষ সময়কাল থেকে দ্বিতীয় বসতি আমলের অন্তবর্তী স্তরগুলোতে কিছু কয়লা, পাথরের ক্ষুদ্রাকার হাতিয়ার এবং গাঢ় পিঙ্গল রঙের একটি বিশেষ ধরনের ওয়্যারের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। দ্বিতীয় অধিবসতি আমলের ঘরগুলো কাদা দিয়ে তৈরি হলেও ভিটা

---

৫৬. Ranjana Mukerjee, ' A winged Figure from Tamluk', JVRM, Vol. 7 1981-82 pp. 96, 98.

তৈরির জন্য জমাটবদ্ধ লালমাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ভিটির মধ্যে খুঁটি পোতার গর্ত ও কাদার পলেস্তরাসহ রেণু বাঁশের দেয়ালের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে জমাটবদ্ধ পথ এবং গোরস্থান অন্যতম। তাছাড়া ওয়্যারের নমুনা একইরকম থাকলেও নক্‌শার মোটিফে এবং পাত্রের গড়নে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে তামা, হাড় ও হরিণের শিঙ দিয়ে তৈরি বিবিধ নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার ছিল, প্রস্তরীভূত কাঠে তৈরি একটি ক্ষুদ্রাকার স্ক্রেপার। কার্বন চৌদ্দ পরীক্ষার মাধ্যমে এ অধিবসতি আমলের সময়কাল পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব এগার শতক। তৃতীয় অধিবসতি আমলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লোহার আবির্ভাব। অন্যান্য নতুন ধরনের প্রত্নবস্তুর মধ্যে হাড়ের তৈরি তীরের ফলা, উপরত্ন পাথরের উপর সাদা রঙ দিয়ে খোদাই ভরাটকৃত পুঁতি, নব্যপাথর পর্যায়ের কৌণিক কুঁদা যুক্ত মসৃণ পাথরের সেল্ট, লোহার তৈরি অ্যল ও ব্লেড এবং ফ্লেইক অবমোচনের ক্ষত সংবলিত পাথরের অন্তস্তল অন্যতম। তাই এ অধিবসতি আমলের নাম দেওয়া হয়েছে নতুন পাথর-তথা- ধাতু-পাথর পর্ব। এর সময়কালের সূচনাকে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার অব্দে নীত করা হয়েছে। চতুর্থ অধিবসতি আমলের একটি উপ-বসতি আমল রয়েছে। শেষোক্ত অধিবসতি আমলটি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি। তবে এর তাৎক্ষণিক উপরের মূল অধিবসতি আমলটিকে প্রাক্-মৌর্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুরাজার ঢিবির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার একটি খড়িপাথরের সীলছাপ ও নলাকার ঠোঁটওয়ালা বাটি। কারণ খড়ি পাথরের সীলছাপ পুরা ঐতিহাসিক পর্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

মঙ্গলকোট ঃ বর্ধমান জেলা সদর থেকে ৩৫ কিমিঃ উত্তর-পূর্বে অজয় ও করনৌল উপত্যকায় অবস্থিত এ প্রত্নস্থলটিতে খননের ফলে ছয়টি অধিবসতি আমল চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।[৫৭] প্রথম অধিবসতি আমলের প্রত্ননিদর্শনগুলোর মধ্যে কাদার জমাটবদ্ধ মেঝে, পোড়ামাটির মৃত্তিকা, কালো ও লাল ওয়্যার এবং হাড় ও লোহার তৈরি বিবিধ সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত। এ অধিবসতি আমলের সূচনা আঃ খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এটি পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় অধিবসতি আমলের অন্তিম ও তৃতীয় অধিবসতি আমলের সময়কালের সমসাময়িক। মঙ্গলকোটের দ্বিতীয় অধিবসতি আমলে কালো ও লাল ওয়্যারের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং এর পরিবর্তে ধূসর, ফিকে লাল এবং দগ্ধপূর্ণ কালো প্রলেপ যুক্ত ওয়্যারের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। এ অধিবসতি আমলের অপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রাপ্তির মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাকার পোড়ামাটির নক্ষত্র জাতীয় নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত। এর সময়কাল ধাতু-পাথর যুগের অন্তিম পর্যায়ে নীত করা হয়েছে। তৃতীয় অধিবসতি আমলের নিদর্শনাদির মধ্যে লালচে রঙের মসৃণ ওয়্যার, উন্নতমানের ধূসর রঙের মৃৎপাত্র, দগ্ধপূর্ণ কালো প্রলেপ যুক্ত ও অত্যন্ত সরু সেকসন সংবলিত ওয়্যার (রঙের অঙ্কন সংবলিত ও বর্জিত), যৎসামান্য পরিমাণের উত্তরদেশীয় কালো মসৃণ ওয়্যার এবং পোড়ামাটির ফলক অন্তর্ভুক্ত। এর সময়কাল

---

৫৭. Amita Ray, 'Terracottas from Excavation at Mangalkot (Burdwan)', JBA, Vol. 1, 1996, pp, 28-31.

মৌর্য-শুঙ্গ শাসনামলের সমসাময়িক বলে গণ্য করা হয়েছে। চতুর্থ অধিবসতি আমলের প্রত্ননিদর্শনাদির মধ্যে উন্নতমানের লালরঙের মৃৎপাত্র (কদাচিৎ অলঙ্কৃত মোটিফসহ), নানাবিধ তামার গহনা (সাপ আকৃতির বালাসহ) এবং নিরেট ও ছাঁচে গড়া পোড়ামাটির মৃত্তিকা অন্যতম। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ অধিবসতি আমল থেকে পোড়াইটের স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড সূচিত হয়েছে। এর সময়কাল কুশান আমলে ন্যস্ত করা হয়েছে। পঞ্চম অধিবসতি আমলে বিবিধ রঙের মৃৎপাত্রের আবির্ভাব লক্ষ করা গেছে। এগুলোর রঙ লাল, বাদামি, ধূসর ও গৌরবর্ণ। অধিকাংশ পাত্রের গায়ে আরও রয়েছে দগ্ধপূর্ব এবং দগ্ধোত্তর রঙের প্রলেপ। এছাড়া ইটের তৈরি স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ডের হার যেমন ব্যাপক হয়েছে, তেমনি ভাস্কর্য নিদর্শনগুলো তাদের শিল্পশৈলীতে অভাবনীয় উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। ফলে এর সময়কাল গুপ্ত শাসনামলে নীত হয়েছে। ষষ্ঠ অধিবসতি আমলের স্তরগুলো এবং নিদর্শনাদি অত্যন্ত বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি।

চন্দ্রকেতুগড় ঃ কলিকাতা থেকে প্রায় ৪০ কিমিঃ উত্তর পূর্ব দিকে ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গা থানায় বিদ্যাধরি ও পদ্মা (ভাগিরথী ও হুগলির উপশাখা) নামক দু'টি মজা তটিনীর মধ্যবর্তী এলাকায় অনুর্ধ তেইশটি গ্রাম জুড়ে মহাস্থানগড় ও এর উপশহরের অনুরূপ একটি বিস্তীর্ণ প্রত্নস্থলটির অবস্থান। এর যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ঢিবি, দিঘি ও পুস্করিনী। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে এ প্রত্নস্থলের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন খনন ও অনুসন্ধান পরিচালনাসহ বেশকিছু আকস্মিক আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছে। এ যাবৎ যেসব ঢিবিতে খনন পরিচালিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে খানামিহিরের ঢিবি, ইঁটাখোলা, নুনগোলা, হদিপুর ও চন্দ্রকেতুগড় অন্যতম। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে।

বেরাচাম্পা (দেউলিয়া) নামক গ্রামে চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান। এই নামের উৎপত্তির সাথে চন্দ্রকেতু নামে একজন হিন্দু রাজা ও শাহ সৈয়দ আব্বাস আলী ওরফে গোরচাঁদ নামক একজন মুসলিম সুফী—সাধকের অলৌকিক যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী জড়িত। খনন, অনুসন্ধান ও যাবতীয় আকস্মিক আবিষ্কারের ফলাফলগুলোর উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ (খননে অংশ গ্রহণ না করেও) অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রত্নস্থলটির স্তরায়নকে নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।[৫৮] তাঁর মতে প্রথম অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ৬০০ – ৩০০ খ্রিস্টপূর্ব (প্রাক্-মৌর্য), দ্বিতীয় অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ৩০০ – ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (মৌর্য শাসনামল), তৃতীয় অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ২০০ খ্রিস্টপূর্ব – ৫০ খ্রিস্টাব্দ (শুঙ্গ শাসনামল), চতুর্থ অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ৫০–৩০০ খ্রিস্টাব্দ (কুশান শাসনামল), পঞ্চম অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ৩০০ – ৫০০ খ্রিস্টাব্দ

---

৫৮. Enamul Haque, 'Chandraketugarh : A Resume of Excavation Report (1956-67)' JBA, 1, 1966, p. 53.

(গুপ্ত শাসনামল), ষষ্ঠ অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ৫০০ – ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ (গুপ্তোত্তর শাসনামল) এবং সপ্তম অধিবসতি আমলের সময়কাল আঃ ৭৫০–১২৫০ খ্রিস্টাব্দ (পাল–চন্দ্র–সেন শাসনামল)। তবে লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে কেবল খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকের শৈলীর ধারাবহ কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মী সীলছাপ।

বানগড় ঃ মহাস্থানগড়ের সবচেয়ে নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল বানগড়। অধিকাংশ পণ্ডিত এ প্রত্নস্থলটিকে গুপ্ত শাসনামলের জারিকৃত তাম্রফলকে উল্লিখিত পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অধীন কোটিবর্ষ বিষয়ের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করেন। এটি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানায় পুনর্ভবা ও আত্রাই নদী দু'টির মধ্যবর্তী এলাকায় এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর শহর থেকে মাত্র ২৭ কিমিঃ উত্তরে অবস্থিত। এটি মূলত একটি প্রাচীর ঘেরা আয়তাকার (৫৪৮ মিঃ × ৪৫৭ মিঃ) দুর্গ। পশ্চিম দিক ব্যতীত এর অপর তিন দিক পরিখা বেষ্টিত। এর মধ্যবর্তী স্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোট বড় ঢিবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ঢিবিটির নাম রাজবাড়ি।

রাজবাড়ি ঢিবিতে প্রথম ১৯৩৮–৪১ সালে এবং পরবর্তী কালে ১৯৫১ সালে অন্য কয়েকটি স্থানে দ্বিতীয় দফা খনন পরিচালিত হয়। খননের ফলাফলকে মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথম বসতি আমলের সময়কাল আঃ খ্রিস্টপূর্ব তিন দুই শতক (মৌর্য শাসনামল), দ্বিতীয় অধিবসতি আমল আঃ খ্রিস্টপূর্ব দুই–এক শতক (শুঙ্গ শাসনামল), তৃতীয় অধিবসতি আমল আঃ খ্রিস্টীয় চার–ছয় শতক (গুপ্ত শাসনামল) এবং চতুর্থ অধিবসতি আমল আঃ খ্রিস্টীয় আট–বার শতক (পাল শাসনামল)। সবচেয়ে উপরিভাগের স্তরগুলো অত্যন্ত বিনষ্টকৃত অবস্থায় অনাবৃত হয়েছে। ফলে সবশেষ অধিবসতি আমলের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। তবে এ অধিবসতি আমলের স্তরগুলো থেকে যেহেতু বেশকিছু নীল ও সবুজ রঙের উজ্জ্বল টাইলস এবং খোলামকুচি আবিষ্কৃত হয়েছে সেহেতু এর সময়কাল মুসলিম শাসনামলের সূচনাপর্বে (আঃ খ্রিস্টীয় তের–চৌদ্দ শতক) ন্যস্ত করা যায়। লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছে চতুর্থ অধিবসতি আমলের একটি স্তরে। এটি ছিল একটি সীলছাপ। এই সীলছাপের বর্ণগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব দুই–এক শতকের বর্ণশৈলীর ধারাবহ ব্রাহ্মী লিপির অস্তিত্ব রয়েছে।

কর্ণসুবর্ণ ঃ খ্রিস্টীয় সাত শতকের চৈনিক পরিব্রাজক উয়ান চুয়াঙের বর্ণনার সূত্র ধরে এ যাবৎ তার উল্লিখিত প্রাচীন বাংলার চারটি ভূখণ্ডের দু'টি প্রশাসনিক কেন্দ্রের (পুণ্ড্রনগর ও তাম্রলিপি) অবস্থান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলেও সমতটের রাজধানী এবং শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত গৌড় সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্ণয় নিয়ে দীর্ঘদিন প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে হয়েছে। বর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে চলতি শতকের বিশের দশকে প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার বেরহামপুরের অধীন চিরুটী রেলস্টেশনের অদূরবর্তী ভাগিরথী নদীর পশ্চিম তীরস্থ বিস্তীর্ণ এলাকার প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কারণ এ এলাকার প্রায় সাত–আটটি গ্রাম (মধুপুর, চুনাপাড়া, চান্দিপাড়া, যদুপুর, সংস্কার, মাঝিরা, গোবিন্দপুর) জুড়ে

অসংখ্য ঢিবি ও জলাশয় এবং বিলের অস্তিত্ব রয়েছে। ঢিবিগুলোর মধ্যে রাক্ষসীডাঙ্গা, রাজবাড়িডাঙ্গা (কর্ণ রাজার বাড়ি), ঠাকুরবাড়িডাঙ্গা, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, বেলতলাডাঙ্গা ও শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠডাঙ্গা অন্যতম। জলাশয়গুলোর মধ্যে যমুনা তালাও ও ভীমকে তালাও নামক পুকুরগুলোসহ বেনীদিঘি ও ফুটাদিঘিসহ চৈতির বিলের উল্লেখ না করলেই নয়। এসব গ্রাম ও প্রত্নস্থলগুলো থেকে অনবরত নানা নমুনার প্রত্নবস্তু আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। এসব আবিষ্কারের মধ্যে মধুপুর গ্রামে প্রাপ্ত চুনবালির তৈরি একটি অবলোকিতেশ্বরের মস্তক, যদুপুর থেকে আবিষ্কৃত খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতকের একটি তারা মূর্তি এবং রাজবাড়িডাঙ্গা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত বৌদ্ধ শ্লোক সংবলিত সীলছাপ অন্যতম। এসব আবিষ্কারের সূত্রধরে এবং রাঙামাটি গ্রামে অবস্থিত রাক্ষসীডাঙ্গা নামক ঢিবির (পরিধি ২১৩ মিঃ এবং উচ্চতা ৭.৬ মিঃ) স্থানবিবরণ সম্পর্কিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয় যে, ঢিবিটিতে উয়ান চুয়াঙ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ গচ্ছিত থাকা সম্ভব।

১৯২৮–২৯ খ্রিস্টাব্দে উপর্যুক্ত সম্ভাবনার আলোকে রাক্ষসীডাঙ্গা ঢিবিতে খনন পরিচালিত হয়। খননে অনাবৃত স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দু'টি নির্মাণ সময়কালের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথম নির্মাণ সময়কালটিকে খ্রিস্টীয় ছয়–সাত শতক এবং দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালটিকে মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম নির্মাণ সময়কালের পোড়ামাটির ইট নির্মিত স্থাপত্যিক কীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কেবল কিছু প্রকোষ্ঠ, একটি হলঘর, চওড়া দেয়াল ও বারান্দা অন্তর্ভুক্ত। প্রত্নবস্তুর সংখ্যা ছিল ২৯২টি। তারমধ্যে ছয়–সাতটি চুনবালির তৈরি বুদ্ধমস্তক অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে প্রথমনির্মাণ সময়কালের বিধ্বস্ত স্থাপত্যিক কীর্তিটিকে একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আখ্যায়িত করা সম্ভব হলেও এটা যে উয়ান চুয়াঙ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা বিহার সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় নি।

রাক্ষসীডাঙ্গার খনন সমাপ্তির পর কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ষাটের দশকে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান পরিচালনাসহ বীরভূমের মহিষদলে ১৯৫৪ সালে এবং বর্ধমানের বীরভবনপুরে ১৯৫৭ সালে খনন পরিচালিত হয়। এবারও কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্ণয়ের প্রসঙ্গটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এরপর ১৯৬১ সালে একই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে বিহারের পুরুলিয়া মানভূম ও সিংহভূম জেলায় আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান চালিয়েও কোন সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। আর এরই ফলে রাক্ষসীডাঙ্গার উত্তরের অদূরবর্তী যদুপুর গ্রামের রাজবাড়িডাঙ্গা নামক ঢিবিতে নতুন ভাবে খনন পরিচালনা করা হয়।

১৯৬২ সালে রাজবাড়িডাঙ্গায় পরিচালিত খননের ফলাফল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। চিরুটী রেলস্টেশন থেকে মাত্র ১২৫০ মিঃ উত্তর–পূর্বে অবস্থিত রাজবাড়িডাঙ্গা নামক ঢিবিটির মধ্যদিয়ে একটি নালী প্রবাহিত থাকায় নালীটির পূর্বপাশের অংশ ঢিবি–১ ও পশ্চিম পাশের অংশ ঢিবি–২ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ঢিবি–২ এর উচ্চতা বেশি হওয়ায় এ অংশেই খনন শুরু হয়েছিল। খননের ফলে এ ঢিবিতে তিনটি নির্মাণ আমলের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। প্রথমনির্মাণ আমলের সময়কাল খ্রিস্টীয় দুই–চার শতক, দ্বিতীয় নির্মাণ আমলের সময়কাল খ্রিস্টীয় পাঁচ–ছয় শতক

থেকে নয়-দশ শতক[৫৯] এবং তৃতীয় নির্মাণ আমলের সময়কাল খ্রিস্টীয় নয়-দশ শতক থেকে বার-তের শতক হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে পোড়ামাটির সীলমোহর ও সীলছাপ, দু'টি চুনবালির মাথা, একটি তামার চক্র, হরেক রঙের (কমলা, ধূসর ও বাদামি) মসৃণ ওয়্যারের খোলামকুচি, পোড়ামাটির গোলক ও চাকতি, গোলপবাসের খণ্ডাংশ, পোড়ামাটির নিবেদন মৃত্তিকা, পুঁতি, মোচা, লোহার পেরেক, কড়ি, মাছের কাঁটা, পশুর হাড়, তামার সামগ্রী, উপরত্ন পাথরের পুঁতি, শঙ্খের চুড়ি, শামুকের খোলা, ঝিনুকের খোলা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় নির্মাণ সময়কালের স্থাপত্যিক নিদর্শনাদির মধ্যে বিভিন্ন আকারের ইটের দেয়াল, সোপানশ্রেণী, শান বাঁধান পথ, মেঝে, বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনা, স্তূপের মেধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সময়কালের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, অসংখ্য সীলমোহর। আর এরই উপর নির্ভর করে এ অঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্ণয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

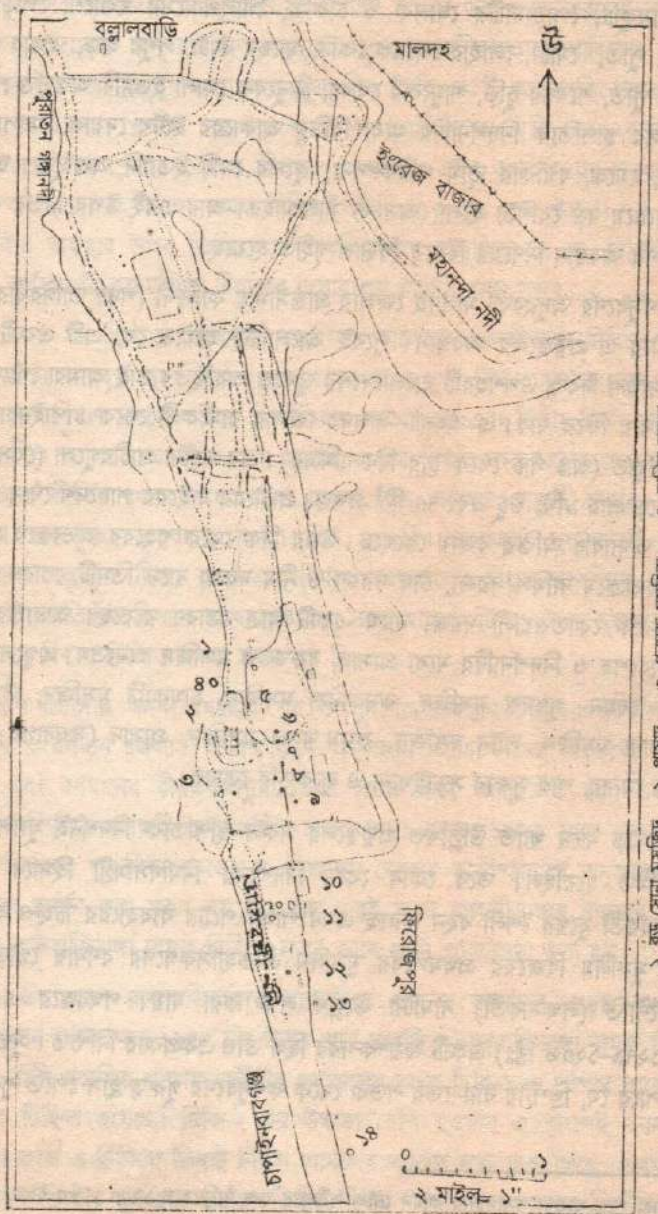
গৌড় ঃ কর্ণসুবর্ণের অদূরবর্তী মালদহ জেলার প্রান্তসীমায় কালিন্দী (পদ্মা ভাগিরথীর শাখা) উপনদের পূর্বতীরে এ প্রত্নস্থলের অবস্থান। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এটি একটি প্রাচীন শহর এবং এর দক্ষিণ দিকস্থ উপশহরটি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবস্থিত। তাই আমরা গৌড়ের মূল শহরের আলোচনায় ফিরে যাব। এ অংশটি মালদহ জেলার রামকেলী থেকে চাপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত (আঃ পাঁচ থেকে চার কিলোমিটার)। এর মাটির প্রাচীরগুলো (যেসব স্থানে টিকে আছে) গড়ে প্রায় ৯মিঃ উঁচু এবং ৭০ মিঃ প্রশস্ত। প্রাচীরের বাইরের পাদদেশ ঘেঁষে সুপ্রশস্ত পরিখার চিহ্নও অদ্যাবধি অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। উত্তর দিক থেকে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পর পর যথাক্রমে দাখিল দরজা, চাঁদ দরজা ও নীম দরজা নামে তিনটি তোরণ রয়েছে। অথচ দক্ষিণ দিকে কোতওয়ালী দরজা নামে একটি মাত্র তোরণ রয়েছে। অভ্যন্তরভাগের স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শনাদির মধ্যে প্রাসাদ, বুরুজ ও মসজিদ অন্যতম। এগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন- গুণমন্ত মসজিদ, ঝনঝনিয়া মসজিদ, চামকাঠি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ, লট্টন মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ, প্রাসাদ (সওদাগর বাদশার ঢিবি), ফিরোজ মিনার, শাহ সুজার সড়াইখানা ও লুকোচুরি তোরণ।

বর্তমানে গৌড় নামে খ্যাত উল্লিখিত প্রত্নস্থলের সকল স্থাপত্যিক নিদর্শনই মুসলমানদের শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। তবে কোন কোন নিদর্শনের নির্মাণসামগ্রী হিসাবে মুসলিম শাসনামলের পূর্ববর্তী যুগের শৈলী বহন করছে এমন পাথর পট্টের ব্যবহারের চিহ্নও লক্ষ করা যায়। তাছাড়া মুসলিম বিজয়ের প্রথমপর্বের মুসলিম ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় গৌড় নামের পরিবর্তে লক্ষণৌতি (লক্ষনাবতী) নামটির উল্লেখ লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে এ অঞ্চলে লক্ষণসেনের (১২৭৯-১২০৬ খ্রিঃ) একটি জয়স্কন্দবর ছিল তাও একপ্রকার নিশ্চিত ! সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, খ্রিস্টীয় বার-তের শতক থেকে কর্ণসুবর্ণের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করলে

৫৯. এ স্তরে প্রাপ্ত পুড়ে যাওয়া শস্যদানার কার্বন চৌদ্দ পরীক্ষার ফল দাঁড়িয়েছে ১২০০ + ৮০ বছর, Sudhir Ranjan Das, Rajbadidanga : 1962, Calcutta, 1968, p. 43

রেখাচিত্র – ৪৪

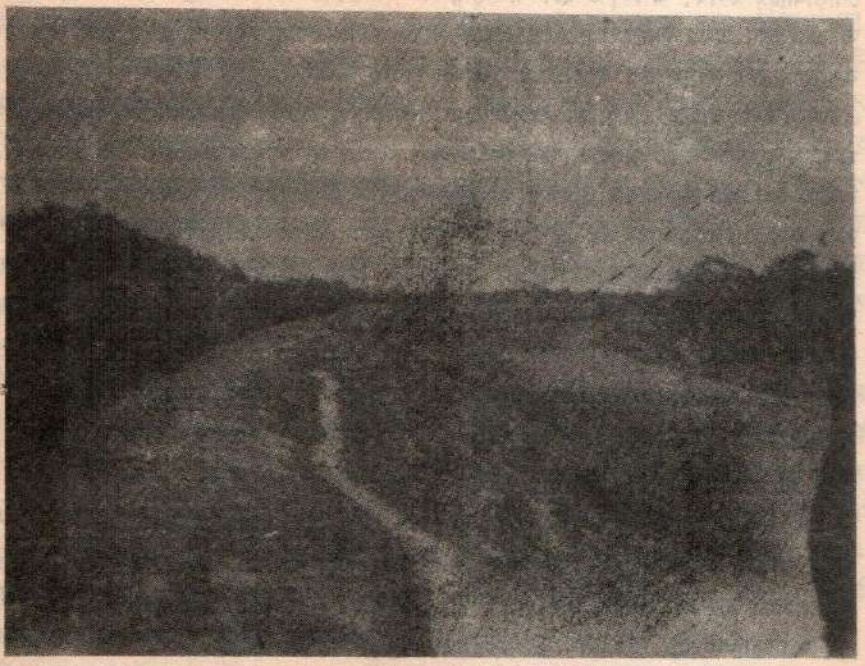
গৌড়-লক্ষ্মণৌতি



১. বড় সোনা মসজিদ ২. প্রাসাদ ৩. গুনমন্ত মসজিদ ৪. দাখিল দরওজা
৫. ফিরোজ মিনার ৬. চামকাঠি মসজিদ ৭. কদমরসুল ৮. লটন মসজিদ
৯. ঠাঁতীপাড়া মসজিদ ১০. লোতওয়ালী তোরণ ১১. দারাসবাড়ি ১২. নেয়ামতউল্লাহ কমপ্লেক্স ১৩. ছোট সোনা মসজিদ ১৪. টাকশাল

লক্ষণসেনের শাসনামল থেকে লক্ষনৌতি এবং মুসলিম শাসনামল থেকে গৌড় নামে নতুন একটি রাজধানীর অভ্যুদয় সূচিত হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গের আরও যেসব প্রত্নস্থলে ইতিমধ্যে খনন পরিচালিত হয়েছে সেসব প্রত্নস্থলগুলো পান্না, তিলদা, হরিণারায়নপুর, হরিহরপুর ও জগজীবনপুরে অবস্থিত। কিন্তু এসব খননের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু অবগত হওয়া সম্ভব হয় নি।

আলোকচিত্র ৫৫



পরিখাসহ গৌড় দুর্গের দক্ষিণ প্রাচীর

বাংলাদেশের বগুড়া জেলার কাটনেরপাড়া নামক একটি প্রত্নস্থলে ষাটের দশকে খনন পরিচালিত হয়েছিল। এই খনন প্রতিবেদন আজও প্রকাশিত হয় নি এবং এ সংক্রান্ত কোন তথ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালিত হয়েছে রাজশাহী, ঢাকা ও পুরাতন খুলনা বিভাগে। দু'একটি জেলা ব্যতীত অন্য জেলাগুলোর জরিপ প্রতিবেদনগুলোর প্রকাশনা দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে ১৯৮৯ সালে প্রাগৈতিহাসিক জরিপ পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর ফলাফল জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিচালিত প্রাগৈতিহাসিক জরিপের প্রতিবেদন আজও প্রকাশিত হয় নি। এমনকি খননে প্রাপ্ত

কোন প্রত্ননিদর্শনের কোন বৈজ্ঞানিক তারিখও নির্ণিত হয় নি।[৬০] ফলে নিকটতম ভূখণ্ড পশ্চিম বঙ্গে অনুষ্ঠিত খননের ফলাফলের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গোটা বঙ্গের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পথ বিলম্বিত হচ্ছে।

খনন, জরিপ বা আবিষ্কারার্থে ভ্রমণের মধ্যেই প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড সীমিত নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে প্রতিনিয়ত আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে অসংখ্য প্রত্নবস্তু। এ শ্রেণীভুক্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে মুদ্রা, মূর্তি, শিলালিপি, তাম্রফলক, ইমারতের নির্মাণসামগ্রী, পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কৃত ইট, সীলছাপ, সীলমোহর, কামান ও অলংকার সিংহভাগ জুড়ে আছে। আর এসব সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশের প্রধান প্রধান জাদুঘরগুলোই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এদের সংগ্রহগুলো সম্পর্কে এ পুস্তকের বিভিন্ন অংশে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বাইরের বেশ কটি জাদুঘরে এ দেশের কিছু নিদর্শন রয়েছে। এসব জাদুঘরগুলোর মধ্যে সানফ্রানসিস্‌কো এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম, লস এঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অব আর্ট, হার্ভার্ড ফগ আর্ট মিউজিয়াম, ব্রুকলিন মিউজিয়াম, নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট, অক্সফোর্ড এ্যাসমোলিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউজিয়াম, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মাদ্রাজ সরকারি জাদুঘর, বেনারস ভারত কলাভবন জাদুঘর, দিল্লী জাতীয় জাদুঘর, শিলিগুড়ি অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় জাদুঘর, মালদহ জাদুঘর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ জাদুঘর, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, আশুতোষ মিউজিয়াম অব আর্ট এবং কোলকাতার ভারতীয় জাদুঘর অন্যতম। এসব জাদুঘরের সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে মূর্তির সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া এমন কোন নিদর্শন আজ আর অবশিষ্ট নেই যেগুলো থেকে আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসে নতুন কোন তথ্য নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বিশালাকার প্রত্নস্থল মহাস্থানগড় থেকেও এ যাবৎ খননের মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকের পূর্ববর্তী কোন নিদর্শন আবিষ্কারের কথা অবগত হওয়া সম্ভব হয় নি। এটা হয় তো এ কারণে যে মহাস্থানগড়ে নব্বই দশকের পূর্বে কোন গভীর খনন পরিচালিত হয় নি। অতি সম্প্রতি ফ্রান্স-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে যে খনন পরিচালিত হচ্ছে তার ফলে এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে মাটির দেয়াল ও মেঝেতে ব্যবহার উপযোগী মাটির জমাটবদ্ধ পিণ্ড ও নানা নমুনার খোলামকুচি অন্যতম। কোন কোন খোলামকুচি ও হাঁড়ির ওয়্যারের রঙ হালকা লাল অথবা ধূসর। এদের বাইরের পিঠে গৌরবর্ণের নানা মটিফের অঙ্কন লক্ষ করা যায়। কোন কোন পাত্রের গড়ন ও মোটিফ পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় অধিবসতি আমলের সাথে সাদৃশ্যময়। আর এসব প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হচ্ছে এমন একটি স্তর থেকে যে স্তরটির কয়েকটি উপরের স্তর থেকে

---

৬০. অতি সম্প্রতি অবশ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে একজন বিশেষজ্ঞ বরেন্দ্র অঞ্চলে উদ্ধারপ্রাপ্ত শুঙ্গ শাসনামলের শিল্পশৈলী বিশিষ্ট কিছু পোড়ামাটির ফলকের তাপদ্যুতি বয়স ২৩০০-২১০০ বছর নির্ণিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন,
ডঃ এনামুল হক, বরেন্দ্রের ভাস্কর্যঃ প্রদোনকালের কিছু কথার, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ-৬।

ইতিপূর্বে ছাপাঙ্কিত ও লিপিবিহীন ঢালাই মুদ্রার একটি গুপ্তভাণ্ডার উদ্ধার হয়েছিল। সুতরাং মহাস্থানগড়ে প্রাগৈতিহাসিক না হোক অন্তত ব্রঞ্জ পর্যায়ের শেষ ও লোহ্য আবিষ্কারের যুগসন্ধিক্ষণের নিদর্শন যে আবিষ্কৃত হবে এমন ধারণা পোষণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

বাংলাদেশের আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের অনেকগুলো সময়কাল সম্পর্কেও আমাদের ধারণা নেহাৎ সীমিত। কারণ যদিও ধরে নেওয়া হয়, মৌর্য শাসনামলে এ দেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তথাপি মৌর্য শাসকদের প্রভাব পূর্বদিকে কতদূর বিস্তৃত ছিল সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। শুঙ্গ, কহ্নব ও কুশান শাসনামলের সময়কাল তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। কেবল মাত্র মেহরৌলি লৌহ স্তম্ভ থেকে সমতটের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য এলাকাগুলো থেকে পাল পূর্বযুগের নিদর্শনাদি একেবারেই আবিষ্কৃত হয় নি বলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়। তবে গুপ্ত শাসনামলের যেসব তাম্রশাসন বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া গেছে সেসবের সময়কাল খ্রিস্টীয় পাঁচ শতকে ন্যস্ত করা যায়। এসব তাম্রশাসনে উল্লিখিত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি সম্পর্কে আমরা পূর্বথেকেই নিশ্চিত হলেও পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত পঞ্চনগরী বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপাদানের অভাব রয়েছে, যদিও অনেকেই ধারণা করেন যে জয়পুরহাটের অধীন পাঁচ বিবির নিকটস্থ পাথরঘাটার প্রত্নস্থলটি পঞ্চনগরী নামক প্রশাসনিক কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ ধারণ করছে।

সমতটে (কুমিল্লা-নোয়াখালি) প্রাপ্ত সবচেয়ে পুরাতন লিখিত সূত্রটি খ্রিস্টীয় ছয় শতকের নিদর্শন। গুনাইঘর তাম্রশাসন (আঃ ৫০৬-৭ খ্রিঃ) নামে কুমিল্লা অঞ্চলে প্রাপ্ত এ লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শন জারিকারী মহারাজা বন্যগুপ্তের কিছু সীলছাপ বিহার রাজ্যের নালন্দা বিহারেও পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে, তিনি প্রথম জীবনে শৈব এবং পরিণত বয়সে বৌদ্ধত্ব গ্রহণ করে চরম কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার তাম্রশাসনটি জারি হয়েছিল ত্রিপুর থেকে। কিন্তু এই বন্যগুপ্তের পরিচয়, তার রাজ্য ও রাজত্বের অবস্থান এবং ত্রিপুরের অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ই এখনও অমীমাংসিত সত্যের মতো আমাদের জানা।

খ্রিস্টীয় ছয় শতকে ফরিদপুর থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আর একটি রাজবংশের উত্থান এবং পতন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। তাদের একটি দুর্গ-নগরী ফরিদপুরের কোটালীপাড়ার চন্দ্রবর্মণকোট সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ যে বরাক (সম্ভবত বঙ্গ) মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল তা চন্দ্রবর্মণকোট, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও বর্ধমানের মল্লসারুলে প্রাপ্ত তাম্রফলকগুলো থেকে অবগত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর সমসাময়িক কালে পুণ্ড্রনগর ও বাংলাদেশের অপরাপর এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য নেই বললেই চলে। তবে ঢাকার সাভার এলাকায় সুধন্যাদিত্য নাম উৎকীর্ণ কিছু গুপ্তোত্তর অনুকৃত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ নামের সাথে কোটালীপাড়ায় রাজত্বকারী ধর্মাদিত্যের নামের সৌসাদৃশ্য এবং পূর্বেআলোচিত কিছু স্থাপত্যিক নিদর্শনাদির শৈলীজাত পারস্পরিক কারণে অনুমিত হয় যে, গুপ্তোত্তর শাসনামলে সাভারকে কেন্দ্র করে আরও একটি প্রশাসনিক

কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

খ্রিস্টীয় সাত শতকে মহারাজ শশাঙ্কের নেতৃত্বে কর্ণসুবর্ণকে (মুর্শিদাবাদের যদুপুর রাঙামাটি) কেন্দ্র করে গৌড় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু গৌড়সাম্রাজ্যের আধিপত্য পূর্ব দিকে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তা একেবারেই অনিশ্চিত। শশাঙ্কের সাথে দীর্ঘদিন কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার যুদ্ধ বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। পরবর্তী একশ বছর (আঃ ৬৫০–৭৬১ খ্রিস্টাব্দ) মাৎস্যন্যায়ের (চরম বিশৃঙ্খলা) শাসনামল হিসাবে পরিচিত। অথচ এসময় কুমিল্লার পূর্বাঞ্চলে সূচিত হয় নতুন ইতিহাস। এ সময়ের দু'টি রাজধানী কর্মান্তবসাক ও দেবপর্বত সম্ভবত কুমিল্লা সদরের কোন না কোন এলাকায় অবস্থিত ছিল। কিন্তু এদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয় নি।

খ্রিস্টীয় আট শতকের শেষ অর্ধাংশের শুরুতে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী পাল সাম্রাজ্য এবং নয় শতকে পূর্বাংশে চন্দ্র নামে আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশের আর্বিভাব সূচিত হয়। পালদের জন্মভূমি বরেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রদের উৎপত্তিস্থল রোহিতগিরির সঠিক অবস্থান আজও নির্ণিত হয় নি। তবে তাদের সমসাময়িক সময়কাল থেকে চট্টগ্রাম–সিলেট অঞ্চল নিয়ে হরিকেল নামে অপর একটি প্রশাসনিক অঞ্চলের উদ্ভব লক্ষ করা যায়। দশম শতকের দিকে চন্দ্রগণ বিক্রমপুরে তাদের রাজধানী স্থানান্তর করেন। এরপর মুসলমান বিজয়ের পূর্বপর্যন্ত যথাক্রমে বর্মন ও সেনগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। চন্দ্র, বর্মন ও সেনদের রাজত্ব পশ্চিমে কতদূর বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে মতামত প্রদানের মতো তথ্য বিরল। অন্যদিকে বার–তের শতকের দিকে সিলেট অঞ্চলে ভট্ট এবং কুমিল্লা–চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরবর্তী দেব বংশ নামে আরও দু'টি বংশের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া উক্ত সময়কালে লালমাই–ময়নামতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পট্টিকের নামে আরও একটি রাজ্যের উদ্ভব সম্পর্কে কোটবাড়ি তাম্রফলক থেকে অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি রূপবান মুড়ায় খনন খাদের বক অপসারণ কালে একটি তাম্রফলক আবিস্কৃত হয়। এর উপরের বর্ধিতাংশে ধর্মচক্রের দু'পাশে দু'টি হরিণ উপবিষ্ট রয়েছে। দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এ তাম্রফলকটি খ্রিস্টীয় সাত–আট শতকে রাজত্বকারী কোন দেববংশীয় রাজা কর্তৃক জারিকৃত বলে অনুমিত হয়। সিরাজগঞ্জ,[৬১] বগুড়ার শেরপুর, ও পাথরঘাটার নিকটবর্তী একটি অঞ্চল থেকে আরও তিনটি তাম্রফলক আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া প্রত্নবস্তু অধিদপ্তরে আরও দু'টি তাম্রফলক রয়েছে। এদের একটির মাপ ২৩.৮ সেমিঃ × ২২.৩ সেমিঃ। তবে উপরের ডিম্বাকার বর্ধিতাংশসহ এটির দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২০.৭ সেমিঃ। ২ মিমিঃ পুরুত্ব বিশিষ্ট এই তাম্রফলকের মুখ্যপিঠে ১৯টি এবং গৌণপিঠে ২৪টি চরণ রয়েছে। চরণের ভাষা সংস্কৃত এবং হরফগুলো খ্রিস্টীয় এগার–বার শতকের দেবনাগরী লিপিশৈলী বহন করছে। এর উপর দিকের বর্ধিতাংশের মুখ্যপিঠে যুগল নরনারী এবং গৌনপিঠে চাঁদতারা উৎকীর্ণ রয়েছে। দ্বিতীয়

৬১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর একটি পাঠোদ্ধারও প্রকাশ করেছে।

তাম্রফলকটি ২৬.৮ সেমিঃ (বর্ধিতাংশসহ ৩০ সেমিঃ) × ২২.৪ সেমিঃ। এর মুখ্যপিঠে চরণের সংখ্যা চব্বিশটি এবং গৌণপিঠে উনিশটি। এর বর্ধিতাংশের এক পিঠে চাঁদতারা অস্পষ্টভাবে বোঝা গেলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। এগুলোর পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। এমনকি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে একাধিক পত্র প্রেরণ করেও শেষোক্ত দু'টি তাম্রফলকের কেবল প্রাপ্তি স্থলগুলো সম্পর্কে কোন তথ্য অবহিত হওয়া সম্ভব হয় নি। এসব তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের ইতিহাসে সংযোজিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

খ্রিস্টীয় তের শতকের শুরু থেকে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হতে শুরু করে। এর পর থেকে গৌড়, সোনার গাঁ, বারবকাবাদ, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি প্রশাসনিক কেন্দ্রের সূত্রপাত হয়। তবে মুসলিম শাসনামলের মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্যকীর্তি দেশের প্রায় সবঅঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং খ্রিস্টীয় তের শতকের পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্বের যতটা না করণীয় তার চেয়ে ঢের বেশি করণীয় রয়েছে পূর্ববর্তী যুগ, পর্যায়, পর্ব ও শাসনামলগুলো সম্পর্কে। আর এ অসমাপ্ত কাজ যেদিন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে কেবল সেদিনই আত্মগর্বে বলা সহজ হবে ঃ আমাদের আছে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

পরিশিষ্ট-১
উপাস্য-মূর্তি পরিচিতি

ধর্ম	পরিচয়	মুখমণ্ডল	হাত	আয়ুধ ও মুদ্রা (দক্ষিণাবর্তে)	বাহন	পরিচারক ও পরিচারিকা	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	ব্যতিক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
হিন্দু	ব্রহ্মা	তিন	চার	অক্ষমালা, কমণ্ডল, পাণ্ডুলিপি ও পবিত্র চামুচ	হাঁস	সাবিত্রি ও সরস্বতী	সৃষ্টিকর্তা হিসাবে পূজিত	ক. একটি হাত অভয় অথবা বরদ মুদ্রায় ন্যস্ত থাকতে পারে। খ. আয়ুধের মধ্যে এক মুঠো ঘাস, কুশ, স্রুব ও ঘি পূর্ণ পাত্র থাকতে পারে। গ. রূপমণ্ডল অনুযায়ী পাঁচটি মাথাও থাকতে পারে। ঘ. শীফতোদর
ঐ	বিষ্ণু	এক	চার	–	গরুড়=পাখি ও মানুষের শংকরজাত	লক্ষ্মী ও সরস্বতী	ক. বনমালা= আজানুলম্বিত পুষ্পমাল্য। খ. রক্ষাকারী হিসাবে পূজিত	
ঐ	কেশব বিষ্ণু	ঐ	ঐ	শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম	ঐ	ঐ	–	ঐ
ঐ	নারায়ণ বিষ্ণু	ঐ	ঐ	পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ	ঐ	ঐ	–	ঐ
ঐ	মাধব বিষ্ণু	ঐ	ঐ	চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা	ঐ	ঐ	–	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯	গোবিন্দ-বিষ্ণু	৯	৯	গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র	৯	৯	৯	
৯	বিষ্ণু	৯	৯	পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা	৯	৯	৯	
৯	মধুসূধন-বিষ্ণু	৯	৯	শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র	৯	৯	৯	
৯	ত্রিবিক্রম-বিষ্ণু	৯	৯	গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম	৯	৯	৯	
৯	বামন-বিষ্ণু	৯	৯	চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ	৯	৯	৯	
৯	শ্রীধর-বিষ্ণু	৯	৯	চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম	৯	৯	৯	
৯	ঋষিকেশ-বিষ্ণু	৯	৯	চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা	৯	৯	৯	
৯	দামোদর-বিষ্ণু	৯	৯	শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম	৯	৯	৯	
৯	পদ্মনাভ-বিষ্ণু	৯	৯	পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ	৯	৯	৯	
৯	সংকর্ষণ-বিষ্ণু	৯	৯	শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা	৯	৯	৯	
৯	বাসুদেব-বিষ্ণু	৯	৯	শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা	৯	৯	৯	
৯	প্রদ্যুম্ন-বিষ্ণু	৯	৯	শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র	৯	৯	৯	
৯	অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু	৯	৯	পদ্ম, শঙ্খ, গদা, ও চক্র	৯	৯	৯	
৯	পুরুষোত্তম-বিষ্ণু	৯	৯	পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্র	৯	৯	৯	
৯	অধোক্ষজ-বিষ্ণু	৯	৯	গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম	৯	৯	৯	
৯	নরসিংহ-বিষ্ণু	৯	৯	পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র	৯	৯	৯	
৯	অচ্যুত-বিষ্ণু	৯	৯	পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা	৯	৯	৯	
৯	জনার্দণ-বিষ্ণু	৯	৯	গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ	৯	৯	৯	
৯	উপেন্দ্র-বিষ্ণু	৯	৯	গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ	৯	৯	৯	
৯	হরি-বিষ্ণু	৯	৯	চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ	৯	৯	৯	
৯	শ্রীকৃষ্ণ-বিষ্ণু	৯	৯	গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ	৯	৯	৯	
৯	মৎস্যাবতার	৯	৯	শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম	৯	৯	৯	দেহের নিচের অর্ধাংশে মাছের রূপ প্রদান করা হয়।
৯	কূর্মাবতার বিষ্ণু	-	-	-	-	-	-	বিষ্ণু কচ্ছপের রূপ ধারণ করেন।
৯								অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	বরাহবতার বিষ্ণু	–	–	–	–	–	–	নরদেহের মাথার ভাগে বরাহ (শূকরের) মাথা জুড়ে দেওয়া হয়।
ঐ	নরসিংহবতার বিষ্ণু	ঐ	ঐ	নিচের দু'হাতে হিরণ্যক শিপ নামক অসুরের পেট বিদীর্ণ অবস্থায় বিন্যস্ত এবং উপরের দু'হাতে শঙ্খ ও চক্র ধৃত থাকে		লক্ষ্মী ও ভূদেবী	লক্ষ্মী ও ভূদেবী	ক. নরদেহের মাথার অংশ সিংহ সদৃশ্য হিসাবে বিধৃত হয়। খ. হাতের সংখ্যায় ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। গ. মোটামুটি কয়েকটি রূপ দেখা যায়– গিরিজ, নরসিংহ বা যোগ-নরসিংহ, স্থূনরসিংহ ও যনক নরসিংহ।
ঐ	বামনাবতার বিষ্ণু	ঐ	–	–	–	–	–	ক. দেহ বামন আকার। খ. হাতের সংখ্যা দুই-চার। গ. আয়ুধের মধ্যে কমণ্ডলু বা লাঠি অন্তর্ভুক্ত হয়। ঘ. কোন কোন মূর্তির দেহকে ত্রিবিক্রম মুদ্রায় বিন্যস্ত করা হয়।
ঐ	পরশুরাম বা ভার্গ-ভরাম বিষ্ণু	ঐ	দুই অথবা চার	দু'হাত বিশিষ্ট অবস্থায় যুদ্ধ কুঠার ও সূচি মুদ্রা	–	–	সুন্দর দেহ বল্লরী	–
ঐ	দশরথ রাম–বিষ্ণু	ঐ	দুই	তীর ও ধনু	–	–	ঐ	–
ঐ	বলরাম–বিষ্ণু	ঐ	দুই অথবা চার	লাঙ্গল	–	–	ঐ মাথার উপর সর্পফণা	–

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	বুদ্ধ-বিষ্ণু	ঐ	দুই	–	–	–	নগ্নদেহী	হাত ও পায়ের তালুতে পদ্মচিহ্ন মুখে প্রশান্তি ও শঙ্খার খর্বাকৃতির চুল।
ঐ	কল্কি-বিষ্ণু	ঐ	দুই অথবা চার	শঙ্খ, চক্র, গদা ও খেটক কখনো এক হাতে একটি তলোয়ার	–	–	ঘোড়ার উপর সমাসীন	বৈইখান সাগম সূত্রানুযায়ী তার ঘোড়া আকৃতির মুখ থাকতে পারে।
ঐ	চর্তুব্যূহ বিষ্ণু	চার	–	–	–	–	–	চারটি মুখ যথাক্রমে বাসু-দেব সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যবর্তী মুখটি মানুষের, ডানেরটি সিংহের বাঁমেরটি বরাহের এবং পেছনেরটিতে ভীষণ-দর্শন রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়।
ঐ	যোগস্থানক-বিষ্ণু	এক	চার	চক্র, বরদ, অভয় এবং শঙ্খ	–	শ্রীদেবী, ভগ্ন ভূদেবী ও সার্কণ্ডেয়	–	ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, একটি হাত কদাচিৎ কট্য-বলম্বিত বিন্যাসে বিন্যাসিত থাকে এবং চার পার্শ্বে সূর্য, চন্দ্র, কিন্নর, যক্ষ, তুম্বুরু নারদ ও ঋষিশনক উপস্থিত থাকেন।
ঐ	বীরস্থানক-বিষ্ণু	ঐ	ঐ	চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম	–	–	–	চার পাশে ব্রহ্মা, শিব, ভগ্ন, মার্কণ্ডেয় সূর্য ও চন্দ্র উপস্থিত থাকেন।
ঐ	অভিচারিক স্থানক বিষ্ণু	ঐ	দুই অথবা চার	–	–	–	–	মুখকরাল-দর্শন, ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং ও কালো পরিচ্ছদ।
ঐ	যোগাসন-বিষ্ণু	ঐ	চার	–	–	–	–	শ্বেত-শুভ্র বরণ, জটা মুকুটধারী রাজকীয় পোশাক, একটি হাত যোগমুদ্রায় বিন্যাসিত এবং চার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								পাশে শিব ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য, সনক, সনাতকুমার ভৃগু অথবা ভূদেবী এং মার্কণ্ডেয় উপস্থিত থাকেন।
ঐ	ভোগস্থানক বিষ্ণু	ঐ	চার	চক্র, বরদ, শঙ্খ ও সিংহকর্ণ	–	শ্রীদেবী ও ভূদেবী	–	গায়ের রং কালো, সিংহাসনে সমাসীন এবং চার-পাশে শিব, ব্রহ্মা, দুজন দেবী, তুমবুরু, নারদ এক জোড়া কিন্নর, যক্ষযক্ষী, বিদ্যাধর, সনক, সনতকুমার, চন্দ্র, সূর্য, কল্পবৃক্ষ এবং নতমস্তকে মার্কণ্ডেয়সহ ভৃগু উপস্থিত থাকেন।
ঐ	বীরাসন-বিষ্ণু	ঐ	ঐ	চক্র, ভোগ, শঙ্খ ও সিংহকর্ণ	–	–	–	গায়ের রং রক্তবর্ণ এবং চারপাশে নত মস্তকে শ্রীদেবী ও ভূদেবী, ব্রহ্মা, মার্কণ্ডেয় শিব, ভৃগু, চামরবাহিনী, সনক, সনতকুমার, তুমবুরু, নারদ, সূর্য প্রমুখ উপস্থিত থাকেন।
ঐ	অভিচারিগসন বিষ্ণু	ঐ	দুই	–	–	–	–	গায়ের রং কালো ও হলুদ মিশ্রিত, দেহের এক চতুর্থাংশ অর্ধ উত্তোলিত, সর্প শয্যায় শায়িত, ডান হাত মস্তকের কিরীট স্পর্শ করবে। বাঁম হাত কটকমুদ্রায় বিন্যাসিত এবং চারপাশে মার্কণ্ডেয় ও ভৃগু, মধু, কৈটভ শিব, আয়ুধপুরুষ, সপ্তঋষি, গরুড় ও বিষ্বকসেন উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্গত পদ্মের উপর ব্রহ্মা সমাসীন থাকবেন।
ঐ	ভোগশয়ান-বিষ্ণু	ঐ	চার	–	–	আয়ুদপুরুষ, সূর্য অশ্বিমি, তুমবুরু,	–	কালো গায়ের রং, যোগস্থানক ভঙ্গি, নাভি থেকে উদ্গত পদ্মের উপর ব্রহ্মা সমাসীন এবং চার পাশে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
							নারদ, আটদিক পাল ও অপসরা	মার্কণ্ডেয়, ভৃগু, শিব, কৈটভ উপস্থিত থাকেন।
ঐ	যোগশয়ান-বিষ্ণু	ঐ	ঐ	–	–		–	অভিচারিক এর অনুরূপ, তবে চারপাশে ভৃগু, মার্কণ্ডেয়, মধু, কৈটভ, আয়ুধ পুরুষ, গরুড়, বিশ্বকসেন, সপ্তঋষি, শিব উপস্থিত থাকবেন। নাভি থেকে উদ্গত পদ্মের উপর ব্রহ্মা সমাসীন থাকেন।
ঐ	বীর-শয়ান-বিষ্ণু	ঐ	ঐ	উপরের দুই হাতে দু'টি চক্র	–	–	শ্রীদেবী ও ভূদেবী	গায়ের রং কালো, একটি হাত শিয়রের নিচে এবং বাঁমের হাতটি প্রসারিত থাকে, চারপাশে ক্ষমা, ভিক্ষার ভঙ্গিতে মধু ও কৈটভ, ভৃগু, মার্কেণ্ডেয়, শিব, সূর্য, চন্দ্র, দ্বাদশাদিত্য, একাদশ রুদ্র, পঞ্চ আয়ুধ পুরুষ, গরুড়, অপসরা, তুমরুরু, নারদ কিন্নর, সনক ও সনতকুমার উপস্থিত থাকেন। নাভিমূল থেকে অঙ্কুরিত পদ্মের উপর ব্রহ্মাও সমাসীন থাকেন।
ঐ	অভিচারিকাশয়ন বিষ্ণু	ঐ	চার অথবা দুই	–	–	–	–	গায়ের রং গাঢ় কালো, মুখাবয়ব করাল দর্শন এবং দু'টি ফণাধারী একটি সাপের উপর শায়িত থাকেন।
ঐ	ব্রহ্মানদেববিষ্ণু বিষ্ণু	দুই	ঐ		–	–	–	বিষ্ণু ও কার্ত্তিকের শঙ্খর জাত। এ মূর্তি কেবল নেপালে দেখা যায়।
ঐ	কৃষ্ণ-বিষ্ণু	এক	দুই, আট দশ এবং বার	–	–	–	–	গাঢ় কালো গায়ের রং। বিভিন্ন অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। শিশু অবস্থার মূর্তিগুলো ননী গোপাল, বালগোপাল,বেনু গোপাল ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত হয়। যুবকরূপে তাকে জোড়া অর্জুনবৃক্ষ উৎপাটনকারী মধু-কৈটভ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								ঋষি ইত্যাদি রূপে দেখানো হয়। কখনও বা মাথার উপর সর্প-ফণা থাকে। এ ধরনের মূর্তিকে অনেকে কৃষ্ণ, বোধিসত্ত্ব পদ্মপানির শঙ্কর জাত হিসেবে গণ্য করে। ঋষিকেশ, লোকেশ্বর, শঙ্কর নারায়ণ প্রভৃতি নামেও পরিচিত।
ঐ	শিব	ঐ	দুই অথবা চার		নন্দী (বৃষ)	–	ক) সংহারকারী হিসাবে পূজিত হন।	ক. মাথায় জটা, গলায় সাপ, বাঘের চামড়ার পরিচ্ছদ ও হাতির চামড়ার ফরাস তার ব্যবহৃত সামগ্রী।
							খ) অসংখ্য রূপে আবির্ভূত।	খ. সৌম ও রুদ্রপ্রকৃতির দুটি প্রধান রূপ আছে।
ঐ	যোগদক্ষিণ শিব	ঐ	চার	যোগপট্ট, অক্ষমালা, কমণ্ডলু ও পদ্ম	–	–	সৌম রূপ	–
ঐ	বীণাধর শিব	ঐ	ঐ	ব্যাখ্যায়ন বীণা, ব্যাখ্যায়ন ও সর্পকর	–	–	ঐ	–
ঐ	ব্যাখ্যায়ন দক্ষিণ শিব	ঐ	ঐ	বরদ, অক্ষমালা, ব্যাখ্যায়ন ও সাপ	–	–	ঐ	ঋষিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত বীরাসনে উপবিষ্ট ত্রিনেত্র ও জটামুকুটধারী।
ঐ	জ্ঞানদক্ষিণ শিব	ঐ	ঐ	অক্ষমালা, অভয় দণ্ড ও জ্ঞানমুদ্রা	–	–	–	–
ঐ	নটরাজ শিব	ঐ	দশটি থেকে ষোলটি	চক্র (বলয়), গদা, ত্রিশূল, মুষল, ডমরু, হাল, তলোয়ার, অগ্নি পূর্ণঘট, ধ্বজ, খড়্গ ও পাশ।	– –	–	–	কোন কোন হাত দন্তহস্ত, গজহস্ত ও অভয় মুদ্রায় এবং শরীর নৃত্যের দ্যোতনায় বিন্যস্ত থাকে। পোশাক হাতির ছল, নাগউপবীত নাগপট্টি বহু নাগ কুণ্ডল, করোটি ও ফুল। তিনি গণেশের সাথে নৃত্যরত থাকেন। মূর্তির উপরাংশে গণেশ ও কার্ত্তিক উপস্থিত থাকেন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	চন্দ্রশেখর শিব	ঐ	চার	অভয়, পরশু, মৃগ ও বরদ			–	জটায় অর্ধচন্দ্র শোভিত এবং উমা উপস্থিত থাকেন।
ঐ	লোকালিশ শিব	ঐ	দুই অথবা চার	রজ্জু, শূল, অক্ষমালা, ত্রিশূল, কপাল, টঙ্ক ও তলোয়ারের মধ্যে যে কোন একটি থেকে তিনটি		আলিধ ও অঞ্জলি মুদ্রায় দু'জন পরিচারিকা		পাশুপাত-শৈবদের নিকট শিবের অবতার হিসেবে পূজিত। মোট তিনটি রূপ। প্রথম রূপে একটি হাত গজহস্ত মুদ্রায়, দ্বিতীয় রূপে একটি হাত অভয় মুদ্রায় এবং তৃতীয় রূপে একটি হাত বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। এছাড়া মুখমণ্ডলে হিং তার ভাব প্রস্ফুটিত করে রুদ্র লোকালিসের রূপও বাঙ্ময় করা হতো।
ঐ	সুখাসন শিব	ঐ	চার	বরদ, মৃগ, সিংহকর্ণ ও পরশু	–	–	–	ত্রিনেত্রসহ সুন্দর মুখশ্রী ও দেহবল্লরির অধিকারী এই দেবতা সুখাসনে ভদ্রপিঠে থাকেন।
ঐ	অনুগ্রহ শিব	ঐ	ঐ	টঙ্ক, চক্র, পদ্ম, বেত, পরশু কৃষ্ণ, মৃগ, উৎপল, ধনু, বান ইত্যাদির মধ্যে যে কোন তিনটি বা দু'টি।				মোট ছয়টি রূপে পাওয়া যায়, যথা- বৈষ্ণবানুগ্রহ অথবা চন্দ্রদান, নন্দিশানুগ্রহ, বিঘ্নেশ্বরানুগ্রহ, কিরা, রাবনীগ্রহ, চান্দেশানুগ্রহ। তবে সব ক্ষেত্রেই একটি তৃতীয় চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। আয়ুধবিহীন হাতগুলোতে বরদ ও অভয় মুদ্রার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিষ্ণুবানুগ্রহ মূর্তিতে ব্রহ্মা ও পার্বতী, নন্দিশানুগ্রহ মূর্তিতে মাল্যদানরত নন্দিকেশর, বিঘ্নেশ্বর মূর্তিতে বিঘ্নেশ্বর, কিরাত মূর্তিতে অঞ্জলি মুদ্রায় অর্জুন, রাবনানুগ্রহ মূর্তিতে গণ পরিবেশিত রাবনসহ পার্বতী এবং চান্দেশানুগ্রহ মূর্তিতে অঞ্জলি মুদ্রায় চান্দেশ উপস্থিত থাকেন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	মল্লারি	ঐ	দুই	ডমরু ও খড়্গ	সাতটি কুকুর পরিবেষ্টিত একটি সাদা ঘোড়া	–	–	শরীরের রং সোনালি। মাথা অর্ধচন্দ্র ভূষিত, কানে কুণ্ডলধারী এবং গলায় মনিমুক্তা সহ ফুলের মালা ধারণ করে। কেরল মধ্য ভারতের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাস্য হিসেবে বিবেচিত হন।
ঐ	বৃষ বাহুল	ঐ	চার	লাঠি, পরশু ও মৃগ	–	–	–	সুখাসনে পার্বতীসহ বিধৃত হন। বাহন বৃষের উপস্থিতি থাকে পেছনে। বামের একটি হাত বৃষের মাথায় ন্যস্ত থাকে। আভরণ হিসাবে রাজকীয় পোশাক ও অলংকার পরিধান করেন।
ঐ	সদাশিব	পাঁচ	দশ	শক্তি, শূল, ঘতভাঙ, ভুজঙ্গ, অক্ষমালা, ডমরু নীলোৎপল, এবং মাতুনঙ্গ				দু'টি হাত অভয় ও বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে।
ঐ	বিষপহরণ	এক	চার	পরশু, মৃগ ও বিষপূর্ণ পাত্র				তৃতীয় চোখ, বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত একটি হাত ইত্যাদির উপস্থিতি দেখা যায়। এছাড়া পার্বতী আলিঙ্গনাবস্থায়, উপস্থিত থাকেন।
ঐ	উমা-মহেশ্বর	–	–	–	–	–	আলিঙ্গন মূর্তি	মধ্যবর্তী স্থানে শিশু কার্তিক (কুমার, স্কন) সহ শিব ও পার্শ্বর্তী উপবিষ্ট থাকেন।
ঐ	গঙ্গাধরশিব	–	–	–	–	–	–	দেবীসহ শিব সুখাসনে উপবিষ্ট থাকেন।
ঐ	কল্যাণ সুন্দর শিব	–	–	–	–	–	–	শিব দেবীসহ নৃত্যায়মান অবস্থায় বিধৃত হন।
								বরকনের সাজে সজ্জিত দেবীসহ শিব। তাঁদের সম্মুখে পিতামাতা হিসাবে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবী, পুরোহিত হিসাবে ব্রহ্মা এবং দর্শক হিসাবে অষ্টদিকপাল, সিদ্ধগণ যক্ষগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব গণ, সপ্তম মাতৃকা ও অন্যান্য দেবীগণ উপস্থিতি থাকেন। শিব ডানে হাতে পার্বতীকে গ্রহণ এবং বাম হাতে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করেন। শিবের একটি তৃতীয় চোখ ও থাকে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	অর্ধনারীশ্বর	–	–	–	–	–	শঙ্করজাত	মূর্তির ডান অংশে শিব ও বাম অংশে পার্বতীকে যৌথভাবে বিধৃত করা হয়।
ঐ	হরিহর	–	–	–	–	–	ঐ	ডানে শিব ও বামে বিষ্ণুর যৌথ সমাবেশ ঘটানো হয়। উভয়ের দেহাংশে তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসূচক প্রলক্ষণগুলো প্রস্ফুটিত থাকে।
ঐ	হরিহর পিতা মহার্ক			–	–	–	ঐ	শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্যের যৌথসমাবেশ ঘটানো হয়। প্রত্যেকের দেহাংশে তাঁদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট সূচক প্রলক্ষ্যগুলো প্রস্ফুটিত থাকে।
ঐ	সৌরশিব	–	–	–	–	–	–	শিব ও সূর্যের যৌথ সমাবেশ ঘটানো হয়।
ঐ	কামান্তক	–	–	–	–	–	–	যোগদক্ষিণা শিবের অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এই যে, শিবের সম্মুখে পঞ্চশর(রাগ অনুরাগ, বিরহ, কাম ও কেলী) বিধৃত এবং পুষ্পমাল্য বিভূষিত ও ধনু হাতে কাম ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় থাকেন।
ঐ	গজাসুর	এক	চার আট অথবা ষোল	পাশ, হাতির চামড়া, হাতির দাঁত, ত্রিশূল, ডমরু, কপাল	–	–	রুদ্র (উগ্র) রূপে শিব	গজাসুর নামক অসুরকে নিধনকারী হিসাবে ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিধৃত হন।
ঐ	কালারি	ঐ	চার অথবা আট	–	–	–	ঐ	ভূলুণ্ঠিত যমকে বাঁ পায়ে আঘাত রত অবস্থায় বিধৃত হন।
ঐ	ত্রিপুরান্তক শিব	ঐ	চার	–	–	–	ঐ	অত্যাচারী তিনজন অসুরবধকারী হিসাবে বিধৃত হন।
ঐ	সরভেশনুশিব						ঐ	সরভেশন (সিংহসদৃশ্য) নামক পাখিকে সংহারকারী হিসেবে শিব বিধৃত হন। এই পাখির দুটি পাখা ও বহুসংখ্যক পা থাকে।
ঐ	ব্রহ্মাশিরচ্ছেদ-শিব	ঐ	ঐ	–	–	–	ঐ	পাঁচ মাথা বিশিষ্ট ব্রহ্মার একটি মাথা কর্তনকারী হিসেবে বিধৃত হন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	ভৈরব শিব	ঐ আট	চার অথবা	–	কুকুর	–	ঐ	তাঁর গায়ের রং পাত্রে কালো, আকৃতি খর্বকার ও স্ফীতোদর। তার চোখ গোলায়িত এবং নাক চেপ্টা। তিনি করোটির মালা ও সর্পালংকার পরিধান করেন। এটাও ব্রহ্মার মস্তক কর্তনকারী দ্বিতীয় রূপ।
ঐ	বীরভদ্রশিব	ঐ ও অগ্নিশিখা।	চার	খরগ, ধনুক, গদা এবং যষ্ক	ছাগল	ভদ্রকালী	ঐ	দক্ষ কর্তৃক আয়োজিত এক উৎসর্গ সভা সংহারকারী হিসেবে বিধৃত হন। একটি তৃতীয় চোখ থাকে।
ঐ	জলন্ধরহরশিব	ঐ	দুই	ছাতা ও কমণ্ডুল	– ও গঙ্গা	জলন্ধর	ঐ	পার্বতীকে অপহরণকারী জলন্ধর নামক এক অসুরকে দমনকারী রূপে বিধৃত হন। কপালে তৃতীয় চোখ ও মাথার জটায় অর্ধচন্দ্র শোভিত থাকে।
ঐ	অঘোরশিব	ঐ	আট অথবা বত্রিশ অথবা দশ	বেতাল, খড়্গ, ডমরু কপাল, ত্রিশূল, শূল পাশ, দণ্ড, ধনু অথবা বান এবং খেতক।	–	–	ঐ	একটি তৃতীয় চোখ ও প্রলম্বিত দাঁত তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোন কোন মূর্তিতে তাকে মুণ্ডিত মস্তকে কালের শায়িত দেহের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় বিধৃত করা হয়। তার গলায় করোটি ও ছোট ছুরির তৈরি হার শোভা পায়।
ঐ	মহাকাল	এক	দুই	–	–	–	ঐ	উজ্জয়নির ব্রাহ্মণগণকে এক অসুরের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য তিনি এরূপে আবির্ভূত হন। এক্ষেত্রে তার গায়ের রং কালো, চোখ রক্তবর্ণ, এর গায়ে ফতুয়া পরিহিত থাকে। তিনি পানীয় পানরত অবস্থায় বিধৃত হন।
ঐ	কঙ্কাল (ভিক্ষু) শিব	এক	চার ও ডমরু	লাঠি ও কপাল	–	–	প্রসমিত শিব	ব্রহ্মার শিরচ্ছেদের পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভিক্ষু হিসেবে বিধৃত হন। এই শ্রেণীর মূর্তিগুলোকে কংকাল ও ভিক্ষাত মূর্তি নামে চিহ্নিত হয়। কোন কোন মূর্তিতে তিনি ব্রহ্মার মৃত দেহরক্ষীর কংকাল বহন করেন। ভিক্ষাত মূর্তিতে তাকে নগ্ন হিসেবে বিধৃত করা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	লিঙ্গ শিব	–	–	–	–	–	প্রতীকী শিব	নালীসহ সোলাকার স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর ঊর্ধ্বমুখী পুংজননেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত করে বিধৃত করা হয়। নারীজননেন্দ্রিয় অংশটি গৌরীপট্ট নামে আখ্যায়িত হয়। পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের নিম্নাংশের চতুষ্কোণাকার অংশকে ব্রহ্মভাগ, মধ্যবর্তী দণ্ডাকার অংশকে বিষ্ণুভাগ ও শিরদেশের ডিম্বাকার অংশকে রুদ্রভাগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। রুদ্রভাগ সাধারণত নিরাভরণ থাকে। তবে যদি এর পাশে কোন মুখমণ্ডলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহলে ঐ গুলিকে মুখলি বলা হয়। মুখমণ্ডলের সংখ্যা একটি হলে একমুখলি এবং দুটি হলে দ্বিমুখ এভাবে লিঙ্গ ত্রিমুখ ও চতুর্মুখ হতে পারে। এছাড়াও আকৃতি ভেদে ছদ্মাকার লিঙ্গগুলোকে চললিঙ্গ বলা হয়। বৃহদাকার লিঙ্গগুলো অচল বা জ্যোতির্লিঙ্গ নামে পরিচিত।
ঐ	কার্ত্তিক	এক, তিন ছয়	দুই, চার বার	মুরগী, বশ, পতাকা শক্তি, ঘন্টা পদ্ম, দন্ড, খড়গ খেতক, অক্ষমালা, কুক্কুট, বান ধনু, পাশ, অংকুশ, শঙ্খ, বজ্র কমণ্ডলু মুসল।	ময়ূর	–	শিবের কনিষ্ঠ পুত্র	স্কন্দ, কুমার ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আয়ুধ বিহীন হাতগুলো অভয়, কট্যবলম্বিত ও বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তার পরিধানে রাজকীয় পোশাক, মাথায় মুকুট ও দেহে নানাপ্রকার অলংকার শোভিত থাকে। তার বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন নাম রয়েছে। নামগুলোর মধ্যে সুব্রাহ্মন্য, শক্তিধর, সেনাপতি, দেবসেনাপতি, সন্মুখ, ব্রহ্মাসাস্তা তারকারি, দেশীকে সুব্রাহ্মন্য প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পরিচিত।
ঐ	গণেশ	এক, পাঁচ	চার, দুই দশ	ফুলের গোছা, নাগ মিষ্টিপাত্র, কুঠার পদ্ম,পাশ, অঙ্কুশ ও রুদ্রাক্ষেরমালা।	ইদুর (মুষিক)		শিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র	তিনি বিঘ্নরাজ, হেরম্ব, গণপতি, গজানন, বিনায়ক এবং আরও বহুনামে পরিচিত। তার মাথা হাতির অনুরূপ। স্ফীতোদর পেটের নিম্নাংশ সর্পবন্ধনী দিয়ে বাঁধা থাকে। হেরম্ব রূপে তিনি সিংহের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								এক্ষেত্রে তার আয়ুধগুলোর মধ্যে অক্ষমালা, নলখাগড়া, তক্ক, গদা, হাতিরদাঁত, সিম ও ফাঁস অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়া দুটি হাত বরদান ও অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তিনি ধন দেবতা হিসেবে পরিচিত।
ঐ	সূর্য	এক	দুই	পদ্ম	একাধিক ঘোড়া চালিত রথ	সুরেনু, স ছন্দ, ছায়া, দণ্ড বা দণ্ডী (স্কন্ধ) পিঙ্গল বা খেতক	রোগহর্তা রূপে পূজা লাভ করেন।	তিনি স্থানকভংগিতে দণ্ডায়মান থাকেন। তিনিই একমাত্র দেবতা যিনি পায়ে বুট জুতা পরিহিত থাকেন। তিনি সবিত, আদিত্য, বরুণ ইত্যাদি আরও বহু নামে পরিচিতি। তার অপর একটি রূপের নাম মার্তণ্ড ভৈরব। এক্ষেত্রে তার তিনটি মাথা ও দশটি হাত থাকে। পাশের দুটি মাথা ভীষণ দর্শন।
ঐ	বীরুপাক্ষ	ঐ	ঐ	–	উট		–	–
ঐ	সাবিত্রী	দশটি	চার	অক্ষমালা, পবিত্র পুস্তক, পদ্ম ও কমণ্ডলু	–	–	–	ব্রহ্মার সহচরী হিসেবে বিবেচিত।
ঐ	গঙ্গা	এক	দুই	অঙ্কুশ ও পাশ	মকর (হাতি ও জলজ প্রাণীর শংকরজাত)			দ্বিভঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে।
ঐ	যমুনা	ঐ	ঐ	–	কচ্ছপ	–	–	দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান থাকে।
ঐ	বিশ্বকর্মা	ঐ	ঐ	মাপদণ্ড ও পাণ্ডুলিপি	করি (হাতি)		মহাশিল্পী হিসাবে পূজিত	তার চার হাত বিশিষ্ট রূপও রয়েছে। এক্ষেত্রে মানদণ্ড ছাড়া তিনি হাতুড়ি, ছেনি ও ধনুর্বাণ ধারণ করেন।
ঐ	সোমনাথ	ঐ	চার	–	শশধর (খরগোস)		রুহিনী ও কান্তি	মাথার পেছনে অর্ধচন্দ্র শোভিত থাকে বলে তিনি চন্দ্রসীতাংশু নামেও পরিচিত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	রেবন্ত	ঐ	দুই	–	–	–	সূর্যের পুত্র হিসাবে পূজিত	একাধিক অনুচর পরিবেষ্টিত অশ্বরোহী রূপে বিধৃত হন।
ঐ	দ্বাদশাদিত্য	–	–	–	–	–	–	ধাতৃ, মিত্র, পরমন্য, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবশ্বান, কূষণ, সবিত তৃষ্টা ও বিষ্ণু প্রমুখ পরবর্তী বেদ যুগীয় দেবতাগণ একত্রে বিধৃত হন।
ঐ	কাম	এক	দুই	ধনু ও বাণ	–	–	প্রেমের দেবতা হিসাবে চিহ্নিত হন	সাধারণত ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তার পায়ের উপর রতি ও মিত্রা নামে দুই স্ত্রী উপবিষ্ট থাকেন। তার পায়ের নিচে মকর ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত ফুল বিধৃত করা হয়।
ঐ	শনি	এক	চার	শুল, বান, ধনু, ও গদা	গৃধ (শকুনী) ও মকর	–	রুদ্ররূপে বিধৃত হন এবং অন্ত্যজদের অধিপতি হিসাবে পরিচিত।	প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, সূর্যের উরসে সঙ্জার (মতান্তরে ছায়া) গর্ভে তার জন্ম। মন্দির বা গৃহের পরিবর্তে উন্মুক্তস্থানে মাস কলাই তেল, নীলা, কৃষ্ণ, তিল, লোহা ইত্যাদি দিয়ে তার পূজা করা হয়। সাধারণত তিনি ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। বিপদ-আপদ মুক্তির জন্য তার পূজা করা হয়। সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি যে দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন সে দিকে সব বিনষ্ট হয়ে যায়।
ঐ	দেবী (গৌরী, পার্বতী, অপরাজিতা)	ঐ	চার	অক্ষমালা, সোম, আয়না, জলপাত্র অথবা পদ্ম ও লিঙ্গ	গোধিকা	–	সৌমরূপ। তিনি শিবের স্ত্রী হিসাবে গণ্য হন।	ব্রহ্ম বৈতর্ত পুরাণ অনুযায়ী তার ষোলটি নাম আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি হাত অভয় মুদ্রায় ন্যস্ত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে গনেশ কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, ও স্বরসতী, উপস্থিত থাকেন।
ঐ	দেবী	ঐ	আট থেকে বিশ		সিংহ	–	রুদ্র রূপ, সংহারকারিণী	তিনি যুগে যুগে বিভিন্নরূপে অসুভকে বিন্যাসের নিমিত্তে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন। তাই তিনি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
							রূপে গণ্য হন।	একাধিক নামে পরিচিত। এসব নামের মধ্যে দুর্গা মহিষাসুর মর্দিনী, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী, শূলিনী, ভদ্রশালী, বিন্দুবাসিনী ইত্যাদি অন্যতম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সাথে শিব পরিবারের অন্য চার সদস্যগণও উপস্থিত থাকেন। তার অন্যান্য রুদ্র রূপের মধ্যে কালী ও সর্বানি অন্যতম।
ঐ	মহালক্ষ্মী	ঐ	চার	যাম্মির, গদা, ঢাল ও করোটি	–	–		তার মাথার উপরে ফেনী, লিঙ্গ ও সাপ বিধৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তলোয়ার, মুণ্ডিত মস্তক ও করোটি আয়ুধ হিসেবে ধারণ করেন। তার ব্যতিক্রম ধর্মী রূপগুলো মহামারি, ক্ষুধা, যোগনিদ্রা, কালোরাত্রি, মহামায়া, মহাসরস্বতী, চামুণ্ডা, এবং আরো বহুনামে পরিচিত। তবে চামুণ্ডা রূপে তাকে কৃষ্ণকায় ও ভয়াল দর্শন এবং নরমুণ্ডের মালা পরিহিত অবস্থায় বিধৃত করা হয়। এক্ষেত্রে তার পরিধানে বাঘের চামড়ার পোশাক এবং মুখে প্রলম্বিত জিহ্বা ও চুলে সর্প ফণা থাকে। তাঁর আসনের নিচে একটি মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় থাকে। তার বাহন পেঁচা। হাতের সংখ্যা অনুযায়ী চামুণ্ডা মূর্তিগুলোকে চর্চিকা, কৃষোদরী ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তার আয়ুধের মধ্যে মুসল, বজ্র, বাণ, অঙ্কুশ, খড়্গ, খেতক, পাশ ধনুক, দণ্ড, পরশু, আগুন, সাপ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	মনসা	ঐ	দুই অথবা চার	সাপ ও ফল	ঘট	ঋষি জরত কাসর ও অস্তিকমুনি	সাপ থেকে রক্ষাকারিনী হিসাবে পূজা লাভ করেন।	তিনি জগৎ গৌরী, শৈবী, বৈষ্ণবী, নাগেশ্বরী, সিদ্ধযোগিনী, পদ্মাবতী ইত্যাদি নামে পরিচিতা। সাধারণত ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তার মাথার উপর থাকে পাঁচ অথবা নয়টি সাপের ফণা। এদের নাম, সপ্ত বাসুকী ও নববাসুকী। কখনও বা তার কোলে অস্তিককে শিশু অবস্থায় বিধৃত করা হয়। চার হাত বিশিষ্ট মূর্তির ক্ষেত্রে তার আয়ুধ হলো গাছের ডাল, ফল ও শিশু।
ঐ	অম্বিকা	ঐ	দুই	আম্রমঞ্জুরি	–	–	–	হিন্দু মূর্তি হলেও জৈন ও বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত হন। ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। বাম পায়ের উপর শিশু উপবিষ্ট থাকে। হিন্দু অম্বিকার ক্ষেত্রে মাথার উপর গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ বিধৃত থাকে। অপর জৈন অম্বিকার ক্ষেত্রে বিশেষ লাঞ্ছণ বিধৃত করা হয়।
ঐ	শীতলা	ঐ	ঐ	ঝুড়ি	খচ্চর	–	বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা করেন।	–
ঐ	সদ্যোজাত	ঐ	ঐ	–	–	–	সৌভাগ্য সূচক	একটি পট্টখেসে অর্ধশয়ান ভঙ্গিতে দেবী বিধৃত হন। পট্টের এক প্রান্তে শিবলিঙ্গ এবং অপর প্রান্তে নন্দীসহ শিবলিঙ্গ বিধৃত করা হয়। কোন কোন নিদর্শনে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গজ লক্ষ্মী উপস্থিত থাকেন।
ঐ	লক্ষ্মী	ঐ	ঐ	মৃনালসহ পদ্ম ও ভিলব ফল	পেঁচা	চামর ধারিনী	তিনি শিবের কনিষ্ঠ দুহিতা।	তার চার হাত বিশিষ্ট রূপও দেখা যায়। এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত দুটি আয়ুধ অমৃত ঘট ও শঙ্খ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
							সৌভাগ্য প্রদান কারিণী রূপে পূজা লাভ করেন।	তার একটি রূপের নাম গজলক্ষ্মী। এক্ষেত্রে দু দিকে দু'টি হাতি দাঁড়িয়ে জল সিঞ্চন করে। তার অন্যান্য রূপের মধ্যে মহালক্ষ্মী, অভিষেক লক্ষ্মী, শ্রী, ভূদেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।
ঐ	সরস্বতী	ঐ	চার	ব্যাখ্যায়ন মুদ্রা অক্ষমালা, পুস্তক ও বীণা	হাঁস	–	তিনি শিবের জেষ্ঠ্য দুহিতা। বিদ্যা প্রদান-কারিণী হিসাবে পূজা লাভ করেন।	তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী রূপও রয়েছে।
ঐ	মাতৃকা	–	–	–	–	–	এরা নৈসর্গিক নারী (প্রকৃতির) মর্যাদা লাভ করেন। তাই বহু দেবতার শক্তি হিসাবে এদের রূপ কল্পিত হয়েছে।	সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে এযাবৎ সপ্ত মাতৃকার ধারণাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এসেছে। এদের মধ্যে মহেশ্বরের মহেশ্বরী বা শিবের শৈবা বিষ্ণুর বৈষ্ণবী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, কুমারের কৌমারী, গণেশ বা বিনায়কের বিনায়কী ব্রহ্মার ব্রহ্মানী ও যোগেশ্বরের যোগেশ্বরী অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কোন কোন অঞ্চলে বরাহ অবতারের বরাহী এবং নরসিংহের নরসিংহীর অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। প্রত্যেক মাতৃকার মধ্যেও তাদের স্ব স্ব নৈসর্গিক নর-প্রকৃতির (যেমন শৈবার মধ্যে শিবের) বৈশিষ্ট্য সূচক প্রলক্ষণগুলো সুস্পষ্ট থাকে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জৈন	ঋষভনাথ (আদিনাথ)	এক	দুই	পদ্মপাপড়ি	চক্র ও কদাচিৎ পদ্ম পাপড়ি	গোমুখ ও চক্রেশ্বরী	দণ্ডায়মান অবস্থায় কায়ৎ-সর্গ বা সমপদ স্থানক ভঙ্গি বজায় থাকে তীর্থংকর (ধর্ম প্রচারক) হিসাবে পরিচিত।	বদ্ধপরায়ঙ্ক বা পদ্মাসন বা ধ্যানাসনেও উপবিষ্ট থাকেন। এছাড়া এর থাকে বুটিদার চুল, প্রলম্বিত কর্ণ লতিকা ও বক্ষে শ্রীকতসত চিহ্ন।
ঐ	অভিনাথ (অজিতনাথ)	ঐ	ঐ	সপ্তপর্ণ	হাতি	মহামক্ষ ও অজিতবালা	ঐ	ঐ
ঐ	সম্ভবনাথ	ঐ	ঐ	–	ঘোড়া	ত্রিমুখ প্রজ্ঞাপতি বা দ্রয়িতারি	ঐ	ঐ
ঐ	অভিন্দনাথ	ঐ	ঐ	–	বানর	লক্ষেশ্বর, ব্রজ শৃঙ্খলী ও কালিকা	ঐ	ঐ
ঐ	সোমতিনাথ	ঐ	ঐ	–	হাঁস বা বক	তমবুরু, পুরু-ষদত্ত বা মহাকাল,	ঐ	ঐ
ঐ	পদ্মপ্রভা	ঐ	ঐ	–	পদ্ম	কুসুম, মনোভেগা মনোগুপ্তা, শ্যাল অচ্যুতা	ঐ	ঐ
ঐ	সুপার্শনাথ	ঐ	ঐ	–	স্বস্তিক	বরনন্দিন মাতঙ্গ কালী শান্তি	ঐ	ঐ
ঐ	চন্দ্রপ্রভা	ঐ	ঐ	নাগকেশর	চাঁদ	বিজয় ভ্রুকুটি ও জ্বালামালিনী	ঐ	ঐ
ঐ	সুবিধিনাথ (পুষ্পদণ্ড)		ঐ	ঐ	মাছ বা কুমির অলংকৃত	অজিত মহাকালী ও সুতারকা	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	শিতলনাথ	ঐ	ঐ	–	বরফি	ব্রহ্মা, ব্রহ্মেশ্বর ও মানসী অশোক	ঐ	ঐ
ঐ	শুপার্শনথ	ঐ	ঐ		স্বস্তিক	বরনন্দিন মাতঙ্গ, কালী ও সান্তা	ঐ	ঐ
ঐ	চন্দ্রপ্রভা	ঐ	ঐ	নাগকেশর	চাঁদ	বিজয় ভ্রুকুটি ও জ্বালামালিনী	ঐ	ঐ
ঐ	সুবিধিনাথ (পুষ্পদণ্ড)	ঐ	ঐ	–	মাছ বা কুমির	অজিত মহাকালী ও সুতারকা	ঐ	ঐ
ঐ	শিতলনাথ	ঐ	ঐ	–	অলঙ্কৃত বরফি	ব্রহ্মা, ব্রহ্মেশ্বর মানসী ও অশোক	ঐ	ঐ
ঐ	প্রেয়ংশনাথ	ঐ	ঐ	–	গণ্ডার	ঈশ্বর, গৌরী, মানবী	ঐ	ঐ
ঐ	বসুপুয্য	ঐ	ঐ	–	ষাঁড়	কুমার গান্ধারী ও চুণ্ডা	ঐ	ঐ
ঐ	বিমল নাথ	ঐ	ঐ	জম্বু	ভেড়া বা বরাহ	সম্মুখ ও বিদিতা	ঐ	ঐ
ঐ	অনন্তনাথ	ঐ	ঐ		বাজ	পাতাল, অনন্ত-মূতি ও অঙ্কুশ	ঐ	ঐ
ঐ	কান্তিনাথ	ঐ	ঐ	নন্দীবৃক্ষ	হরিণ	কিমপুরুষ ও মহামানসী	ঐ	ঐ
ঐ	ধর্মনাথ	ঐ	ঐ		বজ্র বা ত্রিশূলের শিরোদেশ	কিন্নর মানসী ও কন্দর্প	ঐ	ঐ
ঐ	কুন্তনাথ	ঐ	ঐ	তিলক	ছাগল	গন্ধর্ভি ও বলয়	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	অরনাথ (অরিষ্ঠনেমী)	ঐ	ঐ	বেতস	মাছ/শঙ্খ টগর ফুল	কেন্দ্র, যক্ষেন্দ্র অর্জিত ধন	ঐ	ঐ
ঐ	মরিনাথ (মল্লী)	ঐ	ঐ	–	কচ্ছপ ও ফলসী	কুবের অপরা-জিতা ও ধরনপ্রিয়	ঐ	ঐ
ঐ	মনিসুব্রত	ঐ	ঐ	–	ঘট ও কচ্ছপ	বরুণ, বহুরূপিনী ও নরদণ্ড।	ঐ	ঐ
ঐ	সোমিনাথ	ঐ	ঐ	–	শঙ্খ		ঐ	ঐ
ঐ	নরিনাথ	ঐ	ঐ	–	নীলোৎপল	ভ্রুকুটি চামুণ্ড	ঐ	ঐ
ঐ	পার্শ্বভনাথ	ঐ	ঐ	দেবদারু	ফণাতোলা সাপ	ধরনেন্দ্র (বাম) ও পদ্মবতী)	ঐ	ঐ
ঐ	মহাবীর	ঐ	ঐ	শাল	বাঘ ও সিংহ	মাতঙ্গ ও দিন্ধয়িকা	ঐ	ঐ
ঐ	চতুর্বিংশতিপট্ট		–	–	–	–	–	একটি পাথর পট্টে একত্রে চব্বিশ জন তীর্থংকরের যুগ্ম সমাবেশ ঘটানো হয়।
ঐ	সমাসরণ	–	–	–	–	–		একটি বর্গাকার পাটাতনের উপর তিনটি ক্রমহ্রস্বতা প্রাপ্ত গোলাকার ধাপে উর্দ্ধগামী একটি মঞ্চ। এর শিরোদেশে ব্যাঘ্রাসন মুদ্রায় একজন তীর্থংকর উপবিষ্ট থাকেন। তার দু'পাশে একজন করে চামরধারী অনুচর ও দ্বারপাল থাকেন। এছাড়া সমবসরনের অন্যান্য অংশে অন্যান্য তীর্থংকর, দেবদেবী উপ-দেবদেবী, ধর্মানুরাগী ও পশুপাখি বিধৃত করা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	শালক পুরুষ বাহুবলী	ঐ	ঐ	–	–	–	তার দেহ লতা-পাতার অলঙ্করণে সুসজ্জিত থাকে	তার দেহে কায়তসর্গ বিন্যাস বজায় রাখা হয়।
বৌদ্ধ	আদিবুদ্ধ	ঐ	ঐ	–	–	–	যোগাসন	মুণ্ডিত মস্তক গলায় বলিরেখা, সর্বাঙ্গ উত্তরীয়ে ঢাকা, প্রলম্বিত কানের লতিকা।
ঐ	বজ্রসত্ত্ব	ঐ	ঐ	দ্বিমুখো বজ্র ও ঘন্টা	–	–	ঐ	খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে বজ্রযানের আবির্ভাব সূচিত হলে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর মাথায় উষ্ণীষ শোভা পায়। তাঁকে দেবত্ব সূচক প্রলম্বকর্ণেও ভূষিত করা হয়।
ঐ	ধ্যানীবুদ্ধ ও অক্ষোভ্য	ঐ	ঐ	–	–	–	ভূমিস্পর্শ মুদ্রা	ধ্যানে মগ্ন থাকেন।
ঐ	ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি	ঐ	ঐ	–	–	–	অভয়মুদ্রা	ঐ
ঐ	ধ্যানীবুদ্ধ বৈরচন	ঐ	ঐ	–	–	–	উত্তরাবোধি বা ধর্মচক্র মুদ্রা	ঐ
ঐ	ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব	ঐ	ঐ	–	–	–	বরদ মুদ্রা	ঐ
ঐ	ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ	ঐ	ঐ	–	–	–	সমাহিত মুদ্রা	ঐ
ঐ	অবলোকিতেশ্বর	ঐ	দুই অথবা চার	পদ্ম	–	–	উপবিষ্ট অবস্থায় ললিতাসনে বিধৃত হন। তবে দণ্ডায়মান মূর্তির সংখ্যাই অধিক।	তিনি লোকনাথ লোকেশ্বর নামেও পরিচিত। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের হিসাবে পরিচিত। তার শক্তি পাণ্ডরা তারা। বর্তমানকল্পের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের মুকুটে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের প্রতিকৃতি খোদিত থাকে। সাধনমালায় তার বত্রিশটি সাধনার উল্লেখ আছে। কোন কোন উপবিষ্ট মূর্তিতে আলো কিন্তেশ্বরকে ব্রহ্মা বা শিবের সাথে অভিন্ন মনে হয়। এসব ক্ষেত্রে তার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								হাতগুলো অঞ্জলি বরদ বা বিতর্ক মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। অন্যান্য হাতগুলোতে চক্রাকার সাপ বা ত্রিশূল ধৃত থাকতে পারে।
ঐ	বজ্রপানি	ঐ	দুই	পদ্মসহ ডাল	–	–	দণ্ডায়মানরূপেই বেশি পাওয়া যায়। তবে উপবিষ্ট অবস্থায় বজ্রাসন ও মহা-রাজা লীলাসনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়।	তিনি অক্ষোভ্যের বোধিসত্ত্ব। তার দেহে রাজকীয় জৌলুস পাগড়ি, পর্যাপ্ত অলংকার ও কমনীয় পরিচ্ছদ থাকে। একটি হাত বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে।
ঐ	বজ্রধর	ঐ	ঐ	একমুখোবজ্র	–	–		বজ্রজানি বৌদ্ধ মতবাদের বজ্রসত্ত্বের প্রতিনিধি বজ্রধর। একটি হাত বুকের সম্মুখে স্থাপিত থাকে।
ঐ	গৌতমবুদ্ধ	ঐ	ঐ	–	–	–	উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান, শয্যাশায়ী প্রতীকী ইত্যাদি ভঙ্গিতে বিন্যস্ত হন।	তার মূর্তিতে বত্রিশটি প্রলক্ষণ বজায় থাকে। এর মধ্যে কপালের উর্ণা (বটিকার মত ফোঁটা, প্রলম্বিত কর্ণ লতিকা উষ্ণীষ (থোকায় থোকায় কুঞ্চিত চুল) গলায় বলয় রেখা, পরনে সংঘালি (ভিক্ষু পরিচ্ছদ বা চাঁদর) ইত্যাদি অন্যতম। তার হাত দু'টির একটি বরদ অথবা অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত রাখা হয়। অপর হাতটি সংঘালির একটি প্রান্তধৃত অবস্থায় থাকে। ডান কাঁধ উন্মুক্ত থাকে। উপবিষ্ট অবস্থায় যোগাসনে ধর্মচক্র অথবা ভূমি স্পর্শ মুদ্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								প্রতীকী অবস্থায় ঘোড়া (মহা প্রস্থান), শূন্য আসন (মহা প্রয়াণ) চক্র (ধর্ম প্রচার) বোধি বৃক্ষ (বৌদ্ধত্ব লাভ), হরিণ (ধর্ম বাণী শ্রবণ), হাতি (জন্ম) মই (জীবন) ও স্তূপ (মহানির্বাণ প্রাপ্তি) ইত্যাদি রূপেও তাঁকে বিধৃত করা হয়। এছাড়া তাঁর জীবনের ঘটনাগুলোকেও (লুম্বিনিতে জন্ম, বৌদ্ধগয়ায় বৌদ্ধত্ব লাভ, সারনাথ এ ধর্ম প্রচার, কুশি নগরে মহাপরিনির্বাণ, পাগলা হাতি বশীকরণ ও বৈলীতে বানরদের মধু আপ্যায়ন) কোন কোন মূর্তিতে বিধৃতকরে তেলা হয়। তিনি ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মানসী বুদ্ধ হিসাবে পরিচিত এবং একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।
ঐ	মৈত্রেয়	ঐ	ঐ	–	–	–	উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁকে মহারাজা লীলাসনে অথবা ভদ্রাসনে বিধৃত করা হয়। এক্ষেত্রে একটি হাত ধর্ম চক্র মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে	অসঙ্গ প্রচারিত মতবাদের অনুসারী ও তন্ত্রযানীদের মানুষী বুদ্ধ। এক হাত বিতর্ক বা বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গৌতম বুদ্ধের অনুরূপ হলেও তার চুলগুলো ঘাড়ের উপর বিস্তৃত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এক হাতে একটি পাত্র অথবা নাগেশ্বর ফলসহ ডাল ধারণ করেন। গান্ধারা শিল্পে এই মূর্তির সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	মঞ্জুশ্রী	ঐ	ঐ	তলোয়ার ও উৎপল বা পুস্তক	–	–	উপবিষ্ট অবস্থায় মহারাজা লীলাসনে বা অর্ধপরাঙ্ক ভঙ্গি অনুসরণ করেন।	পঞ্চতথাগতের (পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধ) প্রতিনিধিকারী ও ভক্তের রক্ষক এবং ধর্মপাল শ্রেণীভুক্ত দেবতা। কোন কোন ক্ষেত্রে তার ডান হাত বরদ ও বাম হাত ব্যাখ্যায়ন মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে।
ঐ	ভাগিশ্বর	ঐ	ঐ	ঘন্টা ও নীলোৎপলের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা	–	–	সিংহের উপর উপবিষ্ট থাকেন	মঞ্জুশ্রীর অপর একটি রূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে ডান হাত বিতর্ক মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে।
ঐ	মঞ্জুবর	ঐ	ঐ	নীলোৎপলসহ প্রজ্ঞা-পারমিতা ও ধর্মচক্র মুদ্রা	–	–	ঐ	অর্ধপরাঙ্ক অথবা ললিতাসনে বিধৃত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর এক পা স্পর্শ করে ঘন্টা হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন যমান্তক দেবতা উপস্থিত থাকেন। মঞ্জুশ্রীর অপর একটি রূপ হিসাবে গণ্য হন।
ঐ	অরপচন	ঐ	ঐ	তলোয়ার ও প্রজ্ঞাপারমিতা	–	–	জ্ঞান ও শিক্ষা বিতরণের দেবতা	মঞ্জুশ্রীর অপর রূপ। লাস্যমুখে বজ্রপরাঙ্ক মুদ্রায় উপবিষ্ট থাকেন। প্রজ্ঞাপারমিতা ধৃত হাতটি বুকের সম্মুখে ন্যস্ত থাকে।
ঐ	হেরুক	ঐ	ঐ	খতভাং ও রক্ত বটিকাসহ বজ্র	–	–	গলায় নরমুণ্ডের মালা শোভা পায় এবং পদতলে মৃতদেহ শায়িত থাকে।	ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষোভ্য উদ্ভূত ভক্তের রক্ষাকারী দেবতা। তিনি ভয়ঙ্করদর্শী মুখাবয়বে অর্ধ-পরাঙ্ক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান থাকেন। পার্থিব লালসা লোপ করে বৌদ্ধত্ব প্রদানকারী দেবতা হিসাবে পূজা লাভ করেন।
ঐ	জম্ভল	তিন	ছয়	জামির অজকুপ্প, তীর আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রজ্ঞা-পারমিতা, ফাঁসে আবদ্ধ বেজী।	–	–	–	অক্ষোভ্য থেকে উদ্ভূত। ধন দেবতা হিসাবে পূজা লাভ করেন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	উচ্ছুষ্ম	এক	দুই	রক্তপূর্ণ কপাল ও মুখ থেকে মুক্তা উদগিরন রত বেজী	–	–	ভয়াল দর্শন, তবে তাঁকে বামন আকারে বিধৃত করা হয়।	জম্ভলের অপর একটি রূপ। তার অপর নাম ডিম্ব। প্রত্যালিধ মুদ্রায় দণ্ডায়মান উচ্ছুষ্মের ডান পা এক জন ধনাঢ্যের কপালে এবং বাঁম পা ধনাঢ্যের দুই পায়ের উপর রেখে বিধৃত করা হয়। ধনাঢ্যের মুখ থেকে মুক্তা নির্গত দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জম্ভলকে রত্নসম্ভব থেকে উদ্ভূত হিসাবে বিধৃত করা হয়। এক্ষেত্রে তিনি জামির ও বেজী ধারণ করেন।
ঐ	উবউম			জামির ও বেজী	–	–	মিথুন শ্রেণীভুক্ত	শক্তি বসুধারার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ জম্ভল। তিন মাথা ও ছয় হাত বিশিষ্ট রূপে তার হস্ত ধৃত দ্রব্যাদির মধ্যে শক্তি, বজ্র, তলোয়ার, পান্না, পদ্ম ও জামির ধৃত থাকে। দুই হাত বিশিষ্ট উব-উম মূর্তিকে ঘিরে কোন কোন নিদর্শনে আটজন যক্ষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
ঐ	বিঘ্নান্তক	ঐ	দুই	বজ্র ও তর্জনী পাশ	–	–	ভয়ঙ্কর দর্শন এবং সূর্যগর্ভে উপবিষ্ট।	বজ্রযানীগণের দ্বারা পরিকল্পিত এই দেবতা সকল প্রতিবন্ধক অপসারণকারী হিসাবে পূজিত হন। প্রত্যালিধ মুদ্রায় দণ্ডায়মান থাকেন। তবে গুজরাটের বরোদা জাদুঘরের একটি ব্রঞ্জের নিদর্শনে তার ছয় হাত বিশিষ্ট একটি নিদর্শনও সংরক্ষিত আছে। হস্তধৃত দ্রব্যাদির মধ্যে ছুরি, কপাল, ডমরু, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ও তর্জনীপাশ অন্তর্ভুক্ত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	বজ্রহুংকার	ঐ	ঐ	বজ্র ও তর্জনীপাশ এবং বজ্র ও ঘন্টা	–	–	ভয়াল দর্শন	প্রচণ্ড আক্রোশে ভৈরবকে পদদলিতকরণ অবস্থায় প্রত্যালিখ মুদ্রায় বিধৃত হন। তবে হাতের ক্ষেত্রে বজ্রহুংকার মুদ্রা প্রদর্শিত থাকে। তিনি পঞ্চতথাগত উদ্ভূত।
ঐ	হয়গ্রীব	ঐ	ঐ	বজ্র ও দণ্ড	–	–	ভয়ঙ্কর দর্শন	ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ থেকে উদ্ভূত। মুখাবয়ব ঘোড়ার মতো। গলায় দাঁত ও করোটির মালা পরিধান করেন। তবে অক্ষ্যোভ্য উদ্ভূত রূপে তার আটটি হাত ও তিনটি মুখমণ্ডল থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর একটি মুখমণ্ডলে চোখের সংখ্যা হবে তিন। কেন্দ্রীয় মুখমণ্ডলটিতে মুচকি হাসি, ডানের মুখমণ্ডলে প্রলম্বিত জিহবা এবং বাঁমের মুখমণ্ডলে ঠোঁট কামড়ানো দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। এক্ষেত্রে হস্তধৃত দ্রব্যাদির মধ্যে বজ্র, লাঠি, তীর, পদ্ম ও ধনু অন্তর্ভুক্ত। বাঁমের উপরাংশের অবশিষ্ট হাতটি করণ মুদ্রায় (অনামিকা উত্তোলিত) বিন্যস্ত রাখা হয়। অপর একটি রূপে তাকে দেবী খরসপনের অনুচর হিসাবে বিধৃত করা হয়। এক্ষেত্রে তাঁর পরিধানে বাঘের চামড়ার পরিচ্ছদ ও সর্পালংকার উপস্থিত থাকে। দেহাবয়ব স্ফীতোদর এবং চোখ গোলাকার ও বড় আকারের। এছাড়া ঠোটের উপরাংশ জুড়ে থাকে বড় আকারের গোঁফ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	সম্বর	ঐ	ঐ	বজ্র ও ঘন্টা	–	–	ললাটে করোটি সংবলিত রজ্জু এবং অর্ধবাকা চাঁদ বিধৃত থাকে।	ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য উদ্ভূত দেবতা। একাধিক রূপে বিধৃত হন। একটি রূপে ভৈরব ও কালরাত্রিকে পদদলিত অবস্থায় আলিধ মুদ্রায় দণ্ডায়মান থাকেন। দ্বিতীয় রূপে তাঁকে দেবী বজ্রবারাহিকে আলিঙ্গনাবস্থায় বিধৃত করা হয়। দেবী থাকেন উলঙ্গ এবং তাঁর গলায় মুণ্ডিত মস্তকের মালাসহ পাঁচটি রহস্যময় সাংকেতিক চিহ্ন বিধৃত থাকে। তবে কেশগুচ্ছে আলুলায়িত ভাব বিদ্যমান রাখা হয়। নিস্পন্নযোগাবলিতে সম্বরের তৃতীয় রূপটির বিবরণ রয়েছে। এক্ষেত্রে তার চারটি মুখমণ্ডল ও বারটি হাত থাকে। হস্তধৃত দ্রব্যাদির মধ্যে বজ্র, ঘন্টা, হাতির চামড়া, ডমরু, কুঠার, ছুরি, ত্রিশূল, বজ্রখচিত, খতভ্যাঙ, রক্তপূর্ণ করোটি, বজ্রখচিত ফাঁস এবং ব্রহ্মার মুণ্ডিত মস্তক অন্তর্ভুক্ত।
ঐ	হেবজ্র	–	–	–	–	–	–	হেরুকের অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এই যে তিনি তাঁর প্রজ্ঞার সঙ্গে আলিঙ্গনাবস্থায় বিধৃত হন। নিস্পন্নযোগাবলিতে তাঁর চারটি সাধনার বিবরণ রয়েছে। (ক) মুখমণ্ডল ও দুই হাত বিশিষ্ট তার হস্তধৃত দ্রব্যাদি বজ্র ও রক্তপূর্ণ করোটি পাত্র। তিনি বামের রক্তপূর্ণ করোটিধৃত হাতে নৈরাত্মাকে আলিঙ্গনাবস্থায় বিধৃত হন। (খ) অতিরিক্ত দু'টি হাত থাকে। অতিরিক্ত হাতগুলো দিয়ে বজ্র বারাহিকে আলিঙ্গনাবস্থায় বিধৃত হন। (গ) এক্ষেত্রে তাঁর মুখমণ্ডলের সংখ্যা তিন এবং হাতের সংখ্যা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								ছয়। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র, তীর, ত্রিশূল, বজ্র খচিত ঘন্টা, ধনুক ও করোটি পাত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে। বজ্র ও ঘন্টাধৃত হাত দু'টির মধ্যে তার শক্তি বজ্রশৃংখলা আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকেন। (ঘ) এক্ষেত্রে মুখমণ্ডলের সংখ্যা ষোল এবং পায়ের সংখ্যা চার। চারটি পা দিয়ে তিনি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রকে পদদলিত অবস্থায় বিধৃত হন। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র, খড়্গ, তীর, চক্র, মদিরাপাত্র, লাঠি, ত্রিশূল, অঙ্কুশ, ঘন্টা, পদ্ম, ধনুক, খতভাঙ, করোটি পাত্র, মানিক্য ও ফাঁস অন্তর্ভুক্ত। কেবল একটি হাত করণ মুদ্রায় বিধৃত থাকে।
ঐ	ত্রৈলোক্য-বিজয়	চার	আট	বজ্র, খতভাংগ, ঘন্টা, অঙ্কুশ, করোটি ও তীর।	–	–	ভয়ঙ্কর দর্শন	প্রত্যালিধ মুদ্রায় দণ্ডায়মান এই দেবতা তাঁর ডান পায়ে গৌরীর স্তন এবং বাঁম পায়ে মহেশ্বরের মস্তক দলন করেন। চারটি মুখমণ্ডলে যথাক্রমে প্রশান্তি ক্রোধ, আক্ষেপ ও বীরত্বের অভিব্যক্তি বজায় থাকে। আয়ুধবিহীন দু'টি হাত বজ্রহুঙ্কার মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে।
ঐ	যমান্তক						ঐ	তিনি যমারি নামেও পরিচিত। সাধনমালায় রক্তযমারি ও কৃষ্ণযমারি নামে আরও দু'টি রূপের উল্লেখ আছে। তবে উভয় ক্ষেত্রে তাঁর মস্তক হবে মহিষের মস্তকের অনুরূপ। এছাড়াও তিনি মহিষের

BARODA

উপর উপবিষ্ট থাকেন। (ক) রক্তযমারির একটি মাথা, দু'টি হাত, প্রত্যালিধ মুদ্রা, বাঘের চামড়ার পরিচ্ছদ ইত্যাদি থাকে। মহিষের উপর দণ্ডায়মান এই দেবতার হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক সংবলিত একটি লাঠি ও রক্তপূর্ণ করোটি পাত্র অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তিনি তাঁর দু'টি হাত দিয়ে শক্তিসাহাকে আলিঙ্গনাবস্থায় বিধৃত হন। (খ) কৃষ্ণযমারির এক অথবা তিনটি অথবা ছয় মুখমণ্ডলসহ দুই অথবা চার অথবা ছয়টি হাত থাকতে পারে। ছয় হাত বিশিষ্ট অবস্থায় তাঁর হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র,খড়্গ,মুসল অথবা মুদগর, অপদেবতা অথবা ঘন্টা, কুঠার, বজ্রপাশ, ফাঁস অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বজ্রধৃত হাতটি দিয়ে তিনি নিজ শক্তিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ রাখেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি একাধিক সহচর পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও বিধৃত হন। (গ) নিষ্পন্নযোগাবলিতে তার তিন মাথা ও ছয় হাতের উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ছুরি, অঙ্কুশ, কপাল, চক্র ও পদ্ম অন্তর্ভুক্ত। এরমধ্যে ছুরি ও কপালধৃত দু'টি হাতে তিনি তাঁর প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গনরত বিন্যাস বজায় রাখেন। (ঘ) মঞ্জুবর মণ্ডলে তার হস্তধৃত আয়ুধরূপে হাতুরি শোভিত বজ্র, অঙ্কুশ, মানিক্য ও পদ্ম অন্তর্ভুক্ত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	পিণ্ডল	এক	দুই	আমলক ও ভিক্ষাপাত্র	–	–	দীর্ঘায়ুদাতা হিসাবে পূজিত হন।	উষ্ণীষধারী এই দেবতা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন।
ঐ	মহাস্থবির	ঐ	ঐ	–	–	স্বাভাবিক মানুষের আকৃতি		অবতারবাদের প্রভাবে মহাস্থবিরদের উদ্ভব। এদের সংখ্যা ষোল জন। সর্বাধিক পরিচিত মহাস্থবিরগণের মধ্যে নাগার্জুন অন্যতম। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টীয় দুই শতকের একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী হিসাবে পরিচিত।
ঐ	ভক্তের রক্ষাকারী গৌণদেবতা							এদের মধ্যে ভৈরব, মহামায়া, কালচক্র ও তৈরাত্বা অন্যতম।
ঐ	গৌন ধর্মপাল দেবতা	–	–	–	–	–	–	যম ও মহাকাল। এদের রূপ কল্পনা বৈচিত্র্যময়।
ঐ	গৌণ অনুচর	–	–	–	–	–	–	ডাকিনি ও পিচাশ। এদের রূপ-কল্পনা বৈচিত্র্যময়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	তারা	–	–	–	–	–	–	বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধের প্রজ্ঞা (শক্তি) হিসাবে বিভিন্ন নাম ও রূপে বিধৃত হন। (ক) শিততারা ঃ অবলোকিতেশ্বরের প্রজ্ঞা। তার একাধিক রূপ রয়েছে। একটি রূপে তার বর্ণ শ্বেত। তাই তিনি শ্বেত তারা নামেও পরিচিতা। ডান হাত বরদ মুদ্রায় এবং বাঁম হাত ডালসহ বির্তক মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। সাধনমালায় তাঁকে ত্রিনেত্রধারিনী ও চতুর্ভুজা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি পঞ্চতথাগতের যৌথ প্রজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত হন। তার দু'টি প্রধান হাত উৎপল মুদ্রায়, তৃতীয় হাত চিন্তামনিরত্নসহ বরদ মুদ্রায় এবং চতুর্থ হাতে উৎপল কুড়ি ধৃত থাকে। তার ডানে মারিচি (চামর ও ডালসহ অশোক ফুল ধৃত) এবং বাঁমে মহাময়ুরী (চামর ও ময়ূরপুচ্ছধারিনী) উপস্থিত থাকেন। (খ) জাঙ্গুলি তারা : তিনি সর্পবিষ নিরাময়কারিনী। এক অথবা তিন মাথা এবং চার অথবা ছয় হাত থাকে। তাঁর হস্তধৃত আয়ুর্ধের মধ্যে বীন ও সাপ অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য হাতে অভয় মুদ্রা বিন্যাসিত হয়। (গ) শ্যামা তারা: অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ললিতাসনে বিধৃত হন। এক মাথা ও দু'টি হাত থাকে। ডান হাতে বরদ মুদ্রার বিন্যাস ও বাঁম হাতে উৎপল ধৃত থাকে। (ঘ) খদিরবাণী: শ্যামাতারার অনুরূপ। তবে অমোঘ-সিদ্ধির প্রজ্ঞা বলে বিবেচিত হন। তার ডান হাতে বরদ মুদ্রার বিন্যাস ও বাঁম হাতে অশোক বৃক্ষের ডাল ধৃত থাকে। ডান পাশে অশোক-

কান্তামারীচ পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত চাঁদে দণ্ডায়মান থাকেন। একইভাবে তাঁর বাঁম পাশে ভয়ংকর দর্শন এবং ত্রিনেত্র বিশিষ্টা একজটা প্রত্যালিধ মুদ্রায় উপস্থিত থাকেন। (ঘ) মহেশ্বরী : তান্ত্রিক বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত এই দেবী ব্যাখ্যায়ন মুদ্রাসহ জাঁকজমকময় সিংহাসনে উপবিষ্টা থাকেন। তার অলংকারাদি পুষ্প সদৃশ্য, তাঁর মস্তকে অমোঘসিদ্ধি, ডানে অশোকান্তা ও মহাময়ুরী এবং বাঁমে এক জটা ও আরয়া জাঙ্গুলী উপস্থিত থাকেন। (ঙ) বৈশ্যতারা বা আরয়া তারা : তিনি ডান হাত বরদ মুদ্রাসহ এবং বাঁম হাতে উৎপল ধৃত রেখে ভদ্রাসনে (দু'পা ঝুলিয়ে) কেঁদারায় উপবিষ্ট থাকেন। মাথায় অমোঘসিদ্ধির প্রতিকৃতি শোভা পায়। (চ) পাপনাশহরী : তাঁর তিনটি মস্তক, তিনটি চোখ, ছয়টি হাত ও স্ফীতোদর থাকে। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র, পরশু, তীর, ধনু, পত্রকুঞ্জ ও তর্জনীপাশ অন্তর্ভুক্ত। তিনি অনেকাংশে ভয়াল দর্শনা। কারণ তিনি মুখে ভয়াল হাসি বজায় রাখেন এং পরিচ্ছদ হিসাবে বাঘের চামড়া ও পাতা পরিধান করেন। তাছাড়া তার মাথার উপর বিসদৃশ্যভাবে চুলের ঝুঁটি বাঁধা থাকে। তিনি রোগ প্রতিরোধকারিনী এবং অমোঘসিদ্ধি উদ্ভূতা হিসাবে গণ্য হন। (ছ) মহাময়ূরী তারা : এই দেবীর ৬টি হাত ও তিনটি মস্তক এবং প্রতিটি মস্তকে তিনটি চোখ থাকে। তার হস্তধৃত দ্রব্যাদি ও মুদ্রা হলো তার বরদ,

ময়ূরপুচ্ছ, ধনুক, রত্ন ও জলপাত্র। তিনি যুবতী বিধায় তার মুখাবয়বে প্রেমের আবেগ প্রস্ফুটিত এবং সম্পূর্ণ দেহ বিবিধ অলংকারে শোভিত থাকে। এছাড়া তার দুই হাত ও আট হাত বিশিষ্ট রূপও থাকতে পারে। মুকুটে অমোঘসিদ্ধি বিধৃত থাকে। (জ) বজ্রশৃঙ্খল ঃ তিন মস্তক ও আট হাত বিশিষ্টা। ললিতাসন তার জন্য নির্ধারিত। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র, বজ্রশৃঙ্খল (বজ্র অঙ্কিত শিকল), তীর, রক্তপূর্ণ করোটি পাত্র, ফাঁস ও ধনুক অন্তর্ভুক্ত। ডানের অবশিষ্ট হাতটি বরদ মুদ্রায় এবং বাঁয়ের অবশিষ্ট হাতটি তর্জনী মুদ্রায় বিধৃত হয়। তার ছয় হাত বিশিষ্ট আরও একটি রূপ রয়েছে। (ঝ) বজ্রতারা ঃ এই দেবী চার মাথা ও আটহাত বিশিষ্টা হয়ে থাকে। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ফাঁস, তীর, শঙ্খ, নিশিপদ্ম, ধনুক, ও অঙ্কুশ অন্তর্ভুক্ত। বামের অবশিষ্ট একটি হাত অর্ধ উত্থিত ও তর্জনী মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তিনি একটি পদ্মের কেন্দ্রে বজ্রপরাঙ্ক মুদ্রায় অবস্থান করেন। তাঁর চারপাশে আটজন দেবী উপস্থিত থাকেন। এরা হলেন পুষ্প তারা (পূর্বদিকের প্রতিভূ), ধূপতারা (দক্ষিণের প্রতিভূ), দীপ তারা (পশ্চিমের প্রতিভূ), গন্ধতারা (উত্তরের প্রতিভূ) বজ্রাঙ্কুশী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								(পূর্বদ্বারের অধিষ্ঠাত্রী), বজ্রপাশী (দক্ষিণ দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী), বজ্রফোঁটা (পশ্চিম দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী) বজ্রঘন্টা (উত্তরদ্বারের অধিষ্ঠাত্রী) উষ্ণীস বিজয়া (উর্দ্ধদেশের প্রতিভূ), ও সুষ্ণা (অধঃদেশের প্রতিভূ)। তিনি রক্তসম্ভবা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তাঁর মস্তকে পঞ্চতথাগতের সমাবেশ ঘটানো হয়। বিপদলাঘব ও বিজয় সূচনাকারিনী হিসাবে পূজা লাভ করে থাকেন। (ঞ) ভ্রকুটিতারা ঃ তিনি অমিতাভ থেকে উদ্ভূতা হিসাবে গণ্য হন। এক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে যৌবনাবেগ ও ত্রিনেত্র শোভা পায়। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে যথাক্রমে অক্ষমালা, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু অন্তর্ভুক্ত। তবে ডানের উপরের হাতটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তাঁকে চন্দ্রের গর্ভদেশে পদ্মের উপর উপবিষ্ট রূপে বিধৃত করা হয়। কোন কোন মূর্তিতে তিনি অবলোকিতেশ্বর শক্তি রূপেও বিধৃত হন।
ঐ	একজটা	এক	দুই	করত্রি ও কপাল	–	–	অর্ধপরাঙ্মুখ মুদ্রায় উপবিষ্ট থাকেন	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহেশ্বরীর অনুচর হিসাবে বিধৃত হন। তার পরনে থাকে বাঘের চামড়া এবং মুখে ভয়ংকর ভাব।
ঐ	অশোকান্ত	ঐ	ঐ	বজ্র ও অশোক পুষ্প গুচ্ছ	–	–		তার মস্তকে মনিমুক্তা শোভিত থাকে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	আরয়াজা	ঐ	ঐ	সাপ	–	–	–	বামের হাতটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে
	ঙ্গুলী							
ঐ	মহাময়ুরী	ঐ	ঐ	ময়ূরপুচ্ছ	–	–	–	বামের হাতটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে।
ঐ	চুন্তা	ঐ	চার	পাত্র, পুস্তক ও পুষ্প	–	–	–	ডানের অবশিষ্ট হাতটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকবে। তিনি কুরুকুল্লার সঙ্গিনী ও বৈরচন থেকে উদ্ভূতা, তবে তাঁর মূর্তিতে পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ উপস্থিত থাকেন। অপর একটি রূপে তার হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে তীর, পদ্ম ও ধনু স্থান লাভ করে। কিন্তু যখন তাকে দুইহাত বিশিষ্ট রূপে বিধৃত করা হয় তখন হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে নিষ্পন্ন যোগাবলিতে তার ছাব্বিশটি এবং প্রজ্ঞাপারমিতায় ষোলটি হাতের উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, নালন্দা বিহারে ব্রঞ্জের তৈরি আঠার হাতের একটি নিদর্শনও পাওয়া গেছে। অপর একটি নিদর্শন উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মানুষকে তার আসন হিসাবে দেখানো হয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী অপর একটি নিদর্শনে তার একটি মুখমণ্ডল ও আটটি হাত প্রদর্শিত আছে। এক্ষেত্রে তার আসন সিংহ।
ঐ	হারীতি	ঐ	দুই	দাড়িম্ব ও শিশু	–	–		বরেন্দ্র জাদুঘরের একটি নিদর্শনে (পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত) দাড়িম্বের পরিবর্তে মোদক স্থান লাভ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								করেছে। শিশুটি কোলে উপবিষ্ট। বাঁম হাতটি বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত। তিব্বতী সূত্রে দাড়িম্বের পরিবর্তে নকুল এবং শিশুর পরিবর্তে একজন যোদ্ধার উল্লেখ রয়েছে। যোদ্ধাটির নাম পাঞ্চিকয়ক্ষ। তিনি বর্শা ও সম্পদের থলি ধারণ করেন। আবার ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একটি নিদর্শনে হারীতি ও পাঞ্চিকয়ক্ষকে ডান হাতে বীজপূরক ও বাঁম হাতে পত্রসহ ডাল ধৃত থাকে। অপর একটি রূপে হারীতিকে চার হাত বিশিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি হাতে একটি শিশু ধারণ করত যোগাসনে উপবিষ্ট থাকেন। অতিরিক্ত দু'টি হাতে মাছ ও পানপাত্র ধৃত থাকে। তিনি শিশুদের রক্ষাকারিনী এবং সম্পদ প্রদানকারিনী পঞ্চরাক্ষস শ্রেণীভুক্ত দেবী হিসাবে পূজা লাভ করেন। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ তাকে ধনদেবতা কুবেরের স্ত্রী হিসাবে গণ্য করেন।
ঐ	কুরুকুল্লা	–	–	–	–	–	অমিতাভ থেকে উদ্ভূত	এই দেবী একাধিকরূপে বিধৃত হন। (ক) শুক্লকুরুকুল্লা ঃ দুইহাত এক মাথা। তার বাহন পশু। হাত দু'টি। আয়ুধ অক্ষমালা ও সুধাপূর্ণ উৎপল আকৃতির পেয়ালা। তিনি প্রেমাবেগ প্রসমিত

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								করেন। (খ) তারোদ্ভব ঃ এক মাথা চার হাত। ধনু, লালপদ্ম ও তীর তার আয়ুধ। বামের একটি হাত অভয় মুদ্রায় বিন্যাসিত থাকে। তার বাহন রাহু ও কাম। (গ) উদ্দীয়ান ঃ তিনি ভয়াল দর্শন। তার একটি মাথা ও চারটি হাত। তার গলায় নরমুণ্ডের মালা এবং মস্তকে পাঁচটি করোটি শোভা পায়। তিনি একটি মৃতদেহের উপর অর্ধপরাঙ্মুখ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুই হাতে পুষ্পধনু নিক্ষেপে রত থাকেন। (ঘ) মায়াজালক্রম ঃ তার একটি মাথা চারটি হাত থাকে। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে পুষ্পমঞ্জুরি, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু অন্তর্ভুক্ত। অপর হাতটি অভয় মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তাকে পদ্মের উপর ন্যস্ত সূর্যের উপর উপবিষ্ট হিসাবে বিধৃত করা হয়। (ঙ) অন্যান্য ঃ এক্ষেত্রে তাঁর আটটি হাত থাকে। আয়ুধের মধ্যে যথাক্রমে অঙ্কুশ, তীর, ফাঁস, ধনুক ও উৎপল অন্তর্ভুক্ত। অপর হাতগুলো ত্রৈলোক্য বিজয় ও অভয় মুদ্রায় ন্যস্ত থাকে। তার চার পাশে আরও কিছু দেবসত্তা আরোপিত ক্ষুদ্রাকার মূর্তির সমাবেশ ঘটানো হয়।
ঐ	মারিচী	–	–	–	সাতটি বরাহ সংযোজিত রথ	বৈরচন থেকে উদ্ভূত		তিনি বহুরূপে বিধৃত হন। (ক) অশোককান্তাঃ মুখমণ্ডলের সংখ্যা এক এবং হাতের সংখ্যা দুই। ডান হাত বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত এবং বাঁম হাতে

পত্রসহ অশোক বৃক্ষের ডাল ধৃত থাকে। (খ) আর্য ঃ অশোককান্তার অনুরূপ। তবে আয়ুধ সূঁচ ও সুতো। (গ) পিচুতা ঃ মুখমণ্ডলের সংখ্যা আট। মুখমণ্ডলগুলো ডান থেকে যথাক্রমে শৃঙ্গার, ধীর ও হর্ষের ভাব ধারণ করে। আয়ুধের মধ্যে সূঁচ, সুতো, অঙ্কুশ, ফাঁস, তীর ধনুক,বজ্র ও পাতাসহ অশোক ডাল অন্তর্ভুক্ত। (ঘ) বরাহমুখী ঃ মুখমণ্ডলের সংখ্যা তিন। মুখগুলো ডান থেকে যথাক্রমে প্রেম ক্রোধ ও প্রশমন রূপ প্রকাশ করে। তবে বাঁমের মুখমণ্ডলটি শূকরী আকৃতির। তিনি আলিধ মুদ্রায় দণ্ডায়মান থাকেন। (ঙ) উভয়বরাহুনান ঃ মুখমণ্ডলের সংখ্যা তিন। হাতের সংখ্যা বার। দু'টি মুখমণ্ডল বরাহ আকৃতির। আয়ুধের মধ্যে সূঁচ, অঙ্কুশ, বর্শা, খড়্গ, করত্রী,বজ্রশোভিত ষষ্ঠী, পত্রসহ অশোক ডাল,বজ্রাঙ্কুশ, কপাল, ব্রহ্মার মস্তক ও একটি পাত্র অন্তর্ভুক্ত। বাঁমের একটি হাত বুকের বরাবরে তর্জনী মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তাঁর পদতলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব ভূলুণ্ঠিত থাকেন। এছাড়াও পাদদেশে নবগ্রহ ও আরও কিছু ক্ষুদ্রাকার নরমূর্তির সমাবেশ ঘটানো হয়। (চ) বজ্রধাত্বিশ্বরী ঃ মুখমণ্ডলের সংখ্যা ছয় হাতের সংখ্যা বার। পাঁচটি মুখ এক সারিতে বিন্যস্ত থাকে। হস্তধৃত আয়ুধগুলোর মধ্যে খড়্গ, মুসল, তীর, অঙ্কুশ, পরশু,ফাঁস, কপাল, অশোক

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
								ডাল, ব্রহ্মার মুণ্ডিত মস্তক, ধনুক ও ত্রিশূল অন্তর্ভুক্ত। (ছ) উদ্দীয়ান : বজ্রধাত্বিশ্বরীর অনুরূপ। তবে অঙ্কুশ ও কপালের পরিবর্তে তিনি যথাক্রমে চক্র ও খট্বাঙ্গ ধারণ করেন। (জ) বজ্রবেতালি ঃ বজ্রধাত্বিশ্বরীর অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে অঙ্কুশ ও কপালের পরিবর্তে যথাক্রমে দ্বিবজ্র ও ফাঁস ধৃত থাকবে। সাধন মালায় তার মোট ষোলটি সাধনার উল্লেখ রয়েছে।
ঐ		প্রজ্ঞাপারমিতা	–	–	–	–	–	তিনি বহুরূপে বিধৃত হন। (ক)সিতপ্রজ্ঞাপারমিতা ঃ যৌবনদীপ্ত একটি মুখমণ্ডল ও দু'টি হাত থাকে। তাকে বজ্রপরাঙ্ক মুদ্রায় লাল পদ্মের উপর আসীন রাখা হয়। হস্তধৃত আয়ুধের মধ্যে লাল পদ্ম ও পাণ্ডুলিপি অন্তর্ভুক্ত। (খ) পিতপ্রজ্ঞাপারমিতা ঃ সিতপ্রজ্ঞাপারমিতার অনুরূপ। তবে দু'টি হাত ব্যাখ্যায়ন মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। তাঁর বাঁম পাশে পদ্মের উপর স্থাপিত একটি পাণ্ডুলিপি স্থান লাভ করে। আর মস্তকে অক্ষোভ্যের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ থাকে। (গ) কনকপ্রজ্ঞাপারমিতাঃ পিতপ্রজ্ঞাপারমিতার অনুরূপ। তবে উৎকীর্ণ থাকে। (গ) কনকত্তজ্ঞাপারমিতা ঃ পিতপ্রজ্ঞপারমিতার অনুরূপ। তবে দুই হাত ধর্মচক্র মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। এছাড়া

তার দু'পাশে দু'টি পদ্মের উপর দু'টি পাণ্ডুলিপি স্থান লাভ করে। এছাড়াও তাদের আরও কিছু রূপ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, রূপভেদের কারণ হলো, প্রজ্ঞাপারমিতাগণকে বিভিন্ন বোধিসত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হিসাবে বিধৃত করা হয়।

ঐ	বসুধর	–	–	–	–	–	–	–	তিনি প্রাচুর্যের দেবী রূপে পরিচিতা। সাধনমালায় তাঁর তিনটি সাধনার উল্লেখ আছে। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আক্ষোভ্য অথবা রত্নসম্ভার থেকে উদ্ভূত হিসাবে বিধৃত হন। (ক) অক্ষোভ্য উদ্ভূত ঃ যৌবনদীপ্ত একটি মুখাবয়ব ও দুই হাত তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর ডান হাত বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত, এবং বাম হাত পাত্র পূর্ণফসলের শীষ ধারণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রটি থেকে মানিক্য বর্ষিত হতে দেখা যায়। (খ) অপর একটি অক্ষোভ্য উদ্ভূত রূপে তাঁর ছয়টি হাত থাকে। এক্ষেত্রে হাতগুলো যথাক্রমে নমস্কার মুদ্রায় বিন্যস্ত, ফসলের শীষ ধৃত এবং বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। চট্টগ্রামের ঝিউরিতে দুই হাত বিশিষ্ট একটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় দশ শতকের শৈলী বহনকারী এই ব্রঞ্জ মূর্তিকার ডান হাত বরদ মুদ্রায় বিন্যস্ত এমং বাঁম হাতে ফসলের শীষ ধৃত রয়েছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঐ	পর্ণশবরী	ঐ	ঐ	–	–	–	অমোঘ-সিদ্ধি থেকে উদ্ভূত	তাঁর অপর নাম সর্বসবরানম ভগবতী। তিনি আলিধ মুদ্রায় দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁর কোমরে পাতা খচিত বন্ধনী বিধৃত থাকে। অপর একটি রূপে তাঁর তিনটি মাথা ও ছয়টি হাত থাকে। এক্ষেত্রে আয়ুধগুলোর মধ্যে যথাক্রমে বজ্র, ক্ষুদ্র কুঠার, তীর, ধনুক, ফাঁস ও ফুলেরগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

reed – খাগড়া
reference peg – নির্দেশনা খুঁটি
registry – নিবন্ধন
relative – আপেক্ষিক, পরস্পর নির্ভরশীল
relief – নতোন্নত
replica – প্রতিকৃতি
restoration – পুনঃরুদ্ধার, সংস্কার
retaining wall – বারান্দার ঠেস দেয়াল
retouch – পরিমার্জন
reverse – গৌণপিঠ
rim – কানা
ringhead – বেড়ি মস্তক
ring-stone – বেড়ি পাথর
river terrace – নদীতট চত্বর
ringwell – বেড় যুক্ত কূপ
robber's pit – লুণ্ঠনগর্ত
rock-cut – শিলোৎখাত
rockshelter – শিলাশ্রয়
round pointed Butt – কৌণিকভাবে গোলায়িত কুঁদা
rust – মরিচা

salvage – উদ্ধার
sanctum – গর্ভগৃহ
sand dune – বালিয়ারী
sandstone – বেলেপাথর, একটি পাললিক শিলা
sarcophagus – কবরাচ্ছাদন
scale – মাপক
script – লিপি
sculptural – ভাস্কর্য সম্বন্ধীয়
seal – সীলছাপ
sea level – সমুদ্র সমতল
sealing – সীলমোহর
secondary retouch – দ্বিতীয় দফা পরিমার্জন
secular – লৌকিক
sedimentary – পাললিক
semi precious stone – উপরত্ন পাথর
sequence – অণুক্রম
seriation – ক্রমপদ্ধতি
settlement – বসতি পরিব্যাপ্তিক
shaft – স্তম্ভকান্ড
shape – গড়ন
shale – পললশিলা
shell – খোলক

shoulder – কাঁধ
sill – গোবরাট
silt – পলি
sino – চিনা
site – প্রত্নস্থল
size – আকার
slab – পট্ট
slim – শীর্ণ
slip – দগ্ধপূর্ব রঙের প্রলেপ (মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে)
soak jar – ধারকপাত্র
solid – নিরেট
space – স্থানিকবিস্তৃতি
species – প্রজাতি
specific gravity – আপেক্ষিক গুরুত্ব
spiral pennon – শাঙ্খকবাকার পতাকা
spire – চূড়া, শিখর
sprinkler – সিঞ্চনাধার
square – বর্গ
stage – পর্যায়
standard – আদর্শ
stamped – অঙ্ককখচিত
steatite – খড়িপাথর
stepped – ধাপযুক্ত
sterioscope – ঘনচিত্র দর্শন
stone age – পাথর যুগ
straight – খাড়া
stratification – স্তরবিন্যাস প্রক্রিয়া
stratified site – স্তরীভূত প্রত্নস্থল
stratigraphy – স্তরবিন্যাস
stratum – একটি স্তর
strip – ফালি
stroke – খোঁচাচিহ্ন
structural – কাঠামোগত
stucco – চুনবালির কাজ
style – শৈলী
subman – উপমানব
super-structure – অধিন্যস্ত অট্টালক
surface – ভূপৃষ্ঠ
surveyor – জরিপকারী
syllabogram – শব্দাংশ ব্যঞ্জক লিপি
symbol – প্রতীক

tablet – উৎকীর্ণ ফলক

technique – প্রয়োগ কৌশল
technology – প্রযুক্তিবিদ্যা
tectonic – ভূস্পন্দন
terracotta – পোড়ামাটি
textual – পাঠজাত-লিপিজাত
texture – বয়ন
tile – টালি
time bracket – সময়কালের ব্যাপ্তিসূচকবন্ধনী
theodolite – কোণমাপক যন্ত্র
thermoluminescence (tl) – তাপদ্যুতি
tomb – কবর
tool – হাতিয়ার
topography – স্থানবিবরণ
toponym – নামকরণতত্ত্ব
tower – বুরুজ
track – পদচিহ্ন
trail – গমনচিহ্ন
traingular – ত্রিকোণী
trait – বিশেষ বৈশিষ্ট্য
traditional – ঐতিহ্যগত
trancet – অনুপ্রস্থ
translucent – ঈষদচ্ছ
transverse – অনুপ্রস্থ
trap – আগ্নেয়শিলা
trapezoid – অসমান্তরাল বাহু বিশিষ্ট চতুর্ভুজ
treasure hunter – ঐশ্বর্য লুণ্ঠণকারী
trench (incase excavation) – খাদ
trial – পরীক্ষা
tribe – উপজাতি
trimming – সৌজাত্যের ছাঁটান
type – নমুনা
type-site – নমুনা প্রত্নস্থল
typology – প্রকারভেদ

unfaceted – পলকাটা বিহীন
unifacial – একমুখো
unit – একক
upper palaeolithic – উচ্চ প্রাচীন পাথর পর্ব

vase – ফুলদানি
verdigris – সবুজ মরিচা
vertex – শীর্ষস্থ
vertical – উলম্ব

vessel	-	পাত্র
virgin	-	অনাদিম-অকর্ষিত (খননের ক্ষেত্রে)
votive	-	নিবেদন
vowel	-	স্বরবর্ণ ব্যঞ্জক
vowel sound dots	-	স্বরধ্বনি ব্যঞ্জক রেখাংশ
wagon vault	-	প্রায় গোলায়িত ছাদ
wash	-	দগ্ধোত্তর রঙের প্রলেপ (মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে)
wedge	-	গোজ
wheel-made	-	চাকীতে তৈরি
well developed cone	-	সুডৌল মোচাকার প্রস্ফুটন
working edge	-	কার্য সমাপনী প্রান্ত
X-rays	-	রঞ্জনরশ্মি
Zoology	-	প্রাণীবিদ্যা

পরিশিষ্ট- ৩

গ্রন্থপঞ্জি

ক. বই

Agarwala, V.S. Indian Art.Varanasi, 1965

Agrawal, O.P. Care and Preservation of Museum objects,New Delhi, 1977

Ahmed, N. Bagerhat Monuments, Dhaka, 1980

— Mahasthan, Dhaka, 1975

— Paharpur (in Bengali), Dhaka, 1975

— Mahasthangar Mainamati Paharpur (in Bengali), Dhaka, 1966

Ahmed, S. Inscription of Bengal, Rajshahi, 1960

Ahmed, S. and Others (ed.) Abu Muhammad Habibullah Smaraka Grantha (in Bengali), Dhaka, 1966

Alam, A.K.M.S. Sculptural Art of Bangladesh, Dhaka, 1985

— Mainamati, Dhaka, 1975

— Pratnatattve Adunik Sbiskar (in Bengali), Dhaka, 1968

— Lalbagh Durga O Jadughar (in Bengali), Dhaka, 1974

Ali, A.K..M.Y. Muslim Sthapatya (in Bengali), Dhaka 1984

— Muslim Mudra O Hastalikhan Silpa (in Bengali), Dhaka, 1989

Allchin, B. and Allchin, F.R. The Rise of civilization in India and Pakistan, New Delhi, 1989

Asaduzzaman (ed.) Jessore Zilar Itihas (in Bengali), Dhaka, 1989

Asher, M.F. The Art of Eastern India 300-800, Delhi, 1980

Ashfaq, S.M. Lalbagh Fort Monuments and Museum, Karachi, 1968

Ashton, L. (ed.) The Art of India and Pakistan : A Commemorative Catalogue of the Exhibition Held at the Royal Academy of Arts (1947-48), London, 1950

Atkinson, R.I.C. Field Archaeology, London, 1964

Banerjea, J.N. The Development of Hindu Iconography,2nd edition, Calcutta, 1956

Bass, F. Archaeology under water, London, 1966

Basu, S.	Pragitihaser Manus (in Bengali), Calcutta, 1984
Beak, S.	The Life of Hiuen Tsang, London, 1883
Bhattacharya, B.C.	The Jaina Iconography, Delhi, 1974 (2nd ed.)
Bhattacharya, D.K.	Prehistoric Archaeology, Delhi, 1972.
Bhattacharya, B.	The Indian Buddhist Iconography, Calcutta 1968
Bhattasali, N.K.	Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dhaka Museum, Dhaka, 1929
	— Coins and chronology of the Early Independent sultans of Bengal, cambridge, 1929
	— Catalogue of coins of Syed A.S.M. Taifoor Collection in the Dhaka Museum, Dhaka, 1929
	— Catalogue of coins of Hakim Habibur Rahman Khan collection in the Dhaka Museum, Dhaka.
Binford, L.	Archaeology and Anthropolagy, American Antiquity, 1962
	— For theory Building in Archaeology, New york, 1970
	— In pursuit of the past, Decoding the Archaeological Records, London, 1983.
Binford, S.R. and Binford, L.R.	New perspectives in Archaeology, chicago, 1968
Biswas, S.S.	Terracotta Art of Bengal, Delhi, 1981
Bothwell, D. and Higgs, E.	Science in Archaeology, New York, 1969
Grade, B. and	Archaeology, London, 1953
Graham, B.M.	— The world of Archaeology, London, 1959
Casson, S.	Archaeology, London, 1930
Celoria, F.	Archaeology, London, 1970
Chakrabarti, K.D.	Ancient Bangladesh : A study of the Archaeological Souce, oxford University press, 1992.
Chakrabarti, S.S.	Devdavir parichay O Vahana Rahasya (in

Bengali), calcutta, 1995
Champaklaksmi, R. Vaisnava Iconography in the Tamil country, New Delhi, 1981
Chandra, L. (ed.) The Art and culture of south-east Asia, New Delhi, 1991
Childe, V.G. Ashort Introduction to Archaeology, London, 1956
Choudhury, N.D. Historical Archaeology of central Assam (from earliest time to the 11th century A.D.) Delhi, 1985
Clark, G. World prehistory—An outline, Cambridge, 1961
Clarke, D.L. Analytical Archaeology, London, 1968
Cohon, B.S. India : The Social Anthroplagy of a civilization, New Jarsay, 1971
Cokes, J.M. Experimental Archaeology, London, 1972
Crawford, O.G.S. Archaeology in the Field, London, 1953
Dahiya, N. Arts and crafts in Northern India, Delhi, 1986
Dani, A.H. Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal, Appendix to the J.A.S.P., 1, Dhaka 1959.
— Buddhist Sculpture in East Pakistan, Dhaka, 1959.
— Dhaka : Record of its Changing Fortune Dhaka, 1956
— Prehistory and protohistory of Eastern India, Calcutta, 1960.
— Muslim Architecture in Bengal, Dhaka, 1961
— Archaeological Foundation of History and other Lectures, Dhaka, 1968.
Das, S.R. Stone Tools : History and Origing Calcutta, 1964
— Rajbadi Danga : 1962, Calcutta, 1968
— Utkhanan Vignan (in Bengali), Calcutta, 1975.
Das Gupta, R.C. The exeavation at pandu Rajar Dhibi, Calcutta, 1964
— Archaeological Discoveries in west Bengal, A Bulletin of the Directorate of Archaeology,

west Bengal, No. 1, calcutta, 1963
Datta, A. Neolithic Culture in west Bengal Delhi 1992.
De, S. History of Sanskrit Literature, calcutta 1947
Dey, N.L. The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India, Delhi, 1978 (4th edition)
Doran, J. and Hadson, F. Mathematics and computers in Archaeology Edinburgh university pvess, 1970
Droop, J.P. Archaeological Excavation, cambridge, 1915.
Ehrich, R.W (ed.) Chronologies in old world Archaeology. chicago, 1971
Fuch, S. The Origin of Man and His Culture, New York, 1960
Ganguli, K.K. Banglar Bhaskarya, calcutta 1986 (2nd edition).
George, W. Animal Geography, London, 1962
Ghosh, M. Development of Buddhist Iconography in Esstern India : A study of Tara, prajna of Five Tathagatas and Bhrikuti, New Delhi, 1980
Ghosh, N.K. Bharatsilpa, calcutta, 1973
Glyn Daniel A Hundred and fifty years of Archaeology, Duckworth, 1975.
Gupta, S.P. The Roots of Indian Art, Delhi, 1980
Halim, A. Natun Dristite Itihas (in Bengali), Dhaka, 1994
Hammond, P. Archaeological Techniques for Amaturs princeton, 1963
Handa, O.C. Siva in Art (A study of Saiva Iconography and Miniatures, New Delhi, 1992
Haque, E. Bengal Sculptures : Hindu Iconography /upto, Dhaka, 1992
— Treasures in the Dhaka Museum, Part 1 : Sculptures and Architectural pieces, Dhaka, 1963
— Islamic Art Heritage of Bangladesh, Dhaka, 1983
— Puratattva Parivasa, Dhaka, 1985
Haque, Z. Terracotta Decorations of the late Medieval Bengal : potryal of a Society Dhaka, 1980

Robert, H.F. (ed.) The Archaeologists at work, London, 1959
Rashid, M.H Paharpur, Dhaka, 1980
Ruth, D.W. The Macmillion Dictionary of Architecture, London, 1983
Roy, A.K. A History of the jains, New Delhi, 1984
Sahai, B. Iconography of Minor Hidu and Buddhist Dicties, New Delhi, 1975
Safadi, Y.H. Islamic calligraphy, London, 1978
Samad, I.G. Islamic Silpakala (in Bangali), Dhaka, 1978.
Sankalia, H.D. Prehistory and protohistory in India and pakistan, Bombay, 1962
— Indian Archaeology Taday, Bombay, 1962
Saraswati, S.K. A Survey of Indian Sculpture, 2nd edition, New Delhi, 1975
— Early Sculpture of Bengal, 2nd edition, calcutta, 1962
Sarma, I.K. The Development of Early Saiva Art and Architecture, Delhi, 1982
Schiffer, M.B. Behavioral Archaeology New York, 1976
— Formation process of the Archaeological Records Maxico, 1987
Sergraves (ed.) Theory and Explanation in Archaeology London, 1963.
Shahjalal, M. Bangladesher Mritsilpa (in Bengali) Dhaka, 1985.
Shahnewaj, A.K.M. Visvasabhyata (in Bengali), Dhaka, 1993
Sharma, B.N. Iconography of Revanta, New Delhi, 1975
Shepard, A. Ceremics for the Archaeologists, Washington, 1956
Singh, JP. and Sengupta, G. Archaeology of North-Eastern India, New Delhi, 1991
Sinha, B.P. Archaeology and the Art of India, Delhi 1979
— Glorious Art of the sungo Age, Delhi, 1985
sircar, D.C. Silalekha Tamrasasonadi prasango (in Bengali), Calcutta, 1982
Smita, J.B. and Dwivedi, B. Modern Museum, New Delhi, 1979
Srivastava, K.M. New Fra in Indian Archaeology, Delhi 1982
Swarnakamal Protection and conservation of Museum

collections, Baroda, 1975
Swinnerton, H.H Outlines of palacontolagy London, 1965
Taylor, W. A Study of Archaeology, S.I. University press, 1964
Thaper, B.R. Recent Archaeological Discoveries in India, UNESCO, 1985
Walter, S. Archaeology, New York, 1966
Ware, D. and Beathy, B. A short Dictionary of Architecture, New York, 1985
Webster, G. Practical Archaeology, London, 1966.
Wheeler, M. New Techniques in Archaeology, London, 1966
— Still Digging, London 1930
— Archaeology from the Earth oxford, 1954
Winstone, H.V.F. Uncovering the Ancient world, London, 1985
Wood, E.E Collings Field Guide to Archaeology, London, 1968
Woodhead, P. Key Guide to Information source in Archaeology, London, 1985
Wooley, C.L. History unearthed, London, 1963
— Digging up the past, London, 1952
Yamamota, C. Introduction to Buddhist Art, New Delhi, 1990.
Zakariah, A.K.M. Bangladesher Pratnasampad (in Bengali) Dhaka, 1984
— Dinajpur Jadughar, Dinajpur, 1989
Zeuner, F.E. Dating the past, London, 1953
Zhao, S: (trs) Inside Stories from the Forbidden city Beijing, 1986

Harley, J.C. The art and Architecture of Indian subcontinent, Middlesex, 1986

Hasan, S.M. Glinapses of Muslim Art and Architecture Dhaka, 1984

Heizer, R. and Graham, J. A Guide to Field Methods in Archaeology, Palo Alto, 1967

Hodder, I. (ed.) Symbolic and Structural Archaeology, Cambridge, 1982

Hodder, I, and Orton, C. Spatical Analysis in Archaeology. Cambridge 1976

Hodges, H. Artifacts. London, 1965

Hoebel, E.A. Man in the Primitive world. New York, 1958

Hudson, K. Industrial Archaeology, Mthuen, London, 1966.

Huntington, L.S. The pala-Sena Schools of sculptures. Leiden, 1984

Hussain, A.B.M. (ed.) Sonargaon-Panam : A survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh, Dhaka, 1997

— Gaur-Lakhnawte : A survey of Historical Monuments and sites in Bangladesh, Dhaka, 1997

— Mainamati-Devaparvata : A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh, Dhaka, 1997

Islam, I.S.M.P. Islamic Calligraphy in the Medieval India, Dhaka, 1979

Jane, M. The Archaeologists Handbook, London, 1986

Joshi, N.P. Iconography of Balarama, New Delhi, 1979

Jouveau-Dubreuil, G. and Martin Iconography of south India, New Delhi 1978

Karim, R.M. and Akbar, S. Sonargaer Itihas : Utsa O upadan, Dhaka 1993

Keuyon, X. Beginning in Archaeology London, 1952

Khan, F.A. Mainamati, Karachi, 1963

Khan, M.H. Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal, Dhaka, 1988

Kossak, S. Early south Asian Art, The Metropolitan

Museum of Art, 1994.
Kramrisch, S — The Hindu Temple, Calcutta, 1946
Liam de paor — Archaeology : An Illustrated Introduction, London, 1971
Libby, W.F. — Radio carbon Dating, Chicago, 1955
Majumdar, N.G. — Inscriptions of Bengal, Vol. 111, Rajshahi, 1929
Matheus, S. — Photography in Archaeology and Art, London, 1966
Matson, F. (ed.) — Ceramics and Man, London, 1966
Mathews, W.H. — Fossils, Bones and Noble, New York 1962
Mecutchion, O.J. — Late Medieval Temples of Bengal, calcutta, 1972
Meitei, K.K. — Chandraketu Garh (in Bengali),, Calcutta, 1984
Miller, D. — Artefacts as catagories, cambridge 1985
Michall, G. — Brick temples of Bengal, New Jersey, 1983
Mitra, D — Buddhist Monuments, calcutta, 1971
Morlol, B.M. — General views on Archaeology, Washington, 1861
Morrison, B.M. — Lalmai : A Cultural center of Early Bengal, London, 1974
Mukherjee, B. N. — Kharoshti and kharoshti-Brahmi Inscriptions in west Bengal, calcutta, 1990
Murti, C.S. — The Art of India, New York, 1977
Okley, K.P. — Man : The Tool Maker, Chicago, 1964
Ordnance, S. — Some Notes for Beginners, London 1961
— Field Archaeology, London, 1963
Palmes, J.C. (Rev.) — A History of Architecture, Delhi, 1986
Panini, G.P. — The Prehistoric world, Italy, 1982
Pennell, G. — Techniques of Industrial Archaeology, Bath, 1966.
Powell, T.G.E. — Prehistoric Art, London, 1966
Qadir, M.B.A. — A Guide to paharpur, Karachi, 1963
Rahman, M.H. — Gangariddhi Thake Bangladesh, Dhaka, 1985
Rapport, R. and Helen, U. — Archaeology, New York, 1964
Raverty, H.G. (tran) — Tabakat-i-Nasiri by Maulana Minhaj-ud-din, New Delhi, 1970 (re-Print)

পত্রিকা ও প্রতিবেদন

Ancient India (different issues), Delhi.
Annual Report of the Archaeological survey of India (different issues) Delhi.
Bangla Academy patrika (different issues), in Bangla, Dhaka.
Bangladesh Archaeology, Dhaka, 1981.
Epigraphica India (different Issues), Calcutta.
Handbook to the Centenery Exhibition, New Delhi, 1961.
Indian Archaeology-A Review (different Issues, New Delhi.
Itihas parisod patrika (different issues), in Bangla, Dhaka.
Itihas Samiti patrika (different issues), in Bengali, Dhaka.
Jadughar parikrama (different issues), in Bengali, Dhaka.
Journal of the Institute of Bangladesh shedies (different issues), Rajshahi.
Memoirs of the Archaeological survey of India (different issues), Delhi
Monographs of the varendra Research Museum (different issues), Rajshahi.
Prehistory and the Beginning of civilization, UNESCO.
South and East Asia (different issues), London.
Uchchatara Manav vidya Gavesana patrika (different issues), University of Dhaka.

খ. গবেষণাপত্র ও মৌলিক রচনা

Ahmed, N. 'Recent Discoveries at Bhasu Bhiar', Bangladesh Lalit Kala (BLK), I. 1, Dhaka 1975

Ahmed, S. 'Antiquities of Barabazar', Journal of the Varendra Research Museum (JVRM), IV, Rajshahi, 1975-76

— Two Unpublished Mughal Mosques in Rangpur District, Bangladesh, Bangladesh lalitkala (BLK), I. 1, 1994

— The Mosque of Kismat Maria - A Study of Late Mughal Architecture, JVRM, VI, 1980-81

— Jahanabad Inscription : A Revised study', JVRM, VIII, 1994

Ahmed, S.M. 'Arabic and Persian Inscriptions from Sylhet', Bangladesh Archaeology (BA) I. 1, Dhaka, 1979

Akmam, A. 'A Few Inscribed Terracotta Plaques Depicting Scenes from Ramayana, Recently Discovered in Bangladesh', Studies in Archaeology, New Delhi, 1991

— Samprati Sangrihita Poramatir Visnu : Bangladesh Jatia Jadugharer Ekti Ullekyogya Sangyojana (in Bengali), Pratnatattva, Jahangirnager, I. 1, 1994

— Recently Collected Female Sculpture in the Bangladesh National Museum, Pratnatattva, II, 1975

Alam, A.K.M.S. 'paharpur : A Glorious World Heritage', Kristi. 3rd issue, Dhaka, 1987

Alam, M.S. 'Excavation at Bharat Bhayna Mound, Bangladesh: A Preliminary Report', Man and Environment, Poona, 1989

— Historicity of Po-shi-Po Vihara : An Inquary into the Antiquity of Bihar Dhap, District Bagura, Bangladesh, Bulletin of the Deccan College Research Institute, Golden Jubilee Volume, Poona, 1990

— Buddhist Establishments at Rupban Mura, Bangladesh, East and West, Poona, 1990

— Fossil wood Assemblage from Lalmai - Mainamati Range, Comilla, Proceeding of the Fourth SAARC Archaeological Congress (PFSAC), Dhaka, 1993

Ali, A.K.M.Y. 'An Inscription of Ala-al-Din Husayn Shah', JVRM, II, 1973

— 'A study of Mural Calligraphy in Bengal : Based on selected Muslim Epigraphs', JVRM, VII, 1981-82

— An Inscription of Sultan-as-Salatin, JVRM, IV, 1975-76

— Two Unpublished Arabic Inscriptions, JVRM, VI, 1980-81

— Two rare coins of Muhammad sha, JVRM, I, 1972

— Vanga : from Janapada to country, JVRM, IV, 1976-77

Ali, M. 'Some Important Antiquities from Mangalkot Mound (Bogra)', Journal of Bengal Art (JBA), I, Dhaka 1996

Ali, M.S : Thravada Buddhism in Burma : An Analysis of the Traditional Role of the Sangha', JVRM, VII, 1981-82

Banerje, A : Muslim Monuments in West Bangal-Origins and Development, JVRM, II, 1973

— 'Gupta Survival and Influence', JVRM IV, 1975-76

Bari, M.A 'The Masjid of Satgachhia-A Recently Discovered Jami', JVRM, VII, 1981-82

— The Azimpur Mosque at Dhaka : A Shylistic Evaluation', JVRM, VIII, 1994

Barua, R.B. 'Development of Buddhism in Upper Burma', JVRM, III, 1994

Bautze-Picron, C. 'From God to Demon, from Dimon to God : Brahma & Other Hindu Deities in Late Buddhist Art of Eastern India', JBA, I, 1996

Begum, A. 'The Mosque of Badruddin : A Rare Type of two - Domed Mosque', JBA, I, 1996

Lalbagh : The Mughal Fort, BLK, II, I, 1994

— The Mughal River Fort of Sonakanda, Shilpakala, VII, Dhaka, 1995

— Chatmoharer Masjid : Bangla - sthapaty Silpa Yogasandhilagner Nidarsan (in Bengali), Silpakala XVIII, 1992

— Shajadpur Masjid : Reflection on Architecture and Attempt to Date, Journal of the Asiatic society of Bangladesh (JASBD) XXXI, 2, Dhaka, 1986

— Jorbangla Muslim Samadhi (in Bengali), Bangladesh Asiatic Society Patrika (in Bengali), (BDASP) I, 1 & 2, Dhaka, 1992

— 'Shah Amanat Ullaher Samadhisaudher Sthapatya Paryalochana (in Bengali), BDASP, Ix, 1, 1991

— Bibi Mariamer Samadhi Saudha : Sthapatya Tatparya (in Bengali), Silpakala, 11:13, 1991

Bhattacharjee, S.B 'Terracotta Sealings of Bhasu Vihara', PFSAC, 1993

— Pratham Mahipaladever Viwala Tambrafalak (in Bengali), BDASP, Dec., 1987

— A New Find of Harikela Coins, Studies in Art and Archaeology of Bihar and Bengal (SAABB), Delhi, 1989

Bhattacharyya, G 'The New Pala Ruler Mahendrapala : Discovery of a Valuable Charter', South Asian Studies, IV, 1988

— The Magnificent Bronze Image of Vajrasattva from Mainamati, Bangladesh, JBA, I, 1996

Bhattacharyya, D.C 'Coomaraswamy and Buddhist Iconography', JVRM, IV 1975-76

— Brahmanyadeva - Visnu : A Composite from of Visnu and Karttikeya, JVRM, III, 1974

— An Illustrated Manuscript of the Lalitavistara, JVRM, V, 1976-77

— The Chaturmukhalinga Linga of Siva, JVRM, VI, 80—81

Bhattacharyya, N.N. 'Buddhism as Viewed by the Non-Buddhist Philosophers of India', JVRM, III, 1974

— Beginnings of Buddhist Research (1826-1881), JVRM, V, 1976—77

— Studies on Buddhist Art and Iconography, JVRM, VI, 1980-81

Biswas, K. 'Extension of Bengal Icono-Plastic Idioms in South East Asia', JVRM, VII, 1981-82

Bose, S.K. 'Recent Art and Architectural Finds from Tamluk', BLK, I, 2, 1975

Chakrabarti, D.K Some Aspects of Archaeological Field Research in Bangladesh, The Jahangirnagar Review, Part- C, II, Jahangirnagar, 1988

— A Note on the Prehistory of Bangladesh, Bangladesh Quest, 2(I), 1990

— Two Examples of Mauryan Art from Bengal, JBA, I, 1996

Chakrabarti, M 'Occurances of Neolithic Implements in West Bengal', Bulletin of the Cultural Research Institute, VI, 1, 1967

Chakrabarti, S. 'Inscribed Lacquer—ware from Bengal and Burma in the Indian Museum, JVRM, III, 1974

Chawdhury, A.M. 'Pala- Chandra relationship', JVRM, VI, 1980—81

— Mandoil Visnu Image Inscription of Vigrahapala II, JVRM, III, 1974

— Devaparvata : A stronghold in south-Eastern Bengal, JVRM, I, 1972

— Bengal at the rise of the Palas, JASP, X, I, Dhaka, 1965

— The Pala Empire at the Time of Mahipala (C. 995-1043 A.D.), JASP, XI, I, 1966

— Mahipala II and the Revolt of the Samantas, JASP, XI, 2, 1966

— Geography of Ancient Bengal : Pundravardhana Bhukti, JASBD, XXII, 3, 1977

— New Light on sultan Firuz Shah Tughluq's First Invasion of Bengal, JASP, VIII, 1, 1963

— Paharpur : Beyound the Frontiers, PFSAC, 1993

Chowdhury, J.R. 'Harihara Worship in ancient Bengal', JVRM, VII, 1981-82

Chowdhury, S. 'The Technique of Terracotta Art : A Study Based on the perspective of Ancient Indian terracotta Art', JVRM, VIII, 1994

Dani, A.H. 'Kushana Civilization in Pakistan, JASP XIV, 1, 1969

Dasgupta, K.K. 'Vasudeva-Krsna on Early Indian Coins and Seals', JVRM, V, 1980-81

Datta, A. 'The Art of Pottery Paintings in Bengal During Black and Red Ware (Chalcolithic) Culture', JBA, I, 1996

De, B. 'Some Syncretistic Icons of Ancient Bengal', JVRM, VII, 1981—82

De, G. — Pots, Pitchers and Lamps from Chandraketugarh : Myths and Motifs, JBA, I, 1996

— Clay Carts from Chandraketugarh, JVRM, VIII, 1994

Desai, Z.A. 'Correct Attribution of the Socalled Inscription of Nasir al-Din Mahmud Shah II of Bengal', JASBD, XXXIII, I.1978.

— The Socalled Chunakhali Inscription of Nasiruddin

Mahmud Shah, JASBD, XXIV-XVVI, 1979—81

— Some Aspects of the Arabic and Persian Inscription of Bengal, JVRM, VII, 1981-82

Farooq, A.A. Excavation of Mahasthangarh', BLK, II, 1, 1994

Ghafur, M.A. 'Fresh Light on the Sultan-Ganj Inscription of sultan Jalal al-din Muhammad Shah', JASP, VIII, I.1963.

— A Persian Inscription of Shah Hasan Arghun, JASP, VII, 1962

— Archaeological Research in Bangladesh, JASBD, XVII,1, 1972

Ghosh, D.P. 'The Copper-Plate Engravings of Ancient Bengal and the Source of South East Asian Art', BLK, I. 1, 1975

Gupta, K. 'The Controversial Name of a King mentioned in the Two Bhatera Copper—Plates', JVRM, III 1974

— The Agraharaksetra of Mayurasalmala, JVRM, IV, 1975—76

Gupta, K.P. 'The Mainamati Copper—Plate Inscriptions of the Khadga and Early Deva Times',BA, I. 1, 1979

Gupta, P.L 'The Date of Bakhtiyar Khilji's Occupation of Gauda, JVRM, IV, 1975-76

Gupta, R.D. 'The Art of Painting in Peripheral Bengal',JVRM, VII, 1981—82

Habibullah, A.B.M. 'An Unpublished Inscription from Sitalmath', BLK, 1,2, 1975

Haque, E. 'The Manasa Image of bengal', BLK, I.2, 1975

— Laksmi Image from Bengal : An Iconographic Study, BLK, I. 1, 1975

— Chandraketugarh : A Resume of Excavation Reports (1956-67), JBA, I, 1996

— Karttikeya Images of Bengal, JVRM, V, 1976—77

Haque, Z. 'Hunting on the Terrocotta Templs of Late Medieval Bengal', BLK, I, 2, 1975

Hasan, P 'Rugs, Niches and Prayer',JBA, I, 1996

Hasan, S.M. 'An Unpublished Inscription of Fath Shah of Bengal in the British Museum',JASP,XIII, 1, 1968

— A Note on Etymological Origin of the Term Masjid, JASP,XI, 3,1966

— Studies in the relationship between the 13th Century Pottery and Miniatures, JVRM, VI, 1980—81

— Some Interesting Weapons in the Collection of Bngladesh National Museum, BLK, I, 1, 1994

Hoque, M. M. 'Evidence of Mesolithic Culture in the Ganga Plain Area of West Bengal', Pratnatattva, II, 1995.

— Neolithic Settlement Pattern of the Lower Ganga Plain, Pratnatattva, I, 1994

Hosain, S 'Some Sultani Tanks in the Archaeology of Chittagong', PFSAC, 1993

Hosain, M.M. 'Highlight of the Early Medieval Icons in Wood from Bangladesh, PFSAC, Dhaka, 1993

— A Preliminary Study on the Pottery from Mahasthangarh, JASBD, XL, 1, 1995

— The Uninscribed Copper Cast Coins Found at Mahasthangarh, JASBD, XLI, 1, 1996

— Dinajpur : An archaeological Survey Report (In press), Directorate of Archaeology,Dhaka.

— Mritpatrer Pratnatattvik Samiksha Abong Bangladesher aitihasik Mrinmoy Taijas-Patra (in Bengali), Silpakala, 1,1997

— Kotbari : A newly Explored Site (Co-author),Bangladesh Quarterly, XVI, I, 1, 1994

— Bangladesher Nathyogi Darsan O Pratnatattva, (in Bengali),BDASP, XI,1 & 2. 1993

— Conservation of Cultural Heritage in Bangladesh : Present Situation and Problem, Proceeding of the 1994 Regional Trainning Seminar, Accu, Tokyo, 1995

Hussain, A.B.M. 'Notes on Muslim Architecture', BLK, I, 1975

— Kumarpur Tomb, JVRM, I, 1972

— Some Observations on the Development of Gaur-Lakhnawti and its Monuments, JBA, 1, 1996

— Two Late Mughal Inscriptions, JVRM, II, 1973

— Jahanabad Tomb, JVRM, III, 1974

— A Study of the Ferozah Minar at Gaur, JASP, VIII, 2, 1963

Husain,S. 'Archaeological Materials in Reconstructing the Early History of Bangladesh', JVRM, I, 1972.

— Some Historical Aspects of the Bhaturiya Inscription of Rajyapala, JVRM, II, 1973

— Some Historical Aspects of the Subhasitaratnakasa, JVRM, III, 1974

Huntington, L.S. 'Some Aspects of Bengal Stone Sclpture', BLK, I, 1, 1975

— Some Verses on Country Life in the Aryasaptasati of Sri Govardhanacarya, JVRM, IV, 1975—76

— The Terracotta Find - Spots of Pre-Muslim Bengal, JASP, XV.2, 1970.

— The Terracotta Plaques from Paharpur, JASP,VIII, 2, 1963

— Life of Village Women in Early Medieval Bengal, JASB, XIX. 2,1974

— Dress, Coiffure and Cosmatics of the Women of Pala Bengal, JVRM, V, 1976-77

Imamuddin, S.M. 'Bengal's Maritime Trade with the Far East upto the Sultanate period', JASB, XVII, 1, 1982

Islam, K 'Coinage in Ancient bengal', JVRM, I, 1972

Karim, A 'An Arabic Inscription from Murshidabad City',JBA, I,1966

— The Inscriptions of Khan Muhammed Mirdha's Mosque at Dhaka, JASP, XI. 2, 1966

— Mughal Nawwara in Bengal, JASP, XIV, I, 1969

— Date of Bakhtiyar Khalji's Conquest of Nadia, JASBD,XXIV-XXVI, 1979—81

— A Frseh study on the Biral Inscription of Saif-al-Din Firuz Shah,JASBD,XVII. I. 1972

— Some Inscriptions of Dhaka,JASP, XII. 2, 1967

— A fresh Examination on the Inscription Attributed to Mahmud Shah, JASP, XIII. 3. 1968

— An Unpublished Sultanate Inscription on a Mughal Mosque of Chittagong, JASP, IX. 2, 1964

— Two Hitherto Unnoticed Sultanate Mosques of Chittagong, JASP, XII, 3, 1967

— Significance of the Legend 'al Fath al-Kamru Wa-Kamtah Wa-Jajnagar Wa-Orissa' in the Coins of Ala Al Din Husain Shah, JASP, XV, 1, 1970

— Notes on the Navagram Inscription of Nusrat Shah, JASBD, XVII, 2, 1972

— The First and only Discovered Inscription of Ghiath al-

Din-Bahadur Sha, JVRM, VI, 1980—81

Karim, M.R. 'Some Silver Punch—Marked Coins of Wari-Bator', PFSAC, 1993

— New light on the Region of Sultan Sikander II of Bengal : A Numismatic Study, BLK, I.1, 1994

Khan, F.A. 'Development of Archaeology in Bangladesh', JVRM, I, 1972

Khan, M.H. 'Diffusion of Buddhism in Bangladesh', PFSAC, 1993

— Notice of an Ancient Mosque at Narayangonj, JVRM, VIII, 1994

Khan, M.R. 'Iron Objects of Eastern India and Bangladesh', PFSAC, 1993

— Some Organic Antiquities of Eastern India, C. 600 B.C. — 600 A.D. BLK, I, 1, 1994

Khatun, H. 'Wari-Batersvara : An Unexplored Proto-historic Site in Bangladesh', PFSAC, 1993

— The Tomb at Arifail in Comilla District, JVRM, VII, 1981—82

— Bangladesher Duiti Pantris Gambug Visista Masjid (in Bengali), Pratnatattva, II, 1995

Lahiri, A.N. 'Coins of the Sultans of Bengal and their Evidence on Chronology, JVRM, VII, 1981—82

Lahiri, B 'A Survey of Pre-Muhammedan Coins of Bengal', JVRM,VII,1981—82

Losty, J.P. 'Early Views of Gaur and Pandua by the Indian Artist Sita Ram', JBA, I, 1996

Mahmud, F. 'The Earliest Indian Swords', JVRM, VI, 1980—81

Maitra, A.K. 'The ancient Monuments of Varendra", JVRM,V, 1976—77

— Paharpur, JVRM, VI, 1980—81

Majlis, N.K. 'Miniatures in the Lalbagh Fort Museum Dhaka : An attempt at Identification and Fixation of Date', PFSAC, 1993

— Some Observations on the Ragamala Miniatures of the Murshidabad School of Painting, JBA, 1, 1996.

Majumdar, G.S. — 'Some Minor Viharas of Ancient Bengal', JVRM, VII, 1981—82

Mia,N.N. 'Garden in Archaeological Evidences and the Quranic Concept', The Islamic University Studies, I. 2, Jessore 1990

Mia, A.H. 'Medieval Forts in Bangladesh', PTSAC, Islamabad, 1988

— Cannons in the Subcontinent with a Special Reference to the Historical Cannons of Bengal, JASBD, XXXIV, 1, 1991

Miah, A.S. 'An Access to Pundravardhana City - A Recent Discovery in Mahasthan', PFSAC, 1993

— NBP ware from Mahastangarah in Bangladesh, PTSAC, 1988

Mitra, M. 'The Buddhist Goddess Aparajita : Four Armed Form', JBA, I, 1996

Morgan, J.P. and MCIntyre, W.G. 'Quaternary geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India, Bulletin of the Geological Society of America, 1959

Mukherjee, B.N. 'Some Observations on the Coins of Pattikeda (Pattikeda or Pattikera)', JVRM, IV 1975—76

— The Original Territory of Harikela, BLK, 1.2. 1975

— The Date of the End of Pala Rule in bengal (West Bengal and Bangladesh), JBA, I, 1996

— Place of Harikela Coinage in the Archaeology of Bangladesh, JVRM, VII, 1981—82

— Coins in Pre-Gupta bengal : Studies in Archaeology, Papers Presented in memory of P.C. Dasgupta, New Delhi, 1991

— A Survey of the Coinage of Harikela, Memoirs No. 7, Coinage and Economy of North Eastern states of India, The Numismatic Society of India, Varanassi.

— Commerce and Money in the western and central Sectors of eastern India (C.A.D. 750—1200), Reprinted from Indian Museum Bulletin, XVII,1982

— Earliest Datable Iconic Representation of the Buddha, JVRM, VI, 1980—81

Mukherjee, R 'A Winged Figure from Tamluk', JVRM, VII,1981—82

Mukherjee, S.K. 'A Note on Some Buddhist Antiquities in Terracotta from West Bengal', JBA, I, 1996

Mukhopadhyaya, M.M. 'An Image of Mahalaksmi from North bengal', JVRM, VIII, 1994

Musa, M.A. 'A Study of Muslim Calligraphy of Bangladesh in the Light of New Discoveries', PFSAC, 1993

Nizamuddin, M. 'A Fresh study of Silver Coins of Sultan Jalaluddin al-Din Muhammad Shah Ghazi', BLK, I, 1, 1975

BANSDOC Library
Accession No. 18409

— Fresh Light on Biral Inscription of Sultan Saif Al-Din Firuz Shah, JVRM, V, 1976-77
— Royal Title of Sultan Mahmud Shah II of Bengal, JVRM, VI, 1980-81
Niyogi, P 'Buddhism in the Mainamati — Lalmai Region', JVRM, VII, 1981—82
Paul, A.B. 'Prachin Banglar Vibhinna Janapada Abong Ekhane Prapta Poramatir Silapakarma' (in Bengali), Pratnatattva, I, 1994
Qadir, M. A. 'The Newly Discovered Madrasha Ruins at Gaur and its Inscription, JASBD, XXIV—XXVI, 1979—81
— Ancient Mosques at Bajra and Matubi in Noakhali District, JASP, XII. 3,1967.
— Gadagram Inscription and Advent of the Muslims in Bengal, JASBD, XVIII. 2.1983
— The So-called Ladies' Gallery in the Early Mosques of Bangladesh, JVRM, VII, 1981—82
Rahman, H 'Itakhola Mura Excavation, Comilla : A Recent Discovery in Bangladesh', PFSAC, 1993
Rahman, M 'Siva Nataraja', JVRM,VI, 1980—81
— Is Camunda a Matrka, JVRM, II. 1973
— The Socalled Mahamaya Image from Kagajipara (Dhaka), JVRM, I, 1972
— The Mahisamardini Images from Bangladesh, JASBD, XVIII.3. 1973
— The Kalyanasundara Images from Bangladesh, BLK, I, 1, 1975
— Hindu Bhaskarje Durga (in Bengali), BDASP, IX. I, 1991
— The So-called Vagisvari Image, JVRM, V, 1976—77
Rahman, P.I.S.M. 'Calligraphic Elements of the Arabic Alphabet', JASBD, XIX. 3. 1974
Rahman, S.S.M. 'Bangladeshe Pratnatattvik charcha :Ekti Samikha' (in Bengali), Pratnatattva, I, 1994
Ray, A. 'Terracottas from Excavation at Mangalkot (Burdwan)', JBA, I, 1996
— Some Stucco sculptures from Rajbadidanga, Murshidabad, JVRM. II, 1973
— Mangalkot : An Ancient Township : Its History and Archaeology, SAABB, Delhi, 1989
Rashid, M.H. 'The Mainamati Sculpture', BLK, I. 1, 1994
— The Geographical Background to the History and Archaeology of South-East Bengal, JASBD, XXIV. 6, 1979—81
— Stone Age in Bangladesh, Bangladesh Times, 16th September, Sunday Supplement, 1979

— The Mainamati Gold Coins, BLK, I. 1, 1975
— 'Pala Rule in South-East bengal', JVRM.III, 1974
— The Chandra Rulers of Bengal, JVRM.V, 1976
Santra, T. 'Late Medieval Temples of West Bengal : An Account of their Architects and Builders', BLK, I.2. 1975
Saraswati,S.K. 'Rare Architectural types in Manuscript Illustrations', BLK, I. 1, 1975
Selim, L.R. 'Paharpur Terracotta Plaques : Some Reflections on the Thermes, Methods and Style, JVRM, VIII, 1994
Sengupta, G. 'Problem of Pala Art and A Derivative Style in Assam', JBA, I. 1996
Serajuddin, A. 'A Few Remaks on A Painting by Khwaja Abd Al-Samad' JASBD, XXIII. 2, 1978
Shahnawaz, A.K.M. 'Sultanate Coins of Bengal and Its Scope for Reconstructions of Socio-Cultural History', Pratnatattva, II,1995
— Sultani Banglar Silalipir Vaisistya O Bhumika (in Bengali), Pratnatattva, I, 1994
Sharma, R.K. 'Folk Bronzes of Bangladesh' BLK, I.2. 1975
— A Fresh Study of Kanai Badasi Rock Inscription, JVRM, IV, 1975—76
— Mainamati Chandra Plates in a New Light, JASBD, XVII. 2, 1972
Siddhanta, S. 'Some Recently Acquired Sculptures in the Varendra Research Museum', JVRM, III, 1974
— The Jagadishpur Copper-Plate Grant of the Gupta Year 128 (A.D. 447—48), JVRM,1, 1972
Sirajuddin, M. 'Find of Some New Coins from Nawabganj', JASP, X. 2, 1965
Tarafdar, M.R. 'Some Aspects of the Mamluk Buildings and their Influence on the Architectures of the Succeeding Periods, JASP, XI. I. 1966
— Epigraphic and Numismatic Notes Bearing on the History of Pre-Mughal Bengal, JASBD, XX. 3, 1975
— Notes on Indo-Muslim Architecture, JASP. XI. 2, 1966
— Paintings of the Pala Period, JASBD, XXII. 3, 1977
Thapar, R. 'Interpretation of Ancient Indian History',JVRM, 11, 1973
Tinti, P.G. 'On the Brahmi Inscription of Mahasthan', JBA, I, 1996
Zakaria, A.K.M. 'Mahalbari Inscription of Husain Shah, JASBD, XXII. 3, 1977
— Muhammad Bakhtiyar's conquest of Nudiah, JVRM, VI, 1980—81
— Ikhtiyar-ud-din Muhammad Bakhtiyar's Expedition toTibet, BA, 1979
— Jagaddala Mahavihara, JVRM, VIII, 1994